১৯৯৭ সাল

ভরকান্ত সকাল। সূর্যের কড়া ঝিলিক।ব্যাস্ত শহর।কাকের আনাগোনা।

সকাল সকাল উঠেই জয়ার রান্না ঘরে আসতে হয়।বাড়িতে কাজের মহিলা থাকলেও তাদের হাতের রান্না জাহাঙ্গীর খেতে পারেন না। জাহাঙ্গীর চৌধুরী সে বরাবরই রাগি একজন মানুষ।খুব সহজে সবার সাথে মিশে

না।হাজারো রাগ ,ক্রোধ একজনের কাছে হার মানে সে হচ্ছে তার একমাত্র ছেলে।

সকাল ৮ টা নাগাদ __

জয়া রান্না ঘর থেকে জাহাঙ্গীর কে উদ্দেশ্য করে বললো,

সকাল সকাল উঠেই কি পেপার নিয়ে তোমার বসতে হয়? বয়স হয়েছে, বাহিরে একটু সকালে হাঁটতে বের হতে পারো। বসে বসে

থাকলে দেখবে ডায়াবেটিক্স টা বেড়ে যাবে।

জাহাঙ্গীর শান্ত স্বরে বলল,জয়া থামো তো, গুরুত্বপূর্ণ একটা নিউজ পড়ছিলাম, তুমি কি খবর পরো? জানো চারদিকে কি হচ্ছে?দেশের খবর রাখতে হয়। ভালো মন্দ জানতে হয়।

জয়া বললো,কি এমন হচ্ছে শুনি?

জাহাঙ্গীর আহ’’ত কণ্ঠে বললো,২৭ বছরের যুব ছেলেরা নিখোঁজ হচ্ছে। নিখোঁজ হওয়ার কিছুদিন পরে, ওদের লা’শ নদীতে, খালে বিলে, ক্ষেতে পাওয়া যাচ্ছে।ব্যাপার টা সাধারণ নয়।

জয়া নাস্তা তৈরি করা ছেড়ে দৌড়ে জাহাঙ্গীর এর কাছে আসে।

জয়া আতং’ক স্বরে বলল,কি বলো এসব দেখাও দেখি!

জাহাঙ্গীর পেপার টা জয়াকে দিয়ে বললো,এই দেখো।জয়ার চোখ গুলো ছানাবড়া হয়ে যায়। ভ্রু কুঁচকে দেয়। পেপারটা ভালো ভাবে পরোখ করে বললো ,সত্যি ই তো।আমার তো ভিষন ভয় লাগছে। আমাদের খোকা,বলেই মুখে হাত দেয়। চোখে মুখে জয়ার আতং'ক'র ছাপ ফুটে উঠে।

জাহাঙ্গীর বিষয়টা উপেক্ষা করে বললো, আহা তুমি আমাদের খোঁকাকে কেন টানছো, ও হচ্ছে বীর , সাহসী ছেলে। একজন এস আই , ওকে কে কি করবে? বরং ওর থেকে সবাই দূরে থাকে।

জয়া বললো, তুমি কি খবর টা সম্পুর্ন পড়েছো? এই দেখো!২৭ বছরের ছেলেরা নিখোঁজ হওয়ার পর শুধু ওদের খু’ন করা হয়না। ওদের

শরীর থেকে হা'র্ট বের করে নেয়া হয়।এটা কোন হা'র্ট পাচারকা'রী নয় তো?

জাহাঙ্গীর বিষয়টাকে এড়িয়ে গিয়ে বললো, সে যাইহোক, খেতে দাও । এসব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। জাহাঙ্গীর টেবিলে খেতে বসে।তৎক্ষণাৎ বাড়িতে উপস্থিত হয় সূর্য। অপূর্বর খোঁজে।

“আসসালামুয়ালাইকুম আংকেল কেমন আছেন? আন্টি কেমন আছেন? সূর্য সোফাতে বসল।

জয়া মৃদু হেসে বললো, সূর্য যে হঠাৎ তুমি।এসো এসো।

“না আজ আমার সময় নেই। এসেছিলাম অপূর্বর সাথে দেখা করতে।”বলল সূর্য।

” কিন্তু অপূর্বর তো বাড়িতে নেই!”জয়া তাকালেন সূর্যের দিকে।

” তাহলে কোথায়!?

“অপূর্ব ১৫ দিনের জন্য পুলিশ টুরে গেছে।

“সেটা কোথায়?

” বিক্রমপুরের রুশরাজ্যে।

সূর্য দৃষ্টি মেঝেতে স্থাপন করল। কিছু ভাবল এরপর বললো_তাহলে আজ আসি,ও ফিরলে আমার কথা বলবেন।

” তা অবশ্যই।

সূর্য তড়িঘড়ি করে চলে যায়।জয়া ও জাহাঙ্গীর তাদের প্রোপার্টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় তাদের পারিবারিক উকিল।

জাহাঙ্গীর উকিল কে দেখে খাবার রেখে উঠে আসে। কিছু কাগজপত্র নিয়ে দ্রুত পায়ে উকিল ও জাহাঙ্গীর স্থান ত্যাগ করে।

বিক্রমপুরের রাশরাজ্য ——-

রুশ রাজ্য–

ডিসি সাহেব সারাদিন তাদের টিমের সবাইকে বিভিন্ন জায়গা দর্শন করে দেখিয়েছে।ডিসি সাহেব সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো,

এখানের প্রতিটা জায়গা,অজানা অচেনা। তোমাদের হয়তো প্রশ্ন থাকতে পারে এখানে তোমাদের কেন এনেছি?এখানে কি হয়েছিল! কেন হয়েছিলো।কাদের বসবাস

ছিল!তা আমরা কেউ ই সঠিক ভাবে জানি না । তবে , অপা,রেশন এর জন্য কখনো এই রুশরাজ্যে জায়গাটা দরকার হলে যেন কারো কোন বিভ্রান্ত না থাকে, তাই এইখানে তোমাদের ক্যাম্পিং করানো।এভাবে ডিসি সাহেব রুশরাজ্যের আনাচে কানাচে সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল সবাইকে।

বিভিন্ন জায়গা পর্যবেক্ষন করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়।

টিমের সবাই ফিরে আসতে আসতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায় ক্যাম্পে।সবাই ক্লান্ত।

সবাই যে যার রুমে চলে আসলো। টিমে টোটাল ছিল ১৬ জন। একটা রুমে আটজন করে।সবাই বিশ্রাম এ বিলন হয়ে আছে। সারাদিন হেঁটে

হেঁটে বিভিন্ন যায়গা পরিদর্শন করেছে।

সবার মাঝ থেকে হঠাৎ অপূর্বর ইচ্ছা হয় তারা সবাই মিলে দিগন্ত নদীর তীরে যাবে। এই জায়গাটা তে নাকি কেউ আসে না। কিন্তু তার ইচ্ছে সবটা ঘুরে ঘুরে দেখবে তাও আবার রাতে। অপূর্ব সবসময় সাহসী ছেলে। কারো কথা শোনার মত নয় সে।

একজন সৎ সাহসী পুলিশ অফিসার।

অপূর্ব বললো,আমরা সবাই কিছুক্ষণ পর দীগন্ত নদীর তীরে যাচ্ছি।রাতে একবার যায়গাটা পরিদর্শন করবো।

সাদিক কাপা কণ্ঠে বললো,তোরা যা আমি না। কি ভয়া'নক জায়গা টা।

সাদিকের কথা শুনে অপূর্ব সহ, রায়হান,হিমেল,মিদুল,পলাশ খিল খিল করে হেঁসে উঠে।

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,একজন পুলিশ হয়ে ভয় পাচ্ছিস। আমি কারো কোন কথা শুনবো না। আমরা ঠিক ৬:৩০ বের হবো।সবাই অপূর্বের কথা শুনতে বাধ্য।কারন তাদের প্রান প্রিয় বন্ধু। '

৬:৩০ মিনিট ——-

অপূর্বের পরিকল্পনা মত সবাই বেড়িয়ে পরলো।

চাঁদনী রাত- জোসনায় আলোতে চারদিক দিনের মত আলোকিত হয়ে গেছে। চারদিক নিস্তব্ধ সুনসান।ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক,বাদুরের আলাপ আলোচনায় ভয়ানক রুপ ধারন করেছে।

নদীতে কিছু কিছু মাঝি জ্বাল ফেলছে।

সবাই হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর অবধি চলে যায়। সেখানে অবস্থিত ,

অনেক বড় বড় জঙ্গল। চারপাশে ঝোপঝাড়।দেখে মনে হয় এ্যামাজন জঙ্গল।সাদিক ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, হেই অপূর্ব চল ফিরে যাই। আমার কেমন জানি ভয় ভয় করছে।

অপূর্ব তৎক্ষণাৎ হুসসসস বলে চুপ নির্দেশক আঙুল দেখিয়ে সবাইকে চুপ করতে বলে।

“কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করল রায়হান।অবাক সে!চোখ দুটো ছলছলানি দিয়ে উঠল।

‘”কেউ আছে এখানে।আমরা ছাড়াও।”বলল অপূর্ব।

সাদিক বলল_এই ভয় দেখাস না। এখানে কেউ ভুলেও আসে না।

অপূর্ব ফিস ফিস করে বলল,আমি বলছি তো ওদিক টায় কেউ আছে।

পায়ের চপর চপর আওয়াজ আসছে।
সাদিক পুনরায় থমকে গিয়ে বলল_চল ফিরে যাই।
" তোরা এখানেই থাক আমি দেখছি। অপূর্ব সামনে এগিয়ে গেল।
সাদিক , পলাশ,রায়হন , সহ সবাই অপূর্ব কে বারন করলেও শুনলো না।

সাদিক বেশ বিরক্ত নিয়ে বলল_এই ছেলেটা আজ মরবে।

অপূর্ব জঙ্গলের ভেতরে চলে যায়। চারদিক নিশ্চুপ। গাঁ ঝিমঝিম।

হঠাৎ কানে ভেসে আসলো নূপুরের আওয়াজ।

অপূর্ব থমকে দাঁড়ায়। পূরো শরীর থেকে অঝরে ঘাম ঝরতে থাকে।

ভয়ার্ত কন্ঠে প্রশ্ন করলো,

“কে ওখানে কে ওখানে?

কারো কোন সাড়া শব্দ নেই।
অপূর্বর ডান হাতে পিস্তল বাম হাতে টর্চ।
অপূর্ব কাপা কন্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করে, আমি জানি এখানে কেউ আছে বেরিয়ে এসো । হঠাৎ অপূর্বর পেছন দিক থেকে কেউ দৌড়ে সামনের দিকে চলে যায়।অপূর্ব কিছুটা ভয় পেয়ে যায়।সে অনুসরন করে দৌড়াতে থাকে পেছন পেছন সামনে

থাকা ছায়া মূর্তি র। পরক্ষনেই সে বেখেয়ালির জন্য হোঁচট খেয়ে পরে যেতেই হাত থেকে টর্চ টা পরে যায়।

তবুও থেমে না থেকে উঠি দাড়িয়ে , অচেনা লোকটিকে পরোক্ষ করতে থাকে।

জোসনায় আলোতে চারদিকে আলোকিত হওয়ায় সামনের পরিচ্ছেদ টা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

অপূর্ব ঠিক ভাবে খেয়াল করলে দেখতে পায় অচেনা লোকটি কোন ছেলে নয়।একটা মেয়ে।

অপূর্ব অবাক হয়ে যায়। এই জঙ্গলে মেয়ে আসবে কোথায় থেকে। বুকের ভেতর ধুকবুকানি টা বেড়ে যায় তার।

অপূর্ব ভয় না পেয়ে মেয়েটার পেছন ছুটতেই , ধমকের সুরে

বললো,দাড়াও বলছি নয় গুলি করে দেবো।

মেয়েটি থমকে দাড়ায়। মেয়েটি হাঁপাচ্ছে।কম করে ৫-৬ হাত দূরে মেয়েটা ।চুল গুলো বেনুনি করা। পায়ে জুতো নেই।মুখটা সম্পুর্ন ঢাঁকা।

অপূর্ব পেছন থেকেই প্রশ্ন করে,কে তুমি আর এই জঙ্গলেই বা করছো কি,?

মেয়েটি কিছু না বলে সামনে হাঁটতে শুরু করে।

অপূর্ব মেজাজ দেখিয়ে বললো,

এই দাড়াও কে তুমি বলো নয়....

বলতেই মেয়েটি , এক অদ্ভুত কণ্ঠে উত্তেজক ভঙিতে বললো,“আমি এলিজা।

এলিজা! এখানে কি? এত রাতে কি করছো? চুরি না অন্য কিছু?বেশ বিচলিত হল অপূর্ব।

মেয়েটির উত্তরের আশায় থাকতেই , পেছন থেকে রায়হান,মিদুল, সাদিক_'অপূর্ব' অপূর্ব বলে ডাকা শুরু করলে অপূর্ব পেছনে তাকাতেই মেয়েটি গায়েব।

সামনে তাকাতেই দেখে মেয়েটি নেই। এত কম সময় কোথায় গেলো।

সাদিক অপূর্বর ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল_তুই ঠিক আছিস?

অপূর্ব স্বাভাবিক হয়ে বলল_ঠিক আছি ।তোদের বলেছিলাম না কেউ আছে।সেটা সত্যি।আর কোন ছেলে নয় বরং একটা মেয়ে।তবে অদ্ভুত ছিলো মেয়েটি। হয়তো লুকোচুরি খেলছে।

সাদিক হেঁয়ালিপূর্ণ ছাপে বলল_ধুর এই জঙ্গলে মেয়ে আসবে কোথা থেকে। তুই যে সুন্দর হয়তো'বা

জ্বীন দেখা দিয়েছিল। , বলেই সবাই অট্টহাসি দিয়ে উঠলো।

“চুপ কর। ও কোন জ্বীন নয়। অদ্ভুত ছিলো মেয়েটা ।নাম ও বলেছিলো।

“কি নাম জ্বীনের শুনি?“এলিজা।

রায়হান তখন বলল_জঙ্গল টা সুবিধের নয় চল এখান থেকে।

সাদিক তৎক্ষণাৎ কিছু ভেবে বললো – মেয়েটার বয়স কেমন হবে?

অপূর্ব আন্দাজ করে বললো-আনুমানিক ২৩-২৪ হবে।মেয়েটির বচন ভঙ্গি তে এমনটাই বুঝলাম।

সাদিক কিছু বললো না।বেশ কিছুক্ষণ সকলে নিরব রইলো।

অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে চারপাশ টায় চোখ বুলিয়ে নিলো। ভালো করে পরোক্ষ করলো।কেউ নেই। তবে সত্যি ই কি মনের ভুল?

এসব অপূর্ব ভাবতে ভাবতে সামনে যেতেই চোখ পড়ল মাটিতে । কিছু একটা চিকচিক করছে। চাঁদের আলো ভালো দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছিল কিছু একটা পরে আছে। অপূর্ব মাটি থেকে চিকচিক করা জিনিসটা তুলে দেখলো একটা নূপুর। হাতে উঠিয়ে নিলে মনে মনে ভাবতে লাগলো, এটা কোন জ্বীন

নয়। বাস্তবিক একটা মেয়ে ছিলো। আর ঐ মেয়েটির ই নুপুরটি।

কিন্তু কে এই জঙ্গলে ই বা কি করছিলো??

পরদিন সকাল বেলা—-সবাই খাবার খেয়ে যে যার মত বসে বসে গল্প করছে। এতদিন কি কি শিখলো। এসব নিয়ে বিভিন্ন কথায় সবাই মশগুল।

অপূর্ব এক পাশে বসে নুপুর টি দেখছে । আর ভাবছে। যদি কোন মেয়েলোক নাই হবে তবে নুপুরটি , এখানে কিভাবে আসলো?আর যদি কোন মেয়েই হবে, তাহলে এলিজা কে আর এই জঙ্গলেই বা কি করছে! উদ্দেশ্য কি ছিল?
হঠাৎ ডিসি সাহেব রুমে প্রবেশ করলো।

সবাই তাকে দেখে সম্মানের সাথে দাঁড়িয়ে যায়।ডিসি সাহেব সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো,

আজ আমাদের টুরের ১৫ দিন।

হয়তো সবার মনে একটাই প্রশ্ন। এমন একটা জায়গায় কেন নিয়ে এসেছি। গতকাল জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দিতে পারিনি।সবার ধারনা । আজ থেকে প্রাই চাঁরশো,পাঁচশো বছর আগে এখানে রাজা রা বসবাস

করতো। তাদের ই রাজ্য ছিল। কিন্তু তাদের কেউ অমানবিক ভাবে মেরে ফেলেছে। তার পর থেকে এই রুশরাজ্যে কেউ থাকে না। তবে, এখানে সবাই ঘুরতে আসে। তোমাদের এখানে টুর শুধু এইজন্য যাতে ,কখনো অপারেশন এর জন্য এই জায়গা টা দরকার হলে কারো মনে কোন বিভ্রান্ত না থাকে। আমরা শিঘ্রই চলে যাবো।

ডিসি সাহেব রুম থেকে চলে যাবে, ঠিক তখনি থমকে দাড়িয়ে পেছন ঘুরে বললো,সবাই তো খবর পেয়েছো।

অনেক দিন থেকে ২৭ বছরের ছেলেরা কিড,ন্যাপ হচ্ছে ।তারপর তাদের কেউ নৃশং,স ভাবে মেরে লা,শ গুলো এখানে ওখানে ফেলে যাচ্ছে।সব থেকে কৌতুহলের বিষয় হলো, এই পর্যন্ত যাদের ই লা,শ

পেয়েছে। তাদের কারো শরীরে হার্ট নেই।
অপূর্ব বললো,স্যার এটা নিশ্চয় মারাত্মক কোনো সাইকো কি’’লার -সাধারণ কেউ নয়।
রায়হান বলল_ আমরা সম্পুর্ণ’ভাবে চেষ্টা করবো এই কিলা,র কে ধরার জন্য।
ডিসি সাহেব বললেন_ very good .আমরা আগামীকাল এখান

থেকে চলে যাব সবার মনে থাকে যেন।Be safe alwaysবলে চলে যান তিনি।

সবাই সাইকো কি,,লার কে নিয়ে কথা বলছে।

অপূর্ব বাদে , অপূর্ব নুপুরটি নিয়ে মনস্থীর করেছে। আজকে এখান থেকে দূরে যে গ্রাম গুলো আছে , সেখানে যাবে এবং এলিজা কে

খুজবে। কে এই নারী, জঙ্গল ই বা এত রাতে কি করছিলো?

এই মেয়েকে খুঁজতে হবে।সাদিক পাশ থেকে আতংক কণ্ঠে বলল, ভাই আমার তো ভিষন ভয় করছে। ২৭ বছরের ছেলেদের অপ,হরণ করে ওদের খু,ন করে। তারপর শরীর থেকে হার্ট বের করে নেয়া হয়। কি সাংঘা,তিক বল ।

অপূর্ব বেশ হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে বলল_হুম ,ঠিক বলেছিস বিষয়টা খুবই অদ্ভুত।রুশ রাজ্য ক্যাম্পিং মেয়াদ কাল আজ শেষ। আগামীকাল সকালে সকলে ঢাকার উদ্দেশ্যে চলে যাবে।তাই সবাই শেষ বারের মত জায়গাটি পরিদর্শন করছে।কেউ কেউ হাতে নোট_কলম নিয়ে কিছু লিখছে।

রায়হান , তানভির,মিদুল সহ সকলে রিসোর্টের বাহিরে।

সাদিক অপূর্বর কাছে বসে আছে। অপূর্বর কার্যকলাপ পরোক্ষ করছে। গতকাল যে নুপুরটি অপূর্ব পেয়েছে সেটি নিয়ে ভাবনাতে মশগুল।অপূর্ব নুপুরটি কে দর্পন করে ভাবছে,কে ছিলো মেয়েটি?এই জঙ্গলে ই বা এত রাতে কি করছিলো?সবাই বলছে কোন জ্বী'ন। নিশ্চয়ই নয়।যদি কোন

জ্বীন ই হতো তবে, মেয়েটি নিজের নাম বলতো না।জ্বীন কি কখনো কথা বলে?নাকি মানুষের ছদ্মবেশে কোন জ্বীন ই এসেছিল?

অপূর্ব এসব ভাবতেই সাদিক অপূর্বর ভাবনা ভাঙিয়ে বললো,

নুপুরটি ফেলে দে। গতকাল কোন মেয়েই ছিল না ।তুই ভুল দেখেছিস।

অপূর্ব আপত্তি স্বরে বলল, অপূর্ব কোনদিন ভুল দেখে না।কোন মেয়ে

ছিল।আর আমি ওকে আজকে দিনের মধ্যে খুঁজে বের করবো। সাদিক কাট গলায় বললো,মানে? অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, এখানে দূর দূরে গ্রাম আছে।সেই গ্রামে গিয়ে মেয়েটিকে খুঁজবো। আশাকরি মেয়েটিকে পেয়ে যাবোসাদিক চাপ গলায় বলল, অন্ধকার রাতে তো মেয়েটিকে দেখেসনি। শনাক্ত করবি কিভাবে যে ওটাই সেই মেয়ে?

অপূর্ব সাদিকের সামনে নুপুরটি ঝুলিয়ে বললো,এটা থেকে।যার এই নুপুরটি নিশ্চয়ই যার তার-এক পা খালি থাকবে।আর অপর পায়ে এরকম নুপুর থাকবে ।আর মেয়েটি সুন্দরী হবে।চিনে ফেলবো।এখন তুই চল।

সাদিক বললো,এই কাট ফাটা রৌদ্রের মধ্যে আমি কোথাও যাচ্ছি

না। তাছাড়া জায়গাটা একদম ঠিক নয়। যদি আমার কিছু হয়?

অপূর্ব আওয়াজ করে হাসলো। বললো,এত ভিতু আমার বন্ধু।তোকে পুলিশের চাকরি টা কে দিয়েছে রে?

সাদিক চোখ সরিয়ে মাথা চুলকালো।

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,সবই টাকার জোড় তাইনা।

সাদিক হেসে বললো,তোর জন্য ই তো চাকরিটা নিয়েছিলাম।আর তুই কথা শুনাচ্ছিস।

অপূর্ব বললো,ঝগড়া না করে চল।

অপূর্ব এবং সাদিক গ্রাম খোঁজার উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পরে।

রুশরাজ্য থেকে দক্ষিণে কয়েক কিলোমিটার হেঁটে যায়। গাছপালা ব্যতিত কোন জনব মানব দেখলো না। শুধু হেঁটেই যাচ্ছে হেঁটেই

যাচ্ছে।সাদিক ক্লান্তি শরীরে বললো,ভাই আমি আর পারছি না। প্রচন্ড গরম লাগছে।

অপূর্ব বললো, আমার জন্য এতটুকু কষ্ট করতে পারবি না?

তৎক্ষণাৎ অপূর্ব সামনের দিকে দেখলো, একজন মৌলভি আসছে।

অপূর্ব মনস্থির করলো এনাকে জিজ্ঞেস করবে, এখানে কোথাও গ্রাম আছে কিনা।

মৌলভি কাছে আসতেই অপূর্ব লম্বা গলায় সালাম দিলো।

মৌলভি থমকে দাঁড়ায়। সালামের জবাব দিয়ে বললো,তোমরা কারা?

অপূর্ব বললো,আমরা শহর থেকে ক্যাম্পিং করতে এসেছি। এখানের গ্রাম গুলো পরিদর্শন করতে বলা হয়েছে।

কিন্তু এখানে তো গ্রাম ই দেখতে পাচ্ছি না।

মৌলভি বললো, উত্তর দিকে তিলকনগর। সেখানে কিছু গ্রাম পাবে।

অপূর্ব মৌলভী কে ধন্যবাদ দিয়ে তিলকনগর এর উদ্দেশ্যে চলে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ এর মধ্যে পৌঁছে যায় তিলকনগর।

অপূর্ব দেখলো প্রথমেই কিছু কাঠের ঘর দেখা যাচ্ছে।কাঠের হলেও আকর্ষণীয়।

বাড়ির পরিচ্ছেদ পরিপাটি। অপূর্ব বললো,চল এই বাড়িতে ই প্রথমেই যাওয়া যাক।

সাদিক বললো, কিন্তু আমরা বলবো কি? কিসের জন্য এসেছি?

অপূর্ব বললো,চল !আমাকে অনুসরণ কর।আমাকে দেখে কিছু শিখ। কিভাবে অচেনা মানুষের সাথে পরিচিত হতে হয় তোকে এখনই শিখিয়ে দিচ্ছি।

সাদিক মুখ কুঁচকে দিলো।সর্বপ্রথম পরলো ছোট একটি ঘর। অপূর্ব চড়া গলায় কেউ আছেন বলে ডাকলো। একজন বৃদ্ধা লোক বেড়িয়ে আসলো।বললো,কারা তোমরা?

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, চাঁচা আমরা শহর থেকে রুশরাজ্যে এসেছি। ক্যাম্পিং এর জন্য।

আশেপাশের গ্রাম গুলো ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করছিলাম।যা গরম পরেছে, পানির পিপাসা পেয়ে গেছে। লোকটি বললো, তোমরা দাঁড়াও আমি আনছি।

সাদিক বললো, তুই পানি খাবি?

অপূর্ব বললো,আমি খাবো কখন বললাম তুই খাবি।

কিন্তু আমার তো পিপাসা লাগেনি।

তো কি হয়েছে।তুই ই খাবি।

সাদিক কিছু বলার আগেই লোকটি পানি নিয়ে আসে।

অপূর্ব সাদিক কে ইশারা করলো। সাদিক ইতস্তত বোধ করে পানি টা খেয়ে নিলো। ততক্ষণে অপূর্ব আশপাশে পরোখ করলো।কোথাও কাউকে দেখতে পেলো না।যাকে দেখে গতকালের মেয়েটির মত মনে হবে।

প্রথম ঘরটি ত্যাগ করে।কিছুদূর আর একটা ঘর। অপূর্ব একই ভাবে সেই ঘরটি থেকেও পানি নিলো।সাদিক বাধ্য হয়ে খেলো। সেখানে ও তেমন কাউকে দেখলো না।

তৃতীয় আর একটি ঘর। অপূর্ব সেই ঘরে গিয়েও একই ভাবে ডাকলো।

সাদিক ক্লান্তি কণ্ঠে বললো,এই ভাই আমি আর পানি খেতে পারবো না। বলির পাঠা পেয়েছিস নাকি?

অপূর্ব বললো,পানি খেতে বলেছি।বি'ষ নয়।মনে কর আমার বিয়ের পানি পানি।

সাদিক বললো,বিয়েতে কেউ পানি খায়?

আমি খাওয়াই।

সাদিক ক্লান্তি চোখে অপূর্ব কে পরোখ করলো।

তৃতীয় ঘরটি থেকে কেউ পানি দিলে সাদিক বাধ্য হয়ে খেয়ে নিলো।

সাদিক বললো,এখন তো প্রচন্ড চাপ পেয়েছে।আর আমি খেতে পারবো না।আমি চলে যাচ্ছি।সাদিক চলে যেতেই অপূর্ব পেছন থেকে থাবা মেরে ধরে বললো,আর একটা ঘর আছে ঐ ঘরটায় যেয়ে তারপর চলে যাবো।

শেষের ঘরটি তে গিয়ে অপূর্ব অচেনা ভঙ্গিতে ডাকলো।কেউ বেড়িয়ে আসলো না। দ্বিতীয় বার ডাকার পর

একজন মহিলা বেড়িয়ে আসলো। জিজ্ঞেস করল,তোমরা কারা?ডাকছো কেন?

অপূর্ব বললো,আন্টি আমরা পুলিশ অফিসার।শহর থেকে এসেছি। এখানের গ্রাম গুলো পরিদর্শন করছিলাম। প্রচন্ড গরমের জন্য তৃষ্ণা পেয়ে যায়।তাই...

মহিলাটি বললো,তোমরা বসো আমি নিয়ে আসছি।

অপূর্ব বললো, অন্তত ইনি বসতে তো বলেছে।চল বসি।

সাদিক বললো,তুই কি বেহায়া ভাই।

ঘরের সামনের দিকে চৌকি পাতা। অপূর্ব সাদিক বসলো।

সাদিক কিছু টা শান্তি অনুভব করলো। অপূর্বর দৃষ্টি অস্থির । এদিক সেদিক বারবার পরোখ করলো। সেরকম কোন মেয়েকে দেখতে পেলো না।

ঘর থেকে মহিলাটি পানি নিয়ে আসলো।সাদিক খেয়ে নিলো।
অপূর্ব বললো, আঁচ্ছা আন্টি তাহলে আসি।অপূর্ব সাদিক ঘর থেকে বের হতেই অপূর্বর চোখ পরলো বাড়ির পেছনের দিকে। খোলা বাতাসে কেউ চুল শুকাচ্ছে। চুল গুলো এপাশ ওপাশ করে ঝাপটাচ্ছে।পরনে তার কালো রঙের থ্রিপিছ।ফর্সা গায়ের রঙের অধিকারী। উল্টো দিকে মুখ

ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্বর বুকের ভেতর উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। চোখের পাতাগুলো পলক ফেলতে ভুলে যায়। অপূর্ব এক ধ্যানে মগ্ন হয়ে তাকিয়ে রইলো।

সাদিক অপূর্বর ভাবনা ভাঙিয়ে বললো,এই কি সে?

অপূর্ব ধির পায়ে মেয়েটির দিকে এগোতেই ঘর থেকে কেউ লম্বা সুরে এলিজা বলে ডাকলো।

এলিজা পেছন ঘুরে মৃদু গলায় বলল,যাই মামি!

অপূর্ব থম মেরে দাঁড়িয়ে রইলো। ভাবলো,যাকে আমি খুঁজছি তাকে আমি পেয়ে গেছি।এই সেই ।

এলিজা অপূর্ব কে উপেক্ষা করে ঘরের দিকে দৌড়ে আসলো। অপূর্ব মসৃন চোখে দেখলো। লম্বা টে শরীর,ভি_ কার থুতনি, চকচকে ফর্সা, চুল গুলো কমড় অব্দি।এক

এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী। অপূর্ব অপলকে দেখলো,।

এলিজা ঘরের ভেতর চলে যায়।

অপূর্ব সাদিক কে বললো,এটাই সেই মেয়ে।

সাদিক বললো,চিনলি কিভাবে?

অপূর্ব বললো,ওর এক পায়ে নূপুর নেই। তাছাড়া এক্ষুনি তো, এলিজা বলে ডাকলো।

সাদিক বললো,এখন কি করবি?

অপূর্ব বললো,চল চৌকিতে আবার বসি।

অপূর্ব কিভাবে এলিজার সাথে কথা বলবে,সেই চিন্তায় মশগুল হয়।

অপূর্ব সাদিক কে কিছু বলার আগেই, দু'জন লোক একটা মেয়েকে পাঁজা কোলে করে ঘরে নিয়ে আসলো। তৎক্ষণাৎ ঘরের মধ্যে থেকে কান্নার ধ্বনি ভেসে আসলো।

লোকটির কোলের মেয়েটির বয়স ১৩ থেকে ১৪।

অপূর্ব শ্রবন শক্তি কড়া করলো।

ঘরের ভেতর থেকে হুহু করে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। এলিজা ভেজা কন্ঠে বললো,এই পাখি চোখ খুল।কি হয়েছে তোর? সাড়া দে!

পাশ থেকে এলিজার মামি বললো,টাকার অভাবে মেয়েটির চিকিৎসা করা হলো না।আজ এই

অসহায়ত্বর জন্য পাখির চিকিৎসা হলো না।অপূর্ব বুঝতে পেরেছে, বাচ্চা মেয়েটি অসুস্থ।

তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে দু'জন লোক বেড়িয়ে আসলো। একজন পকেট থেকে টাকা বের করে অপরজন কে দিলো।বললো, আপনার ভ্যান ভাড়া। ভ্যান ওয়ালা বললো, রমজান ভাই তোমার ভাগ্নির অবস্থা তো বেশি ভালো নয়। ভালো চিকিৎসা করাও।

শহরে নিয়ে চিকিৎসা করালে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাইবো।
রমজান বললো,শহরে নিয়ে চিকিৎসা করানোর মত আমাদের সমর্থ্য নেই। দেখি সৃষ্টিকর্তা কি করেন।তার উপর ছেড়ে দিলাম।
ভ্যান ওয়ালা চলে যায়।
রমজান পেছন ঘুরতেই দেখলো, দু’জন অচেনা ছেলে। রমজান ভ্রু কুঁচকে বললো,তোমরা কারা?

অপূর্ব আমতা আমতা করে বলল, চাঁচা আমরা রুশ রাজ্য থেকে এসেছি।গ্রাম টা পরিদর্শন করছিলাম।কাট ফাটা রোদের জন্য পানির পিপাসা পায়।তাই পানি খেতে আসলাম।

রমজান বললো,পানি খেয়েছিলে?

হ্যাঁ।রমজান বললো,তাহলে আসতে পারো।

অপূর্ব কিছু ভেবে আমতা আমতা করে বলল, চাচা কিছু মনে না করলে,একটা কথা বলবো?

রমজান নত দৃষ্টিতে বললো,বলো।

অপূর্ব বললো, আপনাদের কথা আমি দুর্ভাগ্যবশত শুনে ফেলেছি।

বাচ্চা মেয়েটি হয়তো অসুস্থ।টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেন না।

আমি চাই ছেলে হিসেবে আপনাদের পাশে থাকতে।

রমজান কোন জবাব দিলো না।

অপূর্ব পকেট থেকে কাগজ বের করে কিছু লিখে রমজানের হাতে দিয়ে বললো, এখানে আমার ঠিকানা দেয়া আছে।আমায় ভরসা করতে পারেন। রমজান কাগজ টা নিলো।

অপূর্ব সাদিক বাড়ি ছেড়ে বের হয়।
___রমজান কে এলিজা বললো,ঐ ছেলেটা কি বললো?
রমজান বললো, তোমরা তো শুনেছো।
এলিজা বললো,আমি কারো দয়া নিয়ে বাঁচতে চাই না। আমার বোন সুস্থ হয়ে যাবে।
রমজান কাগজ টা এলিজার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো,এটা রেখে দে।

যদি দরকার পরে তবে শহরে যেতেই হবে।

___অপূর্ব সাদিক রুশ রাজ্যর দিকে রওনা করলো। সাদিক বললো,তুই সত্যি ই ওদের সাহায্য করতে চাস? অপূর্ব বললো,যদি করি তবে দোষের তো কিছু নয়। মানুষ মানুষের জন্য। দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা হয়ে যায়। অপূর্ব সাদিকের ক্যাম্পে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়।

অপূর্ব খাওয়া-দাওয়া শেষ করে। দীগন্ত নদীর তীরে চলে যায়। নদীর তীরে উষ্ন মনে বসে আছে। চাঁদনী রাত। গরমের আওতাফ সন্ধ্যা হওয়াতে কিছু কম।নদীর ঢেউয়ের তরতূপ শব্দ ভেসে আসছে।দূর দূরে মাঝিরা জ্বাল ফেলছে।তৎক্ষণাৎ অপূর্ব কারো উপস্থিতি অনুভব করলো। পেছন ঘুরে দেখলো সাদিক।

অপূর্ব ভেজা কণ্ঠে বললো,সবার সাথে আড্ডা রেখে এখানে চলে আসলি?

সাদিক অপূর্বর পাশে এসে বসলো। বললো,তোকে ছাড়া অন্য কারো সাথে ভালো লাগে না।

অপূর্ব মৃদু আওয়াজে বললো,রায়হান কোথায়?

তৎক্ষণাৎ পেছন থেকে রায়হান বললো,আমিও দীগন্ত নদী দেখতে চলে আসলাম।

রায়হান ও বসে পরলো।

এতদিন টুরে কে কি শিখলো, না শিখলো,সেই নিয়ে তিনজন আলোচনা করছে।

রায়হান বললো, গতকালের মেয়েটাকে পেয়েছিস?

অপূর্ব বললো পেয়েছি।তবে কথা বলতে পারেনি।

রায়হান বললো, আগামীকাল সন্ধ্যায় তো আমাদের চলে যেতে হবে।তার আগে একবার কথা বলার চেষ্টা করিস। অপূর্ব মৃদু হাসলো।অপূর্ব বললো,চল সামনের দিকে যাওয়া যাক।

সাদিক ইতস্তত বোধ করলো। বললো, আমি ওদিকে যাবো না।

ওদিকে ঘন ঝোপঝাড়।কতটা ভয়া’’নক এই জায়গা।

অপূর্ব বললো,আরে কিছু হবে না চল। আগামীকাল তো চলেই যাবো। তার আগেই শেষ বারের মত রাত টা উপভোগ করি।

সাদিক বাধ্য হয়ে গেলো।

চারদিক নিশ্চুপ।দূর দূরে শেয়াল ডাকছে। বাদুড়ের আলাপ

আলোচনা। জোনাকি পোকাদের উর্ভব।

সাদিকের মনে হচ্ছে এখনই কোন জ'ন্তু জানো'য়ার তেরে আসবে।

বেশ কিছুক্ষণ চাঁদনী রাত উপভোগ করার পর অপূর্ব বললো,চল ফিরে যাওয়া যাক।

রিসোর্টের দিকে পা বাড়াতেই পেছন দিক থেকে পানির মধ্যে ঝব করে আওয়াজ আসলো।এমন মনে হলো

কেউ নদীতে কিছু ফেলেছে।অপূর্ব, রায়হান ,সাদিক হকচকিয়ে উঠলো। অপূর্ব বললো,কোন শব্দ পেয়েছিস? রায়হান বললো,পানিতে কেউ কিছু ফেলে গেছে।দূর থেকে একটা টলার যাচ্ছে।

অপূর্ব বললো সামনে এগোই।সাদিক অপূর্বর হাত ধরে রাখলো।

কিছুটা সামনে এগোতেই দেখলো,একটা সাদা বস্তা ভেসে যাচ্ছে।

রায়হান বললো,একটা লাঠির সাহায্য আনা যাক। সাদিক বাধা দিলো।

রায়হান শুনলো না।

লম্বা একটা লাঠির সাহায্যে বস্তাটা আনলো।

সাদিক ভয়ে চুপসে গেলো।অপূর্ব বস্তাটা খুললো। রায়হান টর্চ লাইট

দিয়ে দেখলো ,বস্তার ভেতর একটা ছেলের লা'শ।

অপূর্ব বস্তাটা সম্পূর্ন খুলে ফেললো।

২৬-২৭ বয়সের একটা ছেলের লা'শ।ছেলেটির হা'র্ট নেই।

সাদিক ছিটকে দূরে সরে যায়।

অপূর্ব বললো, এরকম নিকৃষ্ট খু'নি আর আমি দু'টো দেখেনি।কে এই খু'নি? ছেলেদের হা'র্ট নিয়ে কি করে?

রায়হান হতভম্ব হয়ে যায়।ঢাকা—
চৌধুরী বাড়ি

নতুন একটি দিনের আগমন নিয়ে আসলো প্রানপন্তর সকাল। চারদিকে পাখিদের কিচিরমিচির আওয়াজ। কাকের আশরে ভরা শহর।

জাহাঙ্গীর বৈঠকখানায় বসে পেপার পড়ছে। তৎক্ষণাৎ ডাকলো জয়াকে। বললো,জয়া কোথায় গেলে।সকাল হলেই তোমার কাজের শেষ থাকে

না । আমার দিকেও তো একটু দেখবে নাকি?রান্না ঘর থেকে জবাব আসলো জয়ার।বললো,কাজ ফেলে কি সারাদিন তোমার কাছে বসে থাকবো।

জাহাঙ্গীর ভ্রু কুঁচকে বললো,মনোরা কে তো বলতে পারো কাজ করতে। ওরা থাকতেও তোমার করতে হয়।

জয়া : বাড়িতে কাজের মানুষ থাকলেও তার কাজে সাহায্য করতে

হয় এটা আমাদের কোরআন বলেছে।

জানো না বুঝি।

বলেই জাহাঙ্গীর কে চা দিতে এসে,আতংক স্বরে প্রশ্ন করলো

জয়া: হ্যাগো অপূর্বর খবর কি আমার ভিষন চিন্তা হচ্ছে ওর জন্য। চারদিকে যা হচ্ছে।ফিরবে কবে আমার খোকা ?

জাহাঙ্গীর চায়ে চুমুক দিয়ে বললো,এত চিন্তার কোন দরকার নেই। শুনেছি দু এক দিনের মধ্যে ই চলে আসবে ।

জয়া ভারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,তুমি তো সবটা জানো জেনেও এত নিশ্চিত এ বসে আছো।

জাহাঙ্গীর জয়ার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো,জয়া, অপূর্ব আমার ও ছেলে আমিও ওকে ভালবাসি ।চিন্তা

নেই ও ঠিক ফিরে আসবে আর ওতো একা নয় সাথে অনেক জন।
দরজায় কেউ করা নাড়ার আওয়াজ। সকাল ১০ টা নাগাদ।মনোরা :আমি দেখছি কে!
দরজা খুলতেই দেখে চাঁদনি।জয়ার একমাত্র ভাইয়ের মেয়ে।
চাঁদনী : কেমন আছো মনোরা বুবু
মনোরা :- এইতো ভালো তোমার কি অবস্থা,?

চাঁদনী:এইতো ভালো ই।

মনোরা : ভেতরে যাও।–চাদনী ভেতরে এসেই জয়াকে দেখে মৃদু হাসলো। চাঁদনী উত্তেজিত কন্ঠে বললো,আসসালামু আলাইকুম ফুপি – বলেই পায় হাত দিতে গেলেই , জয়া ধরে আলিঙ্গন করে নেয়।

জয়া : কতদিন পর এসছিস , এতদিনে ফুপির কথা মনে পড়লো?

চাঁদনী : কি করবো , আমার পরিক্ষা ছিল।

আংকেল আপনার কি অবস্থা।

জাহাঙ্গীর : হ্যা মা খুবই ভালো।

ওকে ভেতরে নিয়ে যাও। ভালো মন্দ আপ্যায়ন করো।আমি ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছি।বলেই জাহাঙ্গীর বেড়িয়ে যায়। চাঁদনির ব্যাগটা মনোরা উপরের রুমে দিয়ে আসে।

চাঁদনী,দেখতে অনেক রূপবতী। সবার খুব আদুরে।

জয়া রান্না ঘরে গেলে চাঁদনিও যায়।

জয়া : তা তোর মায়ের খবর কি?

চাঁদনী হেসে বললো,সে আছে বিন্দাস।

চাঁদনী: ফুপি আজকে আমি রান্না করি।

জয়া : আমি থাকতে তুই কেন করবি ।।,

চাঁদনীর চোখ বার বার অপূর্ব কে খুঁজছে। এদিক ওদিক বার বার দেখছে। কোথায় যাবে অপূর্ব ভাবতেই,জয়ার পেছন দিকে সরে যায়।মনোরা নিচে বসে মাছ কাটলে চাঁদনী ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো, বুবু , অপূর্ব কোথায়?
মনোরা :দাদাবাবু তো, দূরে গেছেন বহুদিন। পুলিশ ক্যাম্পিং এ।শুনছি ২,১ দিনের মধ্যে ই চলে আসবো ।

চাঁদনী মনে মনে আনন্দের হাসি হাসলো।

তিলকনগর———-শায়ান

তালুকদার’ দুপুর থেকে নিমতলা পথের বাকে দাঁড়িয়ে আছে।

কাটফাটা রোদ তার গায় লাগছে না।

অপেক্ষা করছে কখন পাখি আসবে , অপেক্ষা করতে করতে অবশেষে অপেক্ষার প্রহর কাটলো।দূর থেকে দেখছে স্কুলের ছেলে মেয়েরা আসছে

, তাদের মাঝে হয়তো পাখিও থাকবে।

কিছুদূর এলেই দেখা মিললো পাখির ।

শায়ান : পাখি দাড়াও ।

পাখি ভালো করেই জানে কেন ডাকছে ।

পাখি না শোনার ভান ধরে হাটা শুরু করে।

শায়ান : দাড়াতে বলছি না।পাখি দুই কমড়ে হাত দিয়ে,শায়ানের দিকে আড় চোখে পরোক্ষ করো বললো,আপনাকে বলছি না আমার আপুকে বিরক্ত করবেন না।আমি আপনার বলা কোন কথাই আপুকে বলতে পারবো না।বলেই মুখ কুঁচকে দেয়।

শায়ান উৎফুল্ল হয়ে বললো,বাবা মেয়ের কি তেজ। তোমার আপুর

পেছন ঘুরবো না। শুধু এই চিরকুট টা নিয়ে তোমার আপুকে দিয়ে দিবে কেমন?

পাখি : না আমি দেবো না।

শায়ান : লক্ষী আপু না, এটা দিবে কিন্তু অবশ্যই। বলেই পাখির বইয়ের ফাকে দিয়ে দেয় চিরকুট টা।

পাখি হাটতে শুরু করলো আপন মনে। কিছুদূর যেতেই পেছন ফিরে একবার শায়ান কে পরোখ করলো।

শায়ান বিড়বিড় করে বললো,চিঠি টা জায়গা মত পৌছালে হয়।
দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো।
এলিজা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পাখির উদ্দেশ্য বললো,পাখি পড়তে বস। সামনে ই না তোর পরিক্ষা।
পাখি : তুমি পড়িয়ে দাও
এলিজা : হুম পড়াবো। তুই বোস , মাগরিব এর আজান দিয়েছে আমি নামাজ পরে আসি। নয় মামি যে

বকাবকি করবে।এলিজা চলে যেতেই পেছন থেকে পাখি ওরনাটা টেনে ধরে।

এলিজা থমকে দাঁড়ায়। পেছন ঘুরে মৃদু হেসে বললো,কি হলো আবার?

পাখি আদুরে কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, আপু , তুমি না আমাকে ঢাকা নিয়ে যাবে।চিড়িখানায় বাঘ দেখাবে।

এলিজা জ্বল জ্বল চোখে, পাখি কে বুকের মধ্যে জড়িয়ে, বললো,খুব

শীঘ্রই নিয়ে যাবো।অপেক্ষার ফল মিষ্টি হয় জানিস তো।পাখি : সত্যি নিবে?

এলিজা : হুম সত্যি নাও এবার পড়তে বস।

এলিজা ক্লান্তি চোখে কিছুক্ষণ পাখিকে পরোখ করলো। এরপর জয়তুন এবং এলিজা দুজনে উযু করতে চলে যায়।

এলিজা, জয়তুন দুজনে একসাথে নামাজ আদায় করে নেয়।
জয়তুন নামাজ বসে বসে তসবিহ পড়ছে।পাশ থেকে এলিজা নতসত হয়ে বললো,
মামি বিকেলে নিরু ভাবি ডেকে ছিলো। যাওয়া হয়নি। উনি সারাদিন ই মন খারাপ করে থাকে। এখন যাবো?

জয়তুন মৃদু হেসে বললো,ওমা এভাবে বলার কী আছে।যা,দু'জনে একটু গল্প কর।

আমি ততক্ষণে তোর মামার জন্য কিছু রান্না করি।

এলিজা দৌড়ে পাশের ঘরে চলে যায়।এলিজা ঘরে নিরাকে না পেয়ে বললো,ছোট চাচী, নিরা ভাবি কোথায়?

আনোয়ারা : নিরা পিছনে নদীর তীরের দিকে গেছে। এলিজা দ্রুত পায়ে চলে যায় নদীর পারে।

ছোট করে শ্মান করা সিড়ি বেয়ে গেছে নদীতে। নিরা শেষ শ্মানে বসে, দুটো পায়ের অর্ধেক পানিতে ভিজিয়ে বসে আছে। পরনে কাপড় টা হাটুর নিচ অব্দি।চোখ মুখ শুকিয়ে থাকে সারাক্ষণ।কোন এক অজানা ভাবনায় মশগুল থাকে।

চারদিকে জোসনার আলো ।

সন্ধা হওয়াতে গরম একটু কমেছে।

এলিজা : নিরা ভাবি ,আপনি এখানে।

নিরা এলিজার কন্ঠ পেয়ে হকচকিয়ে উঠে। হাতের উল্টো দিক চোখের পানি মুছে বললো,তুই! আয় বোস।

নিরা কাপা কন্ঠে বললো,তোর মামি আবার তোরে বকবো না?

এলিজা : না মামিকে বলেই আসছি। নম্র গলায় এলিজা, প্রশ্ন করলো, ভাবি তুমি সবসময় কেন মন খারাপ করে থাকো কেন? লুকিয়ে লুকিয়ে কাদো, মুখে কখনো হাসি দেখি না, তার কারন কি?

নিরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, ভুল করেছিলাম আমি সেদিন ভুল করেছিলাম। শান্ত চোখে নদীর দিকে

তাকিয়ে,ঘৃনিত কন্ঠে বললো,শুনতে চাস !কেন সারাক্ষন হতাশায় থাকি! মুখে কখনো হাসি ফুটে না!তবে শোন

নিরা বলতে শুরু করল,আজকে থেকে ৫ বছর আগে,তোর হাশেম ভাইয়ার সাথে, আমার ৩ বছরের সম্পর্ক ছিল। মন উজার করে ভালোবাসতো আমায়। আমার ব্যাথায়, সে ব্যাথা পেতো, আমার

কান্নায় সে কান্না করতো, একবার রান্না করতে গিয়ে হাত কেটে যায় আমার, সেই কথা শুনে তোর হাশেম ভাই নিজের হাত নিজেই কেটে ফেলে।

এরকম চলতে থাকে আমাদের প্রেম কাহিনী।আমার ভাই, যে বাবার মৃত্যুর পর সেই ছিল আমার বাবা, কথায় আছে বড় ভাই বাবার সমান। হঠাৎ একদিন সে জেনে যায়

সবকিছু। অনেক দিন তোর হাশেম ভাইয়ার সাথে যোগাযোগ বন্ধ থাকলে সে পাগল হয়ে যায়।ভাইয়া আমায় কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। তখন আমি বিবিএ দ্বিতীয় বর্ষে ছিলাম। তখন হাশেম,তার মা বাবার কাছে সবকিছু বললে তারা আমাদের সম্পর্ক মেনে নেয়।দেরি না করে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে । আমার দাদাকে কথায় গলিয়ে রাজি

করিয়ে নিলে, সেও রাজি হয়। কিছু দিন পর,ধুমধাম করে বিয়ে হয়। এই নদী থেকে ই শ্বশুর বাড়িতে আমার প্রথম যাত্রা শুরু হয়। তোর হাশেম ভাই আমাকে পেয়ে সেদিন যেন ঘরে চাঁদ পেয়েছিল।কিন্তু এই শুখ বেশি দিন স্থায়ী হইলো না।

বলেই আকাশের তাকিয়ে-ভারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। চোখ দিয়ে অঝরে পানি পরে।

এলিজা স্বাভাবিক কন্ঠে বললো,তারপর কি হয়েছিল? বলো না ভাবি।

নিরা হাতের তালু দিয়ে চোখ মুছে বললো,বেইমান ছিল হাশেম বেইমান।

এলিজা ভ্রু কুঁচকে বললো, বেইমানির কি করেছিল?নিরা বললো, বিয়ের ঠিক এক মাস পরে তোর হাশেম ভাই নিখোজ হয়।তার

হদিস কোথাও পাওয়া যায়নি। আমি পাগলের মত চারদিকে ছুটতে ছিলাম।কয়দিন পর হাশেমের চিঠি এলো। তার চিঠি থেকে জানা যায়,সে তার সাবেক প্রেমিকা রেখা কে বিয়ে করেছে। সে নাকি তাকে ভুলতে পারছিলো না। আমাদের বিয়ে হওয়ার পর ও সে ফিরে আসলে তাকে আবার গ্রহণ করে। বলেই অঝরে কান্না শুরু করে নিরা।

এলিজাও ফোপাতে শুরু করে।
নিরা ভেজা কন্ঠে বললো,তারপর আমি আত্মহ’ত্যার সিদ্ধান্ত নেই। কিন্তু মনে পরলো ভাইয়ের কথা। আমি চলে গেলে তার যে আপন বলতে আর কেউ থাকবে না।
নিজের মন কে শক্ত করলাম। ভাইকে চিঠি লিখলাম।আমাকে নিতে এসো।

, ৩ দিন পর ভাইয়ের উত্তর আসে। ভাই আমায় নিতে আসছে ।

সময় টা ছিল কালবৈশাখীর।১৯৯২ সাল।

অধির আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় ছিলাম ভাই নিতে আসছে বলে। কিন্তু সেদিন থেকে ৭ দিন পর্যন্ত ভাইয়ের কোন খবর নেই।নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়েছিল ।

ভাই ও শেষ অবধি বেইমানি করলো।

নিরা থমকে যায়।কথার বাকরুদ্ধ হারিয়ে ফেলছে।

শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললো, কিন্তু,আমার ধারনা ভুল ছিল। কিছুদিন পর তোর মামা রমজান, চাচার কাছে জানতে পারি ।সেদিন ভাই সত্যিই আমায় নিতে আসতে ছিলো।একটা টলার করে

আসতে ছিলো। তখন নাকি ,হঠাৎ ই শুরু হয় কালবৈশাখী ঝড়।আর এই কালবৈশাখীর ঝড় কেড়ে নিয়েছিল আমার ভাইকে।

নিঃস্ব করে দিয়েছিলো আমায়। গোটা দুনিয়া টা অন্ধকার হয়ে গেছিলো।

আমার ভাই আমার জন্য তার জীবন কোরবান করেছে ।

বলেই হু হু করে কান্না শুরু করে। ,
নিরার কান্নায় যেন প্রকৃতি ও থমকে যাচ্ছে।
এলিজা নিশ্চুপ চাহনি তে নিরাকে পরোখ করছে।
নিরা হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখের পানি মুছে বললো,জানিস এলিজা ,আমার ভাইয়ের অপেক্ষায় আমার ও আজ গাইতে ইচ্ছে করে ।
পথ চেয়ে বসে থাকতে থাকতে

ভেসে আসা মাঝি কে দর্পন করে জোড় গলায় গাইতে ইচ্ছা করে,—- তোরা কে যাস রে গাটি গাঙ বাইয়া —- আমার ভাই ধনরে বইলো নাইউর নিতে কইয়া — তোরা কে যাস কে যাস –বছর খানি ঘুইরা গেলো গেলো রে ভাইয়ের দেখা পাইলাম না, আ পাইলাম না –

কইলজা আমার পুইড়া গেলো গেলো রে ভাইয়ের দেখা পাইলাম না, পাইলাম না। —

নিরার কান্না শুরু হয়। থমকে যায় চারোপাশ। নিস্তব্ধ আকাশ।বাতাশে বেদনা।

এলিজা ওড়না দিয়ে চোখ মুছে দেয় নিরার। নিরা এলিজার হাত দুটো শক্ত করে ধরে বললো,মানুষ চিনা

বড় দায়, মানুষ হলো মুখোশোর আড়ালের নেয়।
যদি কোনদিন বিয়া করছ আগে তারে সঠিক ভাবে চিনবি, মনে রাখিস মিষ্টি কথার আড়ালে লুকিয়ে থাকে বিষাক্ত ছোবল।এলিজা দৃষ্টি সরিয়ে বললো,কাউকে কষ্ট দিয়ে,ঠকিয়ে কেউ বেশিদিন ভালো থাকতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা এর ঠিক বিচার করবো।

হঠাৎ পেছন থেকে এলিজাকে ডাকতে শুরু করে জয়তুন। জয়তুন বললো,তুই কখন ঘর থেকে বের হয়েছিস। ঘরে চল তোর মামা আসছে। নিরা তুমিও আমাদের ঘরে আসো।আলাপ করো।

বলেই চলে যান জয়তুন।

রুশরাজ্যে ——–—–ডিসি সাহেব সহ সবাই রিসোর্ট এ সি,রিয়াল কিলা,র

কে আলোচনা করছে। তৎক্ষণাৎ ডিসি সাহেব বললো,

তোমরা যে লা,শ টা পেয়েছো সেটা কি করেছো?

অপূর্ব : স্যার ওটা আমরা ফরেনসিক ল্লাবে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ডিসি সাহেব : Good job- তা কোন তথ্য পেয়েছ?

অপূর্ব : না স্যার এখন পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি।তবে খুব শীঘ্রই এই কিলা,র কে ধরে ফেলবো।

পরদিন সকাল বেলা—-

অপূর্ব এক কোনেতে বসে বসে নুপুরটি দেখছে।

সাদিক অপূর্বর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো,কি ভাই আজ সন্ধ্যায় তো আমাদের ঢাকা ফিরে যেতে হবে ।আর এই নূপুর টি দেখে আর কি

হবে।অপূর্ব একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো,মায়া মায়া ।আমি ওর মায়ায় পরে গেছি।

সাদিক : তুই কোথায় আর ও কোথায় কতটা ভেদাভেদ।কতটা দূরত্ব।

অপূর্ব : ভালোবাসা মানে না দূরত্ব।

সাদিক :তুই গেছিস ভাই।

অপূর্ব : আচ্ছা চল আজ একবার তিলকনগর যাই।

সাদিক বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললো ,আমি যাচ্ছি না কোথাও।আমি আর পানি খেতে পারব না।

অপূর্ব : আরে তোর পানি খেতে হবে না। এলিজা আমার জন্য নিমতলা অপেক্ষা করবে।

সাদিক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো,মানে কি বলছিস এসব ? স্বপ্ন দেখছিস না তো।

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,
গর্ধুভ তোর কি আমাকে কাচা খেলোয়াড় মনে হয়।
সেদিন যখন এলিজার বোনের জন্য আমার ঠিকানা দিয়ে আসছিলাম।
সেই পৃষ্ঠার অপর প্রান্তে লিখে দিয়েছিলাম।
সাদিক :কি লিখে দিয়েছিলিস?
অপূর্ব নুপূরটির দিকে তাকিয়ে উপর হয়ে সুয়ে বললো, লিখেছিলাম –

“রাতের আঁধারের রানি ”সেদিন জঙ্গলের চারদিকে অন্ধকার থাকলেও তোমার রুপের ঝলকানিতে, চারদিক আলোকিত হয়ে গিয়েছিল।

আমি জানি না তুমি সেই কিনা তবে , আমার মন কখনো ভুল বলে না।

বেশি কিছু লিখতে পারলাম না।তবে প্রথম দেখাতে কারো মায়ায় পরাটা হয়তো তোমার কাছে অবাক করার মত।

আগামীকাল আমরা চলে যাচ্ছি — যদি একটা বার আমার কথা তোমার স্মরণ হয় , যদি এতটুকু আমার অনুভূতি বুঝতে পারো তবেই এসো। তোমার জন্য বিকেলে নিমতলা অপেক্ষায় থাকবো।

সাদিক :ভাই এখানে নিমতলা আছে তুই জানলি কিভাবে আরে চিঠি কখন লিখেছিস?

অপূর্ব : চিঠি আমি আগেই লিখেছিলাম । জায়গাটার নাম গতকাল যাওয়ার সময় পরখ করি, । যখন ওর মামাকে কাগজটি দেই ঠিকানা লিখে ,তখন,নিমতলার কথাটিও লিখে দেই। আমার ঠিকানা ছিল সঠিক তবে উনি নিরক্ষর সেটা আমি ওনাকে দেখেই বুঝেছিলাম। আর ওটা নিয়ে এলিজার হাতে দিবে তাও বুঝতে পেরেছি।

সাদিক : তুইতো রোমিও হয়ে গেছিস আর এত বুদ্ধি।

অপূর্ব : চল নিমতলা যাই ।

সাদিক : ঐ মেয়ে কোনদিন আসবে না।

অপূর্ব : দেখাযাক কি হয়।

বিকেল ঠিক ৪ টা নাগাদ –

নিমতলা অপূর্ব ও সাদিক অপেক্ষা করছে।

সোনালী রৌদ্রর।নিলাকাশ মেঘ। দমকা হাওয়া বইছে।মাটির রাস্তার ধুলিকনা গুলো বাতাশে উড়ে বেড়াচ্ছে।প্রবল মূলক বাতাসে ,গাছ গুলো নেতিয়ে পড়ছে।

অপূর্ব সাদিক বেশ অনেকক্ষন দাড়িয়ে আছে নিমতলা পথের বাঁকে। কিন্তু কারো কোন খবর নেই।

সাদিক :ঐ মেয়ে আসবে না।

। অপূর্ব : আসবে আসবে।অপেক্ষা করতে করতে অপেক্ষার প্রহর কাটলো।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছে কেউ আসছে। সাথে ১৩-১৪ বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে। বুঝতে আর বাকি রইলো না।

এলিজা আসছে।

অপূর্ব মহাখুশি । এলিজা কে দেখতে জান্নাতি হুরের মত। খায়েল করা

চোখ। চিকচিক করা দেহখানী। পরনে নিল রঙের থ্রিপিস। এলিজা অপূর্বর কাছাকাছি আসতেই ,শায়ান তালুকদার’ দৌড়ে এসেই দাড়ায় এলিজার সামনে।

এলিজা থমকে যায়। অপূর্ব সাদিক দুজন দুজনার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করলো। অপূর্ব হতবাক হয়ে যায়। শায়ান অস্থির ভঙ্গিতে বললো,আমি জানতাম তুমি আসবে। তুমি জানো

তোমাকে আমি কতটা ভালোবাসি।, গত ৪ বছর ধরে আমি তোমাকে ভালোবেসে তোমার পিছন পিছন পাগলের মত ঘুরেছি। , ভালোবাসা তো কোন অপরাধ নয়।এলিজা চুপচাপ শুনছে।

শায়ান পাখির মাথায় হাত দিয়ে বললো, এই বুড়ি তোমার জন্য চকলেট, চিরকুট টা তোমার বোনকে দেয়ার জন্য।

পাখির চোখ গুলো ছানাবড়া হয়ে যায়।
সাদিক অপূর্ব কে উদ্দেশ্য করে বললো,কি ভাই তোমার স্বপ্নের রানি তো দেখছি.....
অপূর্ব ক্রোধের ভঙ্গিতে গাছের সাথে এক ঘুষি। তৎক্ষণাৎ চোখে রক্ত উঠে যায়।
এলিজা উল্টো দিকে মুখ ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে।

শায়ান আমতা আমতা করে বলল,আমি কাল চলে যাবো শহরে। ৩ মাস পরে আসবো। তখন তোমার মামার কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেবো।

অপূর্ব বিড়বিড় করে বললো,ইচ্ছা করছে ওকে এখানে ই পুতে ফেলি।

এলিজা কিছু বললো না। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে শায়ানের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো,বাড়ি যেতে

হবে। সন্ধ্যা হয়ে আসছেশায়ান : হ্যাঁ অবশ্যই চলো এগিয়ে দিয়ে আসছি ।

এলিজা : না দরকার নেই।

শায়ান : দরকার নেই মানে কি ,একা একা তোমার মত স্বর্গীয় পরীর পথ চলা ঠিক নয়।

এলিজা না চাইতেও বাধ্য হয়ে শায়ানের সাথে চলে যায়।

অপূর্ব চেয়ে চেয়ে দেখলো। এলিজার যাওয়ার পানে দেখলো।

কর্কট মেজাজে বললো,এখানে কোন গড়মিল হয়েছে ।

সাদিক : গড়মিল মানে ?

অপূর্ব : হ্যাঁ গড়মিল। যদি এলিজা একবার পেছন ফিরে তাকায় তাহলে ভেবে নেবো আমার ধারনাই সঠিক।

সাদিক : তাকাবে না, এই ছেলেই ওর নাগড়, ।

অপূর্ব : সাদিক মুখ সামলে।হাঁটতে হাঁটতে শায়ান, এলিজা অনেক দূর

চলে যায়। শায়ান ওর মতো করে বক বক করেই যাচ্ছে ।

এলিজার সেদিকে কোন ধ্যান ই নেই।

অপূর্ব সামনের দিকে এগিয়ে বারবার বলতে লাগলো,তাকা তাকা। একবার তাকাও তাহলে ই বুঝবো.....

হঠাৎ এলিজা-পেছন ঘুরে দেখলো। অপূর্ব উঠেই এক লাফ,, তাকিয়েছে।

সাদিক অপূর্ব কে পরোখ করে বললো,এ গেছে মাতোয়ারা হয়ে।

অপূর্ব : দেখেছিস ও তাকিয়েছে ।

সাদিক : তো এবার কি করবি।

অপূর্ব : যা করার তাই , চল এখন ফিরে যাই।

সাদিক জানি না এ ছেলের মাথায় কি ঘুরছে।-(বললো মনে মনে)

ক্যাম্পে সন্ধ্যা হতেই জাহাজ আসে।

সবাই ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে জাহাজে চলে যায়।

সাদিক : – চল বসে আছিস কেন।

অপূর্ব ভরাকান্ত মনে বলে উঠলো ,,রুশরাজ্যে, তিলকনগর খুব মনে পরবে।

সাদিক : তার চেয়ে বল এলিজা কে মনে পরবে।

অপূর্ব সাদিকের কথা শুনে আওয়াজ করে হেসে উঠলো।

সন্ধা হয়ে যায়। জাহাজ ছেড়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। , অপূর্ব অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রুশ রাজ্যের দিকে। নুপুরটি বের করে দেখছে। নুপুরটির দিকে তাকিয়ে বলল,, আপনার জন্য। আবার আসবো।...

তিলকনগর———––-এলিজা

রাগান্বিত হয়ে পাখিকে বললো,এই বদমাইশ, শায়ান তালুকদার’নাকি চিঠি দিয়েছে সেটা কোথায়, ?

পাখি বইয়ের দিকে দেখিয়ে দেয়।

এলিজা

বইটা ঝট করে খুলে দেখলো চিরকুট টা।

সেখানে লেখা ছিল,।

() যদি তুমি আমাকে এতটুকু ভালোবেসে থাকো। তবে আজ বিকেলে নিমতলা এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।

কারন আমি আগামীকাল ঢাকাতে চলে যাবো।

এলিজা,কপালে হাত দিয়ে বললো, হায়রে এটা আমি কি করলাম।

আমি তো ওনার চিঠি পরেই ওখানে গিয়েছিলাম।

পাখি- কার চিঠি?এলিজা পাখির দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো, তুমি এটা আমাকে দাওনি কেন?

পাখি :মনে ছিল না আপু।

এলিজা: মনে ছিল না বলে যেটা হয়েছে। জানি না কি হবে।

পাখি :আপু শায়ান ভাইয়া কিন্তু অনেক সুন্দর।

এলিজা: ধাত কি যে বলিস।বলেই শায়ানের চিঠিটা এলিজা ছিড়ে ফেলে।

ঢাকা চৌধুরী বাড়ি —

দরজায় করা নাড়ছে।

মনে হয় খোকা চলে এসেছে।জয়া দরজা খুলতেই দেখে অপূর্ব। অপূর্ব কে জড়িয়ে কান্না শুরু করে দেয় জয়া।কাপা কন্ঠে বললো,আমি তোর চিন্তায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম খোকা।

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,এত চিন্তা করার দরকার কি মা। তোমার খোকা এখনো কি ছোট আছে!! ভেতরে চলো আর তোমার হাতে

রান্না খাবো। আজ কতদিন ধরে তোমার হাতের খাবার খাইনা। খুব খিদে পেয়েছে।পরে সব গল্প করবো।

জাহাঙ্গীর সিড়ি থেকে নামতে নামতে শক্ত গলায় বললো,কে এসেছে আমার বীর সাহসী ছেলে?

বাবা বলেই জড়িয়ে ধরে অপূর্ব ।

অপূর্ব নিজের ঘরে যায়। চেয়ারের উপর ক্লান্তি শরীর নিয়ে বসে

পড়লো। অপূর্বর চোখ হঠাৎ কেউ চেপে ধরে।
অপূর্ব হকচকিয়ে উঠে বললো,কে ?
কোন সাড়া নেই। অপূর্ব ,হাত টা ধরেই সামনে আনতেই বললো আমাদের চাঁদনি আপা তাইতো!??
চাদনি অমৃদু হাঁসি দিয়ে বলল,কি করে বুঝলি?
অপূর্ব : আমি একজন পুলিশ আর পুলিশ কে ফাঁকি দেয়া এত সহজ

নয়। অপূর্ব জিনিস পত্র ব্যাগ থেকে বের করতে করতে বললো ,খুব টায়ার্ড কাল কথা হবে।

চাঁদনী :আরে খাবার টা তো খাবি নিচে চল।তোর পছন্দের সমস্যা খাবার রান্না করা হয়েছে।টেনে অপূর্ব কে নিচে নিয়ে আসে। সবাই একসঙ্গে খাবার খাচ্ছেচাদনি অপূর্ব কে মায়াবি চাহনিতে পরোক্ষ করছে। হাত ভর্তি পশম, নেশাযুক্ত লাল

চোখ।জোড় ভ্রু।বা ভ্রুর উপরে ছোট একটা তিল।চিকচিক করা গায়ের রং। যেকোনো মেয়ে অপূর্বর সৌন্দর্যর প্রেমে পরবে।

বাড়ির সবাই খুব আজ আনন্দিত। অনেক দিন পর অপূর্ব কে দেখে তাদের মোহতা কাটছে না।

রাত ১২ কা নাগাদ । অপূর্ব ঘুমোয়নি। ঘরের ভেতর এলিজার নুপুরটি নিয়ে পায়চারি করছে।

তৎকালীন অপূর্ব বুঝতে পারলো বাড়ির গেট খোলার আওয়াজ।

এত রাতে কে ? মনে মনে ভাবলো, কোন চোর নয়তো।চোর ই বা কি করে হবে। দারোয়ান আছে। অপূর্ব টর্চ নিয়ে বেরিয়ে যায়। চারদিকে নিস্তব্ধ।দূরে দু একটা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে ।গেটের কাছে যেতেই দেখে সূর্য।

অপূর্ব ভ্রু কুঁচকে বললো,একি সূর্য এত রাতে তুই এখানে? ব্যাপার কি ল্যান্ডলাইনে ফোন দিতে পারতি। কোন দরকার পরলে।সূর্য আতংকিত স্বরে বললো— রায়হান কে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অপূর্ব আহত দৃষ্টিতে বললো,কিহ কি বলিস! রায়হান তো সকালে বাসার দিকেই গিয়েছিল !

সূর্য :- হ্যা কিন্তু ও বাড়িতে ফিরেনি।- কোন বন্ধু বান্ধব এর বাসায় ও নেই।

বাকি ছিল তুই তার তোর কাছে আসলামকি বলিস কোথায় যাবে রায়হান –

কি হলো ওর—?তিলকনগর_

রমজান কাপা কন্ঠে , উত্তেজিত হয়ে বলো উঠলো,পাখি মা -পাখি মা কি

হইছে তোর। এ তোমরা কই দেখো পাখির কি হইছে।

দৌড়ে আসে-এলিজা জয়তুন।

পাখির কোন জ্ঞান নেই, জমিনে পরে আছে ।,রমজান পাজা কোলে করে চৌকিতে শুইয়ে দেয়। এলিজা পানি চোখে ছিটাতে থাকে।পাখি নিস্তেজ হয়ে আছে। এলিজা ভেজা কন্ঠে বললো,এইবোন চোখ খোল। আর কত কষ্ট দিবি এই অভাগা

বোনকে। বলেই অঝরে কান্না শুরু করে এলিজা

রমজান : আমাদের শহরে যাওয়া দরকার। ওর চিকিৎসা করানোর মত সমর্থন তো আমাদের নাই। এই অবস্থায় ওরে নিয়ে বসে থাকবো। সেদিন যে ছেলেটা আসছিলো, ওর কাছে একবার গিয়ে দেখলে হয়না?

এলিজা পাখিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে বললো,না মামা কারো দয়া নিয়ে

বাঁচতে চাইনা। আমার বোনের কিছু হবে না। আমি আছি আমার পাখির জন্য।

পাখি কিছুক্ষণ পর চোখ টিপ টিপ করতে থাকে। এলিজা পাখির মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, তোর কিছু হবে না। যতদিন আমি আছি।জয়তুন: আমাদের ছোট্ট পাখির কি হইবো শুনি!পাখি শিঘ্রই সুস্থ হইয়া যাইবো।

পাখি শোয়া থেকে উঠে বসলো। এলিজার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো।

এলিজা অন্য দিকে ফিরে হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখের পানি মুছে বললো,

-কি খাবি বল? আমি বানিয়ে দিবো। আজকে তুই যেটা বলবি সেটাই বানাবো।

পাখি মুচকি হেসে নরম গলায় বললো,আপু তোমার হাতে খিচুরি অনেক মজা ।
দিবে আমায় রান্না করে?
এলিজা : কেন দেবো না – আমার পাখির জন্য আমি জীবন দিয়ে দিতে পারি।
পাখির কপালে এলিজা চুমু খায়।
রমজান : তোগো এই বন্ধন আল্লাহ কোনদিন ছিন্ন না করে।

মামি তুমি পাখির কাছে থাকো আমি সবার জন্য খিচুরি রান্না করি।

এলিজা চৌকি থেকে উঠে যেতেই-পাখি পেছন থেকে ওরনাটা টেনে -ধরে।

এলিজা থমকে গিয়ে পেছনে তাকায়।

পাখি বললো,আপু আমাকে তুমি শহরে নিয়ে চিরিখানার বাঘ, সিনেমা দেখাবে না?

এলিজা পাখির কাছে গিয়ে দুই হাত পাখির দুপাশে রেখে বললো,– এবার তুই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলেই নিয়ে যাবো।

পাখি : সত্যি তো?

এলিজা : তিন সত্যি।

এলিজা রান্না ঘরে খিচুড়ি রান্না করছে। এলিজা করো উপস্থিতি অনুভব করলো।

মনে হলো পেছনে কেউ আছে। পেছন ঘুরে দেখলো নিরা দাঁড়িয়ে আছে।

এলিজা: ভাবি আপনি? একটা পিরি টেনে দেয়। মৃদু হেসে বললো বসো ভাবি।

নিরা : কাদছিস কেন এলিজা- ?

এলিজা – অন্য দিকে ফিরে হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখের পানি মুছে বললো,

কোথায় কান্না করছি। আগুনের তাপ লেগেছে হয়তো।

নিরা :বোকা ভেবেছিস , আমি সব বুঝি।

পাখির জন্য মন খারাপ- আল্লাহ চাইলে ঠিক হয়ে যাবে।

এলিজা নিরার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করলো।চোখে আগুনের ঝলকানি- নিয়ে বললো,পোড়া কপাল আমার।

নিরা এলিজার মুখে এরকম বাক্য শুনে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ভ্রু কুঁচকে ভাবলো এরকম কথা বলছে কেন।

ঢাকা স্টামফোর্ড কলেজ__মিরা কলেজের পিয়ন কে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করলো,শায়ান স্যার কোথায় ?

পিয়ন : সে তো ,বাংলা বিভাগের ক্লাস নিচ্ছে ৩ তলায়।কোন দরকার?

মিরা : না এমনি – বলেই মিরা চলে যায় তিনতলার দিকে ।

শায়ান তালুকদার’ ঢাকা স্টামফোর্ড কলেজের শিক্ষকতার চাকরি করেন । চাকরির তার কোন দরকার নেই। কারন তার বাবা একজন প্রতাবশালী। কিন্তু এলিজাকে পেতে হলে করতে হবে।নয় বেকার বলে সম্বোধন করে প্রত্যাখান করবে।মিরা

, বাংলা বিভাগ ক্লাসের সামনে এসে ঘুর ঘুর করছে। শায়ান ক্লাস নিচ্ছে। শায়ানের ক্লাস করার জন্য প্রতিটা মেয়েই পাগল। আর কারো ক্লাস করুক আর না করুক শায়ানের ক্লাস করার জন্য তারা পাগল।

শায়ানের চোখ পরলো মিরার দিকে। মিরাও একজন শিক্ষিকা-

শায়ান : মিরা ম্যাডাম কিছু বলবেন?

মিরা : না আসলে দুপুরের খাওয়ার সময় হয়েছে! খেতে যাবেন না?

শায়ান : হ্যাঁ , ক্লাস টা শেষ করেই যাবো।

মিরা :আমি আপনকে আজকে লাঞ্চ এর জন্য দাওয়াত দিলে কি গ্রহন করবেন?

শায়ান : কেন নয় ম্যাডাম। আপনার দাওয়াত ফেলা যায়।

বলেই একসাথে হেসে উঠলো শায়ান ও মিরা।

মিরা -ক্লাসের দিকে পরোখ করতেই দেখলো ক্লাস ভর্তি মেয়েরা । বুঝতে আর বাকি নয়। শায়ান ক্লাস নিচ্ছে আর মেয়েরা ক্লাসে করবে না এটা হতে পারে না।

তবে মিরার খুব হিংসা হচ্ছে। বলতে পারছে না।

ক্লাসের সময় শেষ।শায়ান : চলুন যাওয়া যাক।

দুজন পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটছে।,মিরা শায়ান কে উদ্দেশ্যে করে জিজ্ঞেস করলো,

শায়ান স্যার এর বাড়িতে কে কে আছে , ?

শায়ান : মা বাবা, দাদু, ছোট বোন।

মিরা : আর ভাবি ,?

শায়ান হেসে বলে উঠলো।বললো,

এখনো হয়নি তবে আশাকরি খুব শীঘ্রই হবে।

মিরা : এখানে ভালো একটা হোটেল আছে রজনীগন্ধা হোটেল চলেন ওখানে যাই।দুজন হাটতে থাকে পথের বাকে।- মিরা সাদা রঙের শাড়ি পরা চুলটা খোপা করা দেখতে ভারি সুন্দর লাগলেও , শায়ান পরোক্ষ ই করছে না। কিছুদূর যেতেই পথের কাছে একজন

বেলিফুল বিক্রেতা কে দেখতে পায় শায়ান।

শায়ান বেলিফুল এর মালা গুলো দেখছে। শায়ান বিক্রেতার কাছে যায়। শায়ান প্রশ্ন করলো বিক্রেতাকে

এই দুপুর বেলাও বেলি ফুল বিক্রি করছেন। শুকিয়ে যাবে না?

বিক্রেতা: কি করবো স্যার বিক্রি হচ্ছে না।

শায়ান : আমাকে দিয়ে দেন সব গুলো। বিক্রেতা মহাখুশি।

মিরার বেলিফুল পছন্দ, মনে মনে নিজের জন্য কিনছে সেই চিন্তা ই করছে।

মিরা:- ফুলগুলো কার জন্য?শায়ান মৃদু হেসে বলল,,তার বেলিফুল পছন্দ আর আমার পছন্দ তার মুখের হাসি।

মিরা:কার পছন্দ আমি কি জানতে পারি? ,

শায়ান : ম্যাডাম খুব খিদে পেয়েছে এখনি সব বলে দিলে , পরে বলবো কি ।

শায়ান বাম হাত করে- বেলিফুল গুলো বুকের সাথে আগলে রেখেছে। মিরা খেতে খেতে বার বার শায়ান এর দিকে পরোক্ষ করছে। এমন

ভাবে ফুল গুলো ধরে আছে যেন,কেউ ছিনিয়ে নিবে।

মিরা কোন প্রশ্ন করলো না।খাওয়া শেষ করে দুজনে ক্যাম্পাস এর উদ্দেশ্যে হাটতে শুরু করে।

মিরা- শায়ান দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো,

মিরা: স্যার আপনার কাছে ভালোবাসা মানে কি?

শায়ান ভারি একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেলে –বললো

শায়ান : ভালোবাসা মানে, যত্ন, ভালোবাসা মানে সম্মান, ভালোবাসা মানে ভালোবাসার মানুষ টিকে আগলে রাখা, তার দেহরক্ষী'তা হওয়া,তাকে বোঝা, কেউ তার ভালোবাসার মানুষটির দিকে খারাপ নজর দিলে তার চোখ উপরে ফেলা।

মিরা ঠোঁট কুঁচকে হেসে বললো,আপনি তো দেখছি পুরাই শাহজাহান।
শায়ান: শাহজাহান কিনা জানিনা, তবে শাহজাহান এর মত তাজমহল, না করতে পারলে তার জন্য পূরো জীবন টা উৎসর্গ করে দিবো।মিরা উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কাউকে ভালোবাসেন?

শায়ান: মুচকি হেসে ফুল গুলোর দিকে তাকিয়ে হ্যাঁ সুচক মাথা নাড়ে।

–

মিরা : কে সেই ভাগ্যবতী নারী– ?

শায়ান : আছে একজন ভুবনমোহিনী সুন্দরী রানী।যার সৌন্দর্যের তুলনা হয়না।তবে , সে চাক বা না ,চাক পরের সাত জনম ধরেও আমি তাকে ভালোবাসবো।

কথা বলতে বলতে ক্যাম্পাস এর কাছে চলে আসে।

চৌধুরী বাড়ি। (গতকাল রাতের বাকি অংশ) __

অপূর্ব ভাই মিথ্যা বলিস না ভয় দেখাস না। আমি জানি রায়হান তোর বাসায় ।

তোরা দুজন মিলে ভয় দেখাচ্ছিস। ছোট বেলায় ও তো ঠিক এমনটাই করতি।

অপূর্ব ক্রোধের স্বরে বলে বললো,ফালতু কথা বন্ধ কর। এটা মজা করার সময় নয় এতদিন পর বাসায় ফিরেছে। আর আমরা লুকোচুরি খেলবো।সূর্য : তাহলে ও কোথায়?

অপূর্ব : চল ওর বাড়িতে যাওয়া যাক।

সূর্য : তাও এত রাতে?

অপূর্ব:এখন রাতের হিসেব করে সময়
নষ্ট করা যাবে না।
গেটের সামনে গাড়ির দিকে এগোবে ঠিক তখনই পেছন থেকে অপূর্বর কাদে কেউ হাত দেয়। অপূর্ব থমকে দাঁড়ায়। পেছন ফিরে দেখে জয়া।
অপুর্ব: মা এত রাতে তুমি এখানে?

জয়া : তোকে দেখলাম , বাহিরে বের হচ্ছিস তাও এত রাতে কিসের জন্য দেখতে এলাম।

জয়া: বাবা, সূর্য তুমি এত রাতে? আসলে আন্টি হয়েছি কি- রায়হান এর কথা বলবে ঠিক তখনি অপূর্ব ইশারায় বারন করে।

অপূর্ব আমতা আমতা করে বলল ,মা- আসলে আমাদের এক বন্ধুর জন্মদিন, ওকেই সারপ্রাইজ দিতে

যাচ্ছি। তুমি ভেতরে গিয়ে ঘুমিয়ে পরো।

দারোয়ান চাচাকে ডেকে অপূর্ব বললো,

চাচা মাকে ভেতরে নিয়ে যান। আর আমি না ফেরা পর্যন্ত, গেটের সামনে থেকে নরবে না।

আচ্ছা স্যার,বলেই অপূর্ব – আর সূর্য গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়।

জয়ার বুঝতে আর বাকি রইলো না,অপূর্ব কিছু লুকিয়েছে। কিন্তু কি এমন হয়েছে তা যা লুকাতে হবে।

সূর্য:তুই তোর মাকে মিথ্যা বললি কেন?

অপূর্ব: সত্যি টা বললে আমাকে ঘর বন্দী করে রাখবে। চারদিকে যা হচ্ছে। মা তো চায় ই না আমি পুলিশ এর চাকরি করি।

রায়হান নিখোঁজ জানলে মা হতাশায় পরে যাবে।

সূর্য :- কিছুদিন আগে রায়হান এর জন্মদিনে শেষ দেখা হয় , কত আনন্দ করলাম , আর আজ কতদিন কোন কথা হয় না। ভেবেছি তোরা ফিরলে , দেখা করবো আগের মত আড্ডা দেবো।

অপূর্ব – থমকে গিয়ে গাড়িটা মাঝ রাস্তায় থামিয়ে দেয়।

সূর্যর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে ভ্রু কুঁচকে বললো,জন্মদিন? রায়হান এর ? কততম আর আমি জানি না।

সূর্য: তোর সাথে তো তখন ওর মনোমালিন্য হয়, ভুলে গেলি?

অপূর্ব : কত তম জন্মদিন ছিলো?২৭ তম।

এটা শুনে অপূর্বর কপাল বেয়ে ঘাম ঝরতে থাকে। হাত পায় কাপুনি শুরু হয়।

বির বির করে বলছে- এটা হতে পারে না এটা হতে পারে না।

সূর্য — এই কি হলো তোর ?

ঠান্ডা হাওয়া বইছে আর তুই ঘামছিস কেন?

অপূর্ব কাপা কন্ঠে বলে বলে উঠলো, কিছু না রায়হান এর জন্য চিন্তা হচ্ছে, ও যেন ঠিক থাকে। বলেই ক্রোধ দেখিয়ে স্টেরিয়াংএ একটা ঘুষি মেরে বললো, কি হচ্ছে এসব?

সূর্য: চল এত চিন্তা করে কি হবে রায়হান দের বাড়ি যাওয়া যাক। হতে পারে কোন এভিডিয়েন্স পেয়ে যাবো।

দরজায় করা নাড়ার শব্দরেনু বেগম: মনে হয় রায়হান এসেছে। কে আছিস দরজাটা খোল আমার রায়হান আসছে।

৫০ বছরের রায়হান এর মা।

হাটতে পারে না। উইল চেয়ারে বসে থাকেন সারাদিন।

সেলিম দৌড়ে গিয়ে দরজাটা খুলেই দেখে , অপূর্ব ও সূর্য –

পিছনের দিকে উকি মেরে বললো,

সেলিম : রায়হান কোথায় ও আসে নি তোমাদের সাথে?

অপূর্ব ও সূর্য দুজন দুজনার মুখের দিকে চোখাচোখি করলো। অপূর্ব বললো, আসলে আংকেল,ও আছে

হয়তো কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে।হয়তো লুকোচুরি খেলছে আমাদের সাথে।

রেনু : কইরে আমার রায়হান? ও কোথায়? অপূর্ব বাবা তুই আসছো। অপূর্ব রায়হানের মায়ের কাছে গিয়ে হাটু ঘেরে বসে বললো,আন্টি রায়হান এর কিছু হবে না, আমরা আছিতো।

অপূর্ব কান্না রত কণ্ঠে বললো, ওর তো লুকোচুরি খেলার অভ্যাস ছোট থেকে ই। ও চলে আসবে।নিজে থেকে যদি না আসে আমরা খুজে নিয়ে আসবো,। বড্ড বার বেরেছে ও। ওকে এবার পেলে দেখবেন ওর কি অবস্থা করি।

রেনু হুহু করে কান্না শুরু করে। অপূর্বর হাত ধরে বললো, আমি কিন্তু বাঁচবো না অপূর্ব।, আমার ছেলে

চাই। নয়তো আমায় মা ডাকবে কে? হা কে মা ডাকবে।রায়হান তাদের একমাত্র ছেলে।

আর কোন সন্তান নেই তাদের।

সেলিম: ওর কিছু হবে নাতো?

অপূর্ব :আংকেল এসব কি বলছেন ওর কিছু হবে না।

সূর্য এদিকে পুরো ঘর খোজে কোথাও কিছু পায়নি।

সূর্য অপূর্ব কে ইশারা করলো ঘরে কিছু পাওয়া যায়নি।

অপূর্ব – : আন্টি আমরা , আসছি আর দেখবেন রায়হান শীঘ্রই ফিরে আসবে ।

বলেই উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে আসবে – তখনই রেনু বেগম পেছন থেকে অপূর্ব হাত টা ধরে অপূর্ব থমকে দাঁড়ায়।রেনু বললো,কথা দাও

রায়হান কে সুস্থ সবল অবস্থায় ফিরিয়ে দিবে?
অপূর্বর ধুকবুকানি টা বেড়ে যায়।নত স্বরে বললো, আন্টি ও ফিরে আসবে কথা দিচ্ছি। বলেই চোখ মুছে বেড়িরে যায়।

অপূর্ব সূর্য কে বললো,চল তোকে বাড়িতে ছেড়ে দেই।, অনেক রাত হয়েছে।

সূর্য : না আমি চলে যেতে পারবো ।
অপূর্ব:সময় টা ভালো না একা যাস না। ওঠ গাড়িতে ।

সূর্য কে বাড়িতে ছেড়ে অপূর্ব বাড়ি চলে আসে।

রাত ২:৩০ মিনিট।

বাড়ির মধ্যে ই প্রবেশ করতেই দেখে চাঁদনী সিড়িতে বসে আছে।

তুই এত রাতে এখনো ঘুমোসনি??

চাঁদনী:কি করে ঘুমাবো ফুবু তোর চিন্তায় অস্থির হয়ে পরে আছে। কি এমন দরকার যে তোকে এত রাতে বের হতে হবে??অপূর্ব :আমি একজন পুলিশ, আমার রাত আর দিন নেই। যখন তখন কাজ থাকে। বলেই উপরে উঠতেই চাঁদনী পেছন থেকে বললো,অপূর্ব তোর ঘর থেকে এটা পেয়েছি। অপূর্ব ঘুরে তাকালে ই দেখে এলিজার নুপুর টি।

অপূর্ব : আমার জিনিসে হাত কেন দিয়েছিস, দে বলছি বলেই হাত থেকে টেনে নেয় ।

চাঁদনী:কার এটা?

অপূর্ব:সেই কৈফিয়ত কি তোকে দেবো।

বলেই নিজের ঘরে চলে যায়।

অপূর্বর মস্তিষ্কে হাজারো চিন্তা। –এত চিন্তার পর ও কোন এক কারনে অপূর্বর মুখে মৃদু হাসি।

আনমনে নুপুর টি দেখছে।বিড়বিড় করে বলছে,খুব শীঘ্রই তোমাকে আমার করে আনবো। এত দূরে তুমি তবুও কেন মনে হয়, খুব কাছে ।

আমার প্রিয় – এলিজা- বলেই নূপুর টিতে চুমু খায়।

এক বালিসে অপূর্ব অপর বালিসের উপর নূপুর টি। বললো,কবে যে নূপুর টির যায়গায় তুমি থাকবে।

রাত যতই বেড়েছে অপূর্ব চোখে ঘুম নেই। হঠাৎ উঠে বসে পরলো।

হঠাৎ করে মাথায় আসলো শায়ান এর কথা — বিড় বিড় করে বলছে- ঐ শালা না জানি আমার ভালোবাসাকে কেড়ে নেয়।না, না এটা কি ভাবছি।

ভাগ্য থাকলে আমার এলিজাকে কেউ কেরে নিতে পারবে না।

ভাগ্য থাকলে পাবো এমন চিন্তাও কেন করছি। তাকে পাওয়ার জন্য সত চেষ্টা আমি করবো, হাজার মানুষের সাথে লড়াই করে হলেও আমার ভালোবাসা কে আমার করবো।

বেশ কিছুক্ষণ একা একা বিড়বিড় করতে করতে,মনের অজান্তেই ঘুমিয়ে পরে।

তিলকনগর———————-অপূর্বর দেয়া চিঠি টি এলিজা খুলে পরতে শুরু করলো। দ্বিতীয় বারের মত।

একা একা হাসছে। আর ভাবছে ছেলেটা কত চালাক

এক প্রান্তে ঠিকানা অপর প্রান্তে ভালোবাসার কথা –

পাখি ,চুপি চুপি উঠে বসে,

পাখি :আপু তুমি শায়ান ভাইয়ের দেয়া চিঠি পরছো। আমি কিন্তু সব

জানি , ভাইয়া কিন্তু অনেক সুন্দর। তোমার সাথে ভালো মানাবে।এলিজা : পাকনা বুড়ি আপনি এখনো ঘুমাননি।

পাখি :ঘুমাবো কি করে পাশে বসে ফিস ফিস করে চিঠি পরলে!

তবেরে - বলেই আদুরে আচে মাইর শুরু করে এলিজা।

পাখি কাদ হয়ে এলিজাকে জড়িয়ে বললো,আপু আমার অনেক ইচ্ছা

তোমার বিয়ে হবে, তুমি লাল বেনারশী শাড়ি পরবে হাতে মেহেদী পরবে , আমাদের শায়ান ভাইয়া বর সেজে আসবে আর আমি নাচবো।

এলিজা : শায়ান তোর মাথা খেয়ে নিয়েছে।

চলেন এবার আপনি ঘুমাবেন। অনেক রাত হয়েছে। নয় শরীর খারাপ করবে। ....সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একটা লা’শ পাওয়া গেছে।

অপূর্ব আহত কণ্ঠে বললো,এটা হতে পারে না।নিশ্চয়ই অন্য কারো লাশ হবে।

বলেই চোখ মুখে হাত দেয়। চোখের কর্নারে রক্তে মাখা লাল কর্নিশ দেখা যায়।

একজন কনস্টেবল বললো,,স্যার ডিসি সাহেব আপনাকে যেতে বলেছেন।

অপূর্ব সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উপস্থিত হয়।

আশেপাশে অনেক মানুষ ভির করেছে।

অপূর্ব লা'শটার কাছে যেতেই থমকে দাঁড়ায়।

কনস্টেবল বললো,স্যার এটা তো রায়হান স্যারের লাশ।এটা শুনেই অপূর্ব থমকে যায়। শরীরের সমস্ত শক্তি নিমিষেই নিস্তেজ হয়ে যায়।

তৎক্ষণাৎ অপূর্বর ঘুম ভেঙে যায়। সকাল টা ঠান্ডা হলেও শরীর থেকে পুরোপুরি ঘাম ঝরছে।
অপূর্ব বিড়বিড় করে বললো,তার মানে এটা স্বপ্ন ছিলো। উফ আর একটু হলেই যেন আমার দম আটকে যেতো।
অপূর্ব উঠে হাত মুখ ধুয়ে নিচে নামতেই

ল্যান্ডলাইনে ফোনের আওয়াজ বেজে উঠে। ফোনের রিং পাওয়া মাত্রই অপূর্ব আতংকিত হয়ে যায়। রাতের স্বপ্ন টা না জানি সত্যি হয়ে যায়। এসব ভাবতে ভাবতে,অপূর্ব ফোন টা তুলে।

ওপাশ থেকে ডিসি সাহেব বললো, অপূর্ব তাড়াতাড়ি থানায় এসো। গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। বলেই ফোন টা কেঁটে দেয়।সকালের স্বপ্ন টা

আবার সত্যি না হয়ে যায়। মনে মনে প্রার্থনা করতে থাকে।

অপূর্ব তৈরি হয়ে থানার উদ্দেশ্যে বের হয়।

জয়া :খোকা খাবার টা তো খেয়ে যা!

অপূর্ব: না মা জরুরি কাজ আছে।

বলেই দ্রুত পায়ে বেড়িয়ে যায়।

জয়া : ছেলে টার চিন্তায় আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি।

দরজায় করা নাড়ার আওয়াজ ।

লুৎফা দরজা খুলতেই দেখে।পান্না মাস্টার – তার স্ত্রী- মিনারা বেগম। চাঁদনীর বাবা মা।

সাথে – তাদের ছোট ছেলে আয়ান।

জয়া : ভাবি আপনি — কতদিন পর।সেই কবে আসতে বলছি আর আজ আসার সময় হলো।

বলেই আলিঙ্গন করে জয়ার সাথে।

মিনারা :বাড়ির বাকিরা কোথায়?

জয়া :ওর বাবা বাহিরে গেছেন। অপূর্ব থানাতে।

চাঁদনী ; মা তোমরা না বলেই চলে এলে।মিনারা:হ্যাঁ- তোর বাবার শরীর টা ভালো নেই তাই ভাবলাম....

মিনারা কি বলতে চাচ্ছে বুঝতে পারে জয়া।জয়া মৃদু হেসে বললো,জাহাঙ্গীর ফিরলেই আজকেই ওদের বিয়ে নিয়ে আলোচনা করবো। অপূর্ব তো আজকাল ঘরেই

থাকে না। যদি বিয়ের পর রাখা যায় ।

চাঁদনী লজ্জা মুখ নিয়ে উপরে চলে যায়।

জয়া, মিনারা , সবাই আওয়াজ করে করে হেসে উঠে।

অপূর্ব কিছুক্ষণ এর মধ্যে থানাতে উপস্থিত হয়।

অপূর্ব:স্যার কোন খারাপ খবর নেই তো?

ডিসি সাহেব: রায়হান নিখোঁজ সবাই চিন্তিত। পূরো ডিপার্টমেন্ট , লজ্জায় মরে যাচ্ছে। উপর থেকে কড়া হুঁশিয়ারি আসছে-একজন পুলিশ অফিসার নিখোঁজ।

কি করছো তোমরা একজন অপরাধী কে ধরতে পারছো না।

অপূর্ব:স্যার – এটা নিশ্চয়ই কোন সিরিয়াল কিলার এর কাজ।

ডিসি সাহেব: তুমি কি বলতে চাচ্ছ? রায়হান কে ঐ কি,লার ই কিডন্যা,প করেছে?

অপূর্ব আতংকিত হয়ে বললো,

স্যার এমন টা মুখেও আনবেন না। ওর কিছু হবে না। ও একদম ঠিক আছে। আমরা ওকে খুঁজে বের করবো।

ডিসি সাহেব: যা করার করো,।

অপূর্ব সব পূরানো সিরিলায় কি’লার দের ফাইল নিয়ে একটার পর একটা পরোক্ষ করতে থাকে।

— অপূর্ব একটা একটা ফাইল খুলতেই চোখে পরে —

১৯৮০ সালের এক সি,রিয়াল কি,লার এর ঘটনা।জানুয়ারী ১৯৮০ সালে, বান্ডি অরল্যান্ডো , যিনি ছিলেন একজন সিরিলাল কি”লার।

তিনি একে একে ৩০ টা খু”ন করে , তাদের খু’ন করে তাদের শরীর থেকে কিডনি- চোখ বের করে নেয়া হতো। এবং মেয়েদের অপহরণ করে ধর্ষণ ও করতো।নিস্ঠুর ভাবে হত্যা করতো সবাইকে। ১৯৯০সালে বান্ডি নিজেই তার অপরাধ শিকার করে।

।বিচারের মুখোমুখি হয়েছিল বান্ডি, যেখানে তাকে কিম্বার্লি লিচকে

অপহরণ ও হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আদালতে উপস্থাপিত প্রমাণগুলির মধ্যে রয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য, তন্তু এবং লেক সিটি থেকে হোটেলের রসিদ।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে অনেক মৃত্যুদণ্ডের বন্দীর মতো, টেড বান্ডি তার অনিবার্য মৃত্যুদণ্ডের আগে কয়েক বছর কারাগারে কাটিয়েছিলেন।

ফ্লোরিডা রাজ্য কারাগারে নয় বছর পর, ২৪.জানুয়ারী, ১৯৯০-এ, টেড বান্ডির মৃত্যু ঘটে যখন তাকে বৈদ্যুতিক চেয়ারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

অপূর্ব ফাইলটা রেখে দেয়।

ভাবতে থাকে,,

বান্ডি নিজেই তার অপরাধ স্বীকার করে। তারপর তাকে ধরতে পারে। তাও ১০ বছরের ব্যবধানে।

আমরা কি করে, একে ধরবো কি চায় এই খু”নি , যার টার্গেট শুধু ই কি ২৭ বছরের ছেলেরা ।

ভাবতে ভাবতে অপূর্বর মাথা ব্যথা শুরু হয়চেয়ারে বসে পরে — পকেট থেকে এলিজার নুপুরটি বের করে দেখছে।

অপূর্ব একা একা বিড়বিড় করে বললো,

যখনই তোমার নূপুর টি দেখি। তখনই মনে এক অদ্ভুত শান্তি চলে আসে। হাজারো চিন্তার মাঝে প্রিয় মানুষ টির ভাবনাই পারে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করে দিতে।

আজকে ই মা বাবাকে গিয়ে এলিজার কথা বলবো।

হয়তো এলিজার জন্য ই কাজে মন বসছে না।সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ __

সবাই জয়ার ঘরে বসে চা খাচ্ছে আর বিভিন্ন গল্পে মশগুল হয়ে আছে।

লুৎফা সবাইকে পিঠা দিচ্ছে। অনেক দিন পরে জয়ার ভাই ভাবি এসেছে তাদের জন্য নানান আয়োজন ।

জয়া জাহাঙ্গীর কে উদ্দেশ্য করে বললো,হ্যা'গো অপূর্ব বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে । এখন তো ওর বিয়ে নিয়ে ভাবা উচিত।জাহাঙ্গীর চা টা

টেবিলের উপর রেখে বললো, আমি আর কি ভাববো। অপূর্ব আর চাঁদনী যখন খুব ছোট তখন থেকেই আমরা ভেবে রেখেছি- চাঁদনী কে আমাদের ঘরের বউ করবো। আমার কোন আপত্তি নেই।

মিনারা বললো, তাহলে তো হলোই। কি বলেন বেয়ান সাহেবা।

জয়া চাঁদনী কে উদ্দেশ্য করে বলে,,তোর কোন আপত্তি নেই তো মা? চাঁদনী না সুচক মাথা নাড়ে।

দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ _

লুৎফা দরজা খুললে দেখে অপূর্ব।

অপূর্ব:বাড়ির সবাই কোথায়?লুৎফা : সবাই আপনার বিয়ে নিয়ে আলোচনা করছে জয়া আফার ঘরে।

অপূর্ব কিছুটা রাগান্বিত হয়ে বললো,

মানে কি বলছেন এসব ? আমাকে কেউ কিছু না জিজ্ঞেস করেই বিয়ের আলাপ আলোচনা।

অপূর্ব জয়ার ঘরে চলে যায় –

অপূর্ব কড়া গলায় বললো,মা বাবা তোমাদের সাথে কথা আছে।

আমার ঘরে এসো। বলেই চলে যায়।

জয়া ও জাহাঙ্গীর বিস্ময়কর হয়ে ওঠে । কি হয়েছে আবার কি বলবে।

অপূর্ব দেয়াল ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে।

জয়া :কি হয়েছে কি বলবি?

অপূর্ব: মা আমি একজনকে ভালোবাসি, আর আমি ওকেই বিয়ে করবো।

তোমরা আমাকে কিছু না জানিয়ে বিয়ে ঠিক করে ফেললে?

জয়া :কি বলছিস এসব ।তুই যখন ছোট তখন থেকেই ভেবে রেখেছি , চাঁদনী কে তোর বউ করবো।

অপূর্ব :মা আমি কোন কথা শুনতে চাই না আর চাঁদনী আমার বোন । অন্যথায় কিছু না।

জাহাঙ্গীর :সে কোথাকার মেয়ে?

অপূর্ব :তিলকনগর ।তিলকনগর নামটা শুনতেই জাহাঙ্গীর এর চোখ গুলো ছানাবড়া হয়ে যায়। কপাল

থেকে ঘাম ঝরতে থাকে। জাহাঙ্গীর থম মেরে খাটে বসে পড়ে।

জাহাঙ্গীর : কি বলছিস তুই এসব আর কোন জায়গা পেলি না।

অপূর্ব :-ভালোবাসা কোন জায়গা, জাত বে-জাত, ধনী গরীব এসব মানে না।

জয়া: ব্যাপারটা এরকম নয়।

অপূর্ব:তাহলে কি?

জয়া কিছু বলতে গিয়েও থমকে যায়।

অপূর্ব : যদি তোমরা রাজি না থাকো তো বলতে পারো। তাহলে আমি এখান থেকে আজই চলে যাবো।

জয়া :খোকা- তোর মামি কে কি বলবো? তারা তোর আর চাঁদনীর বিয়ের জন্য ই এসেছে।

অপূর্ব শান্ত স্বরে বললো,তা আমি সামলে নেবো।তিলকনগর-----

–ভোর ঠিক ৬ টা নাগাদ

হঠাৎ করেই নিরার শ্বাশুরির কান্নার আওয়াজের ধ্বনি তে এলিজা সহ সকলের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

রমজান:কি হয়েছে চলো গিয়ে দেখি।এত সকাল সকাল কি হলো।

....

বুক থাপরে থাপরে কান্না করছে, নিরার শ্বাশুরি আনোয়ারা। নিরা কে কখনো ছেলের বউ মনে করতো না।

নিজের মেয়ের থেকে ও বেশি ভালো বাসতো।

আনোয়ারা:একি হলো – কে আমার নিরার এরকম অবস্থা করলো।, কে ওর জান টা কেড়ে নিলো-। বলেই অঝরে কান্না শুরু করে।

বাড়িতে মোটামুটি অনেক মানুষ জন ভির করেছে।— উঠানে একটা লাশ – লাশ টা আর কারো নয় নিরার। জয়তুন হতভম্ব হয়ে যায়। এলিজা

আনোয়ারার কাছে এগোয়।শান্তনা মূলক কণ্ঠে বলল,

এলিজা: চাচী কেঁদো ন।,কি করে হলো, কখন হলো??

কান্না তার থামছেই না।

পাশ থেকে এক লোক বলে উঠলো– আমি যখন ফজরের নামাজ পড়তে বের হই তখন ছোট রাস্তার পাশে নিরার লাশ পাই....

কিন্তু এর তো কোন শত্রু নেই।নম্র ভদ্র ছিলো। ওর এরকম কে করলো.....কে এই নিষ্ঠুর খু'নি?

রমজান লাশের উপর থেকে চাদরটা সরাতেই নিরার হাতের মুঠোয় বেলিফুল এর একটা মালা পায়। রমজান বেলিফুল টা ধরে দূরে ফেলে দেয় ।পাখি মালা টা দেখে-ফেলে।

নিরার শ্বাশুরির কান্না থামাতেই পারছে না।–

পাখি মালা টা মাটি থেকে তুলতেই – এলিজা হাত থেকে মালাটা নিয়েই ফেলে দেয়।

এলিজা: মৃত মানুষের কোনকিছু ব্যাবহার করতে নেই।

পাখি এলিজাকে জড়িয়ে ধরে বললো,

আপু কেউ কি নিরা ভাবিকে মেরে ফেলেছে ?

এলিজা :- জানি না কে তবে উনি ঠিকই ওনার সাজা পাবে।

একজন বয়স্ক লোক- পাশ থেকে বললো,হয়তো কোন দুশ্চরিত্রা লোকের কাজ , ধ'র্ষন করে মেরে ফেলেছে। দেখছো না হাতে একটা বেলিফুল এর মালা।- মনে হয় প্রেম নিবন্ধন করতে আসছিলো। যখন না

করে তখন ধর্ষন করে মেরে ফেলে।-রমজান :যা হবার হইছে ফেরেশতার মত মাইডারে যে মারছে ওর বেশিদিন ভালো কাটবে না। তোমরা গোসল এর ব্যবস্থা কর। লাশ বেশিক্ষণ না রাখাই ভালো। জয়তুন এলিজাকে ঘরে নিয়ে যায়। এখানে লোকজন ঘরে চল। এলিজা কান্না করছে। ।পাশ থেকে জয়তুন ভেজা কণ্ঠে বললো,,দুজন বন্ধুর মত

ছিলিস। সারাদিন কত গল্প গুজব করতিস।

আজ তুইও একা হয়ে গেলি।জয়তুন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,,

কে মারলো ওরে? কতই না ভালো ছিলো? মারছে হয়তো রাতে। কিন্তু মাঝ রাতে বাহিরে কি করছিলো নিরা.?

হাজার টা প্রশ্নে যেন জয়তুন এর মাথা ধরে যায়।এলিজা চৌকির এক কোনেতে বসে আছে।

চারদিক কেমন জানি, নিস্তব্ধ , সবকিছু ধোঁয়াশা হয়ে যাচ্ছে।”আমার সাথে ই এমন হয়। যখন মা বাবার সাথে থাকার কথা - পরিবারের সাথে হাসিখুশি থাকার কথা, তখন থেকেই আমি একা। মা কে হারালাম ।বাবাকে হারালাম।- হারালাম বড়

ভাইকে। মা বাবার মত পেয়েছি মামা মামী কে ।

র'ক্তের বলতে আছে শুধু ছোট বোন। বান্ধবীর মতো ছিল, নিরা ভাবি – সেও আজ নেই। চোখ দিয়ে অঝরে পানি পরছে এলিজার। চারদিক থেকে একাকিত্ব ধেয়ে আসছে।

আজ বড্ড একা লাগছে।

পাখি: তুমি কাঁদছ কেন আপু?

ভাবির জন্য মন খারাপ বুঝি। বলেই এলিজার চোখ মুছে দিলো।

রমজান বারান্দায় এসে বসে বললো,লাশ দাফন করে আসলাম। একটা গামছা দাও।গোসল করে ঘরে ঠুকি।

জয়তুন :এলিজা মা এভাবে মন খারাপ করছিস কেন!,হাত মুখ ধুয়ে আয়। আমি রান্না বসাই বেলা

গড়াচ্ছে।তোর ছোট চাচিকেও আমগো ঘরে নিয়ে আয়।

এলিজা মামির বাধ্য মেয়ে। হাত মুখ ধুয়ে ছোট চাচির ঘরে যায়।

জয়তুন অনেক কিছু ভেবে রমজান কে উদ্দেশ্য করে বললো,,

জয়তুন:আমাগো এখন এলিজা কে নিয়ে ভাবা উচিত।, জোয়ান মেয়ে, চারদিকে যা হইতেছে।

রমজান ;তুমি ওর বিয়ের কথা কইতেছো?

জয়তুন :তা নয়তো কি- নিরার যেভাবে মৃত্যু হলো। এলিজা কে কারো হাতে তুলে দিতে পারলে আমি মরেও শান্তি পামু।

রমজান : হঠাৎ করে তো হয়না দেখি কি করা যায়।

চৌধুরী বাড়ি——

মনোরা : চাঁদনী ম্যাডাম আপনারে অপূর্ব দাদা ছাঁদে ডাকছে।
চাঁদনী ভাবতে থাকলো ,হয়তো বিয়ের জন্য অপূর্ব খুব খুশি। না জানি কি বলবে আমাকে। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে চলে যায় অপূর্বর কাছে।
অপূর্ব ছাদের রেলিং ধরে উল্টো ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে।
চাঁদনী : ডেকেছিস?অপূর্ব উৎফুল্ল হয়ে বললো,হ্যা- আমি জানি চাঁদনী,

তুই আমাকে ভালোবাসিস না, আর আমিও না। তাও তুই জানিস।কিন্তু তোর বাবা মা- আমার মা বাবা তারা সে-ই ছোটবেলার ওয়াদা নিয়ে পরে আছে।

চাঁদনী অশ্রু চোঁখে তাকিয়ে আছে।

কি বলছে এসব অপূর্ব ”ওকে নিয়ে যে আমি সেই ছোটবেলা থেকেই একটু একটু করে স্বপ্ন দেখেছি।

চাঁদনীর ইচ্ছা করছে এখনই ছাঁদ থেকে লাফ দিতে।

, অপূর্ব, : তুই মামা মামী কে সবটা বুঝিয়ে বলিস।আর হ্যাঁ,, তোকে তো বলাই হয়নি, আমি একজনকে ভালোবাসি ।-তার নাম এলিজা । সেদিন অন্ধকার রাতে যেন জোছনার মত আলো নিয়ে এসেছিলো।

অপূর্ব চাঁদনীর দিকে দৃষ্টি স্থাপন না করেই ছাদ থেকে চলে যায়।-

নিজের প্রিয় মানুষ টির মুখে – তার প্রিয় মানুষ এর কথা শোনা যে কতটা বেদনাদায়ক সেটা আজ বুঝতে পারছি।

, কতটা ভালোবাসি আমি ওকে, আর আজ যাকে ভালোবাসি তার মুখে অন্য কারো নাম।

চাঁদনী মনে মনে নিজের মৃত্যু কামনা করতে থাকে। অঝরে কান্না শুরু করে।

জাহাঙ্গীর জয়া তারা মনস্থির করলো। ছেলের যাকে পছন্দ তাকেই বউ করে আনবে। একমাত্র ছেলে তার আবদার কখনো অপূর্ন রাখে না।

জাহাঙ্গীর হতাশার ছাপ নিয়ে বললো,জয়া তুমি তো সবকিছু জানো ।

জয়া:অতিতের কথা এখন মনে করে কি লাব!ছেলেকে খুশি রাখতে হলে

আমাদের যেতে হবে। ওকেই বউ করে আনতে হবে যে।

আগামীকাল আমরা তিলকনগর যাবো।বললো জয়া অপূর্ব কে।

অপূর্ব মহাখুশি।

তার প্রিয় এলিজাকে সে নিজের করতে চলেছে যে।

পরদিন সকাল বেলা

তিলকনগর———–কি তালুকদার সাহেব, শুনলাম তোমার ছেরায় নাকি

ঐ রমজান আলির ভাগিনার পেছনে ঘোরে- শুনলাম তাদের রাশলিলা চলতেছে** আপনার মানইজ্জত আর থাকলো কই,(বললো একজন সবজিওয়ালা)

ফরিদ তালুকদার* এলাকার প্রতাবশালী ব্যাক্তি।শায়ান তার একমাত্র ছেলে। ফরিদ তালুকদার প্রচুর রাগী মানুষ। রাগ উঠলে সে কি করে নিজেই জানে না।

বাজারে এসে , একজন সবজি বিক্রেতার কাছ থেকে এরকম কথা শুনবে আশাই করেনি। মাথায় রক্ত উঠে যায় ।

ফরিদ তালুকদার,, মনস্থির করলো।

এলাকা থেকে রমজান দের তারিয়ে দেবে।

যেই চিন্তা সেই কাজ ।

সেদিন ই কিছু ছেলে ফেলে নিয়ে , রমজান দের বাড়ি উপস্থিত হয়।

কর্কট মেজাজে ডাকতে থাকে,রমজান আলি , বাড়িতে আছো!, রমজান বেড়িয়ে আসে ।

রমজান কাপা কন্ঠে বলে উঠলো,ফরিদ সাহেব আপনি!আমারে কইলেই তো আমি আপনার কাছে জাইতাম।

ফরিদ :তোমার মিষ্টি কথা শুনতে আসি নাই। তোমার ভাগ্নিকে নিয়ে আজকেই গ্রাম ছারবে।

ঘর থেকে এলিজা বেড়িয়ে আসে। উচ্চ স্বরে বললো,কেন আমরা কি করেছি ? কি অপরাধ যে গ্রাম ছাড়তে হবে।

ফরিদ : আমার ছেলের সঙ্গে রাশলিলা করবা আর আমি কিছু বলবো না।

পেছন থেকে ফরিদের একজন চালা বলে উঠলো , এত কথা বলার কি

দরকার টেনে বাড়ি থেকে বের করো।

এলিজা :মুখ সামলে কথা বলুন!কোন অধিকার নেই এভাবে বিনা দোষে দোষারুপ করার।আপনার ছেলের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আঙুল দেখিয়ে এলিজা ফরিদ কে কথা গুলো বলতেই,ফরিদের চালা থেকে একজন এসে এলিজার চুলের মুঠি ধরে,বললো,বে”’শ্যা তেজ তোর

বের করছি– বলেই বাহিরের দিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়।এলিজা ছুটে মাটিতে পরতেই, ধরে ফেলে একজন, সবাই থমকে যায়।

ফরিদ তার লোক জন সবাই হা করে থাকে। এটা আবার কে।

এলিজা আচেনা মানুষটির দিকে পরোখ করতেই দেখে,সে আর কেউ নয় অপূর্ব।

অপূর্ব রাগান্বিত কন্ঠে বলে উঠলো,

এই অবস্থা কেন কারা এরা।কি হয়েছে??
ফরিদ রাগান্বিত ভঙ্গিতে বলে উঠলো,ওহহ হহ , এইখানে ও দেখছি নাগর , এটা আবার কোথাকার নাগর, নাকি দেহরক্ষী তা!
অপূর্বর চোখ গুলো লাল টকটকে হয়ে যায়।কর্কট কণ্ঠে বললো ,

হ্যা- আমি ওর দেহরক্ষী তা।- আর কোন শিক্ষায় একটা মেয়ের গায় হাত দিলেন।

এত বড় সাহস, বলেই যে এলিজা-কে যে ধাক্কা দেয় তাকে এক ঘুষিতে মাটিতে ফেলে দেয়।সবাই অপূর্বর তেজ দেখে দেখে চাপসে যায়।

অপূর্ব:আর যদি কোনদিন, আমার হবু স্ত্রীর,, গায় হাত তো দূরের কথা যদি চোখ তুলে তাকাও, তো চোখ

উপরে ফেলবো।ফরিদ চালাদের নিয়ে চলে যায়। (এরে দেখে নিবো মনে মনে বলতে থাকলো)

জয়তুন : এলিজা কে ঘরে নিয়ে যায়।

রমজান: তুমি সেই না, যে পাখির জন্য ঠিকানা দিছিলা, চিকিৎসা করানোর জন্য?

অপূর্ব: হ্যা চাঁচা।

আজকে তুমি তো সময়মত এসে ......

কথা মাঝ পথে থামিয়ে চোখ মুছে রমজান।

অপূর্ব ইতস্তত বোধ করে বলে উঠলো,,

চাঁচা আমি একা আসিনি। আমার মা বাবাও এসেছে তারা গাড়িতে বসে আছে।

রমজান দ্রুত স্বরে বলল ,ভেতরে নিয়ে আসো ভেতরে নিয়ে আসো।

জাহাঙ্গীর জয়া আসলে অপূর্ব পরিচয় করিয়ে দেয়।

তাদের বুঝতে বাকি রইলো না যে,তারা কেন এসেছে।

সেদিন অপূর্বর হাবভাব ই বলে দিয়েছিলো।জাহাঙ্গীর বিয়ের প্রস্তাব দিলে, রমজান, জয়তুন না করলো না। তারা রাজি হয়।

এত বড় ঘরের ছেলে। তাছাড়া, অপূর্ব ভদ্রতা জানে। দেখতেও মানানসই।

জাহাঙ্গীর: আমরা বিয়ের বেশি দেরী করতে চাইনা। এই সপ্তাহের মধ্যে ই হোক।

রমজান:- আমাদের কোন আপত্তি নেই।

অপূর্ব জয়তুন কে বললো,

আমি একবার এলিজার সাথে কথা বলতে পারি আন্টি?

জয়তুন: হ্যাঁ – কেন না।১৯৯৭ সাল ভরকান্ত সকাল। সূর্যের কড়া ঝিলিক।ব্যাস্ত শহর।কাকের আনাগোনা।

সকাল সকাল উঠেই জয়ার রান্না ঘরে আসতে হয়।বাড়িতে কাজের মহিলা থাকলেও তাদের হাতের রান্না জাহাঙ্গীর খেতে পারেন না। জাহাঙ্গীর

চৌধুরী সে বরাবরই রাগি একজন মানুষ।খুব সহজে সবার সাথে মিশে না।হাজারো রাগ ,ক্রোধ একজনের কাছে হার মানে সে হচ্ছে তার একমাত্র ছেলে।

সকাল ৮ টা নাগাদ __জয়া রান্না ঘর থেকে জাহাঙ্গীর কে উদ্দেশ্য করে বললো,

সকাল সকাল উঠেই কি পেপার নিয়ে তোমার বসতে হয়? বয়স

হয়েছে, বাহিরে একটু সকালে হাঁটতে বের হতে পারো। বসে বসে থাকলে দেখবে ডায়াবেটিক্স টা বেড়ে যাবে।

জাহাঙ্গীর শান্ত স্বরে বলল,জয়া থামো তো, গুরুত্বপূর্ণ একটা নিউজ পড়ছিলাম, তুমি কি খবর পরো? জানো চারদিকে কি হচ্ছে?

দেশের খবর রাখতে হয়। ভালো মন্দ জানতে হয়।

জয়া বললো,কি এমন হচ্ছে শুনি? জাহাঙ্গীর আহ”ত কন্ঠে বললো,২৭ বছরের যুব ছেলেরা নিখোঁজ হচ্ছে। নিখোঁজ হওয়ার কিছুদিন পরে, ওদের লা’শ নদীতে, খালে বিলে, ক্ষেতে পাওয়া যাচ্ছে।ব্যাপার টা সাধারণ নয়।

জয়া নাস্তা তৈরি করা ছেড়ে দৌড়ে জাহাঙ্গীর এর কাছে আসে।

জয়া আতং’ক স্বরে বলল,কি বলো এসব দেখাও দেখি!

জাহাঙ্গীর পেপার টা জয়াকে দিয়ে বললো,এই দেখো।

জয়ার চোখ গুলো ছানাবড়া হয়ে যায়। ভ্রু কুঁচকে দেয়। পেপারটা ভালো ভাবে পরোখ করে বললো ,সত্যি ই তো।আমার তো ভিষন ভয় লাগছে। আমাদের খোকা,বলেই মুখে

হাত দেয়। চোখে মুখে জয়ার আতংক'র ছাপ ফুটে উঠে। জাহাঙ্গীর বিষয়টা উপেক্ষা করে বললো, আহা তুমি আমাদের খোঁকাকে কেন টানছো, ও হচ্ছে বীর , সাহসী ছেলে। একজন এস আই , ওকে কে কি করবে? বরং ওর থেকে সবাই দূরে থাকে।জয়া বললো, তুমি কি খবর টা সম্পুর্ন পড়েছো? এই দেখো!২৭ বছরের

ছেলেরা নিখোঁজ হওয়ার পর শুধু ওদের খু’ন করা হয়না। ওদের শরীর থেকে হা’র্ট বের করে নেয়া হয়।এটা কোন হা’র্ট পাচারকা’রী নয় তো?

জাহাঙ্গীর বিষয়টাকে এড়িয়ে গিয়ে বললো, সে যাইহোক, খেতে দাও । এসব নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। জাহাঙ্গীর টেবিলে খেতে বসে।

তৎক্ষণাৎ বাড়িতে উপস্থিত হয় সূর্য। অপূর্বর খোঁজে।

“আসসালামুয়ালাইকুম আংকেল কেমন আছেন? আন্টি কেমন আছেন? সূর্য সোফাতে বসল।

জয়া মৃদু হেসে বললো, সূর্য যে হঠাৎ তুমি।এসো এসো।

“না আজ আমার সময় নেই। এসেছিলাম অপূর্বর সাথে দেখা করতে।”বলল সূর্য।

” কিন্তু অপূর্বর তো বাড়িতে নেই!”জয়া তাকালেন সূর্যের দিকে।
” তাহলে কোথায়!?“অপূর্ব ১৫ দিনের জন্য পুলিশ টুরে গেছে।
“সেটা কোথায়?
” বিক্রমপুরের রুশরাজ্যে।
সূর্য দৃষ্টি মেঝেতে স্থাপন করল। কিছু ভাবল এরপর বললো_তাহলে আজ আসি,ও ফিরলে আমার কথা বলবেন।

” তা অবশ্যই।

সূর্য তড়িঘড়ি করে চলে যায়।জয়া ও জাহাঙ্গীর তাদের প্রোপার্টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় তাদের পারিবারিক উকিল।

জাহাঙ্গীর উকিল কে দেখে খাবার রেখে উঠে আসে। কিছু কাগজপত্র নিয়ে দ্রুত পায়ে উকিল ও জাহাঙ্গীর স্থান ত্যাগ করে।

বিক্রমপুরের রাশরাজ্য ——-

রুশ রাজ্য–

ডিসি সাহেব সারাদিন তাদের টিমের সবাইকে বিভিন্ন জায়গা দর্শন করে দেখিয়েছে।ডিসি সাহেব সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো,

এখানের প্রতিটা জায়গা,অজানা অচেনা। তোমাদের হয়তো প্রশ্ন থাকতে পারে এখানে তোমাদের কেন এনেছি?এখানে কি হয়েছিল!

কেন হয়েছিলো।কাদের বসবাস ছিল!তা আমরা কেউ ই সঠিক ভাবে জানি না । তবে , অপা,রেশন এর জন্য কখনো এই রুশরাজ্যে জায়গাটা দরকার হলে যেন কারো কোন বিভ্রান্ত না থাকে, তাই এইখানে তোমাদের ক্যাম্পিং করানো।এভাবে ডিসি সাহেব রুশরাজ্যের আনাচে কানাচে সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল সবাইকে।

বিভিন্ন জায়গা পর্যবেক্ষন করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়।

টিমের সবাই ফিরে আসতে আসতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায় ক্যাম্পে।সবাই ক্লান্ত।

সবাই যে যার রুমে চলে আসলো। টিমে টোটাল ছিল ১৬ জন। একটা রুমে আটজন করে।সবাই বিশ্রাম এ বিলন হয়ে আছে। সারাদিন হেঁটে

হেঁটে বিভিন্ন যায়গা পরিদর্শন করেছে।
সবার মাঝ থেকে হঠাৎ অপূর্বর ইচ্ছা হয় তারা সবাই মিলে দিগন্ত নদীর তীরে যাবে। এই জায়গাটা তে নাকি কেউ আসে না। কিন্তু তার ইচ্ছে সবটা ঘুরে ঘুরে দেখবে তাও আবার রাতে। অপূর্ব সবসময় সাহসী ছেলে। কারো কথা শোনার মত নয় সে। একজন সৎ সাহসী পুলিশ

অফিসার।অপূর্ব বললো,আমরা সবাই কিছুক্ষণ পর দীগন্ত নদীর তীরে যাচ্ছি।রাতে একবার যায়গাটা পরিদর্শন করবো।

সাদিক কাপা কণ্ঠে বললো,তোরা যা আমি না। কি ভয়া'নক জায়গা টা।

সাদিকের কথা শুনে অপূর্ব সহ, রায়হান,হিমেল,মিদুল,পলাশ খিল খিল করে হেঁসে উঠে।

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,একজন পুলিশ হয়ে ভয় পাচ্ছিস। আমি কারো কোন কথা শুনবো না। আমরা ঠিক ৬:৩০ বের হবো।

সবাই অপূর্বের কথা শুনতে বাধ্য। কারন তাদের প্রান প্রিয় বন্ধু। ‘

৬:৩০ মিনিট ———-অপূর্বের পরিকল্পনা মত সবাই বেড়িয়ে পরলো।

চাঁদনী রাত- জোসনায় আলোতে চারদিক দিনের মত আলোকিত হয়ে গেছে। চারদিক নিস্তব্ধ সুনসান।ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক,বাদুরের আলাপ আলোচনায় ভয়ানক রুপ ধারন করেছে।

নদীতে কিছু কিছু মাঝি জ্বাল ফেলছে।

সবাই হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর অবধি চলে যায়। সেখানে অবস্থিত ,

অনেক বড় বড় জঙ্গল। চারপাশে ঝোপঝাড়।দেখে মনে হয় এ্যামাজন জঙ্গল।

সাদিক ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, হেই অপূর্ব চল ফিরে যাই। আমার কেমন জানি ভয় ভয় করছে।

অপূর্ব তৎক্ষণাৎ হুসসসসস বলে চুপ নির্দেশক আঙুল দেখিয়ে সবাইকে চুপ করতে বলে।

“কি হয়েছে? জিজ্ঞেস করল রায়হান।অবাক সে!চোখ দুটো ছলছলানি দিয়ে উঠল।

‘’’কেউ আছে এখানে।আমরা ছাড়াও।’’বলল অপূর্ব।সাদিক বলল_এই ভয় দেখাস না।এখানে কেউ ভুলেও আসে না।

অপূর্ব ফিস ফিস করে বলল,আমি বলছি তো ওদিক টায় কেউ আছে।

পায়ের চপর চপর আওয়াজ আসছে।

সাদিক পুনরায় থমকে গিয়ে বলল_চল ফিরে যাই।

” তোরা এখানেই থাক আমি দেখছি। অপূর্ব সামনে এগিয়ে গেল। সাদিক , পলাশ,রায়হন , সহ সবাই অপূর্ব কে বারন করলেও শুনলো না।

সাদিক বেশ বিরক্ত নিয়ে বলল_এই ছেলেটা আজ মরবে।

অপূর্ব জঙ্গলের ভেতরে চলে যায়।

চারদিক নিশ্চুপ। গাঁ ঝিমঝিম।

হঠাৎ কানে ভেসে আসলো নূপুরের আওয়াজ।

অপূর্ব থমকে দাঁড়ায়। পূরো শরীর থেকে অঝরে ঘাম ঝরতে থাকে।

ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো,“কে ওখানে কে ওখানে?

কারো কোন সাড়া শব্দ নেই।
অপূর্বর ডান হাতে পিস্তল বাম হাতে টর্চ।
অপূর্ব কাপা কন্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করে, আমি জানি এখানে কেউ আছে বেরিয়ে এসো । হঠাৎ অপূর্বর পেছন দিক থেকে কেউ দৌড়ে সামনের দিকে চলে যায়।
অপূর্ব কিছুটা ভয় পেয়ে যায়।সে অনুসরন করে দৌড়াতে থাকে পেছন

পেছন সামনে থাকা ছায়া মূর্তি র। পরক্ষনেই সে বেখেয়ালির জন্য হোঁচট খেয়ে পরে যেতেই হাত থেকে টর্চ টা পরে যায়।তবুও থেমে না থেকে উঠি দাড়িয়ে , অচেনা লোকটিকে পরোক্ষ করতে থাকে। জোসনায় আলোতে চারদিকে আলোকিত হওয়ায় সামনের পরিচ্ছেদ টা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অপূর্ব ঠিক ভাবে খেয়াল করলে

দেখতে পায় অচেনা লোকটি কোন ছেলে নয়।একটা মেয়ে।

অপূর্ব অবাক হয়ে যায়। এই জঙ্গলে মেয়ে আসবে কোথায় থেকে। বুকের ভেতর ধুকবুকানি টা বেড়ে যায় তার ।

অপূর্ব ভয় না পেয়ে মেয়েটার পেছন ছুটতেই , ধমকের সুরে বললো,দাড়াও বলছি নয় গুলি করে দেবো।

মেয়েটি থমকে দাড়ায়। মেয়েটি হাঁপাচ্ছে।কম করে ৫-৬ হাত দূরে মেয়েটা ।চুল গুলো বেনুনি করা। পায়ে জুতো নেই।মুখটা সম্পুর্ন ঢাঁকা।অপূর্ব পেছন থেকেই প্রশ্ন করে,কে তুমি আর এই জঙ্গলেই বা করছো কি,?

মেয়েটি কিছু না বলে সামনে হাঁটতে শুরু করে।

অপূর্ব মেজাজ দেখিয়ে বললো,

এই দাড়াও কে তুমি বলো নয়....

বলতেই মেয়েটি , এক অদ্ভুত কণ্ঠে উত্তেজক ভঙ্গিতে বললো,

“আমি এলিজা।

এলিজা! এখানে কি? এত রাতে কি করছো? চুরি না অন্য কিছু?বেশ বিচলিত হল অপূর্ব।

মেয়েটির উত্তরের আশায় থাকতেই , পেছন থেকে রায়হান,মিদুল, সাদিক_’অপূর্ব’ অপূর্ব বলে ডাকা

শুরু করলে অপূর্ব পেছনে তাকাতেই মেয়েটি গায়েব।সামনে তাকাতেই দেখে মেয়েটি নেই। এত কম সময় কোথায় গেলো।

সাদিক অপূর্বর ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল_তুই ঠিক আছিস?

অপূর্ব স্বাভাবিক হয়ে বলল_ঠিক আছি ।তোদের বলেছিলাম না কেউ আছে।সেটা সত্যি।আর কোন ছেলে নয় বরং একটা মেয়ে।তবে অদ্ভুত

ছিলো মেয়েটি। হয়তো লুকোচুরি খেলছে।

সাদিক হেঁয়ালিপূর্ণ ছাপে বলল_ধুর এই জঙ্গলে মেয়ে আসবে কোথা থেকে। তুই যে সুন্দর হয়তো'বা জ্বীন দেখা দিয়েছিল। , বলেই সবাই অট্টহাসি দিয়ে উঠলো।

“চুপ কর। ও কোন জ্বীন নয়। অদ্ভুত ছিলো মেয়েটা ।নাম ও বলেছিলো।

“কি নাম জ্বীনের শুনি?

“এলিজা।রায়হান তখন বলল_জঙ্গল টা সুবিধের নয় চল এখান থেকে।

সাদিক তৎক্ষণাৎ কিছু ভেবে বললো – মেয়েটার বয়স কেমন হবে?

অপূর্ব আন্দাজ করে বললো- আনুমানিক

২৩-২৪ হবে।মেয়েটির বচন ভঙ্গি তে এমনটাই বুঝলাম।

সাদিক কিছু বললো না।বেশ কিছুক্ষণ সকলে নিরব রইলো।

অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে চারপাশ টায় চোখ বুলিয়ে নিলো। ভালো করে পরোক্ষ করলো।কেউ নেই। তবে সত্যি ই কি মনের ভুল?

এসব অপূর্ব ভাবতে ভাবতে সামনে যেতেই চোখ পড়ল মাটিতে । কিছু একটা চিকচিক করছে। চাঁদের আলো ভালো দেখা না গেলেও বোঝা

যাচ্ছিল কিছু একটা পরে আছে। অপূর্ব মাটি থেকে চিকচিক করা জিনিসটা তুলে দেখলো একটা নূপুর। হাতে উঠিয়ে নিলে মনে মনে ভাবতে লাগলো, এটা কোন জ্বীন নয়। বাস্তবিক একটা মেয়ে ছিলো। আর ঐ মেয়েটির ই নুপুরটি।

কিন্তু কে এই জঙ্গলে ই বা কি করছিলো??

পরদিন সকাল বেলা—-

সবাই খাবার খেয়ে যে যার মত বসে বসে গল্প করছে। এতদিন কি কি শিখলো।এসব নিয়ে বিভিন্ন কথায় সবাই মশগুল।অপূর্ব এক পাশে বসে নুপুর টি দেখছে । আর ভাবছে। যদি কোন মেয়েলোক নাই হবে তবে নুপুরটি , এখানে কিভাবে আসলো? আর যদি কোন মেয়েই হবে, তাহলে এলিজা কে আর এই জঙ্গলেই বা কি করছে! উদ্দেশ্য কি ছিল?

হঠাৎ ডিসি সাহেব রুমে প্রবেশ করলো।

সবাই তাকে দেখে সম্মানের সাথে দাঁড়িয়ে যায়।ডিসি সাহেব সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো,

আজ আমাদের টুরের ১৫ দিন।

হয়তো সবার মনে একটাই প্রশ্ন। এমন একটা জায়গায় কেন নিয়ে এসেছি। গতকাল জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দিতে পারিনি।সবার ধারনা ।

আজ থেকে প্রাই চাঁরশো,পাঁচশো বছর আগে এখানে রাজা রা বসবাস করতো। তাদের ই রাজ্য ছিল। কিন্তু তাদের কেউ অমানবিক ভাবে মেরে ফেলেছে। তার পর থেকে এই রুশরাজ্যে কেউ থাকে না। তবে, এখানে সবাই ঘুরতে আসে। তোমাদের এখানে টুর শুধু এইজন্য যাতে ,কখনো অপারেশন এর জন্য এই জায়গা টা দরকার হলে কারো

মনে কোন বিভ্রান্ত না থাকে। আমরা শিঘ্রই চলে যাবো।

ডিসি সাহেব রুম থেকে চলে যাবে, ঠিক তখনি থমকে দাড়িয়ে পেছন ঘুরে বললো,সবাই তো খবর পেয়েছো।

অনেক দিন থেকে ২৭ বছরের ছেলেরা কিড,ন্যাপ হচ্ছে ।তারপর তাদের কেউ নৃশং,স ভাবে মেরে লা,শ গুলো এখানে ওখানে ফেলে

যাচ্ছে।সব থেকে কৌতুহলের বিষয় হলো, এই পর্যন্ত যাদের ই লা,শ পেয়েছে। তাদের কারো শরীরে হার্ট নেই।অপূর্ব বললো,স্যার এটা নিশ্চয় মারাত্মক কোনো সাইকো কি”লার -সাধারণ কেউ নয়।

রায়হান বলল_ আমরা সম্পুর্ণ’ভাবে চেষ্টা করবো এই কিলা,র কে ধরার জন্য।

ডিসি সাহেব বললেন_ very good .আমরা আগামীকাল এখান থেকে চলে যাব সবার মনে থাকে যেন।Be safe always
বলে চলে যান তিনি।সবাই সাইকো কি,,লার কে নিয়ে কথা বলছে।
অপূর্ব বাদে , অপূর্ব নুপুরটি নিয়ে মনস্থীর করেছে। আজকে এখান থেকে দূরে যে গ্রাম গুলো আছে , সেখানে যাবে এবং এলিজা কে

খুজবে। কে এই নারী, জঙ্গল ই বা এত রাতে কি করছিলো?

এই মেয়েকে খুঁজতে হবে।

সাদিক পাশ থেকে আতংক কন্ঠে বলল, ভাই আমার তো ভিষন ভয় করছে। ২৭ বছরের ছেলেদের অপ,হরণ

করে ওদের খু,ন করে। তারপর শরীর থেকে হার্ট বের করে নেয়া হয়। কি সাংঘা,তিক

বল ।

অপূর্ব বেশ হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে বলল_হুম ,ঠিক বলেছিস বিষয়টা খুবই অদ্ভুত।তিলকনগর———-

জয়তুন বারান্দায় বসে ভাঙা গলায় বললো,এত এত ভিরের মধ্যে ও নিরার মৃত্যু টার রহস্য মন থেকে বের ই করতে পারছি না। কি থেকে কি হয়ে গেলো।

রমজান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,সেসব বলে কি আর হবে কপাল মন্দ থাকলে যা হয়।

জয়তুন :পাখি মা তোর কাকির কাছে যা দেখ সে কি করে। হয়তো একা একা নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে।

রমজান: আমগো এলিজা কে আনতে যাইতে হইবো কে কে যাইবো ?

জয়তুন:তুমি বলে আসো, জয়নাল, আসিম, আর শ্যামলি কে। বিয়ের

দিন থাকতে পারলো না, শ্যামলি! অন্তত ফিরে আনতে তো যেতে পারবে।বলে দেখো কি বলে।

ঢাকা স্টামফোর্ড কলেজ__ক্লাসে যেন মন বসছে না শায়ানের। আজকে তিন তিনটা ক্লাস করলাম শুধু অস্থির লাগছে। এরকম অনুভুতি কেন হচ্ছে?সবকিছু যেন অন্ধকার লাগছে। শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। প্রকৃতি যেন বার বার

থমকে যাচ্ছে। কেন আজ এরকম অনুভুতি হচ্ছে।

মা বাবা ঠিক আছেন তো?তাদের কিছু হয়নি তো?

না তাদের কিছু হলে , চিঠি আসতো । তবে কি এলিজার কিছু হলো। মনটা কেন জানি কুহ গাইছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভারী একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেললো শায়ান।

ক্যাম্পাসের ছাঁদের এক কোনে দাঁড়িয়ে আছে শায়ান। চোখ মুখে তার ভিষন্নতা।

তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় মিরা।

মিরা বললো,স্যার আপনি আজকে ক্লাস না করে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

কিছু হয়েছে??শায়ান :আপনি এখানে?

মিরা : আপনাকে ক্লাসে, খুঁজলাম।

, লাইব্রেরী তে দেখলাম,কোথাও নেই।
ভাবলাম ছাদেই আছেন।
শায়ান :শরীর টা ভালো নেই, তাই ক্লাসে যায়নি।
মিরা ঠিক বুঝতে পারছে শায়ান এর চোখমুখে চিন্তার ছাপ, অস্থিরতা । কিছু হয়েছে তবে বলছে না।
মিরা :স্যার চলেন নিচে যাই।

সেদিনের শায়ান আর আজকের শায়ান এর মধ্যে অনেক পার্থক্য।
মিরা ভাবনা উপেক্ষা করে বললো,
মিরা :আপনি চাইলে আপনার মন ভালো করার জন্য, আমরা বিকেলে অচিন পাহাড়ে যেতে পারি।
শায়ান মিরার প্রস্তাব গ্রহণ করলো।
ভাবলো,

হয়তো আকারনেই আমার মন উতালা। যদি বাহিরে বের হই হয়তো মনটা শান্ত হবে।
মিরার কথায় রাজি হয়।চৌধুরী বাড়ি
গতকাল রাতের বাকি অংশ
একজন প্রতিবেশী বললো,
তোর ছেলেকে তো কোথাও দেখছি না।
বউ কি আমাদের জন্য ই আনছে নাকি।

বউকে রেখে সেই যে , চললো এখন পর্যন্ত খবর নেই।

—

এলিজা ভাবলো,এনারা কি বলছেন! পুলিশ বাবু কোথায়, কি হয়েছে তার। সবাই এখানে অঁচেনা। আমাকে এভাবে রেখেই উনি চলে গেলেন।জাহাঙ্গীর -কর্কট মেজাজে বলে উঠলো,বিয়ে করছে দেখে কি, ছেলে কাজ কর্ম, দায়িত্ব ভুলে যাবে।

বলেই একটা সিগার টানতে টানতে বেড়িয়ে যায় ঘর থেকে।

এলিজার খুব অদ্ভুত লাগল, বিয়ের প্রথম দিনে ই এরকম কথা শুনতে হচ্ছে।

রিনা বললো,অপূর্ব হয়তো থানাতে গেছে জরুরি কাজ হইবো। নতুন বউরে নিয়া খাবার দাও।সবাই খেয়ে নাও।

রিনার কথা মত সবাই তাই করলো।

কেউ ই অপূর্বর জন্য অপেক্ষা করলো না। সবাই যে যার মনে খেয়ে নিলো।

কিন্তু খেতে পারলো না এলিজা। আহত চোখ দুটো চারদিকে অপূর্ব কে খুঁজছে!আজকে তো কাল রাত তা বউকে কোন ঘরে রাখবে?বললো মমতাজ- অপূর্বর ছোট চাচী।

অর্পা :বউমনি আমার ঘরে থাকবে।

মমতাজ -: না আমার ঘরে থাকবো।

জয়া-: কোন ঘরে না। বাসর ঘর সাজানো হয়েছে। সেখানে ই থাকবে অপূর্বর সাথে।

অর্পা এলিজা কে নিয়ে যায় অপূর্বর ঘরে চলে যায় । ফুল মাখানো ঘরটা দিয়ে সুগন্ধর বন্যা বইছে। অদ্ভুত অনুভূতি। প্রতিটা মানুষের জীবনে বাসর রাত নিয়ে ঝল্পনা কল্পনা থাকে।

খাটের উপরে বসে আছে এলিজা।

ঘর থেকে বেরিয়ে যায় অর্পা, চাঁদনি যায়নি।
চাঁদনী কিছুক্ষণ এলিজা কে পরোখ করে।বললো,
এই দুনিয়াতে ভাগ্যবান মানুষ কারা জানো?যারা অন্য কারো প্রিয় মানুষ টা কে বেদনা, কষ্ট,হাহা'কার ছাড়াই পেয়ে যায়।তুমি সেই ভাগ্যবতী নারী। যে কিনা ,অন্য কারো প্রিয় মানুষ টাকে যন্ত্রনা ছাড়াই পেয়ে

গেছো। নিজের প্রিয় মানুষ টাকে অন্য কারো সাথে দেখার মত মূহুর্ত কারো জীবনে না আসুক। এলিজা চাঁদনীর কথার মানে বুঝলো না। তবুও কোন প্রশ্ন করলো না। চাঁদনী বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, অপেক্ষা করো অপূর্ব চলে আসবে। বলেই চলে যায়।

এলিজা – ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়।

পথ চেয়ে থাকে অপূর্বর । তার আসার কোন নামগন্ধ নেই।

এলিজা ভাবছে,নিজেকে আজ বড্ড অসহায় লাগছে, জানি না কেন।

ঘরের জানালা থেকে আকাশের চাঁদ গুলো দেখা যাচ্ছে।

লাল বেনারশী , ভারি গহনায় পূরো শরীর টা ওজনের আড়ন্নে একাকার। এলিজা আনমনে তারা দেখছে ।
বিড়বিড় করে বলছে,
আজকাল নিজেকে নিয়ে বড্ড আ'ফসোস হয়,কোথায় থাকার কথা ছিলো রঙিন স্বপ্ন নিয়ে,অথচ কেউ কেউ জীবনে এসে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে,হৃদয় ভা'ঙচুর করে শূ'ন্যে বিলীন করে দিচ্ছে।

আমি ভীষণ অ:বহেলিত একটা মানুষ, যে যেভাবে ইচ্ছে সেভাবেই অ'বহেলায় মু'ড়িয়ে রাখছে,অথচ কেউ বুঝতেই চাচ্ছে না আমিও একটা মানুষ,আমারও নি:শ্বাস নিতে হয়,প্রাণ খুলে বাঁ'চার স্বাদ জাগে।
আমি কি সেই ভাগ্যবতী? যার , জীবনের বিশেষ দিনেও চোঁখের পানি ফেলতে হয়।সাদিক মেঝেতে

পরে অঝরে কান্না শুরু করে। অপূর্ব দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

সাদিক কাপা কণ্ঠে বললো,

আমরা ব্যার্থ , পারিনি আমরা আমাদের বন্ধু কে বাঁচাতে। বাঁধন আজ ছিন্ন হয়ে গেলো।

কি করে ভুলে যাবো, ওর, স্মৃতি গুলো, ছোটবেলা কাটানো দিন গুলি। একসাথে পথ চলা। জীবনের সুখ দুঃখ গুলো ভাগ করে নেয়ার কথা

ছিলো। কিন্তু আজ ও নিঃস্ব দেহে পরে আছে মর্গে।

এসব শুনতেই অপূর্ব , দেয়ালে কয়েকটা ঘুষি মেরে, হাত লাল করে ফেলে।

অপূর্ব বললো,আমি কথা দিয়েও কথা রাখতে পারিনি।

পেছন থেকে কারো পায়ের, আওয়াজ । কেউ আসছে ।

অপূর্ব পেছন ঘুরতেই দেখে সূর্য।

জ্বলজ্বল চোখে, তাকিয়ে আছে। আঝাপটা মেরে জড়িয়ে ধরে অপূর্ব ও সাদিক কে।

ভাঙা গলায় বললো,কি থেকে কি হয়ে গেলো। কখনো ভাবতে পারিনি ওকে এভাবে হারাতে হবে।

চারদিক থমকে যাচ্ছে। সন্ধা মাখা রাতে নিমিষেই কালো ছায়া নেমে আসে। প্রকৃতি ও বন্ধু হারানোর বেদনায় চাপসে যাচ্ছে।সাদিক মনে

মনে ভাবতে থাকলো,এটা কি করছি। এক বন্ধুর জন্য আরেক বন্ধুর জীবনের বিশেষ দিন টাকে মাটি করে দিচ্ছি। ভুলেই তো গিয়েছি আজকে অপূর্বর বিয়ে , বাসর রাত। , আর আমরা ওকে ... না এটা কি করে হয়। একজনের জন্য অন্য জনের আনন্দ মাটি করতে পারি না।

সাদিক চোখ মুখ মুছে এমন হাব ভাব করলো যেন। কিছু ই হয়নি। সাদিক সূর্য কে কিছু একটা ইশারা করলো। সূর্য বুঝতে পারলো,যে সাদিক কি বলতে চাইছে।

সাদিক অপূর্বর দু কাঁদে শান্তনা মূলক হাত রেখে বললো, মানুষ মূলত মৃত্যু পথযাত্রী। আজ হোক বা কাল পরপারে যেতেই হবে। তার

জন্য সবকিছু ভুলে গিয়ে শুধু তাকে নিয়ে থাকলেই তো হবে না।

দেখ আমার দিকে। আজ না তোর বাসর রাত । এলিজা যে তোর জন্য পথ চেয়ে বসে আছে ।ওকি সব ছেড়ে তোর অবহেলা পেতে এসেছে বল। শক্ত কর নিজেকে। ওর কাছে যা। আমরা ওদিকটা সামলে নিচ্ছি। অপূর্ব কে অনেকক্ষন বোঝানোর পর। হ্যাঁ সুচন মাথা নাড়ে।অপূর্ব কে

জোড় পূর্বক ঘরের দিকে পাঠায় ।যা বলছি না আমরা সামলে নিবো ।

অপূর্ব অশ্রু মাখা চোখে ঘরের ভেতরে যায়। সাদিক আর সূর্য মর্গে,,র উদ্দেশ্য , বের হতেই কেউ একজন সাদিকের হাত টা পেছন থেকে ধরে ফেললো।

সাদিক পেছন ঘুরে দেখলো, অপূর্ব।

অপূর্ব সাদিক সূর্য কে আঝাপটা দিয়ে জড়িয়ে ধরে।

অপূর্ব ভেজা কন্ঠে বললো,

তোরা কি মনে করিস তোরাই শুধু বন্ধুত্বের মূল্য দিতে পারিস ।আমি পারি না।

সব বন্ধুদের হৃদয় কষ্টে মাখা। আর আমি কি না বাসর করবো?

বলেই অঝরে কান্না শুরু করে অপূর্ব।তিনজন মিলে হাসপাতালের ম,র্গের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

সাদিক :এক মিনিট , তুই এই শেরওয়ানি পরেই মর্গে যাবি!

অপূর্ব :এখন পাল্টাতে গেলে ঘরের মানুষ দেখে ফেলবে।

গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে পরে। হাসপাতালের উদ্দেশ্যে।হাসপাতালের সামনে যেতেই। কনস্টেবল দের ভির।

লাশ কোথায়?

স্যার মর্গেই আছে।

আশেপাশের সমস্ত মানুষ দেখছে কেউ বিয়ের আশর থেকে তার বন্ধুর জন্য হাসপাতালে ছুটে এসছে।
মর্গে,র রুমে — হিমেল, আকাশ, মিদুল
সবাই এসে অপূর্ব কে জড়িয়ে ধরে।
এমনটা হওয়ার কথা ছিল না।
লা,শ টা বের করো!স্টাপ রায়হানের মৃত লা,শ টি বের করে।

স্টাপ রায়হানের লাশটা বের করেই দূরে সরে যায়।
অপূর্ব ঝাঁপিয়ে পরে লাশের উপর।
কান্না জরিত কণ্ঠে বলতে থাকলো ,,
রায়হান ভাই আমার চোখ খোল দেখ আমরা এসেছি। আমরা জানি তু তু -তুই ছোট বেলার খেলা খেলছিস। মনে আছে তুই সবসময় বলতি , আমি লুকিয়ে যাবো, মরে যাবো

তারপর দেখবো , কারা কারা আমাকে ভালোবাসে ।

তুই সেই খেলা এখনো খেলছিস। , জিতে গেছিস ভাই তুই জিতে গেছিস,। এবার তো উঠ , উঠনা রায়হান উঠ।

একবার চারদিকে দেখ, সবাই তোর জন্য কাঁদছে।হিমেল,আকাশ,মিদুল, সূর্য, সাদিক সবাই, কাঁদছে সবাই,। তুই আজকে জিতে গেছিস আমরা

হেরে গেছি,।হাসপাতালের চারদিকে কান্নার আহা,জারি বসছে। ,,,,,
মর্গে,র মৃত লা,শ গুলোও কাঁদছে, নিস্তব্ধ হয়ে যায় চারদিক।
বুকের ভেতর জড়িয়ে নেয় , রায়হান এর দেহখানি, অপূর্ব ।
স্টাপ- চেয়ে চেয়ে দেখছে।
তার ও চোখ থেকে ও অঝরে পানি পরছে মনের অজান্তেই।এটাই কি তাহলে ছেলেদের বন্ধুত্ব। যে কিনা

বিয়ের মত সূবর্ন বিশেষ দিনকে ফেলে রেখে তার বন্ধুর জন্য চলে আসছে।

নিশ্চয়ই, মৃত ছেলেটি অধিক ভাগ্যবান।(ভাবলো স্টাপ)

অপূর্ব কাপা কণ্ঠে বলতেই থাকলো।

তুই উঠবি না তাইনা ভালো লাগছে খুব তোর। আমাদের এভাবে দেখে। বুকের মধ্যে আগলে ধরে। — অপূর্বর চোখ গুলো লাল হয়ে যায়।

এই আমি তোকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, তোকে যে বা যারা মেরেছে তাদের আমি কাউকে ছারবো না কাউকে না। , ... অপূর্ব কে সবাই সরিয়ে নেয়।লা,শ দাফন এর জন্য নিয়ে যাবে তার আগে কিছু নিয়ম পালন করতে হবে। একজন পুলিশ অফিসার মারা গেলে যা করতে হয়। সমস্ত মানুষ দেখছে, শেরওয়ানি পরে কেউ হাসপাতালে।

সবাই অপলক দৃষ্টিতে দেখছে।কেউ কেউ বলছে পুরুষের বন্ধুত্ব সত্যি ই ভয়াবহ......এক হৃদয়হীন বন্ধু শুয়ে আছে ম,র্গে।

চারদিক আজ নিঃস্ব। বুকের ভেতরে হাহা'কার। আমি আমার বন্ধুকে হারিয়ে ফেললাম। স্বার্থপর আমি। থমকে যাচ্ছে চারদিক। অপূর্ব বিড়বিড় করে বললো, এরকম টা না হলেও পারতো।

সাদিক অপূর্বর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো,বাড়িতে চল এবার না করিস না।

অপূর্ব উৎকৃষ্ট হয়ে বললো,আজ নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে।

রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে ।

সূর্য, সাদিক, দুজনে অপূর্ব কে বাড়িতে নিয়ে আসে।

সাদিক গাড়িতে বসে অপূর্ব কে বললো,এলিজা কে তো তুই

ভালোবাসিস।তাই না?মেয়েটা কি দোষ করেছে বল , নিজেকে শক্ত কর।

শেরওয়ানি তে র,,ক্ত লেগে আছে। কাপড় চোপড় পাল্টে ওর সামনে যাবি। এই আমি বলে রাখলাম।

অপূর্ব হ্যা সুচক মাথা নেড়ে ঘরের ভেতর চলে যায়। ভেতরে যেতেই পেছন থেকে সাদিক কাঁপা কণ্ঠে ডাকে। অপূর্ব ঘুরে তাকায়। সাদিক

বললো,বেলিফুল এলিজার পছন্দ – বাঁসর ঘর বেলিফুল দিয়ে সাজিয়েছিস??
অপূর্ব বললো,সমস্ত পরিকল্পনা মাথা থেকে বেরিয়ে গেছিলো ।অন্য কোনদিন বেলিফুলের আশরে সাজিয়ে দেবো ।দরজায় কড়া নাড়ছে। অবশেষে এলিজার অপেক্ষার প্রহর শেষ হলো।

দরজা খোলাই ছিল। অপূর্ব ভেতরে আসলো।

লাল বেনারশী পরা স্বর্গীও , হুর আমার ঘর আলোকিত করে কারো অপেক্ষায় বসে আছে।জোসনারাও যেন আজ লজ্জা পাবে।

অপূর্বর উপর থেকে এত ধ'’কল গেলো তা মনেই হচ্ছে না। স্বর্গপরী- এলিজাকে দেখা মাত্র ই অপূর্ব কোন এক জগতে হারিয়ে যায়। সমস্ত

ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।অপূর্ব খাটের উপর বসলো। এলিজার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো,

,দুঃখিত আমার রানি। তোমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে।

এলিজা বললো, আপনার জন্য শুধু সারারাত নয়- জনম জনম ধরেও অপেক্ষা করতে রাজি।

বলেই অপূর্বর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে গেলে অপূর্ব বুকে জড়িয়ে নেয়।

অপূর্ব :তোমার স্থান আমার পায়ে নয় বুকে,।বধুবেসে তোমাকে আজ অনেক অপূরুপ দেখাচ্ছে। সমস্ত পরীদের স্বর্দারীনি মনে হচ্ছে।

খুব বেশি বলছেন না তো?

অপূর্ব :যত বলছি কম ই মনে হচ্ছে।

এলিজাকে হঠাৎ করে পাজা কোলে করে অপূর্ব হাঁটতে শুরু করলো।

এলিজা :একি- কি করছেন কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

চুপ করে থাকো।

ছাদের উপর নিয়ে এলো এলিজাকে। চারদিক চাঁদনি আলোয় আলোকিত হয়ে আছে।তারা রা ঘর পাল্টাচ্ছে। এলিজা পেছনে দাঁড়ানো।

অপূর্ব সামনে কয়েক কদম এগিয়ে। দু হাত দুদিকে ছেড়ে বললো,
এই যে চাঁদ,লক্ষ লক্ষ তারা হ্যাঁ তোমাদের ই বলছি। আজ তোমাদের অহংকার শেষ।
সমস্ত চাঁদ তারাদের স্বর্দারীনি কে আমি আমার ঘরে নিয়ে এসেছি। চাঁদের আলোতে রাতের নৈসর্গিক পরিবেশ যেমন দৃষ্টিনন্দন, চিত্তাকর্ষক উপভোগ্য হয়ে ওঠে । তেমনি

আমার মহারানি কে দেখলে আমি নৈসর্গিক শুখ পাই। আমার অন্তরতম অন্তরে, যেখানে আমি একেবারে একা, সেখানে তোমার ঝর্ণাধারা কখনও শুকোবার নয়। এলিজা মিঁটি মিঁটি হাসছে।

কি অপূরূপ লাগছে অপূর্ব কে দেখতে। সাদা পাঞ্জাবি, সাদা পাজামা, চুল গুলো দমকা হাওয়া তে,,উড়ছে সাথে জোড়াশয় ভ্রু।

এলিজা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো।

অপূর্ব এলিজার সামনে হাঁটুঘেরে বসে পরে।

এলিজার পা'টা নিজের হাঁটুর উপরে তুলে নেয়। পায়ে চুমু খায়। এলিজার পূরো শরীরে শিরশিরানি হয়ে ওঠে।

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,আমার কাছে এই সৌন্দর্য কোনদিন শেষ হবে না

।অপূর্ব পকেট থেকে – রুশরাজ্যে পাওয়া

নূপুর টি বের করে পায়ে পরিয়ে দেয়। এলিজা কিছুটা হতভম্ব হয়ে যায়। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারেনি।

পায়ে পরিয়ে দিয়ে আবার চুমু খেয়ে – দাড়িয়ে বললো , কোনদিন একা করে ছেড়ে যাবে না তো ?

এলিজা :আমার শরীরে যতক্ষন প্রান থাকবে,ততক্ষন আপনাকে ভেবেই থাকবো।

অপূর্ব বললো,আজকে চাঁদ তারা গুলো সত্যি ই লজ্জা পেয়েছে। আজকে রাত টা আমাদের জন্য স্বরনীয় হয়ে থাক।

। কিছুক্ষণ মন মহনে- আকাশ দেখলো দুজন মিলে।এলিজ বললো,ভারি বেনারশী, আর

অলংকার এ আমি ঘেমে একাকার হয়ে যাচ্ছি।

ওফফ তুমি যে বেনারশী তে আমি খেয়াল ই করিনি। চলো পাল্টে নিবে।

এলিজাকে পাজা কোলে নিতেই ,এলিজা বললো, আমি হেঁটে যেতে পারবো।

হুসসসস-কোন কথা নয় আমি থাকতে আপনি কেন কষ্ট করবেন মহারানি।

অপূর্বর ঘরের দরজা খুলতেই যা দেখলো তার জন্য প্রস্তুত ছিলো না।

পূরো ঘরটা বেলিফুল দিয়ে সাজানো। চারদিক বেলিফুল এর গন্ধে বিভোর হয়ে আছে।

এলিজা মুখে হাত অবাক দৃষ্টিতে অপূর্ব কে দেখলো।

বললো,আমার বেলিফুল পছন্দ। তাই আপনি পূরো ঘরটা এত সুন্দর করে সাজিয়েছেন?এখন আমি বুঝতে পেরেছি। কেন মাঝ রাতে ছাদে নিয়ে গেলেন যাতে আমাকে অবাক করতে পারেন। সত্যি স্বামী হিসেবে আপনার তুলনা হয়না।অপূর্ব আমতা আমতা করে বললো ,

আমার মহারানির জন্য এতটুকু করতে পারবো না।আমি আগেই

অর্পা কে বলেছিলাম।ওই হয়তো সাজিয়েছে।

বলেই এলিজার পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে। ধুতনি টা এলিজার কাদের উপর রাখলো। চাপ দাড়ি গুলো এলিজার শরীর -রে লাগছে।

অপূর্ব : এভাবেই সারাজীবন আপনাকে আগলে ধরে রাখতে চাই ম্যাডাম।

ম্যাডাম ডাকটা যেন এলিজার হৃদয় কাপিয়ে তুললো।

চুমু খায় এলিজার কাদের উপর। এলিজা কে পাজা কোলে করে বিছানায় শুইয়ে দেয়।এলিজা ঘুমিয়ে পরলেও অপূর্ব চিন্তায় পরে যায় কে এই রুম টা সাজালো।

এলিজার বেলিফুল পছন্দ তা অন্য কেউ কি করে জানবে। বিছানার এপাশ ওপাশ করতেই বালিশের

মধ্যে কিছু একটা- আচ করে। বালিশের মধ্যে কিছু একটা-আছে। অধির আগ্রহ নিয়ে বের করে দেখে একটা চিরকুট।

চিরকুট টা খুললো।আগ্রহ নিয়ে পড়তে শুরু করলো।

প্রিয়_

কি ভাবছিস কে বেলিফুল দিয়ে ঘর সাজিয়েছে? ধারনাই করতে পারছিস না। এলিজার বেলিফুল পছন্দ সেটা

তুই ছাড়া অন্য কেউ কি করে জানবে। তাই তো?,,, এলিজার যা পছন্দ তা তুই জানিস। তোর যা পছন্দ তা আমরা জানি।

এলিজার পছন্দ,, বেলিফুল। ,, তোর পছন্দ এলিজার মুখের হাঁসি। আর আমাদের পছন্দ তোর মুখের হাঁসি। আজ এত ক্লান্তি তে ,, ভুলেই গিয়েছিস, বেলিফুল এর আশর এর কথা। কিন্তু ভুলেনি আমরা।

তুই যখন এলিজাকে নিয়ে ছাদে যাস।সেই সুযোগ কাজে লাগাই। তখনই আমরা ঘরটা সাজাই। ফুল এনে আগেই রেখেছিলাম। বিকেলে,ঘর সাজাবো বলে।আর ঠিক তখনই খবর পাই,, রায়হান কে পাওয়া গেছে।

রক্তের চেয়েও আপন হয়, বন্ধু, ছুরি'র থেকে ও ধারা'লো এই বন্ধন। বন্ধুত্ব মানে শক্তি। আর শক্তি

দিয়েই, জয়ী হবো।,,,, আমরা খুজে বের করবো ,, রায়হান এর হ,ত্যা কারীকে-।

দাম্পত্য জীবনে শুখি হ’’’’’

————-- ইতি ,,, সাদিক ,, সূর্য ।,,,

———-পরদিন সকালে- ————-

বাড়ি ভর্তি অতিথি,,, কেউ নাচ করছে কেউ গান গাইছে।

মেয়েরা সাজগোজ করে চারদিকে ঘোরাফেরা করছে।

ছোট ছোট বাঁচ্চারা দৌড়ে এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে।

আজকে বৌভাত।

পাড়া-প্রতিবেশিরা এসেছে বউ দেখতে,,,

,, কিছুক্ষণ পর ই হাজির হয়,,

রমজান,পাখি, জয়নুল,, শহিদুল,,আর শ্যামলি।

জাহাঙ্গীর অপূর্ব তাদের ঘরের ভেতরে নিয়ে যায়।

,, পাখি , শ্যামলি চলে যায়। এলিজার কাছে। পাখি,, শ্যামলি কে দেখে এলিজা আকাশের চাঁদ পায়,একদিনেই যেন হাজারো কথা জমে আছে। কখন তারা তা ভাগ করবে অস্থিরতায় যেন মুখথুলি ওয়ে ওঠে।অপূর্ব :ওদিকের খবর কি।।

সাদিক : সব ঠিক ঠাক।

কালকে রাতেই জানাজা হয়।দাফন করা হয়।

চৌধুরী বাড়ি ঢাকা তে হলেও। বাড়িটা ,, গ্রামের দিকে।

বাড়ি ভর্তি অতিথি,,,,অপূর্ব , সাদিক ,, কো'লাহল থেকে বেড়িয়ে,বাড়ির পেছনের দিকে হাটতে বের হয়।

কিছুদূর হেঁটে যেতেই অপূর্বর চোখ পরে, একজন মৌলভির দিকে।

অপূর্বর মনে হলো,মৌলভি অপূর্ব কে দেখেই খুব দ্রুত হেঁটে উল্টো দিকে যাচ্ছে। ,, অপূর্ব,র সন্দেহ হলো। পুলিশের মন সবসময় সন্দেহে ভরা থাকে।

পেছন পেছন, অপূর্ব ও সাদিক দৌড়াতে থাকে।অপূর্ব সাদিক দেখে অবাক, এতো তিলকনগর এর সেই মৌলভী সাহেব।

অপূর্ব:মৌলবি সাহেব,, আপনি এখানে,,?? মৌলবির চোখ মুখে আ'তংকে ভরে উঠে।

সাদিক –হ্যাঁ আপনি ই তো সেই ,যে তিলকনগর-এর রাস্তা দেখিয়ে ছিলেন।

আপনি এখানে কি করছেন??

আমাদের দেখেই বা পালাচ্ছিলেন কেন?? ....অপূর্ব,সাদিক দৌড়াতে দৌড়াতে মৌলবির কাছে যেতেই,

মৌলভীর চোখ গুলো ছানাবড়া হয়ে উঠে।

অপূর্বর মাথায় রক্ত উঠে যায়। কাউকে প্রশ্ন করার পর যদি উত্তর না মিলে।,,

সাদিক : আপনি এখানে কি করছেন বলবেন তো,,,

মৌলভি :আমি আপনাদের চিনি না। আআ'''' আপনারা কেন মৌলবি মৌলবি ডাকছেন?

চোখে চোখ রেখে উত্তর দিতে পারছে না মৌলভি।

, অপূর্ব:, আপনার কি ভুলে যাওয়ার রোগ আছে। কিছুদিন আগের কথা ভুলে গেলেন।

মৌলবী:দেহো,, আমারে আটকাইও না, আমি তোমাদের আগে কখনো দেখিনাই। বলেই দ্রুত হাঁটা শুরু করে।

সাদিক :খুব অদ্ভুত না লোকটা।
অপূর্ব:হুম,, কিছু তো গরমিল আছে।
সাদিক : যাইহোক, বাদ দে, তোদের বের হতে হবে। তিলকনগর, এর উদ্দেশ্যে।

বাড়ির দিকে ফিরে যেতে যেতে, অপূর্ব পেছন ঘুরে মৌলবি কে , কয়েকবার পরোক্ষ করে।
কি হয়েছে লোকটার এমন অদ্ভুত আচরন কেন, করলো।

পূরো বাড়ি ফাকা হয়ে গেলো। অতিথি রা সবাই চলে যায়। এলিজা শশুর শাশুড়ি, সহ বাড়ির সকলের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

গাড়িতে সবাই উঠে পরে।

সাদিক: সবাধানে যাস। নিজের খেয়াল রাখবি।

অপুর্ব : হ্যাঁ তুই ও।

অপূর্ব তৎক্ষণাৎ কিছু ভেবে বললো,আচ্ছা সূর্য কোথায়?আজকে

ওকে কোথাও দেখলাম, আমার সাথে ও দেখা করতে আসলো না।

সাদিক : আছে হয়তো কোথাও। সকলে বেড়িয়ে পরে তিলকনগর -এর উদ্দেশ্যে। —

অপূর্ব -এলিজা দুজন পাশাপাশি বসা।

এলিজার মাথা টা অপূর্ব, ওর বুক পাঁজরের উপর।

এলিজা মসৃন কণ্ঠে বললো,আপনার বুকে মাথা রাখলে জান্নাতের সুখ পাই। পৃথিবীর সবচেয়ে সুখি মানুষ তখন আমাকেই মনে হয়। কি আছে আপনার মধ্যে?

অপুর্ব :আছে হয়তো কিছু যা তোমাকে খুঁজতে হবে মহারানি।কি প্রেম করছো? আমি কিন্তু সব শুনে ফেলেছি।

পিছন থেকে বলে উঠলো পাখি।

এলিজা সরে যায়।

অপূর্ব বললো,হুম প্রেম করছে তোমার হিংসে হয়। তোমার জামাই কে জড়িয়ে ধরেছে।

পিছনে বসে থাকা সকলে হেসে উঠে।

,,, শহীদুল, জয়নাল, রমজান তারা অন্য এক গাড়িতে।

গাড়ি পৌছে যায় তিলকনগর।

পথের বাঁকে দাড়িয়ে আছে জয়তুন।

জয়তুন এলিজাকে দেখেই ছুটে জড়িয়ে ধরে ।হুহু করে কান্না শুরু করে।

নিজের সন্তান না থাকায় মাতৃত্বের ছোয়াটা দ্বিগুন। কাপা কন্ঠে বললো,, ১ দিন পর তোকে দেখছি কিন্তু আমার মনে হইতেছে বহু বছর পর তোরে দেখতেছি। তোর মুখ চোখ কেমন শুকিয়ে গেছে। বলেই

আলিঙ্গন এ হুহু করে কেঁদে ওঠে জয়তুন।

এলিজা :এইখানে কয়দিন থাকবো! দেখবে তুমি আমার শুকনো মুখের ছাপ দুদিনে মুছে ফেলবে।রমজান : সকলকে ঘরে নিয়ে আসে।

জয়নুল , শহিদুল তারা বাজারে চলে যায় ,, জামাই এসেছে, ভালো মন্দ খাওয়া তে, হবে।

,,, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যায়।

পাখিকে জোড় করে পরতে বসিয়েছে। সামনে বার্ষিক পরীক্ষা। শ্যামলী -বান্দবীর জামাইর সঙ্গে যেন আড্ডার আশর বসিয়েছে।দুলাভাই এটা ওটা ব্লা-ব্লা ,, হাজার ও কথা বলছে।

অপূর্বর সেদিকে কোন খেয়াল নেই। ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে আছে কখন এলিজা আসবে।

,, হঠাৎ কি যেন মনে পরতেই অপূর্ব বলে ওঠে,আঁচ্ছা শ্যামলী- বলতে পারো এলিজার মা বাবা কিভাবে মারা যায়।???

কথাটা শুনেই শ্যামলীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। উপেক্ষা করে বললো, দুলাভাই আপনি বসেন আমি আপনার জন্য চা নিয়ে আসছি।

অপূর্ব ঠিক বুঝতে পারলো ,।কিছু লুকিয়েছে।একজন পুলিশ অফিসার,,

তার থেকে কিছু লুকানো কঠিন। অপূর্ব জোড় করলো না।— রাত ঠিক ১১ টা নাগাদ ,, কয়েক ধরনের রান্না হয়,,

সবাই একসঙ্গে খাবার খেয়ে নিলো। অপূর্ব গামছা দিয়ে হাত মুছতে মুছতে খেয়াল করলো, এলিজা-হুমকি স্বরুপ ,, শ্যামলি ,, কে কিছু বলছে ,, কাছে এগোতেই স্পষ্ট শুনতে পেলো, এলিজা বলছে,

দেখ তুই আমার মহারাজার দিকে একদম চোখ তুলে তাকাবি না।

অপূর্ব ঠিক বুঝতে পারলো কথাটা,, অপূর্ব কে দেখেই বলেছে। এতক্ষণ অন্য প্রসঙ্গে ছিল। অপূর্ব উপেক্ষা করলো।কথা বাড়ালো না।

দুলাভাই শুভ রাত্রি,, বলেই শ্যামলি চলে যায়,,

এলিজা :রান্না কেমন ছিলো ?

অসাধারণ ম্যাডাম।

এলিজা : চলেন ঘুরে আসি।

এত রাতে কোথায়??

এলিজা :এত রাত তো কি হয়েছে! আমি একজন পুলিশ অফিসার এর বউ।কোন ভয় নেই আমার।অপূর্ব মৃদু আওয়াজ এ হেসে উঠলো।

হাটতে হাঁটতে দুজন আলি বাড়ির পিছনে,, নদীর তীরে চলে যায়। দুজন পাশাপাশি বসে আছে। এলিজার মাথা টা অপূর্বর কাদের

উপর।,, অপূর্ব:নদী, চন্দ্র,তারা সব কিছু সাক্ষী রেখে আরেকবার,, বলতে ইচ্ছে করছে,,

ভালোবাসি মহারানি,, জনম জনম ধরে তোমার হাত ধরে থাকতে চাই! পরপারেও যেন , কোন এক নদীর তীরে বসে, আবার আমার ভালোবাসা নিবেদন করতে পারি।

,,,,,,,

—– নিরবে , নির্ভিঙে,, দুজন বসে আছে। জোসনায় আলোতে চারদিক। আলোকিত হয়ে আছে।

ঘাটেই ছিল বাঁধা নৌকা ।

অপূর্ব: নৌকায় উঠবে?

এলিজা :কে বৈঠা ধরবে শুনি ??

অপূর্ব :কেন ম্যাডাম তোমার মহারাজা।

এলিজা :আমার ভয় করছে।

অপূর্ব :কোন ভয় নেই।

এলিজা : যদি কোন জ,,ন্তু জানো”য়ার আসে ?
অপূর্ব:সেই জানো,য়ার যদি এসেই যায় ম্যাডাম আমি বুক পেতে দেবো।,,
বলেই দুজন নৌকায় উঠে যায়,, একপ্রান্তে এলিজা অপর প্রান্তে অপূর্ব বৈঠা বাইছে।

এলিজা আনমনে গান ধরে-_শোনার ও পাললঙ্কের ঘরে ,, লিখে রেখে ছিলাম, তারে,,

যাও পাখি বলো তারে সে যেন ভোলেনা মোরে,,,

শুখে থেকে ভালো থেকো,, মনে রেখো এই আমারে ,,

বুকের ভেতর নোনা বেথা,,

চোখে আমার ঝরে কথা,,

এপার ওপার তোলপাড় একা,, বুকের ভেতর নোনা বেথা,চোখে আমার ঝরে কথা,,, এবার ওপার তোলপাড় একা,,

যাও পাখি বলো তারে সে জেন ভোলেনা মোরে,,, শুখে থেকো ভালো থেকো মনে রেখো এই আমারে,,,

,,, অপূর্ব এলিজার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এলিজার কন্ঠে এত সুন্দর গান।

ম্যাডাম,চমৎকার,, আমার ম্যাডাম দেখি,, গায়িকা।

এলিজার গলায় গান,, নিস্তব্ধ পরিবেশ,,মিলিয়ে অর্শনগ্র স্বর্গিয় দুজন মানুষ ভাসছে নদিতে।

নৌকা ঘাটে নিয়ে আসলো।

এলিজার হাত ধরে উপরে তুললো।,,,

ঠান্ডা পরিবেশ,, কোন জনব মানব নেই,, কোথাও একটা ঝিঁঝিঁ পোকার

আওয়াজ নেই।,,, কিন্তু হঠাৎ অপূর্ব শুনতে পায়ডান দিকে কিছুটা দূরেই ঝোপঝাড়, সেখানে থেকে চপর চপর আওয়াজ আসছে।

রাত প্রাই — ১ টা নাগাদ

, অপূর্ব ঠিক শুনতে পাচ্ছে।ডান দিকে চপর চপর আওয়াজ।কেউ আছে,,

এলিজা ও শুনতে পেলো।

অপূর্ব: , তুমি এখানেই দাড়াও

কোথাও যাবে না

এলিজা শুনোন না বলতেই অপূর্ব চুপ নির্দেশক ইশারা করলো। পাজামার রবারে আটকানো পিস্তল টা বের করে। সামনে তাক করে অপূর্ব এগোচ্ছে।ঘা ঝিম ঝিম।মাথার উপর থেকে হঠাৎ একটা বাদুর উড়ে গেলো।অপূর্ব কোন ভয় পেলো না।,, অপূর্ব মৃত্যুর বুকেও বুক পেতে দিয়ে

হলেও সত্য উদঘাটন করবে,, বরাবরই এরকম।

পিস্তল টা বের করে ই সামনে যেতেই দেখলো, দুজন লোক দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ঝোপঝাড় থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। সামনে কেউ সাদা পাঞ্জাবি পরা,তার , সামনে উল্টো ,মুখ ঘিরে কেউ। তার পরনে কালো জ্যাকেট,কালো প্যান্ট।

কারা আপনারা,, এত রাতে এখানে কি করছেন???অপূর্ব সামনে গিয়েই মুখ দেখতেই ,

অপূর্বর পায়ের তলা থেকে , মাটি সরে যায়।

সামনে আর কেউ নয় ,, তার ই প্রান প্রিয় বন্ধু সূর্য ,,,, তার সাথে, সেই মৌলভী ।আজকের রাত টা যেন কাটছেই না।

বিভোর হয়ে আছে। নিজের অজান্তেই চোখের কোন থেকে গড়িয়ে পানি পড়ছে।,

৩ বছর আগে।যেদিন যখন শায়ান -প্রথমবার - এই কলেজে চাকরির জন্য পরিক্ষা দিতে আসে।, সেদিন থেকেই যে তাকে ভালো বেসে ফেলেছিলাম। তার অপরূপ দৃষ্টি তে যেন, ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলাম। তাকে পাওয়ার আশায় যে,, কত

জনকে প্রত্যাখান করলাম। তার কোন হিসাব নেই, ।বাবা প্রতিবার ই ছেলে দেখলে কোন না কোন বাহানায় না করে দিতাম।

যার জন্য এত জনকে অবহেলা করলাম।,, সে কি কোনদিন আমাকে বুঝবে। ,,

নাকি অপ্রকাশিত, একতরফা ভালোবাসা নিয়ে ই সারাজীবন কাটাতে হবে।

এসব ভাবতেই মিরার চোখ দিয়ে অঝরে পানি গড়িয়ে পরে।

,

—তুলি মিরার বাড়ির কাজের লোক হঠাৎ বললো,আপা নিচে একজন আপনারে ডাকছে।

মিরা চোখের পানি মুছে ফেললো।

মিরা : এত রাতে কে।

তুলি : জানি না বলছে আপনাকে ডেকে দিতে ।

ছাদ থেকে নিচে দেখতেই শায়ান কে দেখতে পেলো। দৌড়াতে দৌড়াতে নিচে চলে আসে।

মিরা : স্যার আপনি এখানে,?

শায়ান :এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য মাফ চাইছি!

মিরা :ভেতরে আসুন!

শায়ান :না ,, বাড়ি ফিরবো !

মিরা :কি বলেন হঠাৎ বাড়িতে ফিরবেন ??

শায়ান বলল,হ্যা দু'দিন ধরে মনের ভেতর কুহ ডাকছে, ভাবলাম বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

একটা কাগজ টা মিরার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো,এটা আমার ছুটির আবেদন অ'ধ্যাক্ষকে দিয়ে দিবেন।

শায়ান দ্রুত পায়ে পদত্যাগ করতেই–মিরা পেছন থেকে বললো,আমাদের আবার কবে দেখা

হবে?? শায়ান থমকে গিয়ে বললো ভাগ্যে থাকলে,, শীঘ্রই,, না হয় কোনদিন নয়।

বলেই চলে যায়,,

শায়ান এর পথ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মিরা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ।শায়ান এর বাম হাতে বেলি ফুলের তোরাটা।, কি অদ্ভুত।কি হলো হঠাৎ,, এত রাতেই বা কেন ফিরছে

।হয়তো মা বাবার কিছু হয়েছে।তাই এত রাতে ফিরছে।

তিলকনগর———————-অপূর্ব :কথা বলছিস না কেন ? এখানে এত রাতে কি করছিস!

সূর্য বললো ,দেখতে পারছিস না কি করছি কথা বলছি তার সাথে।

অপূর্ব :তুই এনাকে চিনিস?

সূর্য :, না তবে সাদিকের কাছে আজ শুনলাম তুই নাকি মৌলবির জন্য

হতাশায় পরছিস। তার জন্য তোর রাগ হলো । তুই কাউকে নিয়ে চিন্তায় থাকবি , আর আমি চুপচাপ দেখবো, তাই ছুটে চলে আসলাম তার কাছে।

অপূর্ব মৌলবির দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো,আপনি তখন স্বীকার করলেন না কেন যে, আপনি গতকাল ঢাকা ছিলেন ?মৌলভি বললো,তোমাদের কোথাও ভুল

হচ্ছে।আমি এই তিলকনগর ছাইরা কোথাও যাইনা।

অপূর্ব: উনি দেখতে হুবহু আপনার মত । আর আপনি বলছেন ওটা আপনি ছিলেন না।

মৌলভি:ও আচ্ছা, মনে পরছে তাহলে তোমাদের আমার জমজ ভাইয়ের সাথে দেখা হইছে।

অপূর্ব,অবাক হয়ে যায়,

জমজ ভাই মানে?

হ,, ওর নাম গুনজন ,,

গুনজন???

সূর্য: উনি এটাই বলছে. এতক্ষণ থেকে।

অপূর্ব :তুই আজকে সারাদিন কোথায় ছিলিস??

সূর্য কপাল চুলকাতে চুলকাতে বললো, ফ্যাক্টরিতে কাজের চাপ অনেক সেখানে ছিলাম।তোর সাথে

মৌলবির তর্ক বিতর্ক হয় সেটা শুনেই এখানে চলে আসি।

অপূর্ব:এই নদীর পারে কেন ?

সূর্য অস্থির হয়ে বললো,তুই প্রশ্ন করা বন্ধ করবি,, ওদিকে এলিজা অপেক্ষা করছে,। তুই ওর কাছে যা আমি এনার সাথে কথা বলে আসছি।

,, অপূর্ব:তুই কি করবি আমাদের সাথে চল একা কোথাও যাওয়ার

দরকার নেই। মৌলবি সাহেব আপনার জমজ ভাইকে নিয়ে আমার সাথে দেখা করবেন আগামীকাল নয়তো........

বলেই অপূর্ব সূর্য কে নিয়ে সামনে এগোতে থাকে ।

কিন্তু মনের মধ্যে কোন শান্তি নেই,, সবকিছু যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। কি হচ্ছে এসব। ভাবতে থাকে অপূর্ব । মৌলবীর বাড়ি যেদিক, সেদিন

থেকেই। তিলকনগরে আসার রাস্তা
।

মৌলবী ,, ইউনুস দোয়া পরছে,, আয়াতুল কুরসি পরছে,, দৌড়াতে দৌড়াতে একবার মাটিতে পরে যায়,, চারদিকে তাকায়। কারো পথ চেয়ে যেন সাহায্য চাইছে। খুব ছটফট করছে মৌলবী।

রাত ঠিক শেষ অংশ,,

মৌলভি দৌড়াতে দৌড়াতে সামনে পরে শায়ান।থমকে দাড়ায় শায়ান। গাড়ি ভারা করে শায়ান ঢাকা থেকে এসেছে।

শায়ান হঠাৎ মৌলভী সাহেব কে দেখে ভয়ে কাতর হয়ে যায়। শায়ানের হাতেও সময় কম বাড়ি ফেরার তারা।

শায়ান বললো,চাচা আপনি এত রাতে কি হয়েছে হাপাচ্ছেন কেন ,?

মৌলভি কাপা কণ্ঠে বললো, শায়ান বাবা তোরে কিছু কইবার চাই,! যা সবার জানা দরকার।

শায়ান :, চাচা আপনি বাড়ি চলেন ,, আমার হাতে সময় কম।

মৌলভি বললো,না ওদিকে যাওন যাইবো না।

আমার হাতে সময় নেই কাল কথা হবে।,শায়ান এর মন মেজাজ এমনিতেই ভাল না মৌলবী কে

এড়িয়ে চলে যায়। শায়ান।—-

সকাল ৬ টা ,,,

জয়তুন নামাজ পরে তবে বিনা আজানে ।,, আজ আজান কেন দিলোনা মৌলবী সাহেব জানি না।

হঠাৎ ই শুনতে পায়,চারদিকে লোকজনের আহা,জারি।

কান্নার জোয়ার বইছে।

আয় হায়য় ,একি হইলো ,, একি হইলো,, বলেই মহিলারা মাথা

থাপরাচ্ছে,, আর দৌড়ে কোথায় যাচ্ছে।

একজনকে দাড় করিয়ে জয়তুন জিজ্ঞেস করলো, কি হইছে সবাই কইজান??

একজন মহিলা বলে উঠলো,

সর্বনাশ হয়ে গেছে সর্বনাশ, মৌলভী সাহেব রে কারা যেন খু,,ন করছে-

চারিদিকে অন্ধকার নিস্তব্ধ আকাশ।

দূরে দু একটা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে।

গাঁ ছমছম । মৌলবি সাহেব হাপাতে হাপাতে বললো,আর পারছি না আর পারছি না।ধংস হবে ।ওদের অভিশপ্ত রাজ্য শীঘ্রই শেষ হবে।

মৌলবী সাহেব এর পূরো শরীর থেকে অঝরে ঘাম ঝরছে।বার বার ঢেক গিলছে।

বয়স প্রাই ৬০,, শরীরে মোটামুটি বল শক্তি আছে,, কিন্তু আজ যে সে ক্লান্ত।রাস্তার দুপাশের ঝোপঝাড় থেকে,, চপর চপর পায়ের আওয়াজ।কেউ ধেয়ে আসছে। মৌলবি ভাবছে ওরা নয়তো?

,, হঠাৎ করেই দু'পাশের ঝোপঝাড় থেকে বেড়িয়ে আসে,, দুটো ছেলে। মৌলবী সাহেব এর কলিজা কেঁপে উঠে। মুখোশধারী দু'জন ছেলে।

দেখতে লম্বাটে শরীর কালো পোশাক। চেনার কোন উপায় নেই। কালো মুখোশ পরিধান করা। তাদের হাতে রা,ম দা।

একজন মুখোশ’ধারী বললো,

মৌলবী সাহেব এত তারা কিসের ? আমাদের সাথে একটু কথা বলুন এরকম করছেন কেন? বললো একজন মুখোশ,ধারী।

সে যে কথা বলার ভঙ্গিমা,, যে কেউ ভয় পেয়ে যাবে।

কারা তোমরা আমার পথ কেন আটকাচ্ছো, যাইতে দাও যাইতে দাও।

মুখোশ'ধারী বললো,আহহা অহা কি করে যেতে দেবো বলুন তো,, আপনাকে যেতে দিলে তো খেলা বন্ধ হয়ে যাবে। বলেই একজন

মুখোশধারী ভয়ংকর ভাবে হেসে উঠে।

এই হাসি তে যেন চন্দ্র তারাও ভয় গেছে ।

,,এ কোন অচেনা গলা এই গলা আগে তো শুনিনি। কি চায় এরা।

দুটো ছেলে কি ভয়ং'কর ভাবে হাঁসছে। দেখছে আর ভাবছে মৌলবী।ভয়ে আদমরা হয়ে যাচ্ছে।

মৌলবীর বুঝতে আর বাকি রইলো তার সময় ক্ষনিয়ে এসেছে।
মনে মনে কলেমা পরতে থাকে। মৌলবীর পাগড়ি সব মাটিতে লুটিয়ে যায়, ।জীবন বাঁচানোর চেষ্টা সবাই করে। মনের অজান্তে এক দিকে এক দৌড়।সামনে থেকে হঠাৎ,, কেউ থমকে দারায়। হাতে রাম দা,, নিয়ে তেরে আসছে ।মৌলবী মাটিতে পড়ে যায়। চেনা যাচ্ছে না, কালো

মুখোশ,, অবাক করা বিষয় হচ্ছে এ কোন ছেলে নয়। একজন মেয়ে মানুষ। কে সে।এককদম , দু, কদম পেছনে এগোতেই। ছেলে দুটোর সাথে ধাক্কা লেগে যায়। মৌলভি মাটিতে পরে যায়।

কাঁপা কণ্ঠে বলে উঠলো ,আমাকে মেরে কি পাবি তোরা ,, তোদের এই খেলা শেষ করতে আল্লাহ কাউকে না কাউকে ঠিক পাঠাইবো।

কথা শেষ হওয়ার আগেই,পেছন থেকে সেই অচেনা মুখোশধারী মেয়েটি ,, এলোপাথাড়ি ছুরি,র আঘাতে শেষ করে দেয়।

মৌলবী সাহেব,, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে,, কয়েকটা হেঁচকি তুলে।

মৌলবী সাহেব এর চোখ বুঝবে বুঝবে, ঠিক তখনই,, খু”নির গুলোর দিকে তাকায়।

মুখোশধারী ছেলে দুটো , একে অপরের হাত রেখে, এমন ভঙ্গিমা ,, করলো যেন , তারা তাদের কাজ হাসিল করেছে।তাদের হাত দুটোর উপরে মেয়ে টিও হাত রেখে,, মুখোশ টি খুলে ফেলে।

মৌলবী সাহেব মৃত্যুর আগে ,, মেয়েটি দেখে নেয়।

মৌলবী সাহেব যা দেখলো তা দেখার জন্য কাশ্মীম, কালেও প্রস্তুত ছিলো না ।

,, মৌলবি সাহেব,, বিড় বিড় করে বলতে বলতে থাকলো। তোদের এই পাপের খেলা বন্ধ হইবো।

বলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ,,

শান্তা দরজাটা খোল।

শান্তা : আমি পরতেছি তুমি যাও।

মেয়েটা কোন কথা শোনার নয়।
সাত সকালে কে আসলো?
দরজায় খুলেই জবেদা, বেগম তার ছেলেকে দেখে অবাক হয়ে যায়।
জবেদা বেগম : শায়ান বাবা তুই ?? কাউকে কিছু না বলে চলে আসলি?? শহরে কিছু হয়েছে??
শায়ান : মা– এত গুলো প্রশ্ন একসাথে করলে কোন টা রেখে

কোনটার উত্তর দেবো। বলেই ব্যাগটা মায়ের হাতে দেয়,,

মনে পরছিলো তোমাদের তাই চলে আসলাম।তোমাদের এসে সারপ্রাইজ দিবো ভাবলাম, আর দেখলে কেমন ঘাবরে দিলাম।জবেদা : পাগল ছেলে।

ফরিদ : কে এসেছে আমার বাপজান এর গলা পাচ্ছি -।

হ্যাঁ বাবা আমি। খুব মনে পরছিলো তোমাদের। তাই চলে আসলাম তোমাদের কিছু না জানিয়ে।

শায়ান বললো,মা আমাকে পানি খেতে দাও।

সমস্ত পথ শায়ান কিভাবে এসেছে তা শুধু শায়ান ই জানে। পিপাসায় কাতর।

ফরিদ সাহেব ঘরে আছেন ও ফরিদ সাহেব। ডাকছে মাস্টার সাহেব।

মাস্টার সাহেব আপনি?——মাস্টার সাহেব: এদিকে তো মহাবিপদ হয়ে গেছে আর আপনি কিছু জানেন না??–

ফরিদ : কেন কি হইছে হেঁয়ালি না করে বলেন ।

মাস্টার সাহেব: মৌলবী সাহেব, রে কারা যেন খু,,ন করেছে।

চট করে শায়ান এর হাত থেকে কাচের গ্লাস টা মাটিতে পরে যায়।

,, সকলের চোখ মুখ ছানাবরা হয়ে যায়, মৌলভী সাহেব খু,,ন হয়েছে। ফরিদ মাস্টার কে নিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে যায় মৌলবীর বাড়ি।

এটা কি করে হতে পারে,, এটা কি করে হতে পারে,,

এ আমি কি করলাম। রাতে যদি একবার মৌলবী চাচার কথা শুনতাম । আমি কি তাকে বাঁচাতে পারতাম? হয়তো পারতাম,, কে করলো এমন

।একজন মৌলবির সাথে ই কার কি শত্রুতা।হাজার টা প্রশ্নে শায়ান এর মাথা ধরে যায়। মাথায় হাত দিয়ে বসে পরে।শায়ান আর মৌলবী দের বাড়ি যায়নি । তার পায়ের হাটার জোর শক্তি চাপসে গেছে।

ক্লান্ত শরীরে – কি বলতে চেয়েছিলো মৌলবী । ভাবতে থাকে শায়ান।

জয়তুন: শুনছেন ,, ওঠেন ওঠেন,, আর ঘুমাইতে হইবো না।

রমজান : সাত সকালে ডাকছো কেন??
মৌলবী সাহেব রে কারা যেন খু,,ন করছে।
কিহহহহহ–চোখ চাপরে ,, ঘুম থেকে উঠে এলো অপূর্ব, সূর্য!!
এলিজা বললো,কি বলতেছো মামি? মৌলবী চাচা কে খু,ন করছে।
এলিজার পূরো শরীর কাঁপতে থাকে।

তার সাথে কার কি শত্রুতা?? কে মারলো।

রমজান শুনেই মৌলভীর বাড়িতে চলে যায়।

অপূর্ব : কালকে আমরা একটা ভুল করেছি। তোকে মৌলবীর সাথে পাঠানোর উচিত ছিলো।

সূর্য :হ্যাঁ আমি তো বলেছিলাম,, কিন্তু তুই ই তো যেতে দিলি না। কিন্তু কে বা কারা এমন করলো।

উঠানে বের হয় কথা বলতে থাকে। অপূর্ব সূর্য মৌলবি কে নিয়ে আলাচ আলোচনা করছে।

অপূর্ব:তুই খোঁজ নে মৌলবীর জমজ ভাই গুঞ্জন এর।

সূর্য : তোর কি মনে হয় ওনার সত্যি কোন ভাই আছে। আমার তো মনে হয় ,,ওনার কোন ভাই ই নেই। ঢাকা আমরা যাকে দেখেছি। তিনি ই হয়তো ইনি ,,আর নিজের কোন

কর্মের ফল ই হয়তো পেয়েছে ,, না হয় পারিবারিক শত্রুতা। বললো সূর্য

অপূর্ব: তুই কি বলতে চাইছিস মৌলভী আমাদের মিথ্যা বলেছে?

সূর্য : তা নয়তো কি,, কাল যখন ওনার সাথে কথা বলি উনি তখন ভয়ে ভয়ে কথা বলছিলো।সন্ধ্যা থেকে মুষল ধারে বৃষ্টি নামছে ,, এই বৃষ্টি সেই বৃষ্টি যাকে বলে শীত নামিয়ে নিয়ে আসে। শীতের

পূর্বাভাস পরলেও হঠাৎ যেন কালো মেঘে আকাশ টা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে ।

,,,, জয়া সন্ধ্যা থেকে অপেক্ষা করছে , জাহাঙ্গীর ঘরে নেই।কখনো কাউকে কিছু না বলে কোথাও যায়না আজ হঠাৎ কোথায় গেলো তাও এত বৃষ্টির মধ্যে।,,

ফুপি– এত চিন্তা করো না চলে আসবে।

বললো চাঁদনী

হঠাৎ করে মানুষ টা কোথায় যাবে কাউকে কিছু না বলে-কিশ্যামলী-বাঁটি হাতে আচার নিয়ে দৌড়ে এলিজার কাছে যেতেই ,, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সূর্যের সাথে ধাক্কা খেয়ে ধপাশ করে পরে যায়।

শ্যামলী পরে গিয়ে বললো,

ওরে মা কি দানব রে বাবা।

সামনে দাঁড়িয়ে,, লম্বাটে,, একটা ছেলে।পরনে কালো প্যান্ট,,সাদা টি-সার্ট-কালো জ্যাকেট,, সবসময় একটা ভিলেন ভিলেন ভাব থাকে সূর্যের মধ্যে।শ্যামলী :এত বড় দানবের মতো শরীর নিয়ে আমাকে ধাক্কা দিলেন কেন।

সূর্য :ওয়ে নিজে এসে আমার সাথে ধাক্কা খেয়েছো। চোখে দেখো,না অন্ধ মেয়ে।

শ্যামলী : আপনি অন্ধ ইচ্ছা করে আমার আচার গুলো নষ্ট করে দিলেন।বদমা,শ লোক একট।

সূর্য :মুখ সামলে!

শ্যামলী :কি করবেন শুনি।

সূর্য :মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলবো,,

শ্যামলী : একটা মেয়ের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় জানেন না।

সূর্য: যেই না চেহারা হুমমমমম।

বলেই মুখ কুঁচকে দেয় সূর্য,।শ্যামলী : নিজে কি কালা পাঠা আবার আমাকে বলছে।

সূর্য : কি সাহস রে বাবা তালে তাল মিলিয়ে ঝগড়া করছে।এই শোনো তুমি ইচ্ছে করে আমাকে ধাক্কা দিয়েছো।

হিরোর মত ভাব নিয়ে সূর্য বলতে শুরু করলো,,,,কারন ঢাকার সব মেয়েরা আমার জন্য পাগল,,কোন না

কোন বাহানায়, ওরা আমার সাথে কথা বলতে চায়,,আর তুমি ও আমার সাথে,,কথা বলবে কিভাবে তাই ধাক্কা দিলে।

শ্যামালী বললো,রাক্ষসের মত চেহারা নিয়ে কি ভাব।

শ্যামলী,, মেঝে থেকে উঠতে উঠতে যাবে ঠিক তখনই ।

সূর্য হাত বাড়িয়ে দেয় বললো,হাতটা ধরো বুঝেছি আমাকে ছাড়া তুমি উঠতেই পারবে না।

আমি একাই পারবো কোন রাক্ষসকে দরকার নাই।সূর্য ,শ্যামলীর ঝগড়া শুনে বেড়িয়ে আসে। এলিজা-অপূর্ব,,

এলিজা : তোরা ঝগড়া করছিস কেন বলতে যাবে ঠিক তখনই,অপূর্ব মুখ চেপে ধরে।

অপূর্ব ফিসফিস করে বলল,বিরক্ত করছো কেন করতে দাও ওদের ঝগড়া।

এলিজাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে। অপূর্ব ধুতনিটা কাদের উপর রাখলো ।লাল টুকটুকে গালে চুমু খায়।

এলিজা :ছাড়ুন না!সুযোগ পেলেই আপনি –চুমু খেতে শুরু করেন,জড়িয়ে ধরেন।

অপূর্ব মৃদু হাসি হেসে বললো, আমার বউকে আমি যখন ইচ্ছা ধরবো, যখন ইচ্ছা চুমু খাবো।তাতে তোমার ,,কি??

এলিজা : দেখে ফেলবে কেউ।

অপূর্ব চিৎকার করে বললো, এই কে আছো বলতেই এলিজা মুখটা চেপে ধরে।

এলিজা :আপনি ও না একদম বাঁচ্চা, দের মত করেন।

সূর্য গলায় কাশি দিয়ে বললো,আমরা কিন্তু কিছু দেখেনি।

এলিজা লজ্জা পেয়ে ঘরের ভেতর চলে যায়,, শ্যামলী, সূর্য, অপূর্ব আওয়াজ করে হেসে উঠে।—————

রাত ১০ টা

,, ঢাকাতে আজ মুষল ধারে বৃষ্টি হচ্ছে । চারদিক।নিশ্চুপ।কি যেন কি হচ্ছে।মনের মধ্যে শুধু কুহ ডাকছে।

মেঘলা আকাশ যেন কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে। কি যেন কি হচ্ছে ।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কখন থেকে অপেক্ষা করছ জয়া।ভাবছে, মানুষ টি কখন আসবে। এই বয়সেও তোরঝোপ গেলো না তার।

হঠাৎ ই কারো আগমন ঘটলো। কে যেন দ্রুত পায়ে হেঁটে বাড়ির মধ্যে ঢুকছে। কালো রেইনকোট পরনে। ভালো দেখাও যাচ্ছে না।

,, ঠক ঠক দরাজায় আওয়াজ আসছে কেউ এসেছে নিশ্চয়।কিন্তু লোকটা কে? অপূর্বর বাবা নয়তো,। হয়তো চলে এসেছে,,

জয়া দরজা খুলবে।তার আগে ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে। কে আপনি?

আমি জাহাঙ্গীর দরজা খোলো।

দরজা খুলে দেয়।জয়া :আপনি কোথায় গেছিলেন?

জাহাঙ্গীর কিছু বলছে না চোঁখে আতংকের ছাপ।

জয়া কে গ্রাহ্য না করে ঘরে চলে আসে। রেইনকোট টা পাল্টে নেয়,।

জাহাঙ্গীর :খাবার খেতে দাও

অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবছে জয়া। মানুষ টি হঠাৎ অদ্ভুত আচরণ করছে কেন।

,, খাবার খেতে খেতে বললো, অপূর্ব কে চিঠি পাঠাও খবর দাও ।আমি

অসুস্থ, ।ওরা যেন কালকের মধ্যে চলে আসে।

জয়া :হয়েছি কি বলবে তো?এরকম করছো কেন?

জাহাঙ্গীর কর্কট মেজাজে বললো, আমি আমার ছেলেকে ছাড়া থাকতে পারি না, এটা জানো না, নাকি??

জয়ার বুক কেঁপে উঠে।

ছেলের জন্য ভালোবাসা আছে, তা সত্য কিন্তু তাকে ছাড়া দুদিন থাকতে পারছে না,, কোথাও গড়মিল আছে।

রাত ফুরিয়ে সকাল হয়ে যায়__-

তিলকনগর —-

অপূর্ব ঘরের বাহিরে চৌকির উপর বসে চা খাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ বেড়িয়ে আসলো পাখি।

পাখির ভাব দেখে বুঝতে পেরেছি কোন বাহানা নিয়ে এসেছে।

পাখি :দুলাভাই আপনার সাথে একটা কথা আছে ,.

অপূর্ব :আমার শালিকার একটা না , হাজার টা কথা শুনব!

পাখি : নিমতলা প্রতি তিন মাস পর পর মেলা বসে, গ্রামের সব মানুষ মেলা দেখতে যায়, বাচ্চাদের খেলনা থেকে শুরু করে বই ফুল সমস্ত জিনিস সেখানে পাওয়া যায়। চলেন আমরা সেখানে সবাই মিলে যাই।

অপূর্ব মৃদু হেসে বলল, শালির আবদার তো রাখতেই হবে। সূর্য, এলিজা,পাখি শ্যামলি সবাই মিলে মেলার উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পরে। মেলার একপাশে নাগরদোলা। কেউ ফুল বিক্রি করছে। কেউ আসবাবপত্র বিক্রি করছে,। কেউ নাগর দোলনায় দোল খাচ্ছে।তো,কেউ জিনিস পত্র কিনছে, সব মিলিয়ে মেলা জমজমাট।

পাখি এটা ওটা কিনছে । এলিজা,, কিছু কিনছে না ।অপূর্ব বললেও না করে।

শ্যামলী আর সুর্য,, একসাথে এটা ওটা কিনছে।

অপূর্ব,, দেখতে পায় দূরে একটা বেলিফুলের দোকান।

অপূর্ব :বেলিফুল কত করে ?

সাহেব সকাল থেকে একটাও বিক্রি হয়নি। আপনি যা দেন।

অপূর্ব একটা মালা কিনে ৫০০ টাকা ধরিয়ে দেয়।

লোকটি ভিষন খুশি হয়।,, অপূর্ব মেলা ভর্তি মানুষের সামনে এলিজাকে বেলিফুলের মালাটা পরিয়ে দেয়।

এলিজা : কি করছেন সবাই দেখছে।

এলিজা-লাজুক ঠোঁটে হাসলো।

অপূর্ব : যদি সবার সামনে না পরাতাম তবে কি তোমার,, মুখের ঐ লাজুক হাসি দেখতে পেতাম।

__শায়ান খোশ মেজাজে বসে আছে।

শান্তা শায়ান কে উদ্দেশ্যে করে বললো,

তুই বাড়িতে কেন আসছিস আমি কিন্তু জানি।

শায়ান ব্যাগ থেকে কিছু বের করছে আর বলছে ,বল কেন এসেছি,?

শান্তা :আগে চকলেট দে!

তোর কথা তুই বলবি তাতেও ঘুষ দিতে হবে??

শান্তা:তা নয়তো কি।শান্তা চকলেট হাতে পেয়ে বললো, আমাদের মনে পরেছে তাই আসছিস ,,বলেই হেসে উঠলো শান্তা।

শায়ান :বড্ড পেকেছিস।

শান্তা :এই বেলিফুল কার জন্য?

এলিজার জন্য।

শান্তা : কোন এলিজা?

তিলকনগর কয়টা এলিজা আছে।

শান্তা : উফ বলনা।

শায়ান :রমজান আলির ভাগ্নি।

শান্তার হাত থেকে, ধপাস করে চকলেট গুলো পরে যায়।

শায়ান অস্থির হয়ে বললো

শায়ান :কি হয়েছে বল না কি হয়েছে ?শান্তা চুপ করে থাকিস না বল?

শান্তা বললো,ভাইয়া এলিজা আপুর বলেই.. চোখ মেঝের দিকে স্থাপন করলো।

শায়ান : কি হয়েছে আমার এলিজার বল। চুপ থাকিস না বল।

শান্তা : তার বিয়ে হয়ে গেছে,, শহরের একজন পুলিশ অফিসার

এর সাথে।শায়ান ধপাস করে,হাঁটুঘেরে ফ্লোরে বসে পরে। দুহাত দিয়ে,নিজেই নিজের চুল গুলো কে টেনে ধরে। এ আমি কি শুনলাম। এটা আমি কি শুনলাম। ঘরের সমস্ত জিনিস তছনছ করে দেয়। সমস্ত কিছু লুটপাট করে, ফেলে।

ভাইয়ের এরকম অবস্থা দেখে শান্তা অঝরে মুখ চেপে,কান্না করছে।

চিৎকার করে বুক ফাটিয়ে শায়ান কান্না শুরু করে।

শায়ান : মজা করছিস তাই না বল শান্তা তুই মজা করছিস । শান্তা কান্না চোখে ,না সূচক মাথা নাড়ে।,

শায়ানের ভেতরে দুমরে মুছরে যাচ্ছে। কি হবে আমার কি হবে। কি নিয়ে থাকবো। কি করবো এখন আমি।

শায়ান বেখেয়ালি ভাবে,আলি বাড়ির উদ্দেশ্যে দৌড়াতে শুরু করে। পাগলের মত দৌড়াতে থাকে।একটা ভ্যানের সাথে ধাক্কা খেয়ে ,পাশে ধাকা ধান ক্ষেতের মধ্যে পরে যায়। ছেলেটা কি পাগল নাকি। বলছে ভ্যাঁনে থাকা লোক।ক্ষেতে থাকা কাচ ভাঙাতে পা কেটে র'ক্ত ঝড়তে থাকে। সেদিকে খেয়াল ই করলো

না। পা কাটার ব্যাথার থেকেও মনের, ব্যাথা আজ দ্বিগুন।

উঠেই আবার দৌড়াতে থাকে। দৌড়াতে দৌড়াতে পৌঁছে যায় আলি বাড়ি।

এলিজা এলিজা, বলে চিৎকার করতে থাকে ।

বেড়িয়ে আসে জয়তুন।

জয়তুন: শায়ান বাবা তুমি।

এলিজা কোথায়?

জয়তুন :ওরাতো মেলায় গেছে।

শায়ান জয়তুন এর কথা শেষ হওয়ার আগেই দৌড়ে চলে যায় মেলাতে।

এদিক সেদিক দেখছে পূরো মাথা যেন ঘুরছে ।শরীরর রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। প্রকৃতি যেন ,, শায়ান এর এরকম অবস্থা দেখে হায় হায় করছে।

দেখতে পেলো এলিজা কে।

কালো শাড়ি পরা, চুল বেনুনি করা, দাড়িয়ে হয়তো ওর স্বামীর সাথে ই হাঁসছে। শায়ান

এলিজা বলে এক চিৎকার করে উঠলো।

সবাই থমকে যায়।নাগর দোলনার ঘুরপাক বন্ধ করে দেয়। কেনাকাটা রেখে সবাই শায়ান এর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মেলার জমজমাট যেন নিমিষেই ধ

থমকে যায়।

শায়ানের পা থেকে র’ক্ত পড়ছে।ঘৃনা জড়িত কণ্ঠে বলতে থাকলো, কালনাগিনী ,বলেই এলিজা-কে এক ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। পরে যায় এলিজা মাটিতে।

অপূর্ব ক্ষিপ্ত হয়ে অসরক ভাবে মারতে শুরু করে শায়ান কে । তোর এত বড় সাহস কু,ত্তার বাচ্চা।আমার

বউয়ের গায়ে হাত তুলেছিস।

এলিজাকে শ্যামলি উঠিয়ে নেয়।

অপূর্ব কে সূর্য জোড় করে এক পাশে নিয়ে যায়।

শায়ান মার খেয়েছে সেদিকে কোন খেয়াল ই নেই। উঠে দাঁড়িয়ে,ঝাপটে এলিজার পায় পরে যায়,তার কান্নায় আকাশে কালো মেঘ জমে যায়।,চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়।

কাঁপা কণ্ঠে বলতে থাকলো,,

শায়ান : এটা তুমি কি করলে এলিজা-কেন আমার সাথে এমনটা করলে ।কেন? কি অপরাধ করেছিলাম ,,আমি! ভুল কি ছিল আমার ভালোবাসায়!!,, কেন আমার জীবন টা ক্ষতবিক্ষত করে দিলে । কেন?এলিজা-থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে।

কি করে বাঁচবো আমি তোমাকে ছাড়া। গত ,সময়টাতে যে একটু

একটু করে , তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছি। বলেই ,, অঝর বৃষ্টির মত তে কান্না শুরু করে।

সবাই হা করে তাকিয়ে দেখছে কেউ কেউ কানা ফুসফুস করছে, কেউ নানান কথা বলছে,,

,, তুমি যে ছিলে আমার প্রহরী রানী, স্বপ্নের রানি, তুমি যে ছিলে শখের নারী,, তবে কি আমি আমার শখের নারীকে সত্যিই হারিয়ে ফেলেছি।

এলিজার চোখ থেকে পানি ঝরতে থাকে।

আশেপাশের সবাই এক যেন, ব্যার্থ প্রেমিক কে দেখছে।

,,শায়ান: তুমি ফিরে চলো !চলে এসো আমার সাথে!তোমার একটা কেন হাজার টা বিয়ে হলেও আমার তোমাকেই লাগবে।একবার বলো,, ঐ পুলিশ তোমারে জোর করে বিয়ে করছে,, বলো।, না হয় একটা বার

বলো পরিস্থিতির জন্য বিয়ে করেছো,, একটা বার বলো।
আমি তোমাকে নিয়ে অনেক দূর চলে যাবো,।
এলিজা শায়ান কে সরানোর চেষ্টা করলে শক্ত করে ধরে রাখে,, পা দুটো,,
পাশ থেকে কেউ কেউ বলছে ভালোবাসার কি নিষ্ঠুর পরিহাস,,দিন ফুরিয়ে রাত হয়ে যায়।

ফরিদ :শায়ান কোথায়?

জবেদা বললো,সকালে বেড়িয়েছে তারপর আর ঘরে আসেনি।

শান্তা ঘাপটি মেরে বসে আছে। সে জানে তার ভাই কোথায়।

,,,, নদীর তীরে বসে আছে শায়ান। সন্ধ্যা হয়ে আসছে।সারাদিন বাড়ি ফেরেনি খায়নি।

তখন এলিজা একটা কোন কথা বললো না বুকের ভেতরটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।

নিশ্চুপ চারপাশ, শান্ত নদী, সন্ধ্যা মেলায় যেন ওরা আমাকে নিয়ে মজা করছে ,হাসছে ওরা।আমি বুঝতে পারছি।

হাত দুটো মাথার নিচে দিয়ে, ঘাসের উপর শুয়ে পরে।

একা একা ভাঙা হৃদয় নিয়ে বলতে থাকে,বিথাতা,, কি অন্যায় করেছিলাম, কিসের জন্য আমাকে পুড়িয়ে দিলে এই বিষা'ক্ত ভালোবাসায়।উত্তর আছে কি তোমার। হা বলো কোন উত্তর আছে,।আমি জানি কোন উত্তর নেই কোন উত্তর নেই।

মনে হচ্ছে গোটা পৃথিবী টা আমাকে দেখে হাসছে, কারন আমি যে ব্যার্থ।

হে বিধাতা, বলে দাও আমাকে, যাকে আমি ভালোবাসি তাকে কি করে ঘৃনা করবো? কিভাবে!পারবো না আমি তাকে ঘৃনা করতে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ভারি একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেললো ।চোখের দু পাশ থেকে অঝরে পানি পরছে। আমার কেউ নেই কেউ না, বড্ড একা তাই,আজকে আমার ও গাইতে

ইচ্ছা করছে–নিথুয়া পাথারে নেমেছি বন্ধুরে
,, ধরো বন্ধু আমার কেহো নাই, ধরো বন্ধু আমার কেহো নাই ও বন্ধু ধরো বন্ধু আমার কেহো নাই ,,
অল্প বয়সে পিরিতি করিয়া ,, হয়ে গেলো জীবনের ও শেষ,,
হয়ে গেলো জীবনের ও শেষ ও বন্ধু হয়ে গেলো জীবনের ও শেষ।

নিথুয়া পাথারে নেমেছি বন্ধু রে..ধরো বন্ধু আমার কেউ নাই।

চিকোনো থুতিখানী পরিতে না জানি, না জানি বান্দিতে কেশ , না জানি বান্দিতে কেশ,ও বন্ধু না জানি বান্দিতে কেশ।**

চারপাশ যেন নিস্তব্ধ।ভালোবাসার মায়ায়, আমাকে আজ মেরে ফেলেছে,।আকাশের দিকে তাকিয়ে।

আমার মত কপাল যেন কোন পুরুষের না হয়।

পরদিন সকাল বেলা—-

রমজান : অপূর্ব শহর থেকে তোমার মা চিঠি পাঠিয়েছে!

কে দিলো?

একজন লোক এসে দিয়ে গেছে।

() অপূর্ব :বাবা অসুস্থ,,

সূর্য:কি বলিস আংকেল এর হঠাৎ কি হলো?

জানি না আজকেই ফিরতে হবে।

রমজান : কি করে যাবে আজকে যে ঢাকায় যাওয়ার জন্য সমস্ত গাড়ি বন্ধ। আর তোমাদের গাড়ি তো এখানে নেই,,

সূর্য: একটা উপায় আছে ,

কি উপায়?দীগন্ত নদী তে টলার আছে আমরা টলার করে যেতে পারি।

রমজান:বাবা দীগন্ত নদী তো সুবিধার নয়। জন্ত জানো,,য়ার থাকে!

অপূর্ব :মামা নদী পথে কোন জানো,য়ার আক্রমন করবে না!

রমজান:দেখো এলিজা-যদি রাজি হয় আমার কোন আপত্তি নেই।

এলিজা বারান্দায় এক কোনে দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্ব পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বললো,মন খারাপ করে

আছো, তোমার আর শায়ান কে নিয়ে আমার কোন অভিযোগ নেই।তোমার মনের কোন এক কোনে ও যদি শায়ান এর জন্য মায়া থেকে থাকে তাহলে চলে যাও। ভালোবাসা হয় মুক্ত পাখির মত।যদি তুমি ফিরে এসো তবেই তুমি আমার।

এলিজা আঝাপটা — দিয়ে জড়িয়ে ধরে অপূর্ব কে।

কাপা কন্ঠে বললো,এমন কথা বলবেন না,। আমার পৃথিবী আপনি। আপনি যে আমার জান্নাত।আমার মনে শুধু আপনার ই জায়গা।অপূর্ব মৃদু হেসে, এলিজার কপালে চুমু খায়।

অপূর্ব :আমি চাই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এলিজা এমন থাকুক। এলিজার এই রুপ কোনদিন যেন পাল্টে না যায়। বলেই বুকে জড়িয়ে নেয় এলিজাকে।

অপূর্ব: আজকে যে আমাদের যেতে হবে।

এলিজা :কোথায়?

অপূর্ব :ঢাকায়,মায়ের চিঠি এসেছে, বাবা অসুস্থ ।

এলিজা:কি বলছেন বাবা অসুস্থ। কিন্তু সমস্ত গাড়ি বন্ধ কি করে যাবো।,

অপূর্ব:দিগন্ত নদী, টলার করে।

এলিজা অপূর্বর দিকে কে আ'হত চোখে তাকিয়ে বললো,আমি যাবো না, নদীটা ঠিক নয়। ভয়ানক সবাই বলে!

কিছু হবে না যেতে হবেই।আর তোমার থেকে ভয়া'নক কেউ আছে নাকি। তুমি সবথেকে বেশি ভয়ানক।

এলিজা মৃদু সুরে হাসলো।টলার ভারা করে রমজান। এলিজা সূর্য অপূর্ব,সবার কাছ থেকে বিদায় নেয়। এলিজা পাখিকে আদুরে গলায় বলল,তুই একদম শুকিয়ে গেছিস? আমি আবার এসে তোকে যেন এভাবে না দেখি!!

পাখি বললো, তুমি ও নিজের খেয়াল রেখো।আর আমি নিজেকে পরিবর্তন

করে নেবো। আবার এসে তুমি আমায় ভিন্ন রকম দেখবে।

একটা ভ্যানে করে তিনজন বেড়িয়ে পরে দীগন্ত নদীর তীরের উদ্দেশ্যে।

চারদিক

অন্ধকার।বিন্দু বিন্দু চাঁদের আলো। আকাশে মেঘের দর্পন থাকায় চাঁদনীর আলো পড়ছে না।

সন্ধ্যা ঠিক – ৭ টা নাগাদ।

অপূর্ব,, এদিক ওদিক দেখছে। চারদিক পরোখ করছে,।অপূর্ব পূর্ব দিকের ঝোপঝাড় দিকে লক্ষ্য করলে দেখলো। অপূর্ব যা দেখলো তাতে তার মাথা ঘুরে যায়।শ্যামলী ঝোপঝাড় থেকে দৌড়ে কোথায় যাচ্ছে।অনেক ক্ষন পরোক্ষ করলো। হ্যা ওটা তো শ্যামলি।

অপূর্ব কিছুক্ষন চোখ বুঝে ভাবতে থাকে।, হ্যালোসোলেশন হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে দেখে ঘাটের কাছে চলে আসছে। অপূর্ব ভাবলো,উফ, বাবার চিন্তায় মাথা শেষ। তারমানে ভুল দেখছিলাম।

টলারে এলিজা উঠে যায়, সূর্য উঠে যায়।

অপূর্ব উঠবে ঠিক তখনই

পেছন থেকে ঝাপটা মেরে কেউ হাত ধরে ফেলে।

অপূর্ব পেছন ঘুরতেই দেখে, মৌলবী সাহেব।

অপূর্বর চোখ গুলো ছানাবড়া হয়ে যায়। মৌলবী সাহেব আপনি?

আমি গুনজন। মৌলভি কে ওরা মেরে ফেলেছে।

অপূর্ব: আপনি কে আর হাত ধরে রাখছেন কেন, ?আর এটা বলুন, ? মৌলবী কে'কে মেরেছে ?

গুঞ্জন বললো,সব সত্যি জানতে চাও তো চলো, আমার সাথে।

সূর্য গুঞ্জন এর হাত সরিয়ে বললো, দূরে সরে জান , যাওয়ার পথে বাধা দিতে নাই জানেন না,

অপূর্ব : মৌলবী সাহেব এর মৃত্যুর রহস্য জানতে পারার এটাই সুযোগ।,

তোর বাবা বড় না মৌলবী? সূর্য অপূর্ব কে জোড় করে টলারে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।

টলার ছেড়ে দিলে গুনজন বলতে থাকে জোড় গলায়,, ঘোর বিপদ ঘোর বিপদ।

কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে পৌঁছে যায় ঢাকায়।

অপূর্ব বাড়ি ফিরেই জাহাঙ্গীর কে খুঁজলো।

অপূর্ব :বাবা কোথায়জয়া কোন উত্তর,দিলো না ।

বাবা বাবা ডাকতে থাকে অপূর্ব।

কোথাও সাড়া শব্দ নেই।

মনোরা-: বড় সাহেব ফ্যাক্টরিতে গেছেন।

কিহহহ তবে যে বললো অসুস্থ। অপূর্ব রাগান্বিত ভঙ্গিতে এক লাথি মারলো সোফাতে। দূরে সর সোফাটা।

অপূর্ব:তারমানে আমাকে মিথ্যা বলা হয়েছে।

এলিজা জয়ার পায়ে সালাম করে।

রান্না ঘরে মনোরা রান্না করছে।

এলিজা প্রথমবার রান্না ঘরে।

মনোরা :বউমনি,, আপনি এইহানে কে আপনি কন কি লাগবো আমি বানাই দেই।,,

এলিজা মৃদু হেসে বললো,আমি আজ সবার জন্য রান্না করবো। আপনি সব কেটে ধুয়ে দিন।

মনোরা অনেক অনেক প্রশ্ন করতে থাকে এলিজাকে।কিভাবে পরিচয় বিয়ে, ব্লা ব্লা,

এলিজা সব কিছুর উত্তর দেয় ।

,, মনোরা : আঁচ্ছা বউমনি আপনার বাবার বাড়ি যেন কোথায়?

তিলকনগর-

মনোরা : ও আচ্ছা এই ব্যাপার ।বড় বাবুরা ও আগে তো তিলকনগর। থাকতো,, ১৫ বছর হয় ঢাকা চইলা আইছে।

ল্যান্ডলাইনে ফোনের আওয়াজ। ফোনটা অপূর্ব রিসিভ করে বললো, অপূর্ব বলছি ,ওপাশ থেকে একজন কনস্টেবল বললো, স্যার ডিসি সাহেব এর ছেলে সৈকত ,, কে কারা যেন খু,,ন করে ।

তার শরীর থেকে হার্ট বের করে তার লা'শটা মমি করে ,, পাঠিয়েছে। সাথে রক্ত দিয়ে একটা চিরকুট পাঠিয়েছে,, আপনি তারাতাড়ি আসুন....,, চারদিকে মানুষদের কো'লাহল। সবাই আতং'কে দিকভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে।ভয়ে চুপসে যাচ্ছে।একজন ডিসি সাহেব এর ছেলের এরকম নির্মম হত্যা,,কান্ড। এ কোন সাধারণ বিষয় নয়।

সৈকতের লা,শের কাছে বসে কাঁদছে, ডিসি সাহেব।
কাঁদছে শাহানা বেগম,, সৈকতের মা।
ভাগ্যের কি নির্মম খেলা। একমাত্র ছেলেকে হারাতে হলো। চারদিক হইহই,
অপূর্ব ডিসি সাহেব কে শান্ত না দিতে থাকলেন। কিন্তু তাতে কিছু ই হলো না।

কাপা কণ্ঠে ডিসি সাহেব বললো,আমরা অযোগ্য অপূর্ব। আমরা পুলিশের যোগ্য না।পুলিশ হয়ে ও নিজেদের মানুষ দের ই রক্ষা করতে পারলাম না।

সবাই অভাক হয়ে মমিটা দেখছে । কি সুন্দর করে সাজানো।একটা বিয়ের গাড়ি যেভাবে সাজায় ঠিক সেইভাবে সাজানো। ঢাকার শহরের সমস্ত মানুষের ভির জমেছে।এমন

নির্মম মৃত্যু কোনদিন কেউ কল্পনাতেও দেখেনি।

,,, চিঠি টা একজন কনস্টেবল অপূর্বর কাছে দেয়।অপূর্বর শরীর কেঁপে উঠে। তাজা র'ক্ত টক টক করছে।হয়তো সৈকতের র,ক্ত দিয়েই লেখা।

চিঠিটায় লেখা—আমার পাপের সম্রাজ্য সবাইকে স্বাগতম। নির্মম মৃত্যু খেলায় সবাইকে স্বাগতম ।

কেমন লাগছে আজকে সন্তান হারিয়ে ,?বেশ লাগছে? আমার খুব আনন্দ হচ্ছে ।সবার কান্নার আহা,জারি তে খুব তৃপ্তি পাচ্ছি।দেখা হবে খুব শীঘ্রই,, কোন এক হৃদয়বিহীন দেহ নিয়ে দেখা তো হতেই হবে।

,,, অপূর্ব চিরকুট টাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে,, কি ভয়ং'কর শব্দ গুলো। অপূর্বর পূরো শরীর

থেকে ঘাম ঝরতে থাকে। নাক,চোখ, লাল কার্নিশ হয়ে যায়।এলিজা বিড়বিড় করে বললো,উনি বেরিয়ে গেলেন।.একটাবার বলার প্রয়োজন বোধ করলো না। তারজন্য ভালোবেসে এতকিছু রান্না করলাম, মানুষটার কোন হদিস ই নেই।

পাশ থেকে অর্পা বললো,বউমনি এত বেশি চিন্তা কেন করছো, চলে আসবে ভাইয়া।

এলিজা কোন জবাব দিলো না।
অর্পা :বউমনি তুমি সিনেমা পছন্দ করো?
এলিজা : হুম অনেক!তবে এখন তো দেখা হয়না.সংসার সামলাতে হয়!
অর্পা এলিজা কে নিয়ে, দোতলায় চলে যায়। টিভির রুমে।
সিডি, চালু করে,।এলিজা : আহা কি করছো তুমি !সক্ত লেগে যাবে তো!

অর্পা :আচ্ছা এবার বলো তোমার পছন্দের নায়ক কে!

এলিজা মৃদু হেসে বললো, উত্তম কুমার। তবে দ্বিতীয়তম।

আমার স্বামী আমার কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নায়ক। যে কিনা আমার বিপদে আমার ঢাল হয়ে দাড়ায়,।দুঃখের স্বারতি।

কেউ আমাকে স্পর্শ করলে তাকে,তার জান কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করে।

,, সে যে আমার ঐস্বর্যের শুখ।সে যে আমার জান্নাত।

বলেই চেয়ারে দোল খেতে থাকে। এলিজা চোখ বুঝে ভারি একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেললো।

অর্পা অপলক দৃষ্টিতে এলিজাকে পরোখ করলো।কত টা সুন্দরী তার

বউমনি।—- রাত হয়ে যায় অপূর্ব এখনো বাড়ি ফিরেনি। জয়া ছেলের চিন্তায় চিন্তায় দিন দিন আদমরা হয়ে যাচ্ছে।

জয়া নিজের ঘরে বসে তসবিহ পড়ছে।

তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় এলিজা। বললো,

মা আপনি কিছু খেয়ে নিন, নয়তো শরীর খারাপ করবে, এভাবে

কতক্ষন বসে থাকবেন আমি অপেক্ষা করছি তো!

জয়া কোন এক অজানা কারণে কাঁদছে, এলিজা-চোখ মুছে দেয়।

জয়া,ভারি একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেলে বললো

আঁচ্ছা মা পৃথিবীর সব পাপ কি মোচন হয়?

এলিজা বললো,দুনিয়াটা পাপের বিলাশী,, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা অধম দয়াবান –

রাত বেড়ে চলেছে।

জয়া ঘুমিয়ে পরে সাথে জাহাঙ্গীর।

চাঁদনী অর্পা একঘরে।

এলিজা বাড়িটার চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখলো।বললো,।শ্বশুর মশাই ভালো ই বানিয়েছে। রাজকীয় বাড়ির মতন।

রাত ১২ টা নাগাদ —

পুরো বাড়ি টা নিঝুম।

আকাশ টা কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। কি যেন কি ধেয়ে আসছে,।

গা ঝিমঝিম করছে,, চারদিক টা শুনশান।

নিভোর এক পরিবেশ।

এলিজা ঘরে চলে আসে।খাটের উপর চাঁদর পেঁচিয়ে বসে আছে। তৎক্ষণাৎ এলিজা স্পষ্ট শুনতে পায়

চপর চপর পায়ের আওয়াজ।কেউ আসছে । অপূর্ব নয় তো,।

এলিজা ঘাপটি মেরে বসে আছে। ভালো ভাবে বুঝতে পারছে। পায়ের আওয়াজ টা তার ঘরের সামনে এসেই থমকে গেছে।অপূর্ব হলে ম্যাডাম ম্যাডাম বলে এতক্ষণে গগন তুলতো।

এলিজা ধিরে ধিরে দরজার দিকে এগোয়।

তাদের ঘরের মধ্যে ই ছিল রা,মদা,।
এলিজা রামদাটা হাতে নেয়।
এলিজা আতং’ক স্বরে জিজ্ঞাসা করলো,দরজার বাহিরে কে? কোন উত্তর নেই।
জবাব দাও না হলে ..। এলিজা চুপ হয়ে যায়। বাহিরে কোন সাড়া শব্দ নেই।

এলিজা দরজা টা খুলে দেয়। বাহিরে কেউ নেই তবে হাটার আওয়াজ কার ছিলো?

হঠাৎ এলিজার পেছন থেকে কেউ তার মুখ চেপে ধরে।এলিজা উউহউউ করতে থাকে,।

হাতের রামদাটা দিয়ে অচেনা লোকটিকে আঘাত করে।পেছনে পরে যায় লোকটি।

এলিজা: কে তুমি আমাকে কেন মারতে চাইছো,?লোকটি কালো মুখোশ পরা,, কোন কথার জবাব না দিয়ে এলিজাকে ছু'রি দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করলে।এলিজা ঘুরে গিয়ে ফুলদানি টার উপরে পরে। কিছুক্ষণ তাদের মধ্যে লরিঝাপটা হয়।

দোতলায় অনেক টি জিনিস পত্র ভেঙে যায়।লোকটি ব্যার্থ হয়।অচেনা

লোকটি,, যেতেই , এলিজা দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলো,কে তুমি বলে যাও,, আমার পুলিশ বাবু কিন্তু তোমাকে ছারবে না।

লোকটি পেছন ঘুরে বললো,

তোকে মারার জন্য ১০ লাখ টাকায় চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি।তোকে ছারবো না।

ভয়ং’কর এক অচেনা কন্ঠ।কে এই লোক আমাকে কেন মারতে চায়।,,
এলিজা চিন্তা য় পরে যায়,,
,, এতক্ষণ এখানে এত তোরঝোপ হলো, এতকিছুর ভাঙার আওয়াজ হলো,, মা বাবা , অর্পা , চাঁদনী ,ছোট চাচা, মনোরা,বাড়ির কেউ শব্দ পেলো না,..... কেউ আমাকে বাঁচাতে এলো না।দরজায় করা নাড়ার আওয়াজ।

কেউ এসেছে, নিশ্চয়ই অন্য কোন মুখোশধারী। এলিজা, মনস্থির করলো। এবার যে এসেই সামনে দাঁড়াবে,তাকেই শেষ করে দেবো। বাড়ির চারদিকে নিস্তব্ধ।কারো কোন সাড়া শব্দ নেই।সবাই এত গভীর ঘুমে ঘুমোচ্ছে যেন, নে,শায় আশক্ত। ধিরে ধিরে দরজায় সামনে এগোয়। ঢক,ঢক করে কেউ দরজা ধাক্কাচ্ছে।

বাহিরে বৃষ্টি পরছে ।এবার আর বোকার মত প্রশ্ন করবো না, বাহিরে কে।,

দরজা খোলা মাত্রই রাম,দা দিয়ে তার....এলিজা দরজাটা খোলা মাত্রই,, পেছন ঘুরে থাকা লোকটির দিকে রামদা চালালেই সে রাম,দাটা ধরে নেয়।

আরে আরে ম্যাডাম কি করছো আমি তোমার অপূর্ব।

অপূর্ব হাতের একটা আঙুল কেটে র'ক্ত বের হয়।এলিজা অপূর্বর হাতে র'ক্ত দেখে বিড়বিড় করে বললো,এটা আমি কি করলাম নিজের স্বামী কেই আঘাত করলাম। এলিজা মাথা ঘুরে মেঝেতে লুটিয়ে পরে যায়।

অপূর্ব বিষিন্নত কণ্ঠে বললো,

ম্যাডাম, চোখ খুলো ম্যাডাম।

অপূর্ব আওয়াজ করে হেসে উঠলো।

বললো,আঘাত করলো আমাকে ,র’ক্ত বের হলো আমার। মাঝখান থেকে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো, আমার পাগলী ম্যাডাম।

অপূর্ব মৃদু হেসে , এলিজাকে পাজা কোলে করে ,, নিয়ে সোফাতে সুইয়ে দেয়।

রান্না ঘর থেকে পানি এনে এলিজার চোঁখে ছিটাতে থাকে।

সরু গলায় বললো,ম্যাডাম চোখ খুলোন ,, কিছু হয়নি আমার।

এলিজা টিপ টিপ করে চোঁখ মেললো।

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,এতটা ভালোবাসেন, আমাকে? সামান্য আমার হাত কেটে র'ক্ত বের হতে দেখে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে।

এলিজা ভাবলো,কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটা অপূর্ব কে বলা যাবে না। মানুষ টি অযথা চিন্তা করবে।
তার মুখে আমি চিন্তার ছাপ নয়, বরং সবসময় হাসি দেখতে চাই।
অপূর্ব:চুপ করে কেন কিছুতো বলো হাতে রা'মদা নিয়ে তুমি কি করছিলে?
একা একা ভয় করছিলো?

এলিজা: কেমন যেন মনে হয়েছিল। দরজার বাহিরে থাকা লোকটি অন্য কেউ,!

অপূর্ব কিছুক্ষন চুপ থাকলো।ভাবলো, এলিজার এমন কেন মনে হলো?

এলিজা – অভিমানী ভঙ্গিতে বললো, আপনার সাথে কথা বলতে চাই না। সকালে না বলে বেড়িলে গেলেন।

আপনার জন্য কত পদ, রান্না করলাম।সকাল থেকে অপেক্ষা করছি আপনার কোন খবর নেই। ,

অপূর্ব :ম্যাডাম, আমাকে নিয়ে এত চিন্তা হয় আপনার!

এলিজা :কেন আমি করবো না, কে করবে তাহলে? অন্য কোন রমনী-

বলতেই অপূর্ব এলিজার মুখটা চেপে ধরে।

এই বুকে শুধু একটা মানুষের স্থান, সেই মানুষটি আমার এলিজা।

এই অশান্ত মন, শান্ত করে দিতে পারে আপনার ঐ লাজুক হাসি।

তুমি আমার ব্যাক্তিগত এক চাঁদ, যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি রাতের পর রাত।আজকে নিজের হাতে তুমি খাইয়ে দেবে।বললো অপূর্ব।

বাহিরে বৃষ্টি,মেঘলা আকাশ, নিস্তব্ধ পরিবেশ, সবমিলিয়ে প্রিয় মানুষটির

সাথে,, মাঝরাতে সময় কাটানো এক অপূরুপ মোহময় শুখ।

কত ধরনের রান্না,মাছের ভুনা, ডাল ভুনা, খিচুড়ি, মিষ্টি।

অপূর্বর সমস্ত পছন্দের খাবার।

টেবিলের চেয়ারে অপূর্ব বসে।

এলিজা পাশে দাঁড়িয়ে, ভাত মাখাচ্ছে,।

অপূর্ব হুট করে উঠে দাড়িয়ে এলিজার, পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে।

কানের কাছে চুল গুলো সরিয়ে দেয়,,, লাল র'ক্ত মাখা গালে আলতো করে চুমু খেয়ে বললো, এত কেন রূপসী আমার ম্যাডাম, স্বর্গের পরীরাও তোমার কাছে হার মানে।

,, এলিজা: আপনি সুযোগ পেলেই আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খান কেন??

অপূর্ব হেসে উঠলো।বললো, তোমার মুখে যত বার ই ,এই কথাটা শুনি ততবারই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে।

এলিজা বললো,এবার খেয়ে নিন। অপূর্ব সব ধরনের রান্না থেকে একটু একটু খেলো।

অপূর্ব দেখলো টেবিলের এক কোনে পরে আছে পায়েশের বাটি।

অপূর্ব :পায়েশ টা খাওয়ালে না!

এলিজা আমতা আমতা করে বললো ,ওটা ভালো হয়নি।

অপূর্ব বাটিটা কাছে নিয়ে বললো, তবুও এটা আমি খাবো।কারন আমার বউ ভালোবেসে রান্না করেছে।

অপূর্ব সব টুকো পায়েশ খেয়ে নেয়। তৃপ্তি নিয়ে বললো,অনেক স্বাদ ছিলো।

এলিজা : আপনার চিন্তায় চিন্তায়,, পায়েশে চিনির বদলে নুন দিয়ে দিয়েছিলাম,, বিষে'র মত হয়ে গেছিলো আর আপনি এটা খেয়ে নিলেন!

অপূর্ব বললো,”পৃথিবীর সব বিষে’র প্রভাব সহ্য করতে পারবো, যদি তুমি পাশে থাকো।

আর তুমি যদি কোনদিন ছেরে যাও, সেই বিচ্ছেদের যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারবো না, ম্যাডাম।

তুমি যে আধার রাতের জোনাকির আলো, তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না কোনদিন ভালো।__ __

রাত গভীরতর হচ্ছে।__

শায়ান কারো কাছ থেকে জানতে পারে তারে তার বাবা,, এলিজার বিয়ের আগে আলি বাড়িতে গিয়ে, এলিজাকে বেইজ্জত করে।

নিশ্চুপ ঘরের মধ্যে সন্ধ্যা থেকে বসে আছে শায়ান। বিড়বিড় করে বললো, ছোট বোনটা বার বার ডাকছে, মা ডাকছে বাবা ডাকছে,, কারো ডাকে সাড়া দেওয়ার মত,, শক্তি আমার নেই।

কারন আজ যে আমি বড় ক্লান্ত। ভালোবাসার রাস্তায় আমি এক অসহায় পথিক,, দুইধারে কত মানুষ,, কিন্তু আমার যেন কেউ নেই,, কেন আজ এমন অনুভূতি হচ্ছে?আর্ত'নাদ করে কান্না করতে থাকে শায়ান।,
শায়ানের আর্ত'নাতে দেয়াল গুলো চুপসে যাচ্ছে।

ভাঙা গলায় বললো,ভালোবাসা এত কেন নিষ্ঠুর?কেউ একজন আসো। এসে আমার হৃদয়টাকে নিয়ে নাও । সেখান থেকে এলিজার নামটা মুছে , আবার আমাকে দিয়ে যাও।,, এই যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না। তুমি যদি আমাকে ভালো নাই বাসলে,, তাহলে আমার ডাকে সাড়া কেন দিয়েছিলে সেদিন।

ভারি একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেলে শায়ান

হাতে কলম নিয়ে,, কাগজে কিছু লিখতে থাকে।পরদিন সকাল বেলা

—-

ফজরের আজান পরেছে।

কাকের আনাগোনা ,অল্পকিছু পাখিদের কিচিরমিচির আওয়াজ আসছে।

এলিজা ঘুম থেকে উঠে, মুখহাত ধুতে যাবে ,, তখনই চোখ পরে নিচের তলায়।

অচেনা এক লোক,, পরনে ,কালো বুট জুতা,কালো জ্যাকেট, একটা কাপড় মুড়ি দিয়ে কি যেন খুঁজছে।

এটা নিশ্চয়ই চোর ,, মামি বলেছিলো,, শহরে ভোর রাতে চোর আসে।

এলিজা টিপটিপ পায়ে নিচে নামে। কি দিয়ে আঘাত করবে । কিছু খুঁজে না পেয়ে , রান্না ঘর থেকে রুটি বানানোর , বেলুন টা এনে,, ঠাস

ঠাস করে পেটাতে থাকে।আর চেঁচাতে থাকে।চোর এসেছে চোর এসেছে।,

আমি চোর ধরেছি বলেই চেচাতে থাকে,, পুলিশ বাবু নিচে আসুন মা আব্বা।

সবাই দৌড়ে আসে। অচেনা ছেলেটি,, পর্দার কাপড়টি ফেলে দেয়।

জয়া : বাবা তুই?ডার্লিং কেমন আছো আদুরে গলায় বলেই জড়িয়ে ধরে জয়া কে।

জয়া বললো,কত বড় হয়ে গেছিস এত বছর পর সবার কথা মনে পরলো?

শ্রাবন :এই মেয়েটা কে হিং,স্রর মত আমাকে পেটাতে ছিলো।

অপূর্ব, :মেয়েটা না তোর বউমনি!

শ্রাবন :আরে ইয়ার — তুই বিয়েও করে ফেলেছিস!
মৃদু হেঁসে দুইভাই আলিঙ্গন করলো।

”
এলিজার সামনে হিরোর মত ভাব নিয়ে, শ্রাবন বললো,
হেলো মিসেস আমি শ্রাবন , বলেই *হ্যান্ডশেক* করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়।,

এলিজা মনে মনে বললো,আপনি শ্রাবন হোন ,, বা ভাদ্র তাঁতে আমার কিছু যায় আসে না।

দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা হয়ে যায়। __এলিজা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা তারা দেখছে।ভাবছে,

মামা মামীর জন্য মনটা জানি কেমন করছে ।কোন কিছু ভালো লাগছে না। মনস্থির করে, মামা মামী,পাখির উদ্দেশ্য চিঠি লিখবে।

শ্রাবন , অপূর্ব,, জয়া সবাই মিলে আড্ডায় মশগুল,।

দরজায় কড়া নাড়ছে,।

জয়া:এই সন্ধায় কে আসলো।

মনোরা দরজা খুলতেই সূর্য,সাদিক চট করে ঘরের ভেতর ঢুকেই, অস্থির ভঙিতে বললো,অপূর্ব কোথায় তুই?

বেড়িয়ে আসে অপূর্ব ।

কি হয়েছে হাপাচ্ছিস কেন তোরা?

আমাদের রহস্যময় উন্মোচন এর এভিডেন্স নেই আর

অপূর্ব :মানে কি বলতে চাইছিস??

খুলে বল।সাদিক: গুঞ্জন ,কে কেউ খু,,ন করেছে।

অপূর্ব অবাক হয়ে যায়।আকাশটা ভেঙে অপূর্বর মাথার উপরে পরে। আ'হত কণ্ঠে বললো,

কি বলছিস, কোথায়?

লা,শ কোথায় পেলি?

সাদিক : দিগন্ত নদীতে——প্রিয় মামি,

কেমন আছো,হয়তো ভালো। তোমার চিঠি পেয়েছি আজ ১০ দিন। উত্তর দিতে পারিনি।জানতে চেয়েছো আমি কেমন আছি,।আমি খুব ভালো আছি।ভালো শাশুড়ি পেয়েছি,।শশুর পেয়েছি একজন বাবার মতন।ননদ আমার ভারি মিষ্টি।

সারাদিন বউ মনি বউ মনি বলে মাতিয়ে থাকে, বাকি রইলো আমার মহারাজা, তার কথা বলতে শুরু করলে, কলমের কালি শেষ হয়ে যাবে, পৃষ্ঠা শেষ হয়ে যাবে, তবুও তার প্রশংসা শেষ হবে না। সে যে আমার রাজ্যের মহারাজা,আমি যে, তার রাজ্যের মহারনী, আমি যে তার ম্যাডাম। দেখতে দেখতে কেটে গেলো সংসার

জীবনে অনেক দিন, ভালো কাটছে দিনগুলো।

,, তোমাদের কথা অনেক মনে পরছে,

মামি শরীরের যত্ন নিবে মামা,পাখির খেয়াল রাখবে

ইতি তোমার,

আদরের এলিজা,,

প্রিয় দুষ্টু মিষ্টি বোন আমার,,

সেদিন, তোর চিঠি পেয়েছি, চিঠিতে তোর একটা কথা আমাকে ধুমরে মুছরে দিয়েছে,,

বাক্যটি ছিল এমন

বড় বোন হয় মায়ের পরে দ্বিতীয় ছায়া,

আব্দার পূর্বনে হয়,অধুরী,

বড় বোন যে মায়ের পর দ্বিতীয় মা-্আর আজ সেই মা যে গহিনো

দূরে খুব একা লাগছে আপু ফিরে এসো তুমি**

তোকে ছাড়াও আমি ভালো নেই,তোর বাহানা,তোর দুষ্টুমি সারাদিন পরোক্ষ করি।

শরীরের যত্ন নিবে, ভালো ভাবে পরিক্ষা দিবে,, আর মাত্র ৩ বছর তারপর মেট্রিক পরীক্ষা।এই সময়টা ভালো ভাবে কাজে লাগাতে হবে।

মনোযোগ সহকারে পরাশুনা করতে হবে।

মামি মামার দিকে খেয়াল রাখবে,,

ইতি

তোমার দ্বিতীয় ছায়া**ছাদে বসে আছে অপূর্ব, শ্রাবন।

শ্রাবন বললো,

ভাবছি বিদেশে আর যাবো না।

এখানেই তোর সাথে থেকে যাবো।, তুই পুলিশ লাইনে আছিস আমাকেও

কোন একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দে। তাছাড়া তুই এস,আই , আমি কনস্টেবল তো হতে পারবো।

অপূর্ব : আমার কোন আপত্তি নেই যা ভালো মনে হয় তাই কর।

শ্রাবন হেসে বললো,

বউমনি কিন্তু হেব্বি।অপূর্ব :সামলে ,ঠিক আছে সে আমার রানী,একদম নজর দিবী না।

অপূর্ব :আজকে রাতে সূর্য,,ওর বাসাতে দাওয়াত দিয়েছে।ওর আজকে জন্মদিন।

তুই ও চল আমার সাথে ,,পলাশ,হিমেল, সূর্য,মিদুল সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো।

শ্রাবন :এক মিনিট তোর বন্ধু, রায়হান এর কথা বললি না।

রায়হান এর কথা শুনতেই অপূর্ব, অজানা কোন চিন্তায় তলিয়ে

যায়,,অজানা কোন বেথা তার হৃদয়ে ঝড় তুলে।
অপূর্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে ভারি একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেলে বললো,
আমার বন্ধু আমার জন্য জান্নাতে অপেক্ষা করছে ।লুকোচুরির খেলায় সে যে জিতে গেছে।
শ্রাবন থমকে যায়,,
শ্রাবন অপূর্বর দিকে পরোখ করে ভাবলো,বন্ধুত্বের মায়াও যে এত

স্নিগ্ধ হয় ,, আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ টিকে না দেখলে বুঝতে পারতাম না।

শ্রাবন :চল সূর্যের বাসায় যাই!

অপূর্ব :তার আগে আমার ম্যাডামের অনুমতি নিতে হবে।

অপূর্ব শ্রাবন নিচে চলে আসলো। এলিজা কে এদিকে সেদিন খুঁজলো। মনোরা কে উদ্দেশ্যে করে বললো, এলিজা, কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না।

মনোরা বললো,রান্না ঘরে !

অপূর্ব :বাড়িতে এত মানুষ থাকতেও এলিজা কে ই কেন রান্না করতে হবে।গোলাপি রঙের শাড়ি পরে, চুল গুলো বেনুনি রত অবস্থায়,উল্টো দিকে ঘুরে ,, রান্না করছে এলিজা।

ওহে ম্যাডাম বলেই পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে।

, সারাদিন কি কাজ করো তুমি হা খুঁটিনাটি খুঁটিনাটি,, করতেই হবে । বাড়িতে এত মানুষ।

এলিজার হাত টা ধরলো।হাতের উল্টো দিকে চুমু খেয়ে,বললো,

দাগহীন অঙ্গে,আগুনের তাপ পরতে দিও না।

এলিজা বললো,

মেয়েদের রান্না করাটাও একটা সুন্দর্য,

অপূর্ব বললো,

ম্যাডাম, সূর্য ওর বাসাতে আমাদের দাওয়াত দিয়েছে ।

আমাদের মানে?

শ্রাবন কে নিয়ে যাবো সাথে,।

এলিজা : আমার অনুমতি নেয়ার কি আছে, গেলেই তো পারতেন।

অপূর্ব : আমি আমার জীবনের, প্রতিটা অক্ষে, পরক্ষে, নিঃশ্বাস এও আপনার অনুমতি চাই কারন আপনি

যে আমার ম্যাডাম।আমি আপনাদের বন্ধুত্ব কে সম্মান করি। সময় কাটিয়ে আসুন ভালো লাগবে।

এলিজার কপালে চুমু খেয়ে বললো,আসি তাহলে। বলেই অপূর্ব বেড়িয়ে যায়।

সূর্যর আজকে ২৭ তম জন্মদিন, বাসাতে ছোটখাটো আয়োজন।

সকলের সাথে শ্রাবনের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

কেউ কেক আনছে তো ,কেউ নাচতে,

নিলুফা- বেগম অনেক রকম খাবার তৈরি করছে।

কয়েক,প্রহর কেটে গেলো ।

সবাই নাচ গান করে ক্লান্ত।

সূর্য তৎখানিক বললো,তোরা থাক , আমি তোদের জন্য একটা জিনিস নিয়ে আসছি।

অপূর্বর সূর্যর ভাব ভঙ্গি,মা ভালো লাগেনি।

বলেই বাহিরে চলে যায় সূর্য।

অপূর্বর সন্দেহ হওয়াতে সূর্যর পিছু নিলো।কালো একটা হুডিযুক্ত জ্যাকেট,,পরনে, কালো বুট।কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে সূর্য কে।

আমি কি এটা ঠিক করছি।নিজের বন্ধুকে সন্দেহ করছি।

সূর্য অধির দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। কিছুদূর গিয়ে একটা বাইক নিয়ে তিলকনগরের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পরে। অপূর্বর খটকা লাগলো। সূর্য তিলকনগরের দিকে যাচ্ছে কেন? সূর্য যেদিক যাচ্ছে সেদিক তিলকনগর।

অপূর্ব ভাবনা ছেড়ে একজন বাইকারের কাছ থেকে লীপ নেয়।

বেশ অনেক ক্ষন এর ব্যবধানে পৌঁছে যায় তিলকনগর। ঢাকা থেকে তিলকনগরে দূরত্ব অনেক টা।

সূর্য বাইক থেকে কিছু টা দূরে নেমেছে।

সূর্য বাইক রেখে তিলকনগরের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

অপূর্ব দুরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করলো।সূর্য হেটেই যাচ্ছে হেটেই যাচ্ছে ।কিছুক্ষণ পর পর থমকে

দাড়ায়, এদিক সেদিক পরোক্ষ করলো কেউ আছে কিনা।

অপূর্ব লুকিয়ে পরে।

আবার হাঁটতে শুরু করে। সূর্য যে পথে এগোচ্ছে,অপূর্ব তা দেখে ,আদমরা হয়ে যায়। শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকে। , চারদিকে নির্ঝন হাওয়া বইছে,কালো ধোঁয়া ধেয়ে আসছে।

কিছুদূর হেঁটে থমকে দাড়ায় সূর্য।

অপূর্ব একটা গাছের পিছনে লুকিয়ে পরে।

চারপাশে পাতাবিহীন বড় বড় কাছ। চাঁদনী আলোয় চারদিক টা আলোকিত হলেও, কোন এক অজানা কালো ধোয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে আছে।সূর্য কিছুদূর যেতেই ,, পকেট থেকে কিছু একটা বের করে ।বের করে এদিক সেদিক তাকায়।

অপূর্ব,, চোখ গুলো বড় বড় করে দেখছে, এ কোন সূর্য,, কি তার আচরণ, কি লুকিয়ে আছে ওর মধ্যে।

সূর্য কিছুটা সামনে গিয়ে, একটা কব,রের সামনে দাড়ায়।

হাতে যেটা ছিল,সেটা আর কিছু নয় একটি গোলাপফুল ,,গোলাপ ফুলটি কব,রের পাশে রেখে দিলো —-

কার কব,রে ফুল দিলো,, তাও কেন এত রাতে,,

কেন এই তিলকনগর–এ

কি করছে সূর্য কি লুকাচ্ছে ,,চারদিক নিশ্চুপ কি যেন কি হবে।অন্ধকার রাত যেন কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

দূর দূরে শেয়াল ডাকছে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। নিস্তব্ধ পরিবেশ।

সূর্যের অদ্ভুত আচরন অপূর্ব কে ভাবাচ্ছে।কি লুকোচ্ছে সূর্য?গিয়ে কি জিজ্ঞেস করবো এখানে কি করছিস। নাকি আমাকে ভুল বুঝবে আমি ওর পিছু নিয়েছি বলে।

কি করবো আমি কিছু মাথায় আসছে না।

সূর্য কবরের উপর ফুলটা রেখে দিয়ে,তাতে কিছু মাটিও দিলো। মোনাজাত ধরে

বিড়বিড় করে কিছু বললো। অপূর্ব অঝরে ঘামছে। সূর্য কে আজ খুব অজানা লাগছে।

এভাবে এক প্রহর দুই প্রহর কেটে যায় অনেক প্রহর।

রাত প্রাই ১টা নাগাদ।

সূর্য বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা করলো। পরনে কালো জ্যাকেট, হুডি দিয়ে মাথাটা ঢেকে রেখেছে, বার বার

চারপাশে চোঁখ বুলিয়ে দেখছে, কেউ আছে কিনা।

অপূর্ব গাছের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে সূর্যর কর্মকাণ্ড পরোখ করছে। অপূর্ব মনস্থির করলো, সূর্য কি লুকোচ্ছে তা জানতেই হবে।

সুর্য , যেতেই পেছন থেকে সূর্যর বা, কাদের,উপর কেউ হাত দিলো।

সূর্য থমকে দাড়ায়।

জ্যাকেট এর পকেট থেকে পিস্তল টা বের করেই ,পেছনে ঘুরেই তাক করতেই দেখে অপূর্ব।

চট করে সূর্যর হাত থেকে পিস্তল টা পরে যায়।

অপূর্ব ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো,কি করছিস তুই ?এখানে এত রাতে, একা একা, কি লুকোচুরি খেলছিস?,কার কব’রে ফুল দিয়েছিস?,,কি হচ্ছে এসব।

সূর্য এদিক সেদিক পরোক্ষ করলো। অপূর্বর উপস্থিতির জন্য সূর্য প্রস্তুত ছিল না।যা সূর্যর মুখের ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছে।সূর্য ভারী কন্ঠস্বর নিয়ে,খিল খিল করে হেসে উঠে।এ এক অদ্ভূত হাঁসি।

এই হাসির পিছনে লুকিয়ে আছে যেন অগনিত রহস্য।

সূর্য কাট গলায় বললো,বাহ বাহ বাহ,, চমৎকার ।আজকে আমাকে

এমন দিন দেখতে হচ্ছে,, যে,কিনা, আমার প্রানের চেয়েও প্রিয় বন্ধু সন্দেহ করছে,অনুসরন করছে।

অপূর্ব: কথা না ঘুরিয়ে বল কি হচ্ছে এখানে,, কেন এসেছিস এখানে? বল আমাকে!

সূর্য কিছুক্ষন থম মেরে থেকে বললো,

‘জানতে চাস তো , জানতে চাস এখানে কেন এসেছি? কার কব,রে

ফুল দিয়েছি , তোর কাছ থেকে কি লুকিয়েছি তবে শোন–বলেই অপূর্বর হাত টা ধরে নিয়ে যায় কবরের কাছে।

সূর্য হাঁটুঘেরে বসে পরে কবরের কাছে।

কব, রের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতে শুরু করে,এই যে কবরটি দেখতে পাচ্ছিস, এ আর কেউ নয় এ হচ্ছে,, আমার প্রেয়সী, আমার

ভালোবাসা, আমার, আধার রাতের রানী , রঞ্জনা,, রঞ্জনা।বলেই বুক ফাটিয়ে কান্না ,, শুরু করে।,অপূর্ব সূর্য কে দেখে হতভম্ব হয়ে যায়।

যে সুর্য ,, অতি আঘাতেও কাঁদে না, যে সূর্য পাথর মনের মানুষ সে আজ অঝোরে কাঁদছে।তার কান্নায় প্রকৃতি থমকে যাচ্ছে।, আকাশ টা ভেঙ্গে পরেছে, সমুদ্র আচরে পরছে, মাটি

গুলো যেন পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে।

সূর্যের আর্তনাদ দেখে অপূর্বর হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম।

কে এই রঞ্জনা?কোনদিন তো বলিসনি ।

কি হয়েছিল ওর ? কিভাবে মারা যায় ?

কর্কস কন্ঠে ক্রোধের স্বরে সূর্য বলে উঠলো,মারা যায়নি রঞ্জনা, বেঁচে আছে আমার মাঝে।

অপূর্ব সূর্যর কাঁদে হাত দিয়ে বললো,সবটা বল আমাকে ,, কি ঘটেছিল,, আর আমি কেন এসব জানি না।

সূর্য,, চোখ মুছে,, উঠে উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে,বলতে শুরু করে,

কারন তখন তুই ,, পরাশুনার জন্য আমেরিকা ছিলিস,, ইচ্ছা হয়নি,, তোকে জানানোর ।আমার জন্য তোর কষ্ট পেতে হবে। কারন আমি জানি,, তুই আমাকে কতটা ভালোবাসিস।

অপূর্ব: তাহলে এখন বল,,

কে এই রঞ্জনা, এর সাথে তোর পরিচয়, কিভাবে আর এর মৃত্যু কিভাবে হয়

সূর্য বলতে শুরু করলো।
আজ থেকে 6 বছর আগের ঘটনা, যখন আমার ২১বছর বয়স,,– ভরা জ্যামে হাজার ও গাড়ির মাঝে আমিও ছিলাম।কোন এক বাসে
গরমে শরীর পুড়ে যাচ্ছে সবার। অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম জ্যামে বসে থাকতে থাকতে,,
জানালা টা খুলে দেই।
ঠান্ডা হাওয়া বইতে থাকে,,,

তখনই দেখি ,দূর থেকে দাড়িয়ে আছে ,, এক জলজ্যান্ত পরী।বই হাতে দাঁড়িয়ে আছে,,স্বর্বক্ষনী ,মোহমহ, সুন্দরী এক পরী।পরনে সাদা রঙের শাড়ি, মাথা ভর্তি চুল,,মায়াবী তার চাহনি,, এত সুন্দরী নারী আমার চোখে আর কোনদিন পরেনি।গাড়ির অপেক্ষায় ,,দাড়িয়ে ছিল রঞ্জনা।

সেদিন ই আমি রঞ্জনা কে প্রথম দেখি।

পাথরের মত শক্ত হৃদয়ে সেদিন বসন্তের ফুল ফুটেছিলো।

ভরা জ্যাম থেকে নেমে দৌড়াতে থাকি।

আমি যেতে যেতেই ,,, গ্রিন সিগন্যাল এ জ্যাম ছেড়ে দেয়।আমার প্রেয়সী বাসে উঠে যায়।আমি সেদিন

অক্লান্ত ভাবে ছুটতে থাকি বাসের পেছন পেছন ।
শহরের প্রতিটা মানুষ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো সেদিন আমার দিকে,, কেউ কেউ পাগল বলে সম্বোধন করেছিলো।বাস টি গিয়ে থামে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে।
আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পরি কলেজের সামনে,,,

একে একে অনেক এ নামলো ,,
ওকে তো দেখছি না,,
যখনি অচেনা মেয়েটা বাস থেকে নামলো,, তখনি,, কলেজের বেস কিছু ছেলে মেয়েরা,, রঞ্জনা রঞ্জনা রঞ্জনা বলতে বলতে ওকে ভেতরে নিয়ে যায়,, তখনই জানতে পারি ,, আমার স্বপ্নের রানি,র নাম রঞ্জনা।,
সবাই হই হুল্লোর দিয়ে উঠলো ,

আমি অবাক হই একজন ছাত্রীর জন্য এত কোলা'হল কিসের, হয়তো সুন্দরী দেখে।

অনেকক্ষন দাড়িয়ে থাকি, চিন্তা করতে থাকি, কিভাবে ওর সাথে কথা বলা যায়,, পায়চারি করতে করতে চিন্তা করতে থাকি,

আশেপাশে অনেক ছেলেরা , ভাবলাম কাউকে জিজ্ঞেস করি,, না

না,, ছেলে নয়,, কোন মেয়েকে জিজ্ঞাসা করতে হবে

যেই ভাবনা সেই কাজ।একটা মেয়ে আমার দিকে আসলো।আমি মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম,আপু,আপনার সাথে একটু কথা বলা যাবে।

মেয়েটা কাট গলায় বললো,

না, রাস্তা ঘাটে মেয়ে দেখলেই কথা বলতে ইচ্ছে করে।

আমি ধৈর্য নিয়ে বললাম,শুনোন না।
মেয়েটি বললো,
যা বলার তারাতাড়ি বলুন।
আমি বললাম,বলছি এক্ষুনি যে মেয়েটা গাড়ি থেকে নামলো,রঞ্জনা ওর কি কিছু তথ্য পেতে পারি ?
এত সাহস রঞ্জনাকে নিয়ে প্রশ্ন করছেন।এর ফল ভালো হবে না।
বলেই মেয়েটা চলে যায়।

,, কোন ভাবে কিছু জানতে পারলাম না।

অনেক দিনের চেষ্টায় জানতে পারি রঞ্জনার সম্পর্কে। জানতে পারি,ওর বাড়ি তিলকনগর।বাবা একজন প্রতাবশালী,

ভাই আছে, ছোট বোনেরা আছে। রঞ্জনা বড় মেয়ে,, শহরে এসেছে পরাশুনার জন্য।

এবং সব থেকে যেটা শুনে অবাক হই, রঞ্জনা ছিল একজন নৃত্য শিল্পী। চিন্তা টা তখন আরো বেড়ে যায় একজন নৃত্য শিল্পী কে কিভাবে প্রেমের প্রস্তাব দেবো,, তাছাড়া জানতে পারি,, রঞ্জনা আমার থেকে দুই বছরের,বড়,,

চিন্তায় মাথা ভন ভন করতেছিল ।

সে যেমন ই হোক তাকে যে আমার লাগবেই।

প্রতিদিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে গিয়ে বসে থাকতাম, একটা নজর দেখার জন্য। যেখানে যেখানে তার নাচের প্রোগ্রাম থাকতো সেখানেই ছুটে চলে যেতাম।

হাজার হাজার মানুষ তার , নাচের প্রশংসা করতো ।হাজার হাজার মানুষ তার নাচ দেখার জন্য অধীর আগ্রহে বসে থাকতো।দূর থেকে

সবসময় রঞ্জনা কে অনুসরণ করতাম, অপলকে তাকিয়ে থাকতাম, হাজার হাজার সুদর্শন পুরুষ তার প্রেমে মশগুল।

সবার মাঝে ছিলাম আমি এক শ্যামবর্নের পুরুষ।মানবে কি আমাকে রঞ্জনা,, গ্রহন করবে কি আমার ভালোবাসা,,

একদিন মনস্থির করলাম যা হবার ,,হবে আজকে একটা গোলাপ নিয়ে

নিজের মনের কথাটা ওকে বলতেই হবে।

খুব ভয় হচ্ছে বুক ধরফর করছে,, সকাল ১০ টা নাগাদ,, আমি জাহাঙ্গীরনগর ,, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে,, অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছি আমার প্রেয়সীর জন্য।

অপেক্ষার বাধ ভাঙলো।

গাড়ি থেকে, বই হাতে নামলো ,, রঞ্জনা

খুব সাহস করে,,পেছন থেকে ডাক দিলাম,, কাঁপা কণ্ঠে,,
রঞ্জনা ,আমার দিকে তাকালেই আমার মাথা নিচু হয়ে যায়।
খুব ভয় হচ্ছিল,ভয় কে পরোয়া না করে,,
হাঁটুঘেরে বসে বলেই দিলাম,
-যেদিন তোমাকে প্রথম দেখি, দূর থেকে দাড়িয়ে আছো বাস স্টেশনে,, থমকে গিয়েছিল আমার হৃদয়,, আমি

জানি হয়তো আমি তোমার যোগ্য নই,,
কিন্তু আমি এ,ও জানি ভালো বাসা যোগ্য -অযোগ্য দিয়ে হয়না।আমি তোমাকে ভালোবাসি।
বলতেই ঠাস ঠাস করে চড় মেরে আমার গাল লাল করে দেয় রঞ্জনা।
সমস্ত ছেলে মেয়েরা আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো।তবুও আমি অপমানিত বোধ করিনি।

রঞ্জনা বলতে শুরু করে -তোর এতবড় সাহস, রঞ্জনা কে প্রেমের প্রস্তাব দিস, এবারের মত মাফ করে দিলাম আর কোনদিন চোঁখের সামনে আসবে না।সবাই আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলো।

পদত্যাগ করি সেখান থেকে।

তবুও তার উপর থেকে মোহতা, মুগ্ধতা, ভালোবাসা কাটছেই না বরং বেরেই চলেছে।

তারপর থেকে রঞ্জনা কে, কিছু বলার আর সাহস হতো না। দূর থেকে দেখতাম,

একদিন,, সকালে বাস স্টেশনে রঞ্জনা দাড়িয়ে আছে,আমি দূর থেকে,দেখছি,,

তবে ও হয়তো,বুঝতে পারতো যে আমি ওকে পরোক্ষ করি। দূর থেকে দেখি। ওর পথ চেয়ে বসে থাকি

বাস আসতেই বাসে উঠে পরে।আমি সেদিনের মতো , আবার বাসের পেছন পেছন ছুটতে থাকি,, একটা বার ,যদি রঞ্জনা পেছন ফিরে তাকায়, তবেই বুঝবো একটু হলেও সে আমাকে বুঝতে পেরেছে,,

জানালা, দিয়ে তার চুল গুলো উড়ছিলো,, হাতের কনুই টা জানালায় উপর রাখা,,

অপেক্ষা করছি কখন সে পেছন ফিরে দেখবে,,

অবশেষে যেন,দৌড়াতে থাকা আমার দিকে নজর পরে রঞ্জনার।

সে তাকিয়েছে।আমার দিকে দেখেই ,, এক ভ'য়ংকর রকম সুন্দর হাসি দিলো। এই হাসি যে দেখবে সেই পাগল হয়ে যাবে।তার চাহনিতে সমস্ত শহর জুরে আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিল।

রঞ্জনা,, আমাকে ইশারা করে কিছু একট ছুরে দিলো।
আমার দৌড়ের গতি কমে যায়।
থমকে দাড়িয়ে যাই আমি।
ওটা ছিল একটা চিরকুট,,
কি আছে লেখা, খারাপ কিছু নয়তো ,, ভয় হচ্ছিল খুব, ভাবতে ভাবতে আর চিরকুট টা খুলেনি।
ভাবলাম বাড়িতে এসেই দেখবো।
রাত ঠিক __ ৮ টা নাগাদ

খুব আনন্দ হচ্ছিল রঞ্জনা আমাকে দেখে আজকে হেসেছে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শুখি মানুষ টা কেমন জানি আমাকেই মনে হচ্ছিল।

চিরকুট টা খুললাম — তাতে লেখা ছিল

প্রিয় –

সূর্য, তোমার নামের মতই তুমি ঝাঁঝালো।

সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল তুমি।

সূর্যের চেয়েও, সুদর্শন তুমি।
সেদিন যখন , আমার গাড়ির পেছন পেছন ছুটছিলে,, সেদিন ই আমি তোমাকে দেখেছিলাম।
অবাক দৃষ্টিতে তোমাকে আমি দেখেছিলাম।কে এই মানুষটি যে গাড়ির পেছন ছুটছে।
গাড়ি থেকে যখন আমি নেমেছিলাম, তখন আমি তোমাকে হাঁপাতে

দেখেছিলাম,কার জন্য ছেলেটা দৌড়ালো জানতে ইচ্ছে হলে

তোমার সামনে আমার দুটো মেয়ে বান্দবিকে পাঠাই।

যদি তুমি আমার খোজেই এসো তবে কাউকে তো জিজ্ঞেস করবেই।

ঠিক তখনই দেখলাম, ওদের দাঁড়,করিয়ে তুমি কিছু জিজ্ঞেস করছো

,, জানতে পারি,, তুমি আমার খোজ করছো।
সেদিন আমি আরো অবাক হই ,, আমার জন্য হাজার ও ছেলে পাগল অথচ আমি তোমার মত উধার ,কাউকে দেখেনি।আমিও তোমার খোজ নিলাম,, খোঁজ নিয়ে জানতে পারি,তুমি আমার থেকে বয়সে ২বছরের ছোট,।

তাতে কি!, ভালোবাসা মানে না জাত-বেজাত, ভালোবাসা মানে না বয়সের পার্থক্য। বয়স তো দুটো সংখ্যা মাত্র,,

সেদিন তুমি ফুল নিয়ে যখন প্রেম নিবেদন করেছিলে,সেদিন তোমাকে আমি মেরেছিলাম। জানতে চাও কেন,, কারন পেছনে উপস্থিত ছিল আমার ভাই,।,

যদি আমি তোমার সাথে ওরকম ব্যবহার না করতাম তবে,, আমার এবং তোমার দু'জনের ক্ষতি হতো। ** আমি চাই একাল-পরকাল,, সারাজীবন জনম জনম ধরে তুমি এভাবেই আমার পিছু নিতে থাকো। ,, সত্যিই যদি আমাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমার জন্য আগামীকাল অচিন পাহাড় এ

অপেক্ষা করবে —-_________ইতি

তোমার রঞ্জনা

সেদিন থেকে শুরু হয় আমার প্রেম কাহিনী।

পৃথিবীর সবচেয়ে সুখি মানুষ টা আমাকেই মনে হতো।

একটা প্রহর রঞ্জনা কে ছাড়া থাকতে পারতাম না,,

দেখতে দেখতে কেটে যায় ১টি বছর।

সিদ্ধান্ত নেই আমরা একা একা বিয়ে করবো ,,

রঞ্জনা কে, প্রস্তাব দিলে রাজি হয়।

বিয়ের দিনটা ঠিক করা হয় আমার জন্মদিনের তারিখে । কিন্তু তা রঞ্জনা জানতো না।

জমুনা নদীর পারে বিয়ের ছোটখাটো আয়োজন করি,, আমি পলাশ, মিদুল,হিমেল, এবং রায়হান ,আর রঞ্জনার মেয়ে বান্দবীরা ,তবে সেদিন

রঞ্জনা ভেবেছিল আমার জন্মদিন পালন হবে ,, শুধু,,

তবে আমি ওকে বলেছিলাম,, বিয়ের আগে একবার বউ সাজে দেখতে চাই তোমাকে,,

ও রাজি হয়, রঞ্জনা, এতটুকু বুঝতে পারেনি। ওর জন্য আমরা কতবড় সারপ্রাইজ রেখেছিলাম,,কারন, সেদিন ই যে ওকে বিয়ে করার

পরিকল্পনা করেছিলাম ।তা রঞ্জনা জানতো না,,,

ঠিক রাত ৮ টায়,, রঞ্জনা ল্যান্ডলাইন থেকে কল করে। শহর থেকে কিভাবে আসবে রোড, ঘাট,জ্যামে ভরা।

আমি শেরওয়ানি পরা ছিলাম তাই আমি না গিয়ে,রায়হান , কে বলেছিলাম ওকে নিয়ে আসতে।

তখন রায়হানের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল।-________ কিন্তু যা ঘটেছিল

সেই বিষা'ক্ত অতিত আমাকে এখনো, নাড়ায়।

রায়হান ও রঞ্জনা ছিল রাস্তার এপার আর ওপার।

এপারে রায়হান ওপারে রঞ্জনা ।

রঞ্জনা লাল বেনারশী পরা অবস্থায় ছিল।

সূর্য কথা থামিয়ে দেয়। সূর্য হুহু করে কান্নায় ভেসে ওঠে সূর্যর কান্নায় পূরো তিলকনগর-যেন থম হয়ে গেছে।

অপূর্বর চোখ গুলো লাল হয়ে যায়,, কান্নার জোয়ারে।

তারপর কি হয়েছিল?

সূর্য আবারো বলতে শুরু করে

———

এক প্রহর দুই প্রহর অনেক প্রহর কেটে যায় ওদের আমি কোন খোজ পাচ্ছিলাম না,

আমার ও মনের মধ্যে কুহ ডাকা শুরু করে ,,বেশ অনেকক্ষন পর রায়হান হাজির হয়।

র’ক্ত মাখা শরীর নিয়ে,,

রায়হান কে প্রশ্ন করলে

কাপা কণ্ঠে বলতে শুরু করে,,

রঞ্জনা,, আর নেই।

তখন পূরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে আমার মাথার উপর পড়ে, বুকের ভেতর তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। রায়হান কে দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলে।

বলে ,, আমি রাস্তার অপর প্রান্তে ছিলাম

রঞ্জনা ,আমাকে ইশারায় বোঝালো ও রাস্তা পার হতে থাকবে।

তোর কথা মতন রঞ্জনা বধু সেজেই এসেছিলো।
রাস্তা পার হবে ঠিক তখনি ।একটা ট্রাক এসে মেরে দেয় রঞ্জনা কে,,
তখন পূরো পৃথিবী টা আমার অন্ধকার হয়ে গেছিলো।
রায়হান রঞ্জনা কে হাসপাতালে নিয়ে যায় হাসপাতালে রেখে আমার কাছে চলে আসে খবর দিতে।আমিও তখন ছুটে চলে যাই হাসপাতালের

উদ্দেশ্যে। আমি যেতে যেতে ততক্ষণে রঞ্জনা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। সেদিন থেকে ই আমার পুরো পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে যায় থমকে গিয়েছিল আমার জীবনটা সেখানে ই।আমার আয়োজন করা সারপ্রাইজ টা আমি আর সেদিন তাকে দিতে পারিনি।

শাহজাহান,এর তৈরি করা তাজমহল সারা দুনিয়া দেখলেও, মমতাজ দেখিনি,

আমার প্রিয় মানুষটির জন্য বিয়ের আয়োজন সবাই দেখলেও ,দেখেনি রঞ্জনা।

— বলেই সূর্য ভারি একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেললো।

সেদিন থেকে আমার প্রতি জন্মদিনে ওর কব,রে ফুল দিয়ে ওর জন্য দোয়া করি।

অপূর্ব পেছন থেকে কান্না জড়িত কাপা কণ্ঠে বলে উঠলো

—- সময় থাকতেই ভালোবাসার মানুষটি র চাওয়া পাওয়া পূর্ণ করতে হয়।

পূর্নতা থেকে হয়, উপন্যাস

ব্যার্থ হলে হয় দীর্ঘশ্বাসসূর্য অঝরে কান্না করে অপূর্ব কে জড়িয়ে ধরে।
সূর্য অপূর্বকে জড়িয়ে ধরে ভাঙা গলায় বললো,
আমি দেখতে চেয়েছি তাকে ,বধুসাজে
নিয়তি দেখিয়েছে রক্ত সাজেরাত বেড়ে চলেছে __
জাহাঙ্গীর ‘ জয়া ,জয়া বলে চেঁচিয়ে উঠে।

জয়া :কি হয়েছে ডাকছো কেন??
জাহাঙ্গীর : খিদে পেয়েছে খেতে দাও।
অনেক কাজ পরে আছে যেতে হবে।
জয়া: এলিজা মা, তুই গিয়ে তোর শ্বশুড় কে খেতে দে।ততক্ষণে আমি তসবিহ পড়াটা শেষ করি।এলিজা টেবিলে খাবার এনে দিতেই ,, জাহাঙ্গীর রাগান্বিত কণ্ঠে বলে উঠলো, তোমাকে বলেছি না আমার

যত্ন নেয়ার কোন দরকার নেই। আমার আশেপাশে আসবে না। এলিজা আজ আর উত্তর না দিয়ে পারলো না।

‘এলিজা: কেন, কি করেছি আমি , কেন আমাকে এড়িয়ে চলেন? আমাকে কি ছেলের বউ হিসেবে আপনার পছন্দ নয় ??

জাহাঙ্গীর অস্থির একটা, ভাব করে , খাবারের টেবিল থেকে উঠে যায়।

এলিজা , পেছন থেকে বললো,
আপনার কিছু বলার হলে বলতে পারেন আমি মনে কিছু করবো না,,
জাহাঙ্গীর থম মেরে দাঁড়িয়ে, উপরে চলে যায়।______সূর্য কে নিয়ে অপূর্ব বাড়িতে চলে যায়।
সবাই জেগে আছে।শ্রাবন ভালো গিটার বাজায়।খুব ভালো গায় শ্রাবন। অপূর্ব সবার মাঝে বসে পরে

। রাত ঠিক ২:৩০ মিনিট।সবাই বিভিন্ন গল্পে মশগুল।

কে কি করছে কে কি , ভবিষ্যৎ এ কি করবে।

কার কেমন বউ দরকার,,

বলছে আর হেসে হেসে উঠছে।

অপূর্ব এক কোনেতে বসে আছে সূর্যর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভাবছে,

একটা মানুষ কতটা বাস্তবিক জীবনে অভিনয় করতে পারে,তাও এতটা নিখুত।

যার জীবন টা থমকে আছে ৬ বছরের অতীতে।সেও সবার সাথে হাসিখুশি ভাবে থাকছে। থাকতে চায়না,, থাকতে বাধ্য হয় ।

কারন মানুষ অন্যের কষ্টে তৈরি করে উপহাস।,আমরা শুধু মানুষের উপর দেখেই তাকে নিয়ে , কত

সমালোচনা করি, যেমন আজকে মনের অজান্তেই, সূর্য কে সন্দেহ করলাম কত কি ভাবলাম।
মানুষ যে কতটা মুখো'শধারী তা সূর্য কে না দেখলে বুঝতে পারতাম না।
হাঁসির আড়ালে লুকিয়ে ছিল কান্না, পাথরের মত মনেও লুকিয়ে আছে ভালোবাসা।
এটাই কি ছেলেদের জীবন?

সবসময় ভালো থাকার অভিনয় করতে হয়।

অপূর্ব এসব ভাবতেই সূর্য কে কিছু বলতে চাইলো।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ সূর্য একটা লাইটার বের করে ,, সিগারেট ধরায়।চোখ দুটো লাল।

জ্বল জ্বল করছে চোখের কার্নিশ। সিগারেট এর ধোয়া গুলো উপরে উড়ছে।

, অপূর্ব ভালো করেই বুঝতে পারছে,সে যে তার , রঞ্জনার ভাবনায় মশগুল।

চোখ গুলো দেখলেই বোঝা যায়। ভেতরে কি চলছে। হয়তো ভেঙে মুচরে যাচ্ছে।

শেষ হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

হয়তো পারছে না।,,,, অপূর্ব ভাবনা উপেক্ষা করে বললো,

— শ্রাবন আমার বন্ধুর মন ভালো করার জন্য একটা গান ধর”’ আমার সূর্য যে দেওয়ানা হয়ে আছে যে।
শ্রাবন সূর্যর মুখের দিকে তাকিয়ে আচ করলো,
কোন হারানো বেদোনা যেন তাকে গ্রা’স করে রেখেছে।
শ্রাবন মৃদু হেসে ,, গিটার টা হাতে নিয়ে গাইতে শুরু করে।

___ মায়ায় লাগাইছে , পিরিতি শিখাইছে__

দেওয়ানা বানাইছে,—-

কি যাদু করিয়া বন্দে মায়া লাগাইছে–___ মায়ায় লাগাইছে , পিরিতি শিখাইছে__

দেওয়ানা বানাইছে,—-

কি যাদু করিয়া বন্দে মায়া লাগাইছে–

বসে ভাবি নিরালয়, আগে তো জানি
বন্দের পিরিতের জ্বালা ___,
বসে ভাবি নিরালয় ,আগে তো জানি
নায় বন্দের পিরিতের জ্বালা

___

ক,ন ইটের ভাটায় কয়লা দিয়ে
আগুন জ্বালাইছে ,
হায় গো,ক,ন ঈটের ভাটায় কয়লা
দিয়ে আগুন জ্বালাইছে।
দেওয়ানা বানাইছে,

কি জাদু করিয় বন্ধু মায়া লাগাইছে।
__ শ্রাবন গান টা ধামিয়ে দেয়– সূর্য সিগারেট হাতে হেলানে বসে সুর ধরে , শ্রাবন এর সাথে সাথে_
____ আমি কি বলিব ই আর _ বিচ্ছেদের
আগুনে পূরে কলিজা আঙ্গার_আমি কি বলিবো আর_ বিচ্ছেদের আগুনে পূরে কলিজা আঙ্গার _

হায়,গো, প্রান _বন্দের পিরিতে আমায় পাগল করেছে, দেওয়ানা বানাইছে,,

কি জাদু করিয়া বন্দে পাগল বানাইছে ,, কি জাদু করিয়া বন্দে পাগল বানাইছে,, পাগল আব্দুল গায় , ভুলিতে পারিনা আমার মনে যারে চায়—-

এতটুকু শেষ করেই–

এক অদ্ভুত মায়া জড়িত গলায়,, চেঁচিয়ে বলে উঠে

রঞ্জনা,, তোমায়,হীন আমি যে আজ ও পূরছি, আমি আজ ও পুরছি,।

তোমাকে কথা দিয়েছিলাম তোমার এই জায়গা কোনদিন কাউকে দেবো না।

হ্যা- প্রেয়সী কাউকে দেবো–না

অপূর্ব ছাড়া , বাকি সবাই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সূর্যের দিকে

পাথরের তৈরি মানুষ টি যেন আজ নিস্তেজ।
— অপূর্ব বিড়বিড় করে বললো,
__ বিষে'র চেয়েও বি'ষাক্ত বিচ্ছেদ"
প্রিয় মানুষ টিকে হারানোর মত , বেদনা যেন কারো জীবনে না আসে............অপূর্ব রাতেই বাড়ি ফিরে যায়।
এলিজা তার জীবনে আসার পর যেন তাকে ছাড়া রাতের ঘুম হয়না।

এক প্রহর ও যেন তাকে ছাড়া কাটে না।গভির রাতে অপূর্ব বাড়ি ফিরে। অপূর্ব দরজায় কড়া নাড়লে কেউ দরজা খুলছে না।

ডাকাডাকি শুরু করে।

এলিজা, মা, কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

তবে কি এলিজা আমাকে রেখেই ঘুমিয়ে পরলো।

চট করে দরজা খুলে দেয়। মনজুরা

দাদাবাবু এত রাতে ফিরলেন সবাই তো ঘুমিয়ে পরেছে।

,,বললো মনজুরা বাড়ির কাজের মহিলা, ছেলের অসুস্থতার জন্য ২ মাস ছুটিতে ছিলো!

অপূর্ব বললো,মনজুরা বুবু, আপনি ফিরেছেন!ভালো ই হয়েছে , মনোরা আর এলিজা-কাজ করতে করতে শেষ।

আপনি এসেছেন এখন আপনি আর মনোরা সব সামলে নিবেন।

এলিজার সাথে বেশি সময় কাটাতে পারবো।

মনজুরা বললো, আমি আইছি এবার সব ঠিক করে দিবো!!

বলার ধরন টা একটু অন্যরকম ছিল, অপূর্ব কোন প্রশ্ন করলো না।

কারন মনজুরার কথা বার্তা এমন ই।

কর্কট,স্বভাবের মানুষ।অপূর্ব গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে তার ঘরের উদ্দেশ্যে চলে যায়।

দরজায় কড়া নাড়বে ঠিক তখনই দেখে দরজা টা আগে থেকেই খোলা।

অপূর্ব অবাক হয়। একদিন বলেছি ঘরের দরজা খোলা রেখে ঘুমাবে না ।অনৈসিক মেজাজে,,ঘরে ঢুকে,দেখলো,ঘরের লাইট বন্ধ।

— অপূর্ব এলিজা কে অন্ধকারে না দেখতে পেয়েও বললো,
ম্যাডাম আজকে আমাকে রেখেই ঘুমিয়ে পরলেন। সারাদিন কোন না কোন কাজ করেই চলেছেন। দূর্বল তো হতেই হবে। তাই হয়তো ঘুমিয়ে গেলেন।
কিন্তু আমি তো তোমাকে ঘুমাতে দিচ্ছি না।

বলেই অপূর্ব লাইট অন করতেই দেখে ঘর ফাঁকা।

অপূর্বর শরীর আচমকা কেঁপে উঠে।

ঘাম ঝরতে থাকে।অবাক করা দৃষ্টিতে এদিকে সেদিন দেখলো।

এলিজা ঘরে নেই।

এলিজা এলিজা বলে ডাকতে শুরু করে, কোথাও সাড়া শব্দ নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দেখে সেখানেও নেই,,

অপূর্ব ভাবলো, হয়তো মা, অর্পা, চাঁদনী ওদের সাথে আছে।

অপূর্ব জয়ার ঘরে চলে যায়। জয়া কখনো দরজা লাগিয়ে ঘুমোয় না,, কারন সে বলে এতে তার দম বন্ধ হয়ে আসে।

দরজা খুলে লাইট জ্বালিয়ে জয়াকে ডাকতে শুরু করলো।জয়া গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

গায় হাত দিয়ে ডাকতে শুরু করে কোন সাড়া নেই।

পাশেই অর্পা, চাঁদনী ওদের ও কোন সাড়া শব্দ নেই।

ঘুমের গভীরতা দেখে মনে হচ্ছে,, এরা নে,শা করে ঘুমাচ্ছে।

এলিজা এখানেও নেই তাহলে আর কোথায়?

সমস্ত বাড়ি খুঁজলেও এলিজা কোথাও নেই,,হঠাৎ করে মনে পরে,,সব ঘর

খুজলেও জাহাঙ্গীর এর রুমে একবার যাওয়া হলো না।

অপূর্ব ভাবলো,কিন্তু বাবার ঘরে কেন ই বা যাবে?

যেতে যেতে অপূর্ব ভাবতে থাকে,, এলিজা বাবার ঘরে আসবে না,, কারন বাবা, এলিজা কে মন থেকে বউ হিসাবে মানতে পারেনি,কারন, ওদের দরিদ্রতা।

বাবা সবসময় চাইতেন প্রতাবশালী কারো মেয়েকে বউ করবেন,যেমন ছিল চাঁদনী

,, এসব ভাবতে ভাবতে অপূর্ব জাহাঙ্গীর,এর ঘরের সামনে এসে থমকে দাড়ায়

,, অপূর্ব চিন্তায় পড়ে যায় এত রাতে বাবাকে ডাকবো, ঠিক হবে,নাকি এলিজা আমার সাথে লুকোচুরি খেলছে।

,, বলেই দরজায় কড়া নাড়ার আগেই চট করে দরজা টা খুলে দেয় এলিজা।

অপূর্ব অবাক হয়ে যায়।এলিজা এত রাতে বাবার ঘরে কি করছে? আমার ভাবনা ভুল ছিলো।

,, এলিজার চোঁখে পানি জ্বল জ্বল করছে।

অপূর্ব কে দেখেই কি যেন, কি বলবে চেয়ে , অপূর্বর বুকের উপর

ঝাপটে পড়ে হুহু করে কান্না শুরু করে।

অপূর্ব কিছু বুঝে ওটার আগেই।

জাহাঙ্গীর -কাশি ,দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে বললো,তোর অপেক্ষায় মেয়েটা একা একা বসে কাঁদছিলো,, ওর চোখ মুখের বিষন্নতা আমার ভালো লাগেনি।

পানি খেতে নিচে নামলে ,,আমার সাথে কথা বলতে চায়, আমি মুখ ঘুমরে ঘরে চলে আসি।

ও আমার পেছন পেছন আসতে থাকে আর জিজ্ঞেস করতে থাকে আমি কেন ওর সাথে কথা বলিনা,? কেন,অদ্ভুত আচরণ করি?

তাই আজকে ওকে সবটা বললাম। ছেলের বউ হিসেবে, এলিজা-যোগ্য আমি তা আছ বুঝতে পারছি।

অপূর্বর বুকে থাকা অবস্থায়, জাহাঙ্গীর পেছন থেকে এলিজার মাথায় হাত বুলিয়ে আদুরে স্বরে বললো,

পারলে আমায় ক্ষমা করিস,আজ থেকে আমি ই তোর বাবা।

জাহাঙ্গীর এর মুখে এরকম কথা শুনে অপূর্ব অসৈর্যিক আনন্দ পায়।

মনে মনে ভাবলো, এলিজা আজ থেকে তার শ্বশুর কে বাবা,রুপে পেলো।

এলিজার চোখ মুছে দিয়ে ঘরে নিয়ে আসে অপূর্ব।

, অপূর্ব বললো,__ম্যাডাম, আপনি আমার অপেক্ষায় থেকে এভাবে কাঁদলেন, সত্যি ই আমি দুনিয়ার ভাগ্যবান পূরুষ,

যার সামান্য অনুপস্থিতিতে তার অর্ধাঙ্গিনী শূন্যতা অনুভব করে।

এলিজা অভিমানী স্বরে বলল,সেই কখন থেকে আপনার পথ চেয়ে ছিলাম ।আপনি বুঝেন না আমার কষ্ট হয়,বড্ড খালি খালি লাগে,,

“আমার এই শুন্যতা ভরা,জীবনে আপনি ই একমাত্র পূর্নতা”

আপনার স্বল্প অনুপস্থিত,,

আমাকে অনেক কাদায়।

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,কখনো কখনো তোমার থেকে দূরে চলে যেতে হবে ক্ষানিক সময়ের জন্য!

, শুধু মাত্র তোমার চোখে আমাকে হারানোর ভয় দেখার জন্য –তুমি যখন আদুরে গলায় তোমার মনের ভাব প্রকাশ করো,,,

তখন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অনুভূতি গুলো,এসে আমার হৃদয় বাসা বাঁধে।

রাত গভীরতর হচ্ছে। এলিজা অপূর্ব ঘুমিয়ে পরেপরদিন সকাল বেলা—- তিলকনগর———-

রমজান: পাশের ঘর থেকে হাশেমের মায়ের কান্নার আওয়াজ আইতেছে, তুমি যাইয়া একটু দেখতা।

জয়তুন বললো,আর কি দেখুম মানুষ টা যে বড়ই দূর্ভাগা, আজ কেন জানি এই কথাটা বলতেই হলো।

,, একমাত্র ছেলে টা ,,, দ্বিতীয় বিয়ে কইরা যে গেছে আর খবর নাই,,

মেয়ের মতন ছিলো,বউ,

কোন কালো বাতাস যে তার জীবন টা,কেড়ে নিলো –নিরা,রে।

বলেই জয়তুন দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

রমজান; আমার একটা জিনিস নিয়া এখনো খটকা লাগে বুঝলা,, হাশেম যে গেলো ,, আর আইলো না,, হাশেম তো ওর মায়রে একাকার

কইরা ভালোবাসতো।জয়তুন: মানুষ মূলত স্বার্থপর। পাসা,ষ্ঠ, মানুষের রং বদলাইতে কি সময় লাগে –?

রমজান:-তবুও আমার কেমন জানি মনে হয়, হাশেম এমন নয়,, কোথাও ঘাপটি মেরে আছে।

জয়তুন: এসব ছাড়ুন,আপনি বাজারে যান, গিয়ে কিছু মাছ কিনে আনুন, ছোট চাচী রে কয়টা ভাত দিতে

হইবো-দুনিয়ায় তো ওনার কেউ নাই।

______ ঢাকা—–বিকেল,৪ টা

প্রতি ৬ মাস পর পর , অচিন পাহাড়ে, ওয়াক- রাউন্ড খেলা হয়, সমস্ত দম্পতি সেখানে অংশগ্রহণ করে

বলা হয় আজ পর্যন্ত কেউ এই খেলায় জয়ী হতে পারেনি।কারন

অচিন পাহাড়ে উঠতে হলে,১০০ সিড়ি পার হতে হয়।

শ্রাবন মনস্থির করে তারা আজ বিকেলে অচিন পাহাড়ে যাবে।

শ্রাবন অপূর্ব কে উদ্দেশ্য করে বললো,ভাই চল আজকে আমরা অচিন পাহাড়ে যাই।অংশগ্রহণ তো করতে পারবো না তবে , অন্যদের খেলা তো দেখতে পারবো।অপূর্ব: তোর আইডিয়া ,টা

দারুন, এলিজার মন টা ভালো নেই, বার বার বলছে মামা,মামির কথা মনে পরছে।

এলিজা কে বলে দেখি যেতে রাজি হয় কিনা।

___এলিজা যাওয়ার জন্য রাজি হয়___ এলিজা তৈরি হচ্ছে। সাথে,অর্পা, চাঁদনী,

অর্পা ভিষন খুশি,কারন অচিন পাহাড় অনেক দূরে হওয়ায় যাওয়া হয়না।

আজ যেতে পারবে বলেই যেন,ঈদের মত আনন্দ হচ্ছে।

চাঁদনী:— আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। এত দূর ফিরে আসতে আসতে যে রাত হয়ে যাবে।

অর্পা : তাতে কি পুলিশ ভাই আছে,সাদিক ভাইয়া, সূর্য ভাইয়া,,এরা তো আছেই তাইনা ভয় পাওয়ার কোন দরকার নেই। বলেই

মৃদু হেসে দেয় অর্পা।___ যাওয়ার জন্য সবাই বেড়িয়ে পরে,।

একটা গাড়িতে, সবাই উঠে পরলো।

আজ গাড়ি চালাচ্ছে, অপূর্ব বাম পাশে তে এলিজা-,পেছনে, অর্পা, সাদিক, সূর্য শ্রাবন

সাদিক, সূর্য আনমনে কিছু বলছে আর খিল খিল করে হেসে উঠছে।

অপূর্ব, লুকিং গ্লাস দিয়ে, সূর্যর দিকে, দেখছে।

আর ভাবছে__ একটা মানুষ কতটা নিখুঁত অভিনয় জানলে , ভেতরে কষ্ট চেপে ধরে হাঁসতে পারে।

,,,গাড়ি থামলো অচিন পাহাড়ে,,, হাজার হাজার মানুষ এখানে আসে ,, চারদিকে সবুজ স্যামল মাঝখানে অচিন পাহাড়।

এই পাহাড়ের চুড়াই উঠতে ১০০ টা সিড়ি পার হতে হয়।

কেউ কেউ, একা একা হেটে যায়,

তো কেউ সর্ত দেয়,তার স্বামী কে ,পাজা কোলে করে,তার বউকে নিয়ে উঠতে পারলে ১লক্ষ টাকা টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

আজ পর্যন্ত কেউ ই অচিন পাহাড় এ , তার স্ত্রী _কে নিয়ে উঠতে পারেনি।তবে অপূর্ব মনস্থির করে সে উঠবে,তবে টাকার জন্য নয়, তার ভালোবাসার জন্য।***চারদিকে, মানুষের কোলা'হলে ভরে গেছে ।

অর্পা, চাঁদনী এদিক সেদিক, ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাদিক, সূর্য,গাড়ির সাথে হেলানে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আশপাশ পরোক্ষ করছে,, শ্রাবন গিটার বাজাচ্ছে।

অনেক দম্পতি, চেষ্টা করে তার প্রিয় মানুষ টিকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে,তবে সবাই ব্যার্থ হয়।

,, এই দেখে অপূর্ব এলিজা কে- বললো,

ম্যাডাম,, চলেন একবার আমরা চেষ্টা করে দেখি।

এলিজা হেসে উঠলো, বললো_ কখনোই পারবেন না।কারন এগুলো সিনেমা,তে হয়,বাস্তবে নয়।

অপূর্ব ইতস্তত বোধ করলো।,এলিজা মৃদু হেসে, অপূর্ব কে ইঙ্গিত করে বললো, সে নাকি আমাকে নিয়ে অচিন পাহাড়ের চূড়ায় উঠবে।

অপূর্ব, বললো,যদি পারি, তাহলে কি দিবে আমাকে?

এলিজা, অহংকারী স্বরে বললো,পারবেন না।আর যদি পারেন,তাহলে এই জীবন টা, আমি আপনার জন্য,,কোরবা'ন,করে দেবো।

অপূর্ব: কোর,বান করতে হবে না,, শুধু জনমে জনমে আমার হয়ে থেকো।

বলেই, এলিজা-কে পাঁজা কোলে করে নেয়,,
সূর্য,সাদিক , অর্পা, চাঁদনী,সহ আশেপাশের সবাই অবাক দৃষ্টিতে তাকালো।
তৎখানিক সাদিক , বললো, ,ওরা কি সিনেমার কৌশল ধরলো নাকি! বলেই হেসে উঠলো।

*সূর্য অপূর্ব কে বাধা দিতে যাবে ঠিক তখনই, সাদিক সূর্যর হাত টা ধরে ফেলে।

সাদিক:কি করছিস ওকে বাধা কেন দিতে চাইছিস?

সূর্য অস্থিরতা ভাব নিয়ে বললো,, তুই জানিস না ওর কি সমস্যা.....

বলতেই সূর্য কথা থামিয়ে দেয়।

সাদিক: মানে?কি সমস্যা?সূর্য সংযত দৃষ্টিতে বললো,এত দূর ভারী

একজন মানুষ নিয়ে উঠলে ,শরীরের ক্ষতি হবে যে...

সাদিক মৃদু হেসে বললো,,ভালোবাসার জন্য হাজার ও পথ পারি দিতে পারে যদি সে মানুষ টা,, পাশে থাকে।

আশপাশ থেকে সবাই বলে উঠছে,, পারবে না পারবে না,,

অপূর্ব কারো কথায় কান না দিয়ে,,

অচিন পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে থাকে,, এক সিড়ি ,দুই,সিড়ি, করতে করতে অনেক সিড়ি পার হয়।

সূর্য সাদিক, পেছন থেকে বলো উঠলো,তোকে যে পারতেই হবে, অপূর্ব,তুই পারবি,, তুই যে আমাদের বন্ধু তোকে পারতেই হবে।

এলিজা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো অপূর্বর দিকে।ভাঙা গলায়

বললো,আমাকে ছাড়ুন কষ্ট হচ্ছে আপনার,ছাড়ুন।
অপূর্ব উঠতেই থাকে।আশেপাশের হাজারো মানুষ তাকিয়ে আছে, কেউ বলছে,এগুলো সিনেমাতে হয়, বাস্তবে কেউ পারবে না, কিছুক্ষণ এর মধ্যে ই অপূর্ব অচিন পাহাড়ের চুড়ায়,পৌছে যায়।

সবাই হইহই করে ওঠে। ,
,কোলা’হলে অচিন পাহাড়, আচ্ছাদিত হয়ে ওঠে।

কেউ কেউ বলছে, মেয়েটা হয়তো ,
,সৃষ্টিকর্তার তৈরি এক ভাগ্যবতী,যে এমন স্বামী পেয়েছে।

,, এলিজাকে কোল থেকে নামিয়ে,, অপূর্ব হাঁপাতে থাকে,,

এলিজা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে,চোখে জ্বলজ্বল পানি।

এলিজা বললো,এতটা ভালোবাসেন আমাকে?

অপূর্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে,হাত দুটো দুদিক করে। উল্টো দিকে ঘুরে,ভারি চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো। ভালোবাসি ম্যাডাম,আমি আপনাকে,নিয়ে ১০০ কেন,১ হাজার পথ, পারি দিতে পারি, যদি থাকেন আপনি পাশে।আপনার হৃদয়ের কার্নিসে কার্নিসে, আমার

ভালোবাসার ফুল ফুটে ভরে যাক। আপনার হৃদয়ের বাগানের মালি হয়ে থাকতে চাই সারাজীবন।,, এলিজা- জ্বল জ্বল চোখে মৃদু হেসে,পেছন থেকে অপূর্ব কে জড়িয়ে ধরে।

তাদের দুজনের ভালোবাসা দেখে যেন আজ প্রকৃতিও আনন্দে আত্মহারা,,হয়ে গেছে ,পাহাড়ে থাকা সবুজ স্যামল যেন আজ , নতুন রূপ পেয়েছে। সূর্য, অসৈর্য ,কার্নিস চোখে

তাকিয়ে থেকে,বলছে। এ যেন, পৃথিবীর বুকে ,

শাহজাহান,আর মমতাজ কে দেখতে পাচ্ছি।

—-রাত ৮ টা নাগাদ —বাড়ি,, ফেরার জন্য সবাই গাড়িতে উঠতেই,,

এলিজার চোখ পরে,একজন অল্প বয়সী পাগলী, মেয়ে বসে আছে। হাতে কারো ছবি।

এলিজা অবাক হয়ে দেখতে থাকে,, মেয়েটিকে কাছ থেকে দেখতে যাবে ঠিক তখনই,অপূর্ব বললো,সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে,, তারাতাড়ি চলো।

বলেই গাড়ি স্টার্ট করে বেড়িয়ে পরে বাড়ির উদ্দেশ্যে।

নির্জন রাত,, পরিবেশ একদম ঠান্ডা,, রাস্তার দু পাশ থেকে গাছ গুলো হেলিয়ে পরেছে।শ্রাবন, গান গাইছে,,

এলিজা চুপচাপ বসে আছে,, অপূর্ব এক ধ্যানে, গাড়ি চালাচ্ছে।

গাড়ি মাঝ পথে আসতেই অপূর্বর চোখ পরছে

ডান দিকের লুকিং গ্লাসের দিকে,, কেউ একজন দৌড়াচ্ছে ,

অপূর্ব অবাক হয়।

, চারদিক থেকে যেন কালো ছায়া নেমে আসছে,, করন লোকটি আর কেউ নয়

লোকটি, গুঞ্জন।

গাড়ির পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে,,

হাত দিয়ে এমন ইশারা করছে মনে হয় ,গাড়ি থামাতে বলছে। কিছু বলতে চাচ্ছে,।

, সাদা পাঞ্জাবি, পরনে সাদা পাগড়ি,, অক্লান্ত শরীরে দৌড়াচ্ছে,।

অপূর্ব নিজের মন কে শান্ত না, দিচ্ছে

হ্যালোসুলেশন, হচ্ছে।চোখের পাতাগুলো টিপ টিপ করে, আবার দেখলো না এটা ভুল নয় , এটাতো গুঞ্জন ই, তবে সে কি মারা যায়নি,, সূর্য সাদিক ওরা যে বললো গুঞ্জন মারা গেছে।

ধব,করে গাড়িটা ব্রেক করলো।

সূর্য বললো,কি হলো গাড়ি থামালে কেন??

অপূর্ব ভাবলো, মেয়েদের কিছু বলা যাবে না ভয় পাবে। ভাবনা ছেড়ে বললো,গাড়ি থেকে নাম চাকায় সমস্যা হয়েছে,,

তোমরা বসো।

শ্রাবন ঘুমিয়ে পরে,,তাই ওকে আর ডাকেনি।

সাদিক,অপূর্ব, সূর্য নামলো,, গুনজন কে দেখা মাত্রই,, সবার চোখ গুলো বড় বড় হয়ে যায়,, চারদিক থেকে

যেন কালো ধোঁয়া জর্জরিত করে, চাঁদনী আলো ,নিভিয়ে দিয়েছে।

অপূর্ব থেকে গুঞ্জন এর দূরুত্ব প্রাই – ৫০ হাত অনেক টাই দূরে।

তোরা যে বললি গুঞ্জন খু,ন হয়েছে তবে এই কে?

সাদিক:, আমাদের কাছে তো এটাই খবর এসেছিল,,

অপূর্ব বললো, ‘লা’শ কি নিজের চোখে দেখেছিস,?

সাদিক, সূর্য না সূচক মাথা নাড়ে।
গুনজন থম মেরে দাঁড়িয়ে, আচমকা,
উল্টো দিকে দৌড়াতে শুরু করে ,
এমন মনে হলো সে, আজ,রাইল
দেখেছে।
হঠাৎ দৌড়াচ্ছে কেন?
কিছু তো গড়মিল আছে,
সূর্য:এর খোঁজ কাল করবো এখন
ছার, বাড়িতে ফিরতে দেরি হচ্ছে।

অপূর্বর যেন সবকিছু ঘোলাটে লাগছে,,

মনে হচ্ছে,সব সূত্র আমার চোখের সামনে তবে আমি দেখছি না,

কে এই গুঞ্জন আমাদের পেছনে কেন পরে আছে, যদি নাই,খু,ন হয়ে ছিল তবে ভুল তথ্য কে দিলো , হাজার টা প্রশ্ন যেন মাথা ঘুরছে।

পরদিন সকাল বেলা—-

জয়া কাঁপা কন্ঠে অপূর্ব কে ডাকলো। বললো, দরজা খোল, বাবা দরজা খোল,,

অপূর্ব চোখে ঘুম নিয়ে দরজাটা খুলে দেখলো,জয়াকে।,জয়ার চোখে মুখে ভয়ের ঝাঁপসা।

কি হয়েছে ডাকছো কেন?জয়া কাঁপা কন্ঠে, বলে উঠলো।

তোরা যে , গুঞ্জন কে নিয়ে আলোচনা করেছিলিস, তার লা,শ

আমাদের গাড়ির,ঢিকিতে পাওয়া গেছে.৩ বছর পর____________ নির্বিসে, অধিরে,কষ্ট, বেদনায়, রহস্য উন্মোচন, বন্ধু হারানো , একের পর এক নির্মম মৃত্যু,এসব দেখতে দেখতে কেটে যায় তিনটি বছর। এই পর্যন্ত ৪০ টা লা,শ আমাদের নাগালে এসেছে। জানি না আর কত নিরীহ মানুষ মৃত্যু খেলায় প্রান হারাবে এখনো আমরা সেই কি,লার

কে খুঁজে পেলাম না। তবে সবকিছুর ই শেষ আছে এর ও হবে।

আজ ও মনে পরে রায়হান কে হারানোর দিনটি।সেদিন পূরো পৃথিবী থমকে গিয়েছিল। আজ ও আফসোস হয় মৌলবীর মৃত্যু তে , কি বলতে চেয়েছিলো। তারা দুজন। গুন্জন কে কে বা কারা আমার গাড়ির ঢিকিতে রেখেছিলো তা আজ ও অজানা । খেলাটা শুরু যেই করেছে শেষ

আমাকেই করতে হবে।দেখতে দেখতে কেটে যায় অনেক দিন। তবে আজ ও ভুলতে পারিনি রায়হান কে।

বন্ধু হারানোর ব্যাথাও যে এতটা তিঘ্ন তা আজ বুঝতে পারছি।

সূর্য,পলাশ, হিমেল,মিদুল সবাই দূরে।

সূর্য, ওর মামা বাড়িতে।মামা অসুস্থ দেখার মত কেউ নেই। তাই সূর্য

হয়তো ছেলের স্থান টা পূরন করতে চাইছে।

পলাশ, মিদুল , হিমেল ,তিন জন মিলে ছোটখাটো একটা টূরের প্লান করে সেখানে গেছে।

আমাকে বললেও আমি না রাজি হইনি যেতে। কারন সূর্য কাছে নেই।

সূর্যের অতীত টা যেদিন থেকে আমি জেনেছি,সেদিন থেকে যেন ওর প্রতি

ভালোবাসা টা বেরে গেছে। মায়া হয় বড্ড। কি নির্মম অতিত।

মনে পরে আজ ও।ফেলে আসা কৈশোর,

দুরন্ত ঘুড়ি , প্রথম সাইকেল চালানো

পাড়ার সীমানা ছাড়িয়ে

প্রথম হারিয়ে যাওয়া শহরে ।

দাদা বাড়ি শীতের ছুটিতে

হলুদ বনে সরষের গন্ধ মাখানো শরীর নিয়ে

জল হারানো শান্ত পুকুরে ঝাঁপাঝাঁপি
।

এমনি

আরো অগন্তি স্মৃতিরা ঘিরে ধরে

নীরব কোলাহলে।

আমি হারিয়ে যাই।

সেই মধুর সময় আর আসবে না ফিরে।হাজারো কষ্টের মাঝে হাহাকারের, মাঝে শান্তি নিয়ে এসছিলো এলিজা।

সবকিছুর মাঝে সে যেন অনন্ত সুখ। তার চোখের দৃষ্টি যেন আমাকে নতুন করে পথ চলা শেখায়।

এলিজা বাড়িতে নেই। সকালে বেড়িয়েছে এখনো আসেনি। একটা এনজিও তে চাকরি নিয়েছে।

অনেক বুঝিয়েছি চাকরি নেয়ার দরকার নেই।

কিন্তু সে করবেই কারন তার মামার,

বয়স হয়েছে, মামি হাস, মুরগি, গরু এসব লালন পালন করেন।

তাতে সংসার চালানো মুশকিল হয়ে পরে। তার উপর পাখি এবার মেট্রিক পরীক্ষা দিবে। টিউশন করতে হয়। স্কুলের ফি দিতে হয়। সব মিলিয়ে এলিজাকে, চাকরি করতেই হতো। কারন সে যে কারোর দয়া নিবে না। আমি অনেক বার বলেছি। আমি তাদের ভরন

পোষন এর দায়িত্ব নিবো। কিন্তু তা সে রাজি নয়।

বলে ,স্বামির বাড়ির টাকা কখনো বাবার বাড়িতে দিতে নেই। লোকজন কি বলবে। তাই ভেবে সে নিজেই চাকরি নিয়েছে।এলিজা, ইন্টারমিডিয়েট শেষ করছিলো।

বাবা মা মারা যাওয়ার পর আর পরাশুনা করতে পারেনি।

আমি কিছুদিন অবসরে।

শ্রাবন কেও পুলিশ এর চাকরি নিয়ে দিলাম।

ছেলেটা বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে। কিন্তু যেদিন সূর্য,র অতিত জেনে যায়,তারপর থেকে বিয়ের কথা বললেই বলে, যদি তাকে হারিয়ে ফেলি তবে সেই কষ্ট সহ্য হবে না, তাছাড়া সহরের কোন মেয়েও নাকি ওর পছন্দ হয়না।

ছাদে বসে একা একা এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে সন্ধ্যা হয়ে যায় বুঝতেই পারেনি অপূর্ব _

দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ হয়তো। এলিজা এসেছে। অপূর্ব নিচে চলে আসে।

এলিজা: মনজু বুবু !উনি কোথায়? বলতেই অপূর্ব সিড়ি থেকে নেমেই বললো,

ম্যাডাম, আপনার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে যে,কত প্রহর কেটে গেছে। এতক্ষনে আসার হলো।

এলিজা মৃদু হেসে, অপূর্ব কে জড়িয়ে ধরে বললো, আমার খুব শান্তি লাগে,যখন আপনার চোখে আমার জন্য অপেক্ষার ছাপ দেখি।

এলিজা:বাড়ির সকলে কোথায়?

অপূর্ব: অর্পা টিউশন থেকে ফেরেনি এখনো। মা ঘুমোচ্ছে। বাবা বাহিরে।

শুনছেন, গতকাল চিঠি এসেছে পাখির।

ওর তো কিছুদিন পর মেট্রিক পরীক্ষা। মামির শরীর টা ভালো নেই। ওর ঘরের কাজ করতে হয়। এই সময়ে ওর পরার দরকার তা রেখে যদি কাজ করে,তবে ফলাফল খারাপ করবে।

আমি চেয়েছিলাম আমরা যদি কিছুদিন তিলকনগর গিয়ে ,থেকে আসি তবে

আপনার কি কোন সমস্যা হবে? -বললো এলিজা।

অপূর্ব মৃদু হেসে উত্তর দেয়, আমার কোন আপত্তি নেই। আমার ম্যাডামের সাথে, আমি কাঁটা -জড়িত পাহাড়েও থাকতে রাজি।রাত ১১ টা

———-

ল্যান্ডলাইনে কলের আওয়াজ।
ল্যান্ডলাইনে বেশিরভাগ অপূর্ব কে ,থানা থেকে ই ফোন দেয়া হয়।
অপূর্ব দ্রুত পায়ে নিচে নেমে ফোনটা তুললে ওপাশ থেকে বলে উঠলো।
স্যার,, ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এ কিছু জঙ্গি রা আক্রমন করেছে। আপনাকে ডিসি সাহেব দ্রুত টিম নিয়ে সেখানে যেতে বলেছেন। জঙ্গিরা ,, ছাত্র-

ছাত্রীদের আক্রমন করার আগে আপনাকে পৌঁছাতে বলেছেন।

ওপাশ থেকে বলা কথা গুলো খুব হতাশায় ভরা ছিলো।

অবসরে থাকার পরেও আজ যেতে হচ্ছে। কারন,এটা আমার দায়িত্ব।

অপূর্ব দ্রুত গতিতে, পুলিশ ইউনিফর্ম পরে,একটা রাইফেল নিয়ে বেড়িয়ে পরে।

এমন সময় সাদিক ও হাজির হয়। অপূর্ব সাদিককে দেখেই বুঝতে পেরেছে কেন এসেছে।

দু'জনে গাড়িতে উঠে চলে যায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।পূরো টিম সেখানে।

চারদিকে গুলির আওয়াজ।

গুলির আওয়াজে চারদিক টা এলোমেলো হয়ে গেছে।

রাইফেল, থেকে বের হওয়া ধোয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে।

কোথাও যেন একটা কাঁক নেই। যে শহর কাঁকের আহা,জার সেই শহর জঙ্গিদের আক্রামনে নিরব।

শুধু শোনা যাচ্ছে গুলির শব্দ।

সাদিক বরাবরই ভিতু। যেকোনো সাংঘাতিক মূহুর্তে সে ভয় পেয়ে যায়।

অপূর্ব,সাদিককে গাড়িতে বসে থাকতে বলে।

কিন্তু সাদিক রাজি হলো না।

বলে,তোকে একা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে আমি শান্তি তে বসে থাকতে পারবো না।

অপূর্ব, মেজাজ দেখিয়ে বললো,তোকে বলেছি এখানে,বসে থাকতে তো থাকবি, আমাদের বন্ধুত্বের কসম। আমি আসছি বলেই,

অপূর্ব জঙ্গিদের উপর একের পর এক,গুলি ছুরতে থাকে।

একের পর এক, একের পর এক, লা,শ পরতে থাকে।

নি'হত হয় অনেক পুলিশ অফিসার।

নিরিহ পুলিশ অফিসারদের জীবনের বিনিময় জঙ্গিদের হাত থেকে রক্ষা করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

অনেক জন জঙ্গি প্রান হারায়।

বাকিদের পুলিশেরা গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

জরো হয় হাজারো মানুষ।

জরো হয়, হাজারো সন্তান, হারা মা।

চারদিকে কান্নার আহা,জারি বইছে্।

এ্যাম্বুলেন্স এসে মৃতু লা,শ গুলো নিয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় এর পেছন থেকে বেড়িয়ে আসে অপূর্ব,

হাতে রাইফেল।শরীরে রক্ত। পুরো শরীর টাই রক্তে ভিজে গেছে।

সাদিক দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে হুহু করে, কান্না শুরু করে।

সন্তান হারা মায়েদের আর্তনাদের চেয়েও সাদিকের আর্তনাদ বেশি ভয়ংকর।

সাদিক কান্না জড়িত কন্ঠে বলে উঠলো—-কেন আমায় বন্ধুত্বের কসম

দিয়ে স্বার্থপরের মত দূরে রেখে একাই মৃত্যুর মুখে ঠেলে পরলি।

অপূর্ব বললো,বন্ধু হারানোর বেঁদনাও যে বড্ড কাঁদায়। একজনকে হারিয়ে আজ ও পুড়ছি।

যদি তোর কিছু হয়ে যায় তাই দূরেই রাখলাম।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষার্থী রা বেড়িয়ে আসে।

ইট পাথরের রাস্তা আজ র'ক্তে রঞ্জিত।

অপূর্ব, মাটিতে পরে থাকা একটা ওয়ালেট দেখতে পায়।

ওয়ালেটে কি আছে দেখতেই নিচ থেকে তুলতেই,সাদিক- দূর থেকে দেখতে পায় একজন জঙ্গি লুকিয়ে আছে। তার হাতের
বন্ধুক টা ঠিক অপূর্বর দিকে নিশানা করা।

এখনই গুলি করবে।

সাদিক চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো —-সরে যা অপূর্ব, বলেই অপূর্ব কে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিজেই মৃত্যুর সামনে বুক পেতে দেয়।সাদিক ঢলে পরে যায় রাস্তায়। সাদিকের বুকের মাঝে গুলি লাগে।

অপূর্ব চিৎকার দিয়ে উঠেই জড়িয়ে ধরে সাদিককে।

চারদিকের সবাই আবার ছোটাছুটি করছে।

গুলি করা জঙ্গি কে ধরে ফেলে একজন পুলিশ অফিসার।

চারদিকে কালো ধোঁয়া নেমে আসছে। আকাশ টা আজ বড় একা হয়ে আসছে।

অপূর্বর পুরো শরীর সাদিকের রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়।

অপূর্ব অঝরে কাঁদদে কাঁদদে বললো,

এই সাদিক এই সাদিক কি করলি এটা ,
সাদিকের রুহটা চলে যাচ্ছে প্রাই, সেই ভরাকান্ত অবস্থায় সাদিক বললো,আমি থাকতে তোর কি করে ক্ষতি হবে। হা বলনা , আমার সামনে তোকে কেউ মেরে ফেলবে আমি তা দেখবো, আমি যে,তোকে বড্ড ভালোবাসি। আমার সামনে

তোর মৃত্যু যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারবো না।

অপূর্ব : তোকে না আমি কসম দিয়েছি , বিপদের বুকে পা না বাড়াতে ,তবে এলি কেন আমার সামনে ,কেন তোর বুক পেতে দিলি। অপূর্বর কান্নায় পুরো শহর থমকে গেছে। আকাশ টাও অঝরে কাদছে।

প্রকৃতি আজ একা হয়ে গেছে। আকাশের নিল রঙ নিমিষেই কালো হয়ে গেছে।

অপূর্ব ভেজা কন্ঠে বললো,*কসম ভঙ্গ করাতে যদি পাপ হয়”” আর আমি পেলাম জীবন* বলেই অপ্রুভ ভাবে কাঁদদে থাকে।সাদিক দুটো হেঁচকি তুলে চোখ দুটো চিরদিনের জন্য বুঝে ফেলে।

এই চোখ আর কোনদিন দুনিয়া দেখবে না। এই চোখ আর কখনো, বন্ধুকে দেখবে না।

অপূর্ব অঝরে কাঁদদে থাকে।

কাপা কণ্ঠে বললো,এই সাদিক ওঠ না ওঠ, তুই কি করে ছেড়ে চলে যেতে পারিস, কে আমাকে অপূর্ব অপূর্ব বলে ডাকবে।

কে আমাকে সঙ্গ দেবে।

কেন কসম ভঙ্গ করলি,আমি নিষ্ঠুর, আমার সামনে আমার বন্ধু কে শেষ হতে হলো। আমি যে বাঁচাতে পারলাম না। পারলাম না বাঁচাতে। বলেই আকাশের দিকে তাকিয়ে ফাটিয়ে এক চিৎকার।

সবাই আশপাশ থেকে দেখছে, অপূর্বর কান্না দেখে তারাও কাঁদছে। কি নির্মম পরিহাস। নিজের চোখের সামনে রক্তাক্ত বন্ধুর লা'শ।

সাদিকের লা,শ টা

এ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যেতে চাইলে অপূর্ব নিতে দিতে চাচ্ছে না। সে কিছুতেই তার বন্ধুর লা,শ নিতে দিবে না কিছুতেই না।২জন কনস্টেবল অপূর্ব কে সরিয়ে নেয়।

তার বন্ধুকে নিয়ে যাচ্ছে। এটা তার সহ্য হচ্ছে না।

এ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে গাড়ি হাসপাতালের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছে।

অপুর্ব অ্যাম্বুলেন্স এর পিছন পিছন ছুটতে থাকে ,

সাদিক যাসনা_ যাসনা আমায় একা করে যাসনা।

এ্যাম্বুলেন্স টি চোখের আড়াল হয়ে গেলো

অপূর্ব, হাটুঘেরে রাস্তায় বসে পরে।

সমস্ত কিছু আজ এলোমেলো লাগছে।

আমি বড় দূর্ভাগা—— কসম ভাঙাতে যদি পাপ হয়,তবে আমি কেন জীবন পেলাম !!

তোর আর আমার বন্ধুতের বন্ধন থাকবে চিরদিন। —রাত ৩ টা নাগাদ অপূর্ব বাড়ি ফিরে।

দরজা খোলাই ছিলো।

সবাই সজাগ,কেউ ঘুমোয়নি সবাই জেগেই ছিলো। অপূর্বর অপেক্ষায়।

মনজুরা,মনোরা, জাহাঙ্গীর,জয়া ,অর্পা, শ্রাবন, সবাই অপূর্বর র'ক্ত মাখা শরীর দেখে শিহরিত হয়ে ওঠে।সবার মুখের রঙ নিমিষেই বদলে যায়। হতভম্ব হয়ে যায় সবাই অপূর্ব ধপাশ করে হাঁটু ঘেরে, মেঝেতে বসে পড়ে। আজ পূরো পৃথিবীটা নিস্তব্ধ, আকাশ টা বড্ড অভিমান করে আছে আমার সাথে।

আমি যে,আমি যে আমার বন্ধু কে বাঁচাতে পারিনি।

চোখের সামনে রক্তাক্ত শরীর টা বার বার আমায় বলছিল। বাঁচতে চাই আমি বাঁচতে চাই। একসাথে তোর সাথে আরো কিছু টা সময় দীগন্ত পথ চলতে চাই।একসাথে সেই, ছোট্ট বেলার লুকোচুরি খেলা খেলতেই চাই।

,, হাঁটুঘেরে বসে থাকা অপূর্বকে এসেই জড়িয়ে ধরে এলিজা।
হুহু করে কান্না শুরু করে।
এলিজা : কেন গেলেন আপনি? কিসের দরকার ছিল জঙ্গিদের সাথে লড়ার,যদি আপনার কিছু হয়ে যেতো তবে আমার কি হতো?
জয়া : কাউকে কিছু না বলেই এভাবে চলে গেলি যদি তোর কিছু হয়ে যেত তবে আমরা মরে

যেতাম,তুই যে বেঁচে থাকার একমাত্র সম্ভল।

বলেই মুখের উপর কাপড় দিয়ে জয়া কান্না শুরু করে।

অপূর্ব চোখে সবকিছু ঝাপসা দেখতে লাগলো। মাথাটা ঘুরছে। বমি বমি ভাব হচ্ছে। এমন অনুভূতি হতেই,,হঠাৎ করেই অপূর্ব মেঝেতে ঠলে পরে যায় ।সবাই হতাশ হয়ে যায় কি হলো,কি হলো ওর।

হঠাৎ করেই সবার কান্নায় চৌধুরী বাড়ি এলোমেলো হয়ে যায়।

মনজুরা দৌড়ে গিয়ে পানি নিয়ে আসে।

পানির ঝাপটা দেয়ার পরেও অপূর্বর কোন জ্ঞান ফেরে না। হাতের পাল্স পর্যবেক্ষন করলে তা নিস্তেজ।

শ্রাবন, এ্যাম্বুলেন্স কে ফোন করে।

কিছুক্ষণ এর মধ্যে এ্যাম্বুলেন্স আসে।

ঢাকা ,পিজি হাসপাতালে অপূর্ব কে নিয়ে যাওয়া হয়।

অর্পা,জয়া অঝরে কাঁদতে থাকে।

শ্রাবন দেয়ালের সাথে পিট ঘেষে দাড়িয়ে আছে। চোঁখের কার্নিস দিয়ে পানি পরছে।

জাহাঙ্গীর ভরা গম্ভীর মুখ নিয়ে বসে আছে।

কোন অজানা চিন্তায় যেন সে বিভোর।এলিজা হাসপাতালের মেঝেতে বসে বসে ফোপাচ্ছে।

অপূর্বর ,চেকাপ করে বেড়িয়ে আসে ডাক্তার , ইব্রাহিম।

ডা: ইব্রাহিম, চৌধুরী বাড়ির পারিবারিক ডাক্তার ।

ডাক্তার বেড়িয়ে আসার সাথে সাথে এলিজা কাঁপা কন্ঠে বললো, কি হয়েছে ওনার ?বলুন না কি হয়েছে?

সবাই ডাক্তারের কাছে চলে আসে। ডা: ইব্রাহিম বললো, তেমন কিছু না হার্ট দুর্বল হয়ে গেছে।

বলতে পারেন,মিনী এ্যাটাক। জাহাঙ্গীর কাপা কণ্ঠে বললো,আমার ছেলের কিছু হবে না তো ?

বললাম তো চিন্তার কোন কারন নেই। ইনজেকশন দিয়ে দিয়েছি ৪৫ মিনিট পর জ্ঞান ফিরবে।তখন দেখা করবেন।

ইব্রাহিম: চৌধুরী সাহেব আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে।

বলেই জাহাঙ্গীর কে নিয়ে চলে যায়।

শ্রাবন পরোক্ষ করলো ডা: ইব্রাহিম এর ব্যাপার টা কেমন জানি মনে হলো। কি বলতে নিয়ে গেলো তাকে। খুব অদ্ভুত মনে হলো।

শ্রাবন তাদের অনুসরণ করে।

হাসপাতালের এক কোনে বসে দুজন কথা বলছে।

পরিষ্কার কিছু শোনা যাচ্ছে না।
তবুও কিছু শোনার চেষ্টা করলে , শ্রাবন শুনতে পায় জাহাঙ্গীর বলছে,আপনি কাউকে এই কথা বলবেন না। * কখনো ই না।শ্রাবন ভ্রু কুঁচকে বিড়বিড় করে বললো,কি বলবে না, কিসের কথা বলছে,তবে কি অপূর্বর খারাপ কিছু হয়েছে।
এসব ভাবতে ভাবতে শ্রাবন সেখান থেকে পদত্যাগ করে।

৪৫ মিনিট পর——–-

অপূর্ব,টিপ টিপ করে চোখ খুলছে। চারপাশে গোলাকার ভাবে সবাই বসে আছে ।

অপূর্ব : কি হয়েছিল আমার, আমি এখানে কেন?

সবাই ধুব্রে অপূর্ব কে পরোখ করছে।

তৎক্ষণাৎ অপূর্ব অস্থির ভাবে বলে উঠলো,

সাদিক , সাদিক ,সাদিক কোথায়। সাদিককে কোথায় নিয়ে গেছে ওরা। বলেই হাতের ক্যা,মো টা ছুটাতেই এলিজা বা ,পাঁজরের উপর হাত দেয় বললো,শান্ত হন , আপনার শরীর ঠিক নেই। আপনার এই মুহূর্তে উত্তেজিত হওয়া ঠিক নয়।

এলিজার নরম গলায় কথা গুলো শোনা মাত্রই অপূর্ব শান্ত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর হাসপাতালে হাজির হয়

একজন কনস্টেবল।

কনস্টেবল কে দেখেই অপূর্ব সোয়া থেকে উঠে বসে পরে।

আপনি এখানে সব ঠিক আছে তো?

কনস্টেবল বললো,

স্যার – রাজনীতিবিদ জুনায়েদ খান, এর ছেলে মুন্না, ২ মাস আগে নিখোঁজ হয়েছিল তার লা,শ পাওয়া গেছে।

আর তার লা,শের উপর চামড়া গুলো নিকৃষ্ট ভাবে কে’টে লিখে দেওয়া হয়েছে..

অপূর্ব আতংক ভরা কন্ঠে প্রশ্ন করলো,কি লেখা আছে?

কনস্টেবল: আমার পাপের সম্রাজ্যে যে একবার আসে যে আর হৃদয় নিয়ে ফিরে যেতে পারে না। যেতে হয় হৃদয়হীন ভাবে।তাছাড়া অবাক

করা বিষয় হলো মুন্নার শরীর থেকে হার্ট বের করে নেয়া হয়েছে।

জয়া,শ্রাবন ,অর্পা সহ সবাই হতভম্ব হয়ে যায়।

জয়া বললো,কে এই জঘন্য খু'নি। সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি , লুকিয়ে থাকা কিলা,রটি যেন খুব শীঘ্রই ধরা পরে। আর যেন কোন মায়ের বুক খালি না হয় ।

মনজুরা বললো,

সন্তান হারানোর ব্যাথা খুব তিঘ্ন তাইনা আপা?

মনজুরার বলা বাক্যে গুলো অপূর্ব কে কিছু ভাবায় তবুও এড়িয়ে যায়।

২ দিন পর——-

চলন্ত গাড়ি থেকে বাহিরের ভরাকান্ত,উষ্ন , চিত্র গুলো দেখতে অসাধারন লাগছে।

জানালা দিয়ে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। রোদের উজ্জ্বলে ধুলিকনা গুলো দেখা

যাচ্ছে। আজকের সূর্য টা একদম নতুন। প্রকৃতি গুলো আজ সতেজ। ওনাকে অনেক মনে পরছে ।

বলেছিলাম আমার সাথে তিলকনগর- চলে আসেন। কিছুদিন থাকলে মন টা হয়তো ভালো হবে। বন্ধু হারানোর বেঁদনা তাকে গ্রা'স করেছে ।

তবে সে বললো আজকে রাতে আসবে । থানাতে কি কাজ পরেছে।

তাই এখন আসতে পারলো না। আমার চোখে সেরা একজন মানুষ, আমার স্বামী। সকলকে নিয়ে কত চিন্তা তার।

পবিত্র একজন মানুষ।

এলিজা এসব ভাবতে ভাবতেই গাড়ি এসে থামে আলি বাড়ির সামনে।

এলিজা গাড়ি থেকে নামতেই দৌড়ে আসে পাখি। হুহু করে কান্না শুরু করে দেয়। কতদিন পর সে তার

প্রিয় বোনকে দেখছে।এলিজা কে ভেতরে নিয়ে যেতে ই দেখে সেই পাগলি মেয়েটিকে দেখে। যেই মেয়েটিকে দেখেছিলো অচিন পাহাড়ে। হাতে একটি ছবি ।

এলিজার দেখে মনে কৌতূহল জাগলো । মেয়েটির সাথে কথা বলবে বলে মনস্থির করলো।

এলিজা: পাগলি টা কে রে এলাকাতে আগে দেখেনি?

পাখি : গত ২-৩ বছর ধরেই এই পাগলি মেয়েটা হাতে একটা কি নিয়ে ঘুরে। কাউকে ধরতে দেয়না।

এলিজা: রাতেও কি এদিকে থাকে ?

পাখি হ্যা সুচক মাথা নাড়ে।এলিজা পাগলি মেয়েটিকে পরোখ করতে করতে বাড়ির ভেতরে চলে যায়।

জয়তুন এলিজাকে দেখে খুশিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে। হুহু করে কান্না শুরু করে দেয়।

জয়তুন : এতদিন পর মামিকে মনে পরলো ? অনেক বড় হয়ে গেছিস তাই না। মামিকে ছেড়ে দূরে থাকতে শিখে গেছিস ।

বলেই এলিজার সাথে আলিঙ্গন করে নেয়।

জয়তুন নিজের লালন করা,দেশি মুরগি জ,বাই করে, বিভিন্ন কিছু রান্নার আয়োজন করে সাথে এলিজাও।

রাতে অপূর্ব আসবে তাই ভালো মন্দ তো রান্না করছে।

রাত ৮ টা —

এলিজা উঠানে পায়চারি করতে থাকে। কোন অজানা চিন্তায় বুকের ভেতর চিন চিন করছে।

শান্তি পাচ্ছি না কোনভাবে।খুব অসহায় লাগছে। মা বাবাকে , ভাইকে অকাল ভাবে হারিয়ে ফেললাম।

এক হতভাগা নারী আমি।

এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পরে শায়ান এর কথা।

সেদিন শায়ান,বার বার জিজ্ঞেস করছিলো ,ভালো যদি নাই বেসেছিলে তবে আমার ডাকে সাড়া কেন দিয়েছিলে।

শায়ান এর ভুল টা ভাঙাতে পারিনি।

সেদিন নিমতলা যে আমি অন্য কারো জন্য গিয়েছিলাম । ওনার

জন্য নয়। বলেই ভারি একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেললো এলিজা।এলিজা মনস্থির করলো আজ এক্ষুনি একবার শায়ান দের বাড়ি যাবে। অপূর্ব আসার আগে।

শায়ান বাড়ি না ঢাকা তা জানা নেই। তবে বাড়ির অন্য কারো কাছ থেকে খোঁজ তো নিতে পারবো।

হয়তো এখন বিয়ে করেছে । শুখে সংসার করছে। তবুও কেন জানি মন টা কুহ ডাকছে।

পাখি কে সাথে নিয়ে একবার যাওয়া যাক।

ততক্ষণে উনি আসুক।রাত ৯ টা

——

অপূর্ব তিলকনগর-এ চলে এসেছে। গাড়িটা এসেই তিলকনগর স্টেশনে থামে।

আজকে অপূর্ব বাসে করে এসেছে। গাড়ি দুটো গ্যারেজে। তিলকনগরে কাউকে সন্ধ্যার পর আর রাস্তা ঘাটে দেখা যায় না। নির্জন হয়ে যায়। চারদিক কি শুনশান। নিরব পরিবেশ। এমন মনে হচ্ছে এখনি কোথাও থেকে জন্তু, জানোয়া,র এসে হানা করবে।

গ্রাম টা এত নির্ঝন কেন কে জানে।
এসব ভাবতে ভাবতে অপূর্ব নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকে।
হঠাৎ ই চারদিক থেকে শীতল হাওয়া বইতে শুরু করেছে।
আশেপাশের শশ্য শ্যামল গুলো নেতিয়ে যাচ্ছে ।
হঠাৎ ই চোখ পরে রঞ্জনার কবরের দিকে।

অপূর্ব যা দেখলো তাতে তার মাথার উপর আকাশ টা ভেঙ্গে পরে। পৃথিবীর সমস্ত ভার তার শরীরের উপর আচরে পরে। অপূর্বর বুকের ভেতর কম্পন শুরু হয়।

রঞ্জনার কবরের কাছে সূর্য আর শ্যামলী ,

দুজনে কথা বলতে বলতে এমন ভাবে ইঙ্গিত করছে যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাসিল হয়েছে।

কিন্তু সূর্য তো বলেছিলো ও ওর মামা বাড়ি তবে এখানে কি করছে। তবে কি আমাকে মিথ্যা বলেছে।

অপূর্ব ঘাপটি মেরে বসে পরে। গাছের আড়ালে।আজ দেখতেই হবে এরা কি করছে।

দু'জনে মিলে কোথাও যাচ্ছে।আমি ও ওদের পিছু পিছু যাই।

হাঁটতে হাঁটতে, ওরা দুজন পৌঁছালো রুশরাজ্যে।

আমি আরো অবাক হই ওরা ওখানে কেন।

রুশরাজ্যে অতিক্রম করে ওরা চলতে শুরু করে ঝোপঝাড় এর ভিতরে।

গহিন অন্ধকারে কি করছে ওরা। আমি কি ঠিক দেখছি নাকি হ্যালোসোলেশন হচ্ছে।

পিস্তল টা বের করে আমিও ঢুকে পরি ঝোপঝাড়ে

, কিন্তু হঠাৎ করেই দুটো মানুষ গায়েব কোথাও নেই।

কোথাও কোন পায়ের শব্দ নেই। কোথায় গেলো?নাকি আমি বন্ধু হারানোর বেঁদনায় হয়তো উল্টো পাল্টা দেখছি। ব্রেনে চাপের জন্য কি হ্যালোসোলেশন হচ্ছে। অনেকক্ষন খোঁজার পর ও ওদের হদিস পেলাম না।

হয়তো মনের ভুল।

অপূর্ব এসব ভাবতে ভাবতে, উল্টো দিকে রওনা,হয়। তবে কি আমরা ভাবনা ভুল নাকি যা দেখেছি সব সত্যি আর যদি সত্যি হয় তবে কি লুকোচ্ছো সূর্য –এলিজা পাখিকে নিয়ে শায়ান এর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। যেতে যেতে ভয় ও হয়। শায়ানের বাবা যে রাগী মানুষ যদি কিছু বলে। তবুও সেদিন জন্য

শায়ানের জবাব দিতে পারিনি যা আজকে দিতে ইচ্ছে করছে।

শায়ানদের বাড়িটা পুরো শুনশান কোথাও কেউ নেই ।আমি দরজায় করা নাড়লাম। অনেকক্ষন অপেক্ষা করলাম।কেউ আসছে না। অনেকক্ষণ পরে দরজা খুললো শান্তা শান্ত আমাকে দেখেই চমকে উঠে। চোখের কোণে কোথাও যেন একটি ঘৃণার ছাপ দেখতে পেলাম।

শান্তা ভ্রু ভাঁজ করে একবার দৃষ্টি সরিয়ে নেয়।পূনরায় এলিজার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে কাট গলায় বললো,এলিজা আপু আপনি এখানে? এলিজা আমতা আমতা করে বললো, আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিবে না? এখানে বসেই উত্তর নিবে?" আসুন। ভিতরে গেলাম বাড়িটা অনেক বড় সাজানো গোছানো কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

এলিজা প্রশ্ন করলো, তোমার মা বাবা কোথায়?

শান্তা নিশ্চুপ মন নিয়ে হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিলো মায়ের ঘরের দিকে।

এলিজা ঘরের ভেতর প্রবেশ করে। দেখলো-

শায়ানের মা উইল চেয়ারে বসে আছে।

এলিজা কে দেখেই অস্থির হয়ে যায়। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। তার ভাব ভঙ্গীমা দেখে মনে হয় কিছু বলতে চাইছে। এলিজা শান্তার দিকে আড়চোখে তাকালো। শান্তা এলিজার চোখের দৃষ্টি বুঝতে পেরে বললো- মা কথা বলতে পারেনা। প্যারালাইসিস হয়ে মুখ,পা অবশ হয়ে গেছে।

এলিজা জিজ্ঞেস করলো,কাকু কোথায়??

শান্তা মাথা নিচু করে কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো-বাবা মারা গেছেন। হার্ট অ্যাটাক এ।

শুনেই মনের অজান্তে এলিজার চোখে পানি চলে আসে।

এলিজা শান্তা কে অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করলো,

শায়ান কোথায়??

শান্তা হুহু করে কান্না করে শুরু করে ।

“বলোনা তোমার ভাই কোথায়?

শান্তা আঙুলের ইশারায় বাহিরের দিকে দেখিয়ে দেয়।

এলিজা বাহিরে চলে আসে।

কোথাও তো কেউ নেই। এখানে কেন দেখালো।

শান্তা , একটা টর্চ নিয়ে, তাদের পারিবারিক কবর,স্থানে নিয়ে যায় এলিজাকে।

একটি কবর,রের দিকে দেখিয়ে বললো – ঐ যে ভাইয়া আপনার অপেক্ষায় শুয়ে আছে।

বলেই হাঁটুঘেরে বসে পরে শান্তা।

অঝরে কান্না শুরু করে।এলিজাও হাঁটুঘেরে বসে পরে ,

কাদো কাদো মুখে বললো- কি হয়েছিল শায়ানের ?

কিভাবে মারা গেলো?

শান্তা রেপিং করা একটা প্যাকেট দিলো এলিজার হাতে।

শান্তা: এটা আপনার জন্য ভাইয়া রেখে গেছে।

বলেই কান্না শুরু করে।

রেপিং করা প্যাকেটে খুলে দেখলো,

কিছু বেলিফুল এর মালা

আর একটা চিরকুট।

চিঠিটায় লেখা ছিল __

___ প্রিয় ___ এলিজাজানতাম তুমি কোন না কোনদিন আমার খোজে আসবে ।যেদিন তুমি আমার এই চিঠিটা পাবে ।আমি জানি সেদিন আমার জন্য তোমার মনের অজান্তেই অন্তত দু ফোটা চোখের পানি পরবে।

যখনই শুনেছি ঘর বেঁধেছো অন্য কারো থমকে গিয়েছিল আমার হৃদয়। পূরো পৃথিবীটা যেন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

শেষ হয়ে গিয়েছিল আমার জীবনটা। আমি পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি সেদিন, আমার জীবনের পথ চলা এখানেই শেষ,যেদিন তোমাকে দেখি,দাড়িয়ে আছো অন্য কারো

সাথে ।সেদিন থেকে আমার পায়ের হাটার শক্তি আর ছিল না।

যেদিন দেখেছি তোমাকে অন্য কারো সাথে হাঁসতে, বিশ্বাস করো আমার হাসিটা ওখানেই শেষ বারের মতো বিলীন হয়ে গেছিলো।যখন ই ভাবি, তোমার নিঃশ্বাস পরছে অন্য কারো বুকে, বিশ্বাস করো আমার নিঃশ্বাস টা সেদিন আটকে আসছিলো। যখন ই শুনেছি তুমি বেঁধেছো অন্য কারো

সাথে ঘর , আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, আমার ঘর বাধার স্বপ্ন যে এখানেই শেষ। যখনই ভাবি তোমার হৃদয়ের স্পন্দন,পাচ্ছে অন্য পুরুষ। তখন আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম আমার হৃদয়ের স্পন্দন এখানেই বন্ধ হয়ে গেছে।

কেন গিয়েছিলি আমায় একা করে,পরের ঘরে।

তুমি জানতে না কতটা কষ্ট হবে আমার।
ঐ এলিজা শুনো না ভারি কষ্ট হয় জানো খুব কষ্ট হয়। প্রিয় মানুষ হারানোর বেদনা যে কতটা নিষ্ঠুর তা তুমি হয়তো কোন না কোনদিন বুঝবে।
তবে আমি চাই সেই দিন তোমার জীবনে না আসুক।

আমার জীবনের প্রতিটি সুখ তোমার হয়ে যাক।শুনছো , এলিজা। তোমাকে আমি এতটা ভালোবেসেছিলাম যে বেঁচে থাকতে যে তোমাকে ঘৃণা করতে পারবোনা। বেচে থাকতে যে জীবনে প্রতিটা মুহূর্তে তোমাকে ঘৃনা করে বাঁচতে হবে। সেই জীবন রেখে কি হবে।

বেঁচে থেকে তোমাকে ঘৃনা করার চেয়ে ভালোবেসে মৃত্যু কে বেঁচে নিলাম।

ওহে পৃথীবি বলে দিও তাকে। বেঁচে থাকতে যে আমি আমার ভালোবাসার মানুষ টিকে ঘৃনা করতে পারবো না, তাই মৃত্যু কে বেঁচে নিয়েছি।

।

তাই চলে গেলাম আমি পরপারে।

ঐ এলিজা শোনো না! পরপারে দেখা হলে কোন এক নিমতলায় আমি আবার তোমার জন্য অপেক্ষা করবো। সেদিন অন্তত আমায় গ্রহন করো।

ভালো থেকো আমার শখের সখী।

________ইতি

ব্যার্থ শায়ান___

এলিজা থম মেরে বসে পরে। খুব একটা উত্তেজনা দেখলো না

এলিজার মধ্যে। পাসান্ড মহিলি (মনে মনে ঘৃনা নিয়ে বললো শান্তা)

এলিজা খেয়াল করলো

কব,রের পাশে বসে একটা মেয়ে গুন গুন করছে।

উকি মেরে দেখলো। এই সেই পাগলি মেয়েটি।

যেই মেয়েটিকে অচিন পাহাড়ে দেখেছিলো।,আজকে সকালেও দেখেছে। কে মেয়েটি?

এলিজা: এই পাগলি মেয়েটা কে?
শান্ত কাপা কণ্ঠে বললো,- ইনি মীরা।যিনি আমার ভাইকে ভালোবাসতো। যেদিন শুনেছে ভাইয়া আ,ত্মহত্যা করেছে সেদিন তার ঘরের সিড়ি থেকে ছিটকে পরে গিয়ে ব্রেনে আঘাত পায়।
আপনার জন্য জন্য আমার ভাইয়ের জীবন শেষ হয়েছে।

ভাইকে যেদিন বাবা – মা ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত লা,শ অবস্থায় দেখেছে, সেদিন ই বাবা হার্ট অ্যাটাক করে মৃত্যু বরন করেন।এসব শোক সহ্য করতে না পেরে মা স্ট্রোক করে।

এলিজা মিরার কাছে গেলে শুনতে পায়। ফিস ফিস করে বলছে।

মিরা: আমাকে ভালোবাসলে কি হতো। আমাকে ভালোবাসলে হয়তো জীবন টা থেকে যেতো।

মিরা সেদিনের পর থেকে এই দুটো বাক্যই বলতে পারে।

ঢাকা_____

জাহাঙ্গীর ঘরে সব তছনছ করে ফেলছে।

দেয়ালে থাকা পেইন্টিং গুলো ভেঙে ফেলছে।

যেই সামনে আসছে তাকেই পেটাচ্ছে।এসব করছো কেন ? শান্ত হও বলতেই জয়ার গালে ঠাস ঠাস

করে থাপ্পড় দিয়ে ফেলে দেয় জাহাঙ্গীর।

কর্কট মেজাজে, উত্তেজনায় বলে উঠলো,

কেন যেতে দিলে অপূর্ব কে তিলকনগর ।

বারন করেছি না। আমার ছেলেকে আমার কাছ থেকে দূরে সড়ানোর।

জয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললো-

অদ্ভুত আচরণ কেন করছেন?

জাহাঙ্গীর জয়ার দুই সিনায় শক্ত করে হাত দিয়ে, অস্থিরতা কণ্ঠ নিয়ে বলে উঠলো

জাহাঙ্গীর: তুমি কি কিছু জানো না? যদি ওর কিছু হয়ে যায়? যদি সবটা জেনে যায়।

বাড়ির সকলে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কি বলছে জাহাঙ্গীর কি জানবে!

শ্রাবন প্রশ্ন ছুরে দিলো

শ্রাবন: কে ওর কি করবে? ওখানে গেলে সমস্যা কি?

জাহাঙ্গীর আতংকিত স্বরে আমতা আমতা করে বললো, বড়দের ব্যাপারে নাক গলাতে নেই। বলেই দ্রুত পায়ে হেঁটে উপরে চলে যায়......শ্রাবন ঘরের এক কোনেতে বসে গিটার বাজাচ্ছে। তবে গিটারের সুর ভুলে গেছে। গানের কোন কলি

তার মনে পরছে না। কারন তার বড় চাচার অদ্ভুত আচরণ।

কি বলতে চেয়েছিলেন তখন।বলতে গিয়েও বলেনি।

অপূর্ব কে কেন দূরে সরাতে চান না?ডক্টর ইব্রাহিম তাকে গোপনে কেন ডাকলেন? হাজার টা প্রশ্নে শ্রাবন এর চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

কাকিমাকে তখন জিজ্ঞেস করলাম। উনি তার উত্তরে বললেন, একমাত্র ছেলে তো তাই চিন্তা করে। তাছাড়া অসুস্থ শরীর। হার্টে একটু সমস্যা। কাকিমার কথায় আমি সত্যতা পেলাম না। তাদের এরকম আচরণ আমার ভালো লাগছে না।

কালকেই আমি তিলকনগর যাবো। কয়দিন ছুটি পেয়েছি। ছুটি টা তিলকনগর কাটাবো।

এসব ভাবতে ভাবতে শ্রাবন নতুন করে সুর ধরে।

জয়া খাটের উপর বসে পান খাচ্ছে।

বিড়বিড় করে বললো,

পাপ যে বড়ই অদ্ভুত যাকে ছোয় তার জীবন শেষ করে দেয়।

তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় মনোরা।হাতে পানির গ্লাস। জাহাঙ্গীর কে পরোক্ষ করলো।

জাহাঙ্গীর, কালো রঙের , রাতের পোশাক পরে,চেয়ারে বসে, দোল খাচ্ছে। হাতে একটা সিগার। চোখ বুঝে মনের গহিনে কি যেন ভাবছে। লম্বা শরীর। চাপ দাড়ি।চোখ গুলো সবসময় লাল থাকে। যে কেউ ভয় পায় তাকে। তবে আজকের আচরণ সবাইকে অনেক ভাবিয়েছে।

মনোরা চলে যায় রান্না ঘরে।

একা একা বকবক করতে থাকে। বাড়িটা একদম নিঝুম হয়ে গেছে। এখানে আর কাজ করতে ভালো লাগছে না।

পাশ থেকে মনজুরা বলে উঠলো, কখনো কখনো আমাদের অনেক কিছু করতে ইচ্ছে করে না। তবে তাও বাধ্য হয়ে করতে হয়।মনজুরার কথা গুলো অন্যরকম তবুও মনোরা এড়িয়ে গেলো।

মনজুরার চাল চলন বরাবরই অন্য রকম।
অপূর্ব ধিরে ধিরে হেটে আসছে আলি বাড়ির উদ্দেশ্যে। বার বার এদিক সেদিক দেখছে। হালকা হাওয়াতে গাছের পাতা গুলো নড়ছে।
কেমন জানি মনে হচ্ছে সব রহস্যের দড়িটা আমার হাতের নাগালে কিন্তু আমি ছুঁতে পারছি না।

সূর্য কে সন্দেহ করে হয়তো আমি ঠিক করছি না।

এসব ভাবতে ভাবতে, সামনে এগোতেই খেয়াল করলো অপূর্বর সামনে থেকে ৩ জন মহিলা যাচ্ছে। খুব দ্রুত পায়ে।

দেখে মনে হচ্ছে শহরে মার্কেট করতে গিয়েছিলো।

আমি পাত্তা না দিয়ে নিয়ে পাশ কেটে যেতেই , তাদের একটা কথা আমার কানে আসলো।

বাক্যটা এমন ছিলো।বাবর সিকদার বেঁচে থাকলে আজ এসব হতো না।

আমি চমকে উঠলাম এই বাবর সিকদার টা আবার কে?

সবকিছু মাথা থেকে ফেলে আমি আলি বাড়ির উদ্দেশ্যে হাটা শুরু করি।

এলিজাদের ঠিক ঘরের সামনে এলেই আমি ভেতর থেকে চেনা গলার আওয়াজ পাই।

কয়েকজন মিলে আড্ডার আশর বসিয়েছে। আমি দরজায় কড়া নাড়তেই পাখি দরজা খুলে দেয়।

তারপর আমি যা দেখলাম। আমি সম্পূর্ণ ভাবে বিষিন্নত হয়ে যাই। অবাক হয়ে যাই।

অবাক করার মানুষটি আর কেউ নয় সূর্য আর শ্যামলী।

সবাই মিলে আমাকে দেখা মাত্র ই খিল খিল করে হেসে উঠে।সূর্য: কি ভাই একদম চমকে দিলাম তো । খুব মনে পরছিলো তোদের কথা। হঠাৎ জানতে পারি সাদিক আর নেই। তাই মামা, বাড়ি থেকে খবর পেয়ে সোজা চলে আসি তোর

কাছে। কেমন সারপ্রাইজ দিলাম বল??

অপূর্ব ভাবলো,উফফফ তারমানে আমার হ্যালোসোলেশন ই হচ্ছিল। ছিহ আমি দ্বিতীয় বার সূর্য কে সন্দেহ করলাম একদমই উচিত হয়নি।

ভাবনা ছেড়ে বললো,হুম সত্যি ই চমকে দিয়েছিস। আমি মনে হয়

তোমাদের আড্ডা মহলে আসতে দেরি করে ফেলেছি।

পাখি পানি এনে দেয় অপূর্ব কে।

অপূর্বর চোখ অস্থিরতা। কাকে যেন খুঁজেছে।

সবার বুঝতে আর বাকি নয়।

সূর্য গলা পরিষ্কার করে বললো,আমাদের বউমনি রান্না ঘরে । যান সাক্ষাত করে আসেন।

অপূর্ব মৃদু হাসলো।এলিজা-বসে বসে রুটি বানাচ্ছে। সব রান্না হয়ে গেছে। মামির শরীর ভালো না তাই ভাত খাবে না। বললো রাতে রুটি খাবে। অপূর্ব গিয়েই পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে।

বললো, আমার মহারানি কি করছে? আজকে সারাদিন আপনাকে ছাড়া থাকতে যে অনেক কষ্ট হয়েছে। বড্ড অসহায় লেগেছে।

এলিজা: সুযোগ পেলেই জড়িয়ে ধরেন।এত শক্ত করে ধরলে যে আমার হার গুলো ভেঙে যাবে।

অপূর্ব এলিজাকে ছেড়ে দিয়ে একটা পিরিতে বসে পরে।

অপূর্ব এলিজার হাত থেকে ধব করে বেলুন , টা নিয়ে নেয়।

অপূর্ব: আজকে আমি রুটি বানাবো। আমার সামনে তুমি কেন কষ্ট করবে।

তোমার কোন কোন কষ্ট যে সহ্য হয়না।এলিজা : বাববা,হা এত মায়া , যদি হঠাৎ আমি হঠাৎ মরে যাই ? অপূর্ব রাগান্বিত হয়ে বললো,এমন বাক্য তুমি কোনদিন উচ্চারন করবে না। আমি থাকতে তোমার কিছু হবে না ।

অপূর্ব আনমনে রুটি বানাচ্ছে। এলিজা মায়ার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কি অপূরূপ দেখাচ্ছে। খাড়া খাড়া কালো চুল। কালো চাপ দাড়ি। জোড় ভ্রু। পরনে সাদা সার্ট।

অপূর্ব : কি দেখছো ওমন ভাবে !! নজর লেগে যাবে যে।

এলিজা ভাবলো,যাব বাবা উনি কিভাবে বুঝলেন আমি তাকিয়ে আছি ওনার দিকে?

অপূর্ব : তুমি মনে মনেও যে খুব জোড়ে কথা বলো।

এলিজা মৃদু হেসে খেয়াল করলো অপূর্বর রুটির দিকে। অপূর্বর রুটি গুলো দেখে এলিজা খিল খিল করে হেসে উঠে ।

এলিজার হাসি শুনে। ঘর থেকে রান্না ঘরে চলে আসে সবাই।

সূর্য অট্ট হাসি দিয়ে রুটি গুলো হাতে নিয়ে দেখাচ্ছে। আর বললো,এই দেখো আমার বন্ধু আসামি ধরার পাশাপাশি ভালো রুটিও বানাতে

পারে। একটা হয়েছে ত্রিভুজ, একটা ঢাকার মানচিত্র, একটা তিলকনগর,একটা বাংলাদেশের মানচিত্র।

সূর্যর কথা গুলো শুনে। এলিজা , খিল খিল করে হেসে উঠে ।

অপূর্ব মাথা চুলকাতে চুলকাতে, এলিজাকে পা থেকে পরোক্ষ করছে।

সোনালী রঙের শাড়ি পরনে। চুল গুলো বেনুনি, ভি-কার থুতনি চোখ গুলো হরিনের মত ডাগর ডাগর।

যে কেউ এই আসিতে পাগল হয়ে যাবে।

অপূর্ব উল্টো করে এলিজা কে সবার সামনে জড়িয়ে ধরে।

এলিজা বললো,সবাই দেখছে ছারুন না

অপূর্ব: তোমার মুখের ঐ হাসি দেখার জন্য, আমি হাজারো রুটিতে মানচিত্র আঁকতে রাজি।

এলিজা: আপনি না পূরাই পাগল হয়ে গেছেন।অপূর্ব: পাগল তো আমি সেদিন ই হয়েছি। যেদিন আধার রাতের জোসনার আলো নিয়ে এসেছিলেন।ম্যাডাম ,,

সূর্য;; ও ভাই আমরা এখানে ভুলে যাস না।

অপূর্ব এলিজা-কে ছেড়ে দেয়। বললো,

তোদের মত বন্ধু আর শালি থাকলে ঠিক মত প্রেম ও করা যাবে না।

পরদিন সকালে ____সূর্যের ঝলকে ঝলকে যেন নতুন এক দিনের আগমন ঘটেছে। কুয়াশায় ভরা সকাল। শীঘ্রই আগমন নিয়ে আসবে ফাল্গুনের অনৈসিক ছোঁয়া। মাঘের শুরুটাও যেন মুগ্ধকর।

চারদিকে পাখিদের কিচিরমিচির আওয়াজ।

মোরগের ডাকে ঘুম ভেঙে যায় এলিজার।

পাখি টিউশনে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। সামনেই তার মেট্রিক পরীক্ষা।

আর মাত্র দের মাস বাকি। বাকি। দের মাস ও যেন পরিক্ষার প্রস্তুতির জন্য খুবই ই কম সময়।

ঝটপট তৈরি হয়ে টিউশনে বেড়িয়ে পরে।

এলিজা সবার জন্য খাবার তৈরি করতে থাকে।

সকাল ১১ টা____ পাখি সহ তার দুই বান্ধবী হাতে বই নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে হাটছে।

শ্রাবন হিরো স্প্লেন্ডার প্লাস বাইক , সাথে গিটার নিয়ে,

হিরোর মত ভাব নিয়ে আলি বাড়ির উদ্দেশ্যে যেতেই। হুট করে বাইকটা থামিয়ে দেয়। চোখ পরে রাস্তায়। একটা কলম পরে আছে। কলমটা বেশ দামী। কোন সে যে,কলম না। রোদের আলোতে ঝলকাচ্ছে। এটাতে স্বর্নের প্রলেপ দেয়া। খুব অদ্ভুত সুন্দর।আশেপাশে পরোখ করলো। কলমটা কার। হঠাৎ ই সামনে দেখতে পায় । তিনজন

মেয়ে হেলেদুলে হেঁটে যাচ্ছে। হয়তো ওদের ই হবে।

বাইক চালিয়ে সোজা মেয়েদের সামনে গিয়ে দারায়।

পাখি হতভম্ব হয়ে থমকে দাঁড়ায়।

পাখি: কে আপনি ? এরকম হুট করে এসেই কেন আমাদের সামনে দাড়ালেন? এখনি দুর্ঘটনা ঘটতো।

শ্রাবন : এই যে পিচ্চি। তোমাদের সামনে আশার কোন ইচ্ছা ই নেই

ওকে। আমি শ্রাবন। কোন মেয়েদের পেছন ঘুরি না বরং মেয়েরাই ঘুরে। এই যে একটা কলম পেলাম। হয়তো তোমাদের কারো । তাই তো দিতে আসলাম।

পাখি আতংক চোখে কলমটি দেখে বললো, এটাতো আমার কলম। কোথায় পেলেন?

শ্রাবন: পিচ্চি,মেয়ে পিচ্চিদের মতই থাকো।বেশি পেকো না।

বলেই বাইক চালিয়ে চলে যায়।

পাশে থাকা মেয়ে দুটো বলে উঠে ছেলেটা কি সুদর্শন তাইনা।

পাখি কিছু বললো না।

কলমটি বইয়ে ঢুকিয়ে নেয়।

পাশের মেয়ে দুটোর একজন বললো,

কলমটা দেখছি স্বর্নের মত ঝলকাচ্ছে! এত দামী কলম কোথায়

পেলি। আর এগুলো তো কয়েক বছর পুরানো কলম।

পাখি: এটা আমার দুলাভাই দিয়েছে।

সূর্য, অপূর্ব রাস্তায় হাটছে । বিভিন্ন কেস নিয়ে কথা বলছে।অপূর্ব সূর্য কে উদ্দেশ্য করে বললো,তুই কি শুনেছিলিস! রাজনীতিবিদ জুনায়েদ আংকেল এর ছেলে মুন্নার কথা। ফরেনসিক ল্যাব এ ওর লা,শ

পাঠানোর পর ওর পেট থেকে আমি একটা চিপ (মেমোরি)পেয়েছি
সেই চিপে একটা ভিডিও আছে। কিন্তু এখন ও ভিডিও টি দেখিনি......
আমাদের এটা রহস্য উন্মোচন এর এভিডেন্স হতে পারে.....
সূর্য ; পেটে মোমেরি কি বলিস?......
সকাল থেকে সব কাজ আমাকে করতে হচ্ছে।

বয়স বাড়লে নাকি মানুষ অবসরে থাকে। কিন্তু আমার পোরা কপাল। বাড়ির সব কাজ আমাকে করতে হচ্ছে। আজকে আবার মুজিবুর আসবে।

সকাল থেকে মনজুরা কে দেখতে পাচ্ছি না কোথায় যে যায়। মাঝে মধ্যেই গায়েব হয়ে যায়। মনোরা সেও বাড়িতে নেই। আমার বাড়ির কাজের লোকেরাই এমন অদ্ভুত হয়।

সকাল বেলা কাজে অসস্থি হয়ে একা একা বক বক করছে জয়া।(মুজিবুর চৌধুরী জাহাঙ্গীর এর ছোট ভাই , মমতাজ বেগম তার স্ত্রী। তারা শ্রাবন এর মা বাবা ,তারা বিদেশে ব্যাবসা করেন।)

জয়া কাজ করতে করতে বললো,খোকার বাবা আজকাল যে কি হয়েছে সেই ভালো জানে।

কাউকে কিছু না বলেই হুটহাট বেড়িয়ে পরেন।
ছেলেকে যে এক মুহুর্তের জন্য ও চোখের আড়াল করতে চান না।
অর্পা: মা বাবা ভাইয়া কে কি আমার থেকে ও বেশি ভালো বাসে?
জয়া কিছুটা কর্কট কণ্ঠে বললো,
বাবা সবাইকেই ভালো বাসে। জানিস না তোর ভাইয়ের কি সমস্যা।

অর্পা: তাহলে ভাইয়া পুলিশের চাকরি কিভাবে পেলো?

জয়া রান্না ঘরে কাজ করতে করতে বেখেয়ালি ভাবে উত্তর দিয়ে দেয়। বললো,খোকার স্বপ্ন ছিলো পুলিশ হবে। তোর বাপের টাকার জোড়ে ....জয়া আতংক মুখে মাঝপথে কথা থামিয়ে দেয়।

অর্পা দ্বিতীয় বার কোন প্রশ্ন না করে টিউশন এর উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পরে।

অর্পা এবার মেট্রিক পরীক্ষা দিবে। তৎকালীন ঘরে উপস্থিত হয় মনজুরা।

মুনজুরার হাব ভাপ জয়াকে ভাবালেও এড়িয়ে যায়।কারন মনজুরা বরাবরই অদ্ভুত আচরন করে।

তবুও প্রশ্ন না করলেই নয়।

জয়া বললো,গিয়েছিলে কোথায় হাঁপাচ্ছো কেন? সাত সকালে সব কাজ আমাকেই করতে হলো।

মনজুরা বললো, হঠাৎ খবর পাই ছেলেটার শরীর খারাপ তাই দেখতে গেছিলাম। আপনি সরেন আমি সব করতেছি।

আজকাল সবার আচরণ কেমন জানি অদ্ভুত লাগে। জানি না কি হচ্ছে। নাকি সবই মনের ভুল। এসব

ভাবতে ভাবতে জয়া নিজের ঘরে চলে গেলেন।সকাল ১১ টা ______ জাহাঙ্গীর চলে আসে। সাথে একজন লোক। কারো বিয়ের উদ্দেশ্যে কথা বলছে।

জয়া সোফাতে বসে পান খাচ্ছে। জাহাঙ্গীর আর ঘটকটিও বসে পরে। জাহাঙ্গীর: বুঝলা খোকার মা আমি ভালো একটা সম্বন্ধ পেয়েছি। আমাদের অর্পার জন্য। বড় হয়েছে

মেয়েটা তাছাড়া চারদিকে বখাটে রা ভরে গেছে। আমার ও বয়স হয়েছে ভাবলাম মেয়েটার একটা ভালো পাত্রের হাতে তুলে দিতে পারলেই শান্তি।

জয়া : হঠাৎ করে মেয়ের বিয়ের কথা ভাবছো আর কিছুদিন পর তো ওর পরিক্ষা।

ঘটক: সমস্যা নাই। পরিক্ষা দেয়ার পরই তারা বিয়ে করবে।

জয়া আপত্তি স্বরে বললো,আমরা নিজেরা নিজেরা ওর বিয়ের কথা বলতে পারি না। ওর ভাই আছে। ওর ও একটা মতামত আছে।

জাহাঙ্গীর: তা এখন তো আমি কথা পাকা করছি না।ওরা আসুক তারপরে।

অপূর্ব কে শিঘ্রই চিঠি দাও। দ্রুত বাড়ি আসতে বলো।

বলো আমি ওর বোনের বিয়ে ঠিক করেছি।

বলেই ঘটক কে নিয়ে বাহিরে চলে যায়।

জয়া : পেয়েছে একটা কারন। এখন অপূর্ব কে আনার জন্য বেকুল হয়ে যাবে। জানি না কি চায় ইনি।হয়তো ছেলেকে এক প্রহরের জন্য চোখের আড়াল করতে চায়না। জয়া

এসব ভাবতে ভাবতে ছাদে চলে যায়।

অর্পা টিউশন থেকে আসার পরেই মেঝেতে ধপাস করে বসে পরে।

বই,খাতা, সব মেঝেতে পরে যায়।

পূরো শরীর থেকে ঘাম ঝরছে। অথচ এখন শীতের দিন।

জয়া , জাহাঙ্গীর,মনজুরা,সবাই দৌড়ে আসে।

জয়া : কি হয়েছে মা কি হয়েছে ।

অর্পা কোন উত্তর দিলো না।
হাঁপাতে থাকলো।দ্বিতীয় বার জাহাঙ্গীর প্রশ্ন করাতে উত্তরে ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো,
ঐ কালো লোকটা বর্ষা কে তুলে নিয়ে গেছে।
বলেই মেঝেতে ঠলে পরে।
জাহাঙ্গীর আহত কণ্ঠে বললো,
কিহহহহহহ বর্ষা তো ডিসি সাহেব

এর মেয়ে। শুনেছি বিয়ে ঠিক হয়েছে এমন সময় কে এমন করলো?

তিলকনগর—————— শ্রাবন বাইক চালিয়ে সোজা সূর্য অপূর্বর সামনে থামে।

শ্রাবন মৃদু হেসে বললো,কেমন চমকে দিলাম বল। তোকে ছাড়া মোটেও ভালো লাগছিল না তাই চলে আসলাম।

অপূর্ব ; হঠাৎ এখানে কেন আসলি? বাবা মাকে একা রেখে?

শ্রাবন: একা কোথায় আমার বাবাও চলে আসতেছে আজকের ফ্লাইটে।

সূর্য; তাহলে তো ভালো ই হলো। আমাদের অনুপস্থিত তাদের আর গ্রাস করবে না। একসাথে সময় কাটাতে পারবো।

শ্রাবন সহ সবাই ভেতরে চলে যায়।

অপূর্ব মনস্থির করলো, মুন্নার পেটে পাওয়া মেমোরি টি_ দেখতেই হবে। তবে সূর্য কিংবা শ্রাবন কে জানানো যাবে না। সবাই একসঙ্গে গেলে এলিজা-চিন্তা করবে।

ঢাকা—-পূরো শহর তোলপাড় ডিসি সাহেব এর মেয়ে কিডন্যা,প।

চারদিকে পুলিশ ফোর্স।

কন্ট্রোল রুম থেকে শুরু করে সবাই খোঁজাখুঁজি করছে।

কেউ কানা ফিসফিস করছে। হয়তো বিয়েতে রাজি নয় তাই পালিয়ে গেছে।

কেউ কেউ বলছে যদি কিডন্যা,প ই হয় তবে কার এত বড় সাহস যে ডিসি সাহেব এর মেয়ে কে কি,ডন্যাপ করবে!!

এদিকে বসে বসে চোখের পানি ফেলছে বর্ষার মা,।

ছেলেকে হারালো ৩ বছর হয় তার মাঝে মেয়েটাও নিখোঁজ। বলেই হুহু করে কাঁদছে।

তিলকনগর———–-

শ্রাবন পাখিকে আলি বাড়ি দেখে অবাক হয়ে যায়।

শ্রাবন: এই পিচ্চি মেয়েটা কে রে ? এখানে কেন।

অপূর্ব: ওয়ে এটা আমার একমাত্র শালিকা ভুলেও নজর দিবি না।

এলিজা সবার জন্য চা করে নিয়ে আসে।

জয়তুন বসে বসে কাঁথা সেলাই করছে।মেহমান আল্লাহর রহমত আমার ঘরটা রহমতে ভরে গেছে্ । (রমজান বললো মনে মনে)

সূর্য খেয়াল করলো অপূর্ব গহিন চিন্তায় বিভোর। হয়তো আশেপাশে যা হচ্ছে তা নিয়েই চিন্তা করছে।

তবে আমার ওকে এরকম গম্ভীর দেখতে ভালো লাগে না।

সূর্য : শ্রাবন গিটার নিয়ে এসেছিস,চল একটা গান ধরি।

শ্রাবন: সূর্যর অতিত টেনে একটা গান ধরি।

গান শুরু করে।

“*লাল শাড়ি পরিয়া কন্না
রক্ত আলতা পায়ে, আমার চোখের জ্বল মিশাইয়া দিলা

তুমি পার,,তুমি ফিরাও চাই,লানা একবার চইলা গেলা হায়,, জানি আজ রাতে হইবা পরের, আর ভাইবো না আমায়......চান্দের মত মুখটি যখন ভাসতো নয়ন জ্বলে,আদর কইরা মুইছা দিতাম গালে,,

ঘাটে আইসা পাশে বইসা জরাই তো এ বুকে ভুলবো আমি এই কথা কেমনে,,

গানটি এতটুকু পর্যন্ত গাওয়া শেষ করতেই।

সূর্য হাতের উল্টো দিকে চোখ মুছে।

বাহিরে চলে যায়।

অপূর্ব পরোক্ষ করলো।

এ যেন কোন অচেনা অজানা বেথা।

যা সূর্য কে গ্রাস করে রেখেছে।

রঞ্জনা কে হারানোর বেথায় ছেলেটা আজ ও ভুলতে পারলো না।

,, ভালোবাসা বড়ই অদ্ভুত,,

মানুষ টি চলে গেলেও মায়া যে পিছু ছাড়ে না,,
এসব ভাবতে ই এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলিজার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অপূর্ব।
যদি কোনদিন এই মানুষটি কে_ আমি হারিয়ে ফেলি তবে আমার যে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে যাবে।
না,এ আমি কি ভাবছি এলিজা কে হারাবো মানে। আমি থাকতে আমার

এলিজাকে কখনো কেউ কেরে নিতে পারবে না।

দিন ফুরিয়ে রাত হয়ে যায়।

__এলিজা জয়তুন এর মাথায় তেল দিয়ে দিচ্ছে।

শ্রাবন আনমনে গিটার বাজাচ্ছে।

পাখি বারান্দায় বসে বসে পড়ছে।

পাশের বারান্দা থেকে পেছনের ঝোপঝাড়টা পরিষ্কার দেখা যায়।

পাখির চোখ পরে ঝোপঝাড় এর দিকে। কেউ আছে ওখানে। কে লোকটা লুকিয়ে লুকিয়ে কি করছে? পাখি একা একাই চলে যায় লোকটিকে দেখতে। মনে মনে ভাবলো, যদি লোকটা চোর হয় তবে দুলাভাইর হাতে তুলে দিলে সে যে বাহবা দেবে।

যেই চিন্তা সেই কাজ।কোন টর্চ ছাড়াই চলে যায় ঝোপঝাড়ে।

চারদিকে জোসনার আলো।

চারদিক নিশ্চুপ কোথাও কোন মানুষ নেই শান্ত নদী।

কিন্তু অশান্ত আমার মন। কারন ঐ লোকটিকে যে ধরতে হবে।

পাখি, চুপি চুপি এগোলো।

কে সে, লোকটাকে ঠিক ভাবে পরোখ করতেই।

পাখি এক চিৎকার মেরে উঠে। সবাই পাখির চিৎকারে বেড়িয়ে ঝোপঝাড়ে চলে আসে। সবাই এসে পাখিকে অজ্ঞান অবস্থায় পেলো। জয়তুন কান্না শুরু করে।বললো, আবার ও মেয়েটা অসুস্থ হয়ে পরলো।

অপূর্ব পাজা কোলে পাখিকে ঘরে নিয়ে যায়।

শ্যামলী পানির ছিটা দিতেই। পাখি চোখ খুলে। সবাই আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করা শুরু করলো।

অপূর্ব : কি হয়েছে চিৎকার করলে কেন? ঐখানে কেন গেলে, ?

সবার একই প্রশ্ন।পাখি আতংক কণ্ঠে বলে উঠলো ,আমি একজনকে দেখেছি। তবে ওনার অবস্থা খুব নৃশং’স ছিলো। আর ওনাকে আমি খুব কাছ থেকেও দেখেছি।এর

আগেও কোথাও ওনাকে দেখেছি। কিন্তু কিছু মনে করতে পারছি না। বলেই দুই হাত দিয়ে মাথার চুল গুলো টানতে শুরু করে।পাখি মনে করার চেষ্টা করেও মনে করতে পারলো না।

অপূর্ব দ্রুত পায়ে হেঁটে ঝোপঝাড়ে চলে যায়।

কে আছে দেখতে । অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। কাউকে দেখলো

না। অপূর্বর মাথায় আকাশ টা ভেঙ্গে পরেছে। চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। কি হচ্ছে কিছু মাথায় আসছে না।

হঠাৎ অপূর্বর মনে পরলো মুন্নার পেটে পাওয়া চীপ(মেমরী) টার কথা।

অপূর্ব মনস্থির করলো। এখনি একবার শহরে যাবে। শ্রাবন এর বাইক টা ঘরের বাহিরে রাখা ছিলো।

কাউকে কিছু না বলেই বাইক নিয়ে বেরিয়ে পরলো।রাস্তা ঘাট পুরো ফাঁকা। কেউ নেই। অপূর্ব পথ ভুলে যাচ্ছে।

কি হচ্ছে ?এই রহস্য উন্মোচন করতেই হবে তার। তবে কিভাবে কোথাও কোন ক্লু নেই।

তৎকালীন সময় অপূর্বর চোখ পরে বাম দিক থেকে কেউ খুব জোড়ে দৌড়াচ্ছে ।

খুব অদ্ভুত মনে হচ্ছে। কে লোকটা দেখতে হয়।

লোকটা ক্ষেতের ভিতরে থাকায় অপূর্ব বাইক রেখে দৌড়াতে থাকে লোকটার পেছনে।

অপূর্ব: কে তুমি দাড়াও ! দাড়াও বলছি। নয় সুট করে দেবো।

অপূর্বর কথা লোকটির কানে যাচ্ছে না।অপূর্ব পিস্তল টা বের করে আকাশের উপর তাক করে সুট

করে। লোকটি হোঁচট খেয়ে পরে যায়।

হোঁচট খেয়ে লোকটি পড়ে উঠেই আবার দৌড়াতে শুরু করবে ঠিক তখনি ধরে ফেলে অপূর্ব।

লোকটি ভারি অদ্ভুত, কালো মুখোশ পরা। শরীর টা পূরো সাদা। অপূর্ব মূখোশ টা খুলে ফেললে যা দেখে তাতে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়।

শীতের দিন তবুও শরির থেকে অঝরে ঘাম ঝরতে থাকে।

লোকটির পূরো শরীর সাদা ধবধবে।

পিসি গুলো সাদা।

এ কোন বাংলাদেশী নাগরিক নয়।

ভিনদেশী তবে এখানে কেন।

তিলকনগর কেন।

অপূর্ব: কে তুমি ? এখানে কি করছো?

মনে হয় বাংলা বুঝে না।

অপূর্ব ইংরেজি তে প্রশ্ন করলোWhat’s your names? what are you doing here ? অচেনা লোকটি কর্কট কণ্ঠে বলে উঠলো : আই এম চীপস ডুপিয়াল। বলেই লোকটি কারাতে করে অপূর্ব কে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেয়। অপূর্ব উপর হয়ে পরে যায়। অপূর্ব অসুস্থ থাকায় কিছুটা কাতর হয়ে যায়। উঠে দাড়াতেই। লোকটি

গায়েব——কোথায় গেলো ? কে এই চীপস ডুপিয়ালি ?

আমাদের দেশের কোন ক্ষতি করতে আসেনি তো? নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্যে

হাজারো চিন্তায় অপূর্ব বিষন্নতা হয়ে যায়জয়া ভিষন চিন্তায় পরে যায়।

কারা বর্ষা কে কিডন্যা,প করলো।

যদি আমার মেয়েটাকেও করে ফেলতো। বুকের ভেতর কেমন চাপ চাপ বেথা হচ্ছে।

চারদিকে কি হচ্ছে।

কোন কিছুতেই আর মন বসাতে পারছি না।

অর্পা আমার কোলে শুয়ে আছে।

ভিষন আতংক এ অর্পা। কিছু জিজ্ঞেস করলেই বলে। ভাইয়াকে নিয়ে এসো।

ভাইয়া কে বলবে।
ভাইয়ার আদুরের যে ছোট বোন।
এসব ভাবতে ভাবতে চোখের কোনে অজানা কোন বেথায় এক ফোঁটা জ্বল গড়িয়ে পরে জয়ার,।
অপূর্ব ঢাকা শহরে চলে আসে।
এসেই ফরেন্সিক সেন্টারে চলে যায়।
সেখানে শুধু উপস্থিত ছিলো। ডাঃ জাকির

অপূর্ব অস্থিরতা ভাব নিয়ে বললো,আপনি যে চীপ টা পেয়েছিলেন সেটা আমাকে দেখান।

ডা: অপূর্ব তুমি হাপাচ্ছ কেন? কি হয়েছে ?

আগে শান্ত হও।

অপূর্ব: এখন শান্ত হতে পারবো না। চীপ টা ভিডিও প্লেয়ারে চালু করুন।

ডাঃ ভিডিও টি চালু করলে যা দেখে তাতে অপূর্ব অবাক ।

২০ সেকেন্ডের একটা ভিডিও । তাঁতে শুধু একটা মেয়ের নাচের ভিডিও।

মেয়েটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু অঙ্গ। নাভির নিচ পর্যন্ত একটা লেহেঙ্গা। সাথে বিছা, সমস্ত শরীর সাদা ধবধবে। কমড় টা হেলেদুলে নাচাচ্ছে।

মুখটা দেখা যায়নি।

ভিডিও টা দেখেই এটাই বোঝা গেলো যে, মুন্না ভিডিও টি লুকিয়ে লুকিয়ে করেছে। তবে ঐখানে এমন কিছু হচ্ছিল যাতে ভয়ে মুন্না ঠিক ভাবে ভিডিও করতে পারেনি। ভিডিও টা ভারি অদ্ভুত ছিলো। এই ভিডিও দ্বারা তো কিছুই বুঝলাম না। সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। অপূর্ব একটা চেয়ারে হেলানে বসে ভাবতে থাকে। ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হবে সবকিছু।

গুলিয়ে ফেললে চলবে না।

, হঠাৎ একজন কনস্টেবল আসে।

অপূর্ব কে উদ্দেশ্যে করে বলে স্যার , ডিসি সাহেব এর মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না।

অপূর্ব আহত ভঙ্গিতে বললো,

কিহহহহহ বলছো এসব কখন হলো? আর ,আর অর্পা ঠিক আছে তো?

বলেই সেখান থেকে বেড়িয়ে যায় বাড়ির উদ্দেশ্যে অপূর্ব।

ঘরের দরজা খোলা অপূর্বর খটকা লাগলো । কাউকে দেখছে না। অর্পার ঘরে গেলে অর্পা সেখানেও নেই। একদম নিশ্চুপ চারদিক। মায়ের ঘর থেকে আওয়াজ আসছে। হয়তো ঐখানে ই সবাই।অর্পা মায়ের কোলে শুয়ে আছে। অপূর্ব কে দেখা মাত্র ই ভাইয়া বলে জড়িয়ে ধরে,, হুহু করে কান্না শুরু করে। এ কান্না

যে ,যে সে কান্না নয়। বন্ধু হারানোর কান্না। অপূর্ব ঠিক বুঝতে পারছে।

অপূর্ব : শান্ত হ , আমি আছিতো। ঠিক খুঁজে নিয়ে আসবো,তোর বন্ধু বর্ষাকে।

অর্পা শান্ত হয়ে বসে।

অপূর্ব বললো,এবার বল তখন কি হয়েছিল? কারা বর্ষাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল? কাদের দেখেছিস? বর্ননা দে আমাকে।

অর্পা,কাপা কণ্ঠে বললো,

আমি আর বর্ষা যখন টিউশন এ যাচ্ছিলাম তখন,একটা বড় কালো রঙের মাইক্রো আমাদের পিছু নেয়। তবে আমরা বিষয়টা পাত্তা দেয়নি। ভেবেছি কত গাড়ি ই তো এভাবে চলতে থাকে।

টিউশন থেকে যখন বের হই।তখন ও একই ভাবে গাড়িটা পিছু পিছু আসতে থাকে। বর্ষা কে আমি

সাবধানের সাথে বলেছিলাম আমাদের জলদি যাওয়া দরকার। কিন্তু বর্ষা বললো, আমার বাবা পুলিশ। কারো সাহস নেই আমাদের কেউ কিছু বলার।

আমরা ধানমন্ডি গলি তে ঠুকে পরি। কিন্তু গলিটা একদম নিশ্চুপ ছিলো। হঠাৎ মাইক্রো টা সামনে এসে দাড়ায়। আমি ভয় পেয়ে যাই। হঠাৎ একটা,কালো মুখোশ পরা লোক

এসে বর্ষাকে ,জোর জাবরদস্তি করে মাইক্রো তে উঠিয়ে নিয়ে যায়।

আমি চোখের সামনে আমার বন্ধু কে কিডন্যা,প হতে দেখেছি, কিন্তু কিছু করতে পারিনি। বলেই অর্পা অঝরে কেঁদে উঠে।

অপূর্ব অর্পাকে বুকে জড়িয়ে নেয়। অপূর্ব ভাবতে শুরু করে ,এতদিন ছেলেরা কিডন্যা,প হতো। আর এখন মেয়েও হচ্ছে ।তবে অর্পাকে

ছেড়ে দিলো কেন। এর পিছনে যে আছে সে আসলে কি চায়।

অপূর্ব: মা, আমাকে কি ডিসি সাহেব ফোন দিয়েছিলো ?

জয়া : কোথায় নাতো”

অপূর্ব: সব কেসে আমাকে সে ইনফর্ম করে। তবে তার মেয়ের ক্ষেত্রে কেন জানালো না?

তিলকনগর—-

শ্যামলী : সবাই খেতে আসেন?

এলিজা : সূর্য, শ্রাবন আপনারা খেতে বসেন। পাখি তুই ও কিছু খেয়ে নে।

পাখি : আপু তুমি খাবে না?

এলিজা: তোর ভাই না আসলে খাচ্ছি না।

বলেই জয়তুন কে খাবার দেয়। জয়তুন আলাদা ঘরে বসে আছে। সাথে রমজান। দু'জনের ই বয়স হয়েছে। শরীরের অবস্থা ভালো নয়। সূর্য, শ্রাবন আনমনে খাবার খেতে

খেতে শ্রাবন বললো, অপূর্ব আমাদের রেখে এভাবে চলে গেলো। কি অদ্ভুত তাইনা।

সূর্য: গোটা দুনিয়াটাই অদ্ভুত। আর আমরা তো মানুষ। হয়তো কাজ পরে গেছে তাই চলে গেছে।

সূর্যর ভাব ভঙ্গিমা ভালো লাগেনি শ্রাবনের।

শ্রাবন খাবার খেতে খেতে বার বার পাখির দিকে পরোখ করছে।

পিচ্চি তবে ভারি মিষ্টি, মায়াবি চাহনি,ফর্সা গায়ের রং,ভি কার থুতনি একদম এলিজার মতই তবে,পাখির চুল গুলো কোকরানো।

ভিষন আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে ।

শ্রাবন এর হাব-ভাব দেখে

সূর্য বললো,ঐ বেটা,কি দেখছিস ? সামথিং সামথিং?

শ্রাবন: আরে কখনো ই না আমাকে পটানো এত সহজ । তাছাড়া আমার

কারো প্রতি অনুভূতি আসে না। বলেই খাবার শেষ করে উঠে যায় শ্রাবন।শ্রাবন হঠাৎ, হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে সবাইকে। এই অভ্যাসটা ওর বরাবর ই আছে।

শ্রাবন এলিজা কে বললো,আঁচ্ছা বউমনি,তোমার নামের অর্থ কি?

এলিজা অহংকারী স্বরে বললো,-নামের অর্থ সময়ের সাথে সাথে হয়ে যায়।

শ্রাবন: তোমাদের প্রথম দেখা কিভাবে হয়েছিল?

পাশ থেকে শ্যামলী হাসতে হাসতে বলে উঠে।

কিভাবে আবার লুকোচুরি খেলতে গিয়ে।

শ্রাবন: লুকোচুরি মানে?

আমরা প্রতি মেলাতে সব মেয়েরা মিলে লুকোচুরি খেলতাম, তখনই একদিন রুশরাজ্যে দুলাভাই কে,

আমরা দেখি।আর তখনই এলিজার পছন্দ হয়ে যায় তাকে। আমার বান্দবী এতটাই তার প্রতি আবেগময় হয়ে পরে,প্রথম দেখাতে, যে পরদিন একা একাই রুশরাজ্যে চলে যায়। তাকে দেখতে। আর সেদিন ই অপূর্ব ভাইয়া ধরে ফেলে। তাইনা, ?

এলিজা হাসলো।শ্রাবন হই করে উঠেই বললো, ও তারমানে

ভালোবাসার প্রথম অনুভূতি টা শুরু হয়, বউমনির থেকে।

কিন্তু আমি তো শুনেছি রুশরাজ্যে কেউ যায়না তবে তোমরা লুকোচুরি খেললে কিভাবে?

শ্যামলী: আমাদের জন্ম এখানে তাই ভয় হয়নি।তাছাড়া, তখন মেলা চিলো তো। তাই ভয় হয়নি।

সূর্য: অনেক ঘুম পেয়েছে ঘুমানো যাক। তোমরা গল্পে থাকো।

হঠাৎ ই দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ। এত রাতে কে!

এলিজা দরজা খুলতে যাবে ঠিক তখনই শ্রাবন বাধা দেয়।

শ্রাবন: খুলো না,এত রাতে কে না কে!!

এলিজা নিশ্চিত ভঙ্গিতে মৃদু হেসে বললো, আমার পুলিশ বাবু এসেছে।

শ্রাবন থমকে যায়। –না দেখেই কিভাবে নিশ্চিত হয়ে বললো।

এলিজা: ওনার উপস্থিতি আমি অনুভব করতে পারি।

শ্রাবন: ভালোবাসা গভির ও থেকে গভীর ও তম হলেই,তার উপস্থিতি হয়তো উপলব্ধি করা যায়,,

এলিজা দরজা খুলতেই দেখে অপূর্ব

–

অপূর্ব কে দেখেই এক আকাশ পরিমান শান্তি মিললো এলিজার। তার ভাব ভঙ্গিমা তে প্রকাশ পায়,যে

তার প্রিয় মানুষটির পথ চেয়ে ছিলো।অপূর্ব: মনে পরছিলো আমায় খুব। তাই না?

এলিজা: আপনাকে ছাড়া যে এক প্রহর কাটে না।

কি করে বুঝাবো আপনাকে। বলেই বুকের উপর মাথা রাখে অপূর্বর।

অপূর্ব : ম্যাডাম , আপনি আমাকে বাহিরেই রাখবেন? প্রচুর ঠান্ডা যে।

শ্রাবন, সূর্য,শ্যামলী,পাখি তিনজন পাশাপাশি দাড়িয়ে হা করে তাকিয়ে আছে। একজন আরেক দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে বলছে,এলিজা কি করে বুঝলো,যে অপূর্ব এসেছে।

এলিজা: আপনি আসুন খেতে দেই!!

অপূর্ব, খেতে যেতেই , চারজনার থুতনির নিচে হাত দিয়ে মুখ বন্ধ করে মৃদু হাসি দিয়ে বললো,মুখে

মসা ঠুকবে।অপূর্ব এলিজাকে নিয়ে রাতে হাঁটতে বের হয়।

দুজন মিলে রাতের তারা গুনে। কত সুন্দর জোসনায় রাত। ভরাকান্ত আকাশ। শীতল হাওয়া। তার মাঝে অপূরুপা এলিজা।

আমি যতই দেখি ততই অভাক হই। কতটা মায়াবী,নিস্পাপ একজন মানুষ। এলোকেশী চুল গুলো উড়ছে।

আমার সামনেই দাড়ানো এলিজা।
অপূর্ব এসব ভাবতেই পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে এলিজাকে।
সুযোগ পেলেই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে তাই না?
অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,হাজারো ব্যাস্ততার মাঝেও যে আপনি আমার অনন্ত শান্তি ম্যাডাম। যখনই তোমার সংস্পর্শে আসি, তোমার ঐ নিঃশ্বাস যখনই আমার বুকেতে লাগে,তখনই

আমার ভেতরের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়।

এলিজা মৃদু হেসে শান্ত স্বরে বলে উঠলো— একটা কথা বলবো?

হুম বলো,,

এই তিনবছর তো অনেক বার , বাচ্চা কনসিভ করলাম , কিন্তু আমার সমস্যা নাকি। তাই বাচ্চা থাকে না। বন্ধ্যা নারী আমি।

আপনার ও তো বাবা ডাক শোনার ইচ্ছা করে। আপনি চাইলে আরেকটা বিয়ে......

বলতেই অপূর্ব এলিজাম মুখ চেপে ধরে।

অপূর্ব: আমি সেই সন্তানের বাবা হতে চাইনা,যে সন্তান তোমার গর্ভের নয়,, সন্তান সৃষ্টিকর্তার দান।

তোমার সমস্যা তাই বলে তোমাকে হারাবো কখনো ই না।,, আমি

আপনাতে থেকেই সারাজীবন বাঁচতে চাই।

পেছন থেকে দুষ্টু স্বরে

শ্রাবন, সুর্য,

লালালালা,, বেসুরো ভাবে বলতে থাকে।সূর্য: আরে ইয়ার বিরক্ত করছি না,, কর ভাই তোরা প্রেম কর আমরা তো আকাশ দেখতে আসছিলাম।

অপূর্ব আশেপাশে লাঠি খুঁজে বললো,তোদের জ্বালায় দেখছি প্রেম ও করা যাবে না,তবে রে বলতেই সূর্য, শ্রাবন এক দৌড় ,পেছনে দৌড়াচ্ছে অপূর্ব।

এই দেখে খিল খিল করে হেসে উঠে,এলিজা,শ্যামলী ,পাখি।

পাখি: তাদের বন্ধুত্ব কত সুন্দর তাই না। কোনদিন যেন এই বন্ধন না ভাঙে।

দৌড়াতে গিয়েই হঠাৎ তিনজন থমকে দাড়ায়।

তিলকনগর থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে একটি কালো মাইক্রো।

অপূর্ব খেয়াল করলো এটাতো সেই মাইক্রো, যার বর্ননা অর্পা দিয়েছিলো......ভরাকান্ত সূর্য।

রৌদ্রজ্জ্বল দিন। চারদিকে পাখিদের কিচিরমিচির আওয়াজ।

শান্তময় শীতের হাওয়া।

সব মিলিয়ে সকাল টা পরিপূর্ণ। কিন্তু মনের ভেতর যে কুহু ডাকছে। কোন কিছুতে মন বসছে না। কি হবে না হবে। মেয়েটার ফ্যাকাশে মুখ যে আর ভালো লাগছে না। বর্ষা কিডন্যা,প হওয়ার পর মুহূর্ত থেকেই চুপচাপ বসে থাকে কিছু খাচ্ছে ও না অর্পা। আল্লাহর কাছে একটাই অনুরোধ। বর্ষাকে যেন সুস্থ সবল ফিরিয়ে দেয়। পাপের ছায়া যেন

কাটিয়ে দেয়। এই বয়সে এসেও এত চাপ আর নিতে পারছি না। এসব ভাবতে ভাবতে রান্না করছে জয়া।

মনজুরা: আপা ,, ভাজি পূরে যাচ্ছে। কি ভাবছেন এত?

বলেই সবজি ভাজি টা মনজুরা ,চুলা থেকে নামালো।

জয়া এক পাশে সরে যায়।

জয়ার মুখে যে আতংকের ছাপ।

মনজুরা: পাপ বাপকেও ছাড়ে না। একদিন না একদিন পাপের আগুনে জ্বলতেই হতো।

(বললো অহংকারী স্বরে)

তিলকনগর————-।

অপূর্ব, সূর্য, শ্রাবন চৌকিতে বসে চা খাচ্ছে ।অপূর্ব: গতকাল রাতে মাইক্রো টা একটুর জন্য ধরতে পারলাম না। আমি নিশ্চিত,ঐ গাড়িতে করেই নিয়ে গেছে বর্ষাকে।

সূর্য: কিন্তু আমরা তো পূরো তিলকনগর খুজলাম । কিছু তো পেলাম না। এখানে ওদের আস্থানা নেই মনে হচ্ছে।

শ্রাবন: তবে কি নতুন কারো শিকা,রে আসছিলো!

অপূর্ব উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে করতে বললো,সে যাইহোক আমাকে এর শেষ অবধি যেতেই হবে। যা

কিছুর শুরু আছে তার, শেষ ও আছে।

এলিজা ,অপূর্ব কে উদ্দেশ্যে করে বললো,শুনছেন পাখির আজ টিউশনে দেড়ি হয়ে গেছে। আপনি যদি পাখিকে স্কুলে বাইকে করে ছেড়ে দিতেন!!

শ্রাবন হুট করে দাঁড়িয়ে বললো,আমি থাকতে অপূর্ব কেন যাবে। অপূর্ব তোমার সাথে সময় কাটাক আমি

নিয়ে যাচ্ছি। হাজার হোক পিচ্চি বেয়ান।

তারমানে মনে ধরেছে (সূর্য বললো মনে মনে)

পাখি: আমি আপনার সাথে যাচ্ছি না। সারাদিন শুধু পিচ্চি পিচ্চি করেন।

এলিজা: বড়দের সাথে এভাবে কথা বলে না।এখন তারাতাড়ি তার সাথে যাও।

শ্রাবন বাইক নিয়ে বের হয়। পেছনে পাখি।পর পুরুষের সাথে গা-ঘেসে বসতে অসস্থি বোধ করছে।

দু'পাশে ধান ক্ষেত। মাঝখানে মাটির রাস্তা। কুয়াশায় কিছুটা আচ্ছন্ন।

বাইক চলছে স্কুলের উদ্দেশ্যে।

শ্রাবন লুকিং গ্লাস দিয়ে দেখছে পাখিকে।

পাখি শ্রাবন কে না ধরেই বসছে।

শ্রাবন ,: ঐ পিচ্চি ধরে বসো নয় যে পরে যাবে।

পাখি অহংকারী ভঙ্গিতে বললো, ধরবো না আমি আপনাকে ।পরে গেলে গেলাম।

শ্রাবন: ধরবে না তাইতো।বলেই বাইক হঠাৎ ব্রেক করতেই পাখি শ্রাবন এর গাঁয়ের উপর ঘেসে পরে। শ্রাবন খিল খিল করে হেসে উঠে। কি পিচ্চি ধরবে না নাকি।

পাখি ; ভারি অ,সভ্য লোক তো আপনি।

বলেই বাইক থেকে নেমে সোজা রাগী ভঙ্গিতে হাটা শুরু করে।

শ্রাবন পাখির পেছন পেছন ধীরে ধীরে বাইক চালাতে থাকে।আর ডাকতে থাকে।

শ্রাবন : ওই পিচ্চি বেয়ান

রাগ কেন করলে দাড়াও বলছি।

কে শোনে কার কথা। পাখি আনমনে হাটতে থাকে।

শ্রাবন পাখিকে পরোখ করছে। শুকনো শরীর। চুলের বেনুনি টা ধুলছে।সাথে চাদর,হাতে বই। চলার ধরন ই যে এত সুন্দর যে কেউ প্রেমে পরে যাবে।

এসব ভাবতে ভাবতে চলে আসে তিলকনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

পাখি ভেতরে চলে যায়।

ঠিক তখনি একজন মহিলা পাখিকে দাড় করিয়ে জিজ্ঞেস করে। রত্না কেমন আছে। পাখি থমকে দাড়ায়। মহিলাটির বয়স ৪৫-৫০ হবে।শ্রাবন খেয়াল করলো কিছু জিজ্ঞেস করছে।

পাখি: আমি তো কোন রত্না কে চিনি না। আপনি কার কথা বলছেন।

মহিলাটি : ও তোমারে দেখতে একদম রত্নার মতন লাগলো তাই

জিগাইছি। কিছু মনে করো না (সেকেলের মানুষ)

বলেই মহিলাটি চলে যায়।

শ্রাবন কিছুটা অবাক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে পাখিকে।

কে এই মহিলাটি? আর রত্নাই বা কে?

পাখি: হয়তো ওনার কোথাও ভুল হচ্ছে। বয়স হয়েছে হয়তো গুলিয়ে ফেলেছে।

বলেই ভেতরে চলে যায়।

শ্রাবন – অদ্ভুত তো। মহিলাটি ততও বয়স্ক না, যে গুলিয়ে ফেলবে। কিন্তু রত্নাই বা কে। জিজ্ঞেস করে দেখি।

শ্রাবন দৌড়ে গিয়ে মহিলাটি কে দাড় করায়।

শ্রাবন: আচ্ছা আন্টি আপনি একটু আগে যে রত্নার কথা বলছিলেন কে সে?

মহিলাটি রত্নার কথা শুনতেই ভয়ে, আতংক এ চাপসে উঠে।

অবাক দৃষ্টিতে শ্রাবন এর দিকে তাকিয়ে। দ্রুত পায়ে চলে যায়।

শ্রাবন বলে উঠলো,কি আজব মহিলা। হয়তো পাখি ঠিকি বলেছে। মাথায় সমস্যা ওনার।— তিলকনগর বাজার–বাজারের নাম অন্তিম বাজার।

অপূর্ব, সূর্য হাটতে হাঁটতে বাজারে চলে আসে।

অপূর্ব বাজারে থাকা ল্যান্ডলাইন থেকে,ঢাকাতে কথা বলবে। ডিসি সাহেব এর সাথে। বর্ষার খোজ পাওয়া গেলো কিনা জানতে।

চারদিক পরোখ করতেই অপূর্ব যা দেখলো। অবাক হয়ে যায়। চোখ গুলো ছানাবরা হয়ে যায়।

সেই কালো মাইক্রো গাড়ি টা। কারো অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। অপূর্ব ধীরে ধীরে গাড়িটার দিকে এগোতেই যা দেখে তাঁতে আকাশ টা মাথার উপর ভেঙে পরে।

। কোথা থেকে দৌড়ে আসলো হিমেল।খুব অস্থির দেখাচ্ছে।হিমেল গাড়িটাতে উঠে পরে। ওঠা মাত্রই ছেড়ে দেয়।

অপূর্ব গাড়িটা ধরার জন্য দৌড়াতে থাকে।

কিন্তু চোখের পলকে হারিয়ে যায়।

সূর্য: কি হলো দৌড়াচ্ছিস কেন? পাগলের মত কেউ রাস্তার মাঝে এভাবে দৌড়ায়।

অপূর্ব হাঁপাতে হাঁপাতে বললো,

ঐ কালো মাইক্রো টা দেখেছি । আর সেই গাড়িতে হিমেল ছিলো।

সূর্য: খিল খিল করে হেসে উঠে। তুই পাগল ওরা এখানে আসবে কেন! হিমেল,পলাশ ,মিদুল ওরাতো ঘুরতে গেছে। সারাদিন কেস, আসামি নিয়ে ভাবতে ভাবতে তোর বার বার হ্যালোসোলেশন হচ্ছে।

অপূর্ব: হয়তো তোর কথাই ঠিক।

বলেই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

সকাল ১১- টা

শ্রাবন পাখিকে নিয়ে ফিরছে।

বার বার লুকিং গ্লাস দিয়ে পাখির দিকে পরোক্ষ করছে।

পাখি: ওভাবে দেখতে থাকলে সোজা ক্ষেতে পরবো। সামনে তাকিয়ে গাড়ি চালান।

বলেই মৃদু হাসে।

শ্রাবন পাখির হাসিটা দেখে বললো,পিচ্চি বেয়ান, তোমার ঐ মিষ্টি হাসি দেখার জন্য আমি হাজার বার দূর্ঘটনায় পরতে রাজি।

বলেই বাইক দ্রুত গতিতে চালিয়ে আলি বাড়ি ফেলে রেখে সোজা চলে যায় দিগন্ত নদীর পারে।

পাখি: আপনি এখানে কেন নিয়ে আসলেন? বাড়ির সকলে যে চিন্তা করবে।

আজিব লোক তো আপনি। আপনাকে বিশ্বাস করাই আমার ভুল হয়েছে।

শ্রাবন মৃদু হেসে বললো,তুমি রাগলে কিন্তু দারুন লাগে। এখানে তোমাকে না নিয়ে আসলে এভাবে রাগ দেখার সৌভাগ্য হত ?

পাখি উল্টো দিকে ঘুরে মৃদু হাসে।

শ্রাবন ঘাসের উপর বসে পরে।

পাখি বইহাতে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। শ্রাবন পাখির দিকে বার বার দেখছে।

পাখি: ওভাবে তাকাবেন না।শ্রাবন: কিভাবে তাকাবো শিখিয়ে দাও।

কিছুক্ষণ এভাবে দুজন চুপ থাকে।

কিছুক্ষণ পর শ্রাবন বলে উঠলো, শুনেছি তোমাদের স্কুলে পুনর্মিলনী উপলক্ষে কনসার্ট হবে।

পাখি হ্যা সুচক মাথা নাড়ে।

শ্রাবন: তুমি কি নাচ গান, এসবে অংশগ্রহণ করেছো?

পাখি: মামা মামি, আপু এগুলো পছন্দ করেন না। আর আমিও না।

শ্রাবন: আমি গান করি তাতো জানো। কিছু রেকর্ড ও বের হয়েছে। কিছু মানুষ আমাকে এই গানের জন্য চিনে।তাই তোমাদের স্কুলে আমাকে গান গাইতে অনুরোধ করা হয়েছে।

পাখি : তাতে আমার কি!

শ্রাবন : কিছু না তবে , আমি তোমাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য

অনুরোধ করছি। ওদিন এসো। সমস্যা নেই সাথে তোমার বোন দুলাভাই ও থাকবে।

পেছন থেকে অপূর্ব, সূর্য গলায় কাশি দিয়ে উঠে।

কি চলছে এখানে? এই বুঝি দরকারি ক্লাস?

বলে উঠলো অপূর্ব।শ্রাবন আমতা আমতা শুরু করে দেয়।

কি বলবে বুঝতে পারছে না। অপূর্ব, সূর্য খিল খিল করে হেসে উঠে।

অপূর্ব: ভয় পাওয়ার কোন কারন নেই। তাছাড়া দু'জনকে ভালো মানিয়েছে।

পাখি লজ্জা পেয়ে দৌড়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

অপূর্ব খেয়াল করলো ঘাসের উপর কিছু একটা পরে আছে।

উঠিয়ে নিলে দেখতে পায় একটা ওয়ালেট।

আশ্চর্য হয়ে যায়। এটা কার ওয়ালেট।

ওয়ালেট টা খুলতেই দেখে।

কিছু টাকা,আর একটা আইডি কার্ড। অপূর্ব অবাক হয়ে যায়। এটা আর কারো নয়। চীপস ডুপিয়ালির আইডি কার্ড। তবে এটা মেডিকেল আইডি

কার্ড। তারমানে উনি একজন ডাক্তার!!!

বিদেশী ডাক্তার এখানে কি করছে।

আলি বাড়িতে সবার আড্ডার আশর বসিয়েছে।

নানান কথা নিয়ে হাসাহাসি করছে। শ্যামলী, সূর্য,শ্রাবন,এলিজা।বারান্দার চৌকিতে বসে চা খাচ্ছে আর বিভিন্ন কথায় একজন আরেকজনের উপর হেসে হেসে পরছে।

অপূর্ব এক কোনেতে দাড়িয়ে আছে। অপর বারান্দায় পাখি পরছে। অপূর্ব পাখির কাছে যায়। পাখি কিছু লিখছে।

অপূর্ব অবাক হয় পাখির কলমটি দেখে।

অপূর্ব শান্ত গলায় পাখিকে বললো,কলমটা অনেক সুন্দর। দেখে মনে হয় স্বর্নের । কে দিয়েছে কলমটি?

পাখি কিছু চিন্তা করে বললো,
আমার আব্বা মৃত্যুর আগে দিয়ে গিয়েছিলেন।
হঠাৎ সূর্যর ডাক পরে। অপূর্ব চৌকি থেকে উঠে যেতেই। পাখি পেছন থেকে অপূর্বর হাতটি ধরে ফেলে।
অপূর্ব থমকে দাঁড়ায়।
অপূর্ব: কিছু বলবে?
পাখি চোখে হতাশা নিয়ে বলে উঠলো,

পর্দার আড়ালে থাকা একজন হতভাগি মেয়ের কথা বলবো। যার জীবনের পথ চলাটা একজন মাঝপথে ই শেষ করে দেয়।অপূর্ব পাখির মুখে এরকম কথা শুনে অবাক হয়ে যায়।

অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে জানতে চায়।

কে সেই মেয়ে ?????চারদিক থেকে কোলাহল এর শব্দে ভেসে আসছে।

নির্জন প্রহরে চারদিক কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ব্যাস্ত শহর আজ নিরব হয়ে গেছে।

এটা কি অভিশাপ নাকি পাপ। চারদিকে যা হচ্ছে।

মনে পরলেই বুকের মাঝে হুহু করে উঠে।

হঠাৎ এসব ভাবনা মাথা থেকে ফেলে দেয় জয়া।

অর্পাকে ডাকতে থাকে।

অর্পা গম্ভীর মুখে আসলো।
জয়া বললো,এখানে বস আমি চুল বেঁধে দিচ্ছি।
অর্পার মন যে প্রতি মূহুর্তে কেঁদে উঠছে।অথচ কাউকে বলতে পারছে না।
তার প্রান প্রিয় বন্ধু কে হারিয়েছে।
অর্পার চুল বাঁধতে বাঁধতে জয়া খেয়াল করলো বাড়িতে কেউ ঢুকেছে।চপর চপর পায়ের

আওয়াজ।জয়া ভয় পেয়ে যায়। বাড়িতে কেউ নেই। শুধু জয়া,অর্পা,আর মমতাজ আজ এসেই তার বাবা বাড়িতে গেছে সবার সাথে দেখা করতে। জাহাঙ্গীর ঘরে নেই। ডিসি সাহেব এর সাথে দেখা করতে গেছে।

জয়া অর্পাকে তার রুমে রেখে একা একা বের হয়

টিপ টিপ পায় চারদিকে দেখে কেউ নেই।

হঠাৎ ই চোখ পরে এলিজার ঘরের পাশে দুটো মাথার,ছায়া দেখা যাচ্ছে। জয়া আড়ালে লুকিয়ে যায়। বুকের ভেতর কাঁপা শুরু করে। কারা এরা,ঘাপটি মেরে বসে পরে টেবিলের এক কোনে জয়া।অচেনা দুজন লোকের মুখে কালো মুখোশ।

চেনা যাচ্ছে না। তাদের দুজনের কথপোকথন থেকে একটা কথা পরিস্কার শোনা, ,গেলো।

এলিজা বাড়িতে নেই, আজ ও বেঁচে গেলো। তবে কতদিন বাঁচবে চল যাই।

এই বলে লোক দুটো বেড়িয়ে যায় হাতে ছিলো বড় রামদা।

এরা কারা জিজ্ঞেস করার মত কোন সাহস পায়নি।

জয়া দৌড়ে গিয়ে অর্পার কাছে বসলো।

অর্পা: মা হাপাচ্ছ কেন?

জয়া গভীর চিন্তায় ভিবোর। কারা এরা এলিজা কে কেন মারতে চায়। কারা পাঠিয়েছে।

এসব ভাবতে ভাবতে জয়ার বুকের ধুকবুকানি বেড়ে যায়।

তিলকনগর —-

কে সেই মেয়ে যে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে আছে?কিসের জন্য আর কে তার জীবন টা মাঝপথে থেমে গেছে আর কার জন্য।?

পাখি বলতে শুরু করলো —ওর নাম খুশি। তবে নামের মত ওর জীবন টা খুশিতেই ভরা ছিলো না। আমার একমাত্র ভালো বন্ধু ছিলো।

রোজ সকালে একসাথে ফুল তুলতে যেতাম।রোজ বিকেলে একসাথে

খেলতে যেতাম।একে অপরের সমস্ত কষ্ট ভাগাভাগি করে নিতাম। খুশি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে।খুশির বাবা একদম ই চায় না খুশি পরাশুনা করুক। কিন্তু খুশির মায়ের খুব ইচ্ছে তার মেয়ে একদিন অনেক বড় হবে। সে তার বাবার বাড়ির জমি(ওয়ারিশ) বিক্রি করে খুশির সমস্ত চাওয়া পাওয়া পূর্ণ করতো। খুশির বড় ভাই আছে কিন্তু তারা

খুশিকে বোঝা মনে করে। কখনো কখনো খুশিকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বলতো। কখনো বলতো কোন নাগরের হাত ধরে চলে যাচ্ছে না কেন।এসব কথায় খুশি অনেক আঘাত পেত। লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক কাঁদতো। কিন্তু হাল ছাড়ার মেয়ে ছিল না। ও সবসময় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার এর দিকে অটুট ছিলো।

কিন্তু হঠাৎ ই কালো ঝড় আসে ওর জীবনে।

খুশি দেখতেও খুব সুন্দরী ছিল। এলাকার অনেক ছেলেরা ওর পিছন ঘুরতো। কিন্তু ও কাউকে পাত্তা দিতো না। এড়িয়ে চলতো। কারন ও মনে করে ,বিয়ের আগে হারাম সম্পর্ক,সফলতায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বর্ষন নামে একটা ছেলে খুশিকে অনেক পছন্দ করতো। একবার নয়

হাজার বার খুশি কে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু খুশি প্রত্যাখান করে। ছেলেটাকে বলতো,যে আমি আমার স্বপ্ন নিয়ে ভাবি। ভালো একটা ভবিষ্যৎ গড়তে চাই। কিন্তু বর্ষন তাও মানলো না।পাখি মাঝপথে কথা থামিয়ে দেয়।

অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে। তারপর কি হলো?

পাখি আবার বলতে শুরু করে। আজ থেকে ২ বছর আগে। আমি আর খুশি স্কুল থেকে আসছিলাম। তখন দেখি ছেলেটা সামনে দাঁড়িয়ে। সেদিন ও ছেলেটা একই কথা বললে,খুশি সেই আগের কথাই বললো। তখন বর্ষন ,ক্রোধের স্বরে বললো,তুই কিভাবে তোর স্বপ্ন পূরন করিস আমিও দেখবো বলেই ছেলেটা খুশির মুখের উপর এ,সিড

নিক্ষেপ করে।বলেই পাখি ফোঁপাতে থাকে।

অপূর্ব, উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো—তারপর কি হয়েছিল বলো?

পাখি : আমার চোখের সামনে খুশি ছটপট করতে থাকে। চিৎকার করতে থাকে। আশেপাশের মানুষ এলে সবাই ওকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

খুশির সেড়ে উঠতে,৬ মাস সময় লেগেছিল। তবে,
খুশির মুখের অর্ধেক টা পুড়ে যায়। ডান চোখে আর সেদিন এর পর থেকে দেখতে পায় না।
অপূর্ব বললো,এখন কোথায় খুশি?
পাখি: সেদিনের পর থেকে খুশি আর ঘরের বাইরে বের হয়না। ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে সারাদিন বসে থাকে। সেদিন এর পর আর কারো

সাথে দেখা হয়নি।নিজের মায়ের সাথে ও কথা বলে না।

ছোট্ট একটা জানালা আছে ওর ঘরে। ওর মা বেলা মত খাবার দিয়ে আসে।

একদিন আমি গিয়েছিলাম আমার সাথেও কথা বলেনি। কিন্তু ছোট্ট একটা চিরকুটে লিখে দিয়েছিলো যে, আমার সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে। আমার জীবনের পথ চলা এখানেই

শেষ। সেদিনের পর আর ও স্কুলেও আসেনি।

অপূর্ব: ওর জীবনের পরিকল্পনা কি? কি হতে চেয়েছিলো?

পাখি বলে উঠলো, খুশি চাইতো,যে ও একজন সায়েন্টিস হবে। খুশি সবসময় পরিক্ষায় প্রথম হতো। কিন্তু ওর জীবন........পাখি থেমে যায়। কান্না শুরু করে।

অপূর্ব ভারি একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলো,চলো যাওয়া যাক।

পাখি অবাক দৃষ্টিতে বললো, কোথায় যাবেন?

খুশির কাছে।

পাখি: ও কারো সাথে কথা বলবে না। আপনার সাথে ও না।

অপূর্ব: চেষ্টা করে দেখি।

বলেই দুজনে বের হতেই অপূর্ব, হোঁচট খেয়ে পরে যেতেই , এলিজা-

আঝাপটা দিয়ে ধরে ফেলে অপূর্ব কে।

অপূর্ব অবাক দৃষ্টিতে এলিজা-কে পরোখ করে।

এলিজা বললো, ছোট-বড় সমস্ত বিপদে আমি আপনার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়াব*আমার জীবনের বিনিময় হলেও আপনাকে রক্ষা করবো* কারন আমি যে আপনার অর্ধাঙ্গিনী।

অপূর্ব এলিজার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাঁসে।অপূর্ব বললো, এতদিন শুনে এসেছি মেয়েদের শুধু ছেলেরা রক্ষা করে, কিন্তু আমি দুনিয়ার সব চেয়ে ভাগ্যবান পূরুষ,যার অর্ধাঙ্গিনী তাকে রক্ষা করতে চায়।

এলিজা বললো,জীবন কখনো এক সুতো দিয়ে বাধা যায়না। ভালোবাসা তখনই মজবুত হয়।যখন একে অপরের জন্য পরিপূরক হয়।একে

অপরের বিপদে,প্রয়োজনে ঢাল হয়ে দাড়ায়।

স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক হয় দাড়িপাল্লার মত। যখন তা এক দিকে বেশি ঝুঁকে তখন অপর দিক বেশি উপরে উঠে আবার তা নিচে পরে যায়।তাই দু’জনকে সবসময় দুজনের প্রতি সমান সমান যত্ন সম্মান রাখতে হয়।

অপূর্ব এলিজার মুখে এরুপ কথা শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ঢাকা——————ল্যান্ডলাইনে ফোনের আওয়াজ।

জয়ার ভেতরটা ফোনের আওয়াজ শুনেই থমকে যায়।কাপা হাতে ফোনটা ধরতেই ওপাশ থেকে বলে উঠে- অপূর্ব স্যার , ডিসি সাহেব এর মেয়ে বর্ষার লা,শ পাওয়া গেছে,তবে তার মেয়ের লা,শটি

রাজকীয় কনের মত সাজিয়ে দিয়েছে।

ওপাশের কনস্টেবল জানে না ফোন কে ধরেছে।

জয়া ধপাস করে ফ্লোরে বসে পরে।...।।

জয়া ক্রোধের স্বরে বলে উঠে, আমার মৃত্যুর আগে একটাই ইচ্ছা। নিকৃ,ষ্ঠ এই খেলা যে খেলছে তাকে

স্ব-চোক্ষে দেখা।সে কোন মায়ের দুধ খেয়েছে তা আমি দেখতে চাই।

খুশির বাড়িতে অপূর্ব পাখি চলে যায়।

অনেক ক্ষন দরজায় কড়া নাড়ার পর দরজা খুলে এক ভদ্র মহিলা।

আমি সালাম দিলাম। উনি দেখে আমাকে চিনতে পারে। বলে আলির জামাই।

আমি হ্যা সুচক মাথা নেড়ে ভেতরে ঢুকি।

আমি তাকে তার মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে কান্না শুরু করে দেয়।

উনি বললেন, আমার মেয়ের জীবন টা যে নর,ক করে দিছে।তার জীবন টা আল্লাহ শেষ করে দেবে। এক হতভাগা মায়ের কান্না , আল্লাহ সইবো না।আমি ওনাকে শান্তনা

দিয়ে বললাম।আমি খুশির সাথে একবার কথা বলতে চাই।

উনি বললো,খুশি কথা বললো না।

আমি বললাম ঘরটা দেখিয়েদেন।

আমি চেষ্টা করছি।

একটা ছোট্ট ঘর ভেতরে কোন সাড়া শব্দ নেই।

আমি ছোট একটা ছিদ্র দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলাম। চুল গুলো এলোমেলো।

মুখ দেখা যাচ্ছে না। তবে ওর কাছে ক্যামি,কেল এর কিছু বোতলের মত। কিছু করছে।হয়তো স্বপ্ন আকড়ে ধরে বাঁচতে চাচ্ছে।আমি ডাকলাম, খুশি, খুশি। আমি তোমার এক ভাই। দরজা টা খুলবে।

কোন সাড়া নেই। অপূর্ব কিছুক্ষন অপেক্ষা করলো। খুশি দরজা খুললো না।অপূর্ব ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,

খুশি , সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকবে যারা সর্বদা তোমাকে নিচে নামানোর চেষ্টা করবে। যে আজকে তোমার এই অবস্থা করেছে ওর মুখ লুকিয়ে থাকার কথা তুমি কেন থাকবে। সফলতার জন্য দরকার চেষ্টা, আত্মবিশ্বাস, প্রচেষ্টা, ধৈর্য খারাপ সময়, কিছু মানুষের খারাপ আচরণ।

সফলত অর্জন করতে শি,কার হতে হয় সমালোচনার।শিকার হতে,হয় খারাপ সময়ের,শিকা,র হতে হয় নিজের রক্তের মানুষদের খারাপ আচরণের।অন্যের দেয়া কষ্ট থেকে কান্না করাটা বোকামি। অন্যের দেয়া কষ্ট থেকে ধরতে হয় জেদ। মানুষ চাইবে তোমাকে কাঁদাতে, মানুষ চাইবে তোমাকে টেনে হিছরে নিচে নামাতে। কিন্তু তোমাকে তোমার

লক্ষ্যের প্রতি কঠোর থাকতে হবে। সংগ্রাম করতে হবে সফলতার জন্য। বার বার ব্যর্থ হওয়ায় পরেও উঠে দাড়াতে হবে।

যারা বলেছে তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না তাদের দেখিয়ে দাও তুমি পারো্, সফলতার জন্য রুপ কোনদিন দরকার নয়। যারা তোমাকে বোঝা মনে করে। তাদের

দেখিয়ে দেও, তুমি বোঝা নও তুমি শ্রেষ্ঠ।

আমি সফল হতে চাই থেকে,আমি সফল হতে পেরেছি পর্যন্ত যেতে হয়।অপূর্ব হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখের পানি মুছে দেখতে পায়। খুশি হাটু ঘেরে বসে আছে।

অপূর্ব: যদি আমার কথা গুলো তোমাকে এতটুকু অনুপ্রেরণা করে,তবে এই ফর্ম ফিলাপ এর

টাকা দিয়ে গেলাম। তুমি পরিক্ষা দিবে। আমরা চাই তুমি পরিক্ষা দাও।

বলেই সেখান থেকে চলে যেতেই ,খুশির ভাই বলে উঠে, পোড়ামুখি আর কি করতে পারবে।

অপূর্ব : অবহেলার শিকর খুব মজবুত হয়।

বলেই পাখিকে নিয়ে চলে যায়।অপূর্ব পাখিকে নিয়ে চলে যেতেই দেখতে পায়। হিমেল কে।

অপূর্ব অবাক হয়ে যায়,হিমেল চীপস ডুপিয়ালির সাথে অবাক করা ভঙ্গিতে কথা বলছে। এইখানে যদি হিমেল হবে, তবে ওরা মিথ্যা কেন বললো যে,ঘুরতে গেছে। আর এই তিলকনগর কেন? কি আছে এই তিলকনগর ,ওদের সাথে কি

সম্পর্ক?.......সমস্ত ঢাকার শহর আজ ব্যাস্ত।চারদিকে ভয়ের আচ্ছন্ন। প্রতিটা মানুষের মনে আতঙ্ক। ডিসি সাহেব এর মেয়ে খু,ন।তবে শুধু খু,ন নয়। ফরেন্সিক রিপোর্ট অনুযায়ী বর্ষা কে ধ,র্ষন করা হয়েছে । আকাশটা আজ বড্ড নিশ্চুপ। মনে হচ্ছে কোন দূর্ঘটনা নয় বরং কারো পাপের ফল।

বললো জয়া-

জাহাঙ্গীর: তুমি এত বেশি কথা বলো কেন? নিজের মেয়ের খেয়াল রাখো সেইটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

জয়া ভ্রু কুঁচকে ভাবলো ,এই মানুষটির মনে কি কখনো কারো জন্য মায়া জন্মাবে না! কতটা পাষান। সব ভালোবাসা হয়তো তার ছেলের জন্য ই আছে।

কনস্টেবল এর কাছ থেকে খবর পাওয়ার পর অপূর্ব কে জানাইনি।

কারন চাই না ছেলেটা চিন্তায় থাকুক।

বর্ষা যেদিন থেকে কি,ডন্যাপ হয় সেদিনের পর থেকে আর অর্পাকে স্কুলে যেতে দেয়নি।

বড্ড ভয় হয়। ভাবতে ভাবতে শুয়ে পরে জয়া।

তিলকনগর———————-এলিজা সবার জন্য রান্না করেছে। সূর্য, শ্রাবন চৌকিতে বসে বসে গান গাইছে।

শ্যামলী, সূর্য বিভিন্ন কথা বলছে আর হাসছে। যদিও শ্যামলী এলিজার থেকে বয়সে বড়। তবুও মিশুক ।

শ্রাবন গিটার টা সূর্যর কাছে রেখে ঘরে আসে পানি খেতে আসে। তৎক্ষণাৎ মনে মনে ভাবলো বাড়িটা একটু ঘুরে দেখি।

কাঠের ঘর হলেও বেশ বড় আর সুন্দর।

কয়েকটা ঘর আছে ।

একটা ঘরে এখনও যাওয়া হয়নি। ভেতরে অনেক পূরানো জিনিস রাখা। পারিবারিক এ্যালবাম। তবে ছবিটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না। অনেক পূরাতন। একটা ডায়েরি ও পেলাম। তবে ডায়েরিটা পূরানো হলেও যখন খুলে দেখি তখন অবাক হই। কারন ডায়রির লেখা গুলো একদম নতুন।

সমস্ত লেখা ইংলিশে।আর লেখা গুলো পূরাতন নয়। সদা লেখা ডায়েরি। ভেতরে একটা কাগজ, কৌতুহল হলো কাগজটি দেখার। কাগজটি খুলতেই যা লেখা দেখলাম। পরিষ্কার বোজা না গেলেও, , এরকম কিছু লেখা, A , ফর এ,লিয়েন L ফর, লায়,ন মানে সিং,হ । তারপর G ফর গার্ডেন।

কি অদ্ভুত শব্দ রে বাবা এরকম শব্দের অর্থ ও প্রথম শুনলাম। ভেবেই মৃদু হাসে শ্রাবন।ডায়েরি তে যা লেখা আছে তা পরতেই, এলিজা খেতে ডাকে শ্রাবন কে। বাকি সবাইকেও ডাকে।

ভিষন খিদে পাওয়াতে আমিও খেতে চলে যাই। তবে পরে ডায়েরিটা পরতে হবে।

সবাই খেতে বসে ।

তবে কারো অপূর্বর জন্য কোন চিন্তা ই নেই......অপূর্ব পাখিকে নিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে হিমেল এর কাছে পৌছাতে চাইলেই পাখি অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পরে যায়।

অপূর্ব পাখিকে উঠিয়ে হিমেল এর দিকে দেখলে ওরা আর সেইখানে নেই। চীপস ডুপিয়ালি সেও নেই হিমেল ও নেই। কোথায় যাবে ওরা । কি করছে এরা সবাই মিলে?

আমি ঠিক দেখেছি। নাকি মনের ভুল।

পাখিকে আলি বাড়ির সামনে ছেড়ে আমি আশেপাশে খুঁজতে গেলাম। চারদিকে আপছা কুয়াশা। শীতল হাওয়া। একদম গা ঝিমঝিম অবস্থা। কোথাও কোন জনব মানব নেই। পিস্তল টা হাতে নিয়ে চারদিক খুঁজছি। নজরে তেমন কিছু দেখছি না। তবুও কোথায় একটা তো

গড়মিল আছে।এসব ভাবতে ভাবতে বাড়ির দিকে রওনা দিতেই পেছন থেকে চপর চপর আওয়াজ আসে। কেউ বের হচ্ছে ঝোপঝাড় থেকে। আমি ক্ষেতের পাশে ঘাপটি মেরে বসে আছি।আজ দেখতেই হবে ওরা কি করছে।

অনেক ক্ষন থেকে দেখছি, যেদিক থেকে আওয়াজ আসছে। ঝোপঝাড়ে

কেউ আছে কিন্তু কেউ বের হচ্ছে না।

অবশেষে অপেক্ষার প্রহর কাটলো। ঝোপঝাড় থেকে বের হলো, হিমেল সাথে চীপস ডুপিয়ালি। দুজনে এমন ইশারায় কথা বলছে যেন কাউকে মেরে ফেলা,র পরিকল্পনা করছে । ওঁদের থেকে আমার দূরুত্ব অনেক টা । আমি আজ দেখবো ওরা কোথায় যাচ্ছে।ওরা দিগন্ত নদীর

দিকে হাঁটা শুরু করছে। আমিও ওদের পিছু নেই।হাঁটতে হাঁটতে ওরা পৌছে যায় রুশরাজ্যে ,

আমি দেখছি আর অবাক হয়ে যাচ্ছি। শরীর থেকে অঝরে ঘাম ঝরছে।

রুশরাজ্যে থেকে কেউ একজন বের হয়েছে। মুখটা ঘুরানো আমি দেখতে পেলাম না।

কিন্তু আমি ওদের কিছু বলছি না। কারন এদের আস্তানা কোথায় তা আমাকে জানতে হবে। আমি একটা ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে পরি। ওরা তিনজন কথা বলতে বলতে নদীর তীরে অবস্থিত হয়। নদী পথে হাজির হয় একটি স্পিডবোট । তিনজন উঠেই ঢাকার উদ্দেশ্যে চলে যায়।

আমি হতভম্ব হয়ে যাই। হাঁটুঘেরে বসে পরি কি হচ্ছে এসব। হিমেল যে বললো ওরা টুরে গেছে। তাহলে এখানে কেন।কিসের জন্য মিথ্যা বললো।

আচমকা ঘাষের উপর শুয়ে পরেছি। এই চাপ আর নিতে পারছি না। ঠান্ডা হাওয়া, ক্লান্ত শরীরে হঠাৎ চোখ বুঝে যায়।

বেশ কয়েক মিনিট পর অপূর্ব দেখতে পেলো, রুশরাজ্যের ঝোপঝাড় থেকে কেউ একজন বেড়িয়ে আসছে। ভিষন ভয় পেয়ে যাই। অপূর্ব চৌধুরী কখনো কিছু ভয় পায়না সে হঠাৎ আজ ভয়ে চাপসে যাচ্ছে।

রক্তা'ক্ত একজন লোক।

সাদা পাঞ্জাবি,পরনে পাগড়ি,তার পাঞ্জাবি তে রক্তের দাগ।

আমার দিকেই আসছে। আমি আতংক দৃষ্টিতে তার দিকে দেখছি। সে আর কেউ নয়। মৌলবী সাহেব। আমার হাত পা সমস্ত কিছু কাঁপছে। নদীতে অথৈই জোয়ার হচ্ছে।

সে আমাকে বলে উঠলো, অপূর্ব তুমি সত্যর খুব কাছে,খুব কাছে,খুব কাছে, । সত্যর দড়ি তোমার হাতে। তুমিই পারবে এই পাপের খেলা বন্ধ করতে। মৌলবী আহত কণ্ঠে বলে

উঠলো,ওরা আমাকে বাচতে দেয়নি ওরা আমাকে বাচতে দেয়নি,, তুমি এর শেষ করবে।

চট করেই অপূর্বর ঘুম ভেঙে যায়। বুকের ভেতর ধুকবুকানি পরিস্কার শোনা যাচ্ছে। তারমানে এটা দুঃস্বপ্ন ছিলো.... উফ সারাদিন বদ চিন্তায় মাথা যে যাচ্ছে।

তবে এই রহস্যর উন্মোচন আমাকে করতেই হবে। ......জড়ন্ত হিমেল

হাওয়া বইছে। নিশ্চুপ আকাশ। অভিমানী মেঘ। রৌদ্রজ্জ্বল সূর্যের কিরন।সব মিলিয়ে এক অসাধারণ সকাল।

পাখি ঘুম থেকে উঠেই, বেরিয়ে পরে টিউশন এর উদ্দেশ্যে। শীতের সকাল কুয়াশায় আচ্ছন্ন। প্রানপৈত্রিক সরষে ক্ষেত বয়ে গেছে রাস্তার দু'পাশে।

মাঝ প্রান্তর রাস্তায় বান্ধবীদের সাথে স্কুলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে পাখি।

কোন এক অজানা কারনে আনন্দিত সে।

শ্রাবন, সূর্য, শ্যামলী সবাই মিলে নদীর পারে রোদ পোহাচ্ছে। শ্রাবন গিটার বাজাচ্ছে। সূর্য বেসুরো কণ্ঠে গান করছে।

শ্যামলীর বয়স ওদের থেকে বেশি হলেও সে সবসময় মিশুক প্রকৃতির মেয়ে।

অপূর্বর ঘুম দেখে এলিজা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

‘কতটা মায়া মানুষ টার মুখে। যে দেখবে সেই তার অনন্ত মায়ায় পরে যাবে। সারাদিন ক্লান্ত শরীরে ছুটতে থাকে। আসা,মি অ,পরাধি কে শনাক্ত করার ধান্দায়। গতকাল রাতে ঘরে

ফিরেই ক্লান্ত শরীর নিয়ে ঘুমিয়ে পরে।আমি বলেছিলাম আপনি ঢাকা ফিরে যান। কিন্তু সে রাজি নয়। আমাকে একা রেখে যাবে না।

এসব ভাবতে ভাবতে এলিজা গিয়ে ঘুমন্ত অপূর্বর পাশে বসে। ঘুমন্ত স্বামির কপালে মায়াবী মুখে চুমু খায় এলিজা। ফিসফিস করে বলল,আমি চাই,পরকালে কোন এক কারনে আপনি আবার আমার পিছু নেন।

যখনই আপনার চোখে আমাকে হারানোর ভয় দেখি ভেতরটা খুশিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

এলিজা এসব বলে অপূর্বর কাছ থেকে উঠে যেতেই, অপূর্ব পেছন থেকে হাত টা ধরে টান নিয়ে নিজের কাছে বসিয়ে নেয়।

এলিজা থমকে বসে।

অপুর্ব শান্ত স্বরে বলে উঠলো,এত টা ভালোবাসো যদি কোনদিন কারো

বুলেটের আঘাতে শোনো আমি নেই তখন কি করবে।

এলিজা অপূর্বর কথা শুনে আতংক স্বরে বললো,আমি সবসময় সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি , যেন আপনার আগে আমার মৃত্যু হয়।

অপূর্ব: আর আমি চাই এটা না হোক।বলেই মৃদু হাসে।

এবার উঠুন আপনাকে খাবার দেই। আমি এনজিও তে যাবো দরকার আছে।

বেলা ১১ টা—

পাখি টিউশন থেকেই ফিরেই উত্তেজিত হয়ে তার দুলাভাই কে খুঁজতে থাকে।

এলিজা,জয়তুন তারা বার বার জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলে না।

জানতে পারে তার দুলাভাই, নদীর পারে।

দৌড়ে সেখানে চলে যায় নদীর তীরে। পেছনে জয়তুন, রমজান তারাও আসতে থাকে।

অপূর্ব পাখিকে হাঁপাতে দেখে জিজ্ঞেস করে,কি হয়েছে হাপাচ্ছ কেন? কেউ কিছু বলেছে?

পাখি না সূচক মাথা নাড়ে ।

সবাই অবাক হয়ে পাখিকে দেখছে।

কি হয়েছে বুঝতে পারছে না।অপূর্ব পাখির দুই স্বিনাতে হাত দিয়ে, শান্ত স্বরে আবার প্রশ্ন করে ,কি হয়েছে বলো।

পাখি অস্থিরতা নিয়ে বলে উঠলো,ভাইয়া খুশি আজকে স্কুলে আসছে। এবং তোমার দেয়া টাকা দিয়ে পরিক্ষার জন্য ফর্ম করেছে।

পাখির মুখে এই কথা শুনে রমজান,জয়তুন, এলিজা সবাই অবাক হয়ে যায়।

যে মেয়েটা গত দু বছর ধরে ঘরবন্দি,কারো সাথে কথা বলেনি, নিজের মায়ের সাথে ও না সে আজ অপূর্বর কথায় অনুপ্রেরণীত হয়ে নিজেকে প্রদর্শন করছে।

অপূর্ব: দেখবে খুশি চাইলে ,ওর জীবনে অনেক বড় হবে।

ঢাকা——জাহাঙ্গীর সকাল থেকে গম্ভীর মুখে বসে আছে।

কারো সাথে কথা বলছে না। সকালের খাবার টাও সে খায়নি। হাবভাব দেখে মনে হয় কোন এক ফন্দি আটছে। সত্যি ই কি আমার ধারনা ঠিক। নাকি অতিরিক্ত ভাবছি। সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

এসব ভাবতে ভাবতে জয়া প্রশ্ন করেলো,

জয়া: শুনছেন। সকাল থেকে এভাবেই বসে আছেন। কিছু খাননি,আমি আপনার জন্য কিছু নিয়ে আসবো??

জাহাঙ্গীর ধপ করে চেয়ার থেকে উঠ দাঁড়িয়ে কর্কট মেজাজে বলে উঠলো,বলেছি তোমাকে, আমায় নিয়ে চিন্তা করতে! যদি আমাকে নিয়ে চিন্তা ই করতে । তবে আমার

ছেলেকে আমার থেকে দূরে সরাতে পারতে না।

এসব বলেই একটা সিগার ধরায়,চোখ গুলো একদম লাল। দেখে মনে হচ্ছে এখনি রক্ত বের হবে।

জাহাঙ্গীর,জয়াকে আবার ধমকের সুরে বলে উঠলো,

আমার ছেলেকে ঐ তিলকনগর থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে এনে দিবে।

যদি আমার ছেলের কিছু হয়। তবে আমি কাউকে ছারবো না।তোমাকেও না।জাহাঙ্গীর মেজাজ দেখিয়ে ঘর থেকে চলে যায়।

অর্পা দরজার আড়াল থেকে তার বাবার এরকম রুপ দেখে অর্পার ভেতর থেকে রুহ বের হয়ে যাচ্ছে। জয়া মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। কান্না করতে থাকে।

অর্পা এসে তার মাকে শান্ত না দিতে থাকে।

কিন্তু কোন প্রশ্ন করার সাহস পাচ্ছে না।

তবুও জিজ্ঞেস করলো

মা ,বাবা এরকম আচরণ কেন করে? ভাইয়া তিলকনগর তাতে কি হয়েছে? আমাকে বলো না মা!!

জয়া চোঁখের পানি মুছে

বলে উঠলো,তোর বাবা তার ছেলের ভালোবাসায় অন্ধ।

অর্পার খটকা লাগলো।

মায়ের জবাবে সত্যতা পায়নি।

তিলকনগর ——–-নদীর ঘাটে বসে আছে সবাই। সূর্য, শ্রাবন , অপূর্ব বিভিন্ন কথায় মশগুল।

তবে অপূর্ব কোন কিছুতে শান্তি পাচ্ছে না।

তার মাথায় হাজার টা প্রশ্ন তবে কাউকে বুঝতে দেয়না।

এলিজাও বাড়ি নেই। বললো এনজিওর হে,ড অফিস থেকে লোক আসছে কোথায় মিটিং হবে সেখানে গেছে।

তৎকালীন,নদীর তীরে একটা টলার এসে পৌছায়।

শহর থেকে একজন মহিলা এসেছে। বয়স খুব একটা নয়। দেখতেও সুন্দর।

মহিলাটি টলার থেকে নেমে এদিক সেদিক দেখছে। হাব ভাব দেখে মনে হচ্ছে এই গ্রামে নতুন।

হঠাৎ মহিলাটি আমাদের উদ্দেশ্য ই আসে।

অপূর্ব দাড়িয়ে পরে।অচেনা মহিলাটি বললো, আঁচ্ছা ভাইয়া, এখানে

হাশেম আলীর বাড়ি কোথায় বলতে পারেন?

অপূর্ব কিছুটা অবাক হয়ে যায়,

হাশেম একটা স্বার্থপর লোক। নিজের স্ত্রীকে রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। সে থাকলে হয়তো নিরার আজ এমন অবস্থা হতো না। (বললো অপূর্ব মনে মনে)

অপূর্ব: হ্যাঁ চিনিতো। তবে উনি আপনার কি হয়?

অচেনা মহিলাটি বলে উঠে,উনি আমার কিছু হয়না।

অপূর্ব: তবে ওনার খোঁজ করছেন কেন?

মহিলাটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,

একসময় ওনার সাথে আমার সম্পর্ক ছিলো। অনেক ভালোবাসতাম ওনাকে।তবে একটা ভুল বোঝা বুঝির জন্য সম্পর্ক টা ভেঙে যায়।

এরপর উনি নিরা,আপুকে বিয়ে করে নেন।তাই দেখতে আসলাম দাম্পত্য জীবনে তারা কেমন আছে। বলেই মহিলাটি মৃদু হাসে।

এই কথা শুনে, অপূর্ব অবাক হয়ে যায়। শরীর থেকে অঝরে ঘাম ঝরতে থাকে।

তবে,আমরা যে শুনেছি হাশেম দ্বিতীয় বিয়ে করে চলে গেছে।তবে ইনি কে। আর হাশেম যদি,এনাকে

বিয়ে না করে থাকে তবে সে কোথায়।

এসব অপূর্ব মনে মনে ভাবতেই।

প্রশ্ন করলো অচেনা মহিলাটি কে,আপনি যা বলছেন সব সত্যি তো?

মহিলাটি কিছু টা অবাক হয়ে উত্তর দেয়, মিথ্যা কেন বলবো!! যদি মিথ্যা হতো তবে কি এখানে আসতাম!!

অপূর্ব আলি বাড়ির দিকে দেখিয়ে দেয়।

অপূর্ব পেছন থেকে ডেকে মহিলাটি কে জিজ্ঞেস করে, আপনার নাম টা কি? মহিলাটি বললো , আমার নাম রেখা।

বলেই চলে যায় আলি বাড়ির উদ্দেশ্যে।মহিলাটির চলার ধরন একদম ভিন্ন।শাড়ি পরা একদম অন্যরকম, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যাচ্ছে।

অপূর্ব ভাবতে থাকলো, এরকম একজন মহিলার সাথে হাশেম ভাই,কি করে সম্পর্কে জড়াতে পারে। শুনেছি উনি ধার্মিক ছিলো।

সূর্য : ভাই এত ভাবছিস কি? হতে পারে হাশেম অন্য কোন মেয়ের সাথে সম্পর্কে ছিলো।

অপূর্ব: আমি যতটুকু, জানি জয়তুন মামির থেকে শুনেছি,উনি খুব দ্বিনদার একজন মানুষ ছিলেন।

এরকম একজন নারীর সাথে ওনার সম্পর্ক থাকতে পারে না।

সূর্য: তোর কাজ হচ্ছে সবসময় সবাইকে সন্দেহ করা। তাই তোকে বুঝিয়েও লাব নেই।

অপূর্ব ভাবতে থাকলো,আমাকে আরেকবার মামির সাথে কথা বলতে হবে।

অপূর্ব, সূর্য বাড়ির উদ্দেশ্যে চলে যায়।শ্রাবন একা একা বসে আছে কোন অজানা চিন্তায় মশগুল।

এতক্ষণ এখানে কি হলো তা যেন খেয়াল ই করেনি।

আজ এলিজা বাড়ি নেই ।সমস্ত কাজ পাখি করছে।

ডান দিকে ফিরতেই দেখি পাখি কলসি কাঁকে আসছে।, হয়তো নদীতে পানি নিতে আসছে।

শ্রাবন পাখিকে দেখা মাত্রই বসা থেকে উঠে দাঁড়ায়।

শ্রাবন: আমি জানতাম পিচ্চি বেয়ান, আপনি আসবেন।

পাখি: আপনি কি করে জানলেন! আমি আসবো! আজিব কথাবার্তা।

শ্রাবন হিরোদের মত ভাব নিয়ে বলে উঠলো,

শ্রাবন: আমার জন্য শহরের সমস্ত মেয়ে পাগল। তুমিও আমায় এখানে

দেখে কথা বলতে চলে আসলে। পানি নেয়াটা তো বাহানা মাত্র।পাখি: ফালতু বক বক করবেন না।

বলেই নদীর ঘাটে নামে পানি তুলতে।

পেছন থেকে শ্রাবন বলে উঠলো, পিচ্চি ধপাস করে পরে জাইয়েন না।

পাখি: আমি আমাকে সামলাতে পারি।

শ্রাবন ও পাখির সাথে ঘাটে নামে।
পাখি কলসিতে পানি তুলে উপরে উঠতেই পা পিচলে ধপাস করে পরে যেতেই শ্রাবন ধরে ফেলে।
শ্রাবন খিল খিল করে হেসে উঠে।
কি পিচ্চি বললাম না,পরে যাবেন। এখন আমি না থাকলে কি হতো?
হুমমমম
পাখি লজ্জা ভঙ্গিতে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়।

পানির কলসিটা নিচে পরে যায়। শ্রাবন কলসিতে পানি ভরে নিজের কাঁধে তুলে নেয়। পাখি দেখে খিলখিল করে হেসে উঠে।পাখি : আপনাকে যা মানিয়েছে না।

শ্রাবন: ওয়ে পিচ্চি , তোমাকে সাহায্য করছি আর তুমি হাসছো। বলেই বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করে।

পাখি পেছন থেকে শ্রাবন কে পরোক্ষ করছে। পরনে কালো শীতের পোশাক,কালো জুতো,গলাতে চেন, লম্বা টে শরীর মিলিয়ে ভারি দেখাচ্ছে।

শ্রাবন: পেছন থেকে কি দেখছো। পাশে এসো।

পাখি আমতা আমতা করে বলল, আপনি কি করে বুঝলেন আমি আপনাকে দেখছি।

শ্রাবন: মানুষের চোখ থাকে দুটো।

অপূর্ব, সূর্য,রেখাকে অনুসরণ করে হাশেম দের ঘরে চলে যায়।

হাশেমের মায়ের বয়স,৫৬ প্রাই । ছেলে আর বউয়ের শোকে একদম আধমরা হয়ে গেছে।

রেখা গিয়ে হাশেমের মাকে সালাম দিতেই, হাশেমের মা হাতের লাঠি দিয়ে রেখাকে পেটাতে শুরু করে।

কাঁপা কণ্ঠে বলতে থাকে,বেহায়য়া,বে*শ্যা,অন্যর সংসার ভাঙ্গছো,ওহন আইছো কি আমার লা,শ দেখতে!! বলেই হুহু করে কান্না শুরু করে হাশেমের মা।

অপূর্ব: তারমানে ইনি ই তার প্রাক্তন প্রেমিকা। হয়তো আগেও দেখেছে তাই চিনতে পেরেছে।

সূর্য: হয়তো।রেখা ডং করে বলে উঠলো,আসলে আন্টি আপনার

কোথাও ভুল হচ্ছে। হাশেমের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল।তবে তা অনেক আগে।সে আমায় ভুল বুঝে চলে গিয়েছিল। তারপর নিরা কে বিয়ে করে।

হাশেমের মা অবাক হয়।কি বলছে মেয়েটা। হাশেম ওরে বিয়ে করে নাই। তবে কোথায়।

ঘন্টাখানেক পর —

অপূর্ব, সূর্য,রেখা ,আর আনোয়ারা বিবি(হাশেমের মা)

সবাই বসে আলোচনা করলো।

অপূর্ব: যদি আপনার কথা সত্যি হয় তবে উনি কোথায়।

কি হয়েছে তার।

রেখা : আমিও সেটাই ভাবছি কোথায় যাবেন উনি। আর আমি যতটুকু জানি নিরা কে উনি খুব ভালোবাসতেন।

অপূর্ব: কোথাও কোন কারনে ঘাপটি মেরে বসে আছে।

সূর্য: হতেপারে কোন নোং,রা কাজ করেছে তাই ধরা খেয়ে লুকিয়ে আছে।

আনোয়ারা: আমার পোলারে গ্রামের সবাই চেনে ওর চরিত্রে কোন দাগ ছিল না।

একেক জনের একেক কথা অপূর্ব কে অনেক ভাবালো।

হাশেমের মায়ের কথা সে চরিত্রবান একজন মানুষ তবে উনি কোথায়।

রাত ৯ টা–জয়তুন,পাখি দু’জন মিলে অনেক কিছু রান্না করলো।

হাজার হোক, রেখা বাড়ির অতিথি।

হাশেমের মায়ের যা অবস্থা। তার কিছু করা সম্ভব নয়।

এলিজা সকালে বেড়িয়েছে। এনজিও তে কি কাজ। এখনো আসছে না।

কেমন জানি বিষন্ন অনুভূতি হচ্ছে,মনে হয় সব রহস্যের সুত্র আমার সামনে অথচ আমি দেখছি না।বসে বসে ভাবছে অপূর্ব।সবাইকে খাবার দিচ্ছে জয়তুন।

সূর্য, শ্রাবন,রেখা সবাই খেতে বসছে।

অপূর্ব খাবার সামনে গভীর চিন্তায় মশগুল।

হঠাৎ শ্রাবন বলে উঠলো,

হাশেম ভাইয়ের বিষয়টা আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে।
হাশেমের নাম শুনতেই পাখি, অস্থির হয়ে যায়।
কাঁপা কন্ঠে বললো,আমি দেখেছি,আমি দেখেছি,ঐ,ঐ ঐদিন আমি তাকেই দেখেছি।
অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে,কাকে দেখেছো, কি বলতে চাচ্ছ তুমি ?বলো।।পাখি: সেদিন

ঝোপঝাড়ের পেছনে তাকে আমি দেখেছি। তবে উনি খুব রক্তাক্ত অবস্থায় ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল কেউ ধাওয়া করছে।আমি তো কিছু মনে রাখতে পারি না।তাই মনেই পারছিলো না।বার বার শুধু মনে হয়েছে ওনাকে কোথাও দেখেছি। কাছের মানুষ।এখন মনে পরলো।

জয়তুন পাখির মুখে এই কথা শুনে,তার হাত থেকে ধপাস করে পানির জগ টা পরে যায়।
কাপা কণ্ঠে বলে উঠলো, গত ৫-৬ বছর ধরে তার খবর নেই। তাহলে কি হাশেম কে কেউ অপ,হরণ করেছে......সবাই থম মেরে বসে আছে। পাখি এসব কি বললো। পাখি সত্যি ই হাশেম কে দেখেছে। তাও কিনা রক্তাক্ত অবস্থায়। আজ 5

বছর ধরে হাশেম নিখোঁ’জ। বলেছিল সে তার প্রাক্তন প্রেমিকাকে বিয়ে করেছে। কিন্তু সে তো আমাদের সামনে আসলো। সত্যি টা বললো।তবে হাশেম কোথায়।কোথায় লুকিয়ে আছে।নাকি কেউ লুকিয়ে রেখেছে।

এসব ভাবতে ভাবতে অপূর্ব নিশ্চুপ হয়ে নদীর তীরে বসে আছে।

পেছনে পায়ের আওয়াজ কেউ আসছে। তাকাতেই দেখলাম। সূর্য আর রেখা।রেখার চালচলন মোটেই ভালো লাগে না। কি রকম পোশাক পরে। সূর্যের সাথে একদম ঠলে ঠলে কথা বলছে।

এসেই দুজন আমার পাশে বসলো।

সূর্য: ভাই কি ভাবছিস?

অপূর্ব: নতুন আর কি । যা হচ্ছে তাই ভাবছি। সবসময় শুধু মনে হয়

সব কিছু আমার সামনে অথচ দেখছি না।

রেখা : সবসময় সব কিছু সামনে থাকলেও আমরা তা বুঝে উঠতে পারি না।

সূর্য: এসব চিন্তা ছেরে দে যা হবার হবে।

অপূর্ব গা ঘেষা মহিলাটিকে একদম সহ্য করতে না পেরে উঠে গেলো।

এলিজা এনজিও তে গেলো। অথচ এখনো ফিরলো না। কোথাও ওর কিছু হলো নাতো। শ্যামলী কে একবার জিজ্ঞেস করতে হয়।এসব ভাবতে ভাবতে, অপূর্ব শ্যামলী দের ঘরে যায়।

উকি মেরে দেখলো ভেতরে একজন বয়স্ক লোক।

আমি গলায় কাশি দিয়ে বললাম। ভেতরে কেউ আছেন।

কারো কোন সাড়া নেই। আমি ইতস্তত বোধ করেই ভেতরে গেলাম। ভেতরে কেউ নেই। শুধু একজন বয়স্ক লোক। উনি আমাকে ইশারায় বসতে বললো।আমি বসলাম।

শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম। শ্যামলী কোথায়?

উনি কিছু বললো না।

লোকটার পেরালাইসিস। মনে হয় কথা বলতে পারে না।উনি হঠাৎ জানি কেমন ছটফট শুরু করে। আমি আর কিছু বললাম না। ভাবলাম একবার ঘরটা দেখি।

অনেক সুন্দর সাজানো।এদিক সেদিক দেখতেই চোখ পরে একটা ডায়েরির দিকে।

হয়তো শ্যামলীর ডায়েরি। অন্য কারো ব্যক্তিগত জিনিস তার

অনুমতি ছাড়া ধরা ঠিক নয়। তাই আমি চলে যাওয়ার উদ্দ্যেক যখন নেই। ঠিক তখনই চোখ পরে ডায়েরির উপরে অন্য কারো নাম লেখা।

একটা ছেলের নাম । কৌতুহল বসোতো দেখতে গেলেই পেছন থেকে আমার কাদে কেউ হাত রাখে। আমি চমকে উঠে।পেছনে ঘুরতে ই দেখি সূর্য।

সূর্য: এখানে কি করছিস? ওদিকে এলিজা অপেক্ষা করছে।

অপূর্ব; এলিজা চলে এসেছে। আর আমি এখানে ওর খোজ করতেই এসেছি।

আলি ঘরে গিয়ে দেখি।এলিজা ,শ্যামলী ,পাখি , শ্রাবন,সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছে

আর আমি ওদিকে এলিজা কে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ঢাকা———-জাহাঙ্গীর অদ্ভুত আচরন করছে।সবার সাথে খারাপ আচরণ করছে।

জাহাঙ্গীর কর্কট মেজাজে বললো, অর্পা একটা কাগজ কলম নিয়ে আস।আমি এখনই অপূর্ব কে চিঠি লিখবো।

জয়া: কি লিখবে তুমি। এরকম করছো কেন?

জাহাঙ্গীর সাপে,র মত ফসফস করছে।

জয়া আর কিছু বললো না। অর্পা সাহস করে বলে উঠলো, বাবা তুমি ই তো গিয়ে ভাইয়া কে নিয়ে আসতে পারো।যদি এতই তাকে দরকার।

মেজাজ দেখিয়ে জাহাঙ্গীর বললো, আমি যদি যেতে পারতাম তবে আমি

ঠিকি যেতাম।ঐখানে গেলে আমায়......

মাঝপথে কথা থামিয়ে দেয়।

চিঠিটা লেখা শেষ করে।দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অপূর্ব এলিজা কে টেনে নিয়ে বাহিরে চলে যায়।

ম্যাডাম আজকাল দেখছি আমাকে এড়িয়ে চলো। খেয়াল ই করো না আমাকে।

সকালে বেড়িয়ে গেলে । তারপর থেকে সবকিছু খালি খালি লাগছিলো।তা কি বুঝতে পারেন না? হুম?

এলিজা মৃদু হেসে বলল,

আজকে কাজ ছিল। নতুন একজন অফিসার এসেছে।ওনার সাথে সবাই কে পরিচয় করিয়ে দিলো।আর তাছাড়া কিছুদিন পর আমাদের নিয়ে দূরে যাবেন।অপূর্ব: আমি আপনাকে

কোথাও যেতে দিচ্ছি না। এতটুকুর জন্য ও হারাতে চাই না।

এলিজা : আপনার চোখে আমাকে হারানোর ভয় দেখে খুব ভালো লাগে।

অপূর্ব: আর আপনার অনুপস্থিতিতে যে আমি দুমরে মুচরে যাই ম্যাভাম পাখি এলিজাকে খুঁজতে বাহিরে আসতেই।

কেউ মুখ চেপে ধরে নদীর তীরে নিয়ে যায়।

পাখি ছটপট করতে থাকে।

কি করবে ভেবে না পেয়ে হাতে কামড় দেয়।

ওমনি ধপাস করে নিচে পরে গিয়ে চেঁচাতে থাকে।

বাঁচাও , বাঁচাও কেউ আমায় অপহরণ করছে।

ওমনি পেছন থেকে আবার মুখ চেপে ধরে,

পেছনে ঘুরে দেখে শ্রাবন।শ্রাবন: আরে বাবা অপহরণ করছি না। বাঁচ্চাদের মত চেঁচামেচি করছো কেন।?

পাখি : অসভ্য লোক। আপনি আমাকে ধরে নিয়ে আসলেন,তাও এভাবে।

শ্রাবন উঠে দাঁড়িয়ে বললো,

আমার হাত শেষ। কি দাঁড়ালো তোমার দাঁত গুলো।দেখি একটু পাখি খিল খিল হেসে উঠে।

শ্রাবন: ঐ পিচ্চি এভাবে হেসো না। পাগল হয়ে যাই যে।

চারদিকে চাঁদনির আলো।বয়ে যাচ্ছে নদীর স্রোত।মাঝীরা জ্বাল ফেলছে।

পাখি : কেন এনেছেন এখানে? কিছু বলবেন।শ্রাবন: বলতে চাই তো

অনেক কিছু ।শোনার ইচ্ছা কি তোমার আছে।

পাখি ; হেয়ালি না করে বলেন। কেউ দেখে ফেললে সমস্যা হবে।

শ্রাবন: হাজারটা সমস্যার বিনিময়ে যদি আপনাকে পাই। তাহলে দেখুক সবাই।

পাশ থেকে একটা লোক নৌকা বেয়ে যাচ্ছে। আর বলছে।

চালিয়ে যাও চালিয়ে যাও,ভালো মানিয়েছে।

শ্রাবন: দেখতে হবে না জুটি টা কাদের।

পাখি : দেখেন যদি কিছু বলার হয় তো বলেন।

শ্রাবন: তুমি এখনো বুঝলে না কি বলবো।

পাখি কিছুক্ষণ থম মেরে থেকে বললো, যদি কিছু বলার থাকে সবার

সামনে বলেন। লুকোচুরি আমার ভালো লাগে না ।পাখি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হতেই।

শ্রাবন বলে উঠলো।,

ঐযে জ্বীন আসছে।

বলতেই পাখি পেছন ফিরে শ্রাবন কে ভয়ে জড়িয়ে ধরে।

শ্রাবন খিল খিল করে হেসে উঠে।

কি পিচ্চি কেমন দিলাম।

পাখি কিছু বলছে না।

শ্রাবন: আরে পিচ্চি কিছু নেই।আমি আছিতো আমি থাকতে কে তোমায় কি করবে।এলিজা ঘরের ভিতর চলে যায়।

অপূর্ব রাস্তার দিকে বের হয়। চিন্তায় মশগুল ।কি হচ্ছে চারদিকে ?হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে যায়।

অপূর্ব দূর থেকে দেখতে পায় , চীপস ডুপিয়ালি আর রেখা। দ্রুত

পায়ে কোথাও যাচ্ছে। অপূর্ব আড়চোখে দেখলো। ভাবছে,
এটা কি করে হতে পারে। রেখার সাথে চীপস এর কি সম্পর্ক?
রেখা তো হাশেম এর প্রাক্তন। তবে এই রেখা ই হাশেম কে লুকিয়ে রাখেনি তো। ......অপূর্ব সামনে যাবে না পেছনে বুঝতেই পারলো না। কারন কিছুক্ষণ আগেই তো রেখা

কে সূর্যের সাথে দেখলো। অপূর্ব যেতে যেতে দেখলো।

রেখা চীপস ডুপিয়ালি দিগন্ত নদীর তীরে যায়।

অপূর্ব দ্রত পায়ে যেতে থাকলেও গিয়ে আর রেখা কে পায়নি। রেখা চীপস ডুপিয়ালি দু'জনেই মিলে একটা স্পিড বোডে করে চলে যায়। অপূর্ব এবারো অপরাধীদের ধরতে ব্যার্থ হয়।

আমি নিশ্চিত রেখা হাশেম নিখোঁজ হওয়ার পেছনে দায়ী।

তবে খুব শিঘ্রই ধরে ফেলবো।এদের রহস্য আমি বের করবোই। অপূর্ব নিজেই নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করে।

এলিজা সবার জন্য রান্না করছে।

শ্রাবন, সূর্য বিভিন্ন আড্ডায় মশগুল।

পাখি বারান্দায় বসে পরছে। কিন্তু কোনভাবেই পরাতে মন বসাতে পারছে না।বার বার শুধু শ্রাবন এর

কথা গুলো কানে ভাসছে।পাখি খাটের উপর বসে পড়ছে।আর ভাবছে,,

কি চায় উনি,কেন আমার সাথে এরকম করে।তবে কি সে .. ।না এ আমি কি ভাবছি হয়তো,ছোট বেয়ান হিসেবে মজা করেন। কারন উনি কত বড়।কতটা উচ্চ বংশের ছেলে। তার সাথে তো আমার যায় না।

পাখি এসব ভাবতে ভাবতে, হাতে তুরি মেরে শ্রাবন ভাবনা ভেঙ্গে দেয়।

শ্রাবন: কি ভাবছেন পিচ্চি বেয়ান? পড়া রেখে কোন ভাবনায় মশগুল শুনি ?

পাখি : কোথায় আমি ভাবছি । আমি তো পড়তেই ছিলাম। আপনি এসে আমার পড়াটা নষ্ট করে দিলেন।

শ্রাবন: একটা কথা বলতে এসেছি। তোমাদের পুনর্মিলনী তে তুমি

উপস্থিত থাকবে। লাল চুড়ি, পায়ে নুপুর,আলতা পায়ে, সেখানে থাকবে।

পাখি: কিসের জন্য?

শ্রাবন: কারন আমি কল্পনাতে দেখেছি তোমাকে এই সাজে খুব সুন্দর দেখাবে। বুঝলে!?

বলেই শ্রাবন চলে যায়।

পরদিন সকালে —

সূর্যর ঝরাতে এক অন্য রকম দিন নিয়ে আগমন ঘটে নতুন দিনের।

কুয়াশায় আচ্ছন্ন সাথে সূর্য মামার কিছুটা ঝলক দেখা যাচ্ছে।সবাই ঘুমন্ত অবস্থায়।

হঠাৎ এক লোক এসে আলি বাড়িতে হাজির হয়

।আলিকে ডাকতে থাকে। ঘুমন্ত চোখ নিয়ে বেড়িয়ে আসে এলিজা। লোকটি এলাকার ডাকপিয়ন। এলিজাকে বললো,ঢাকা থেকে অপূর্বর জন্য চিঠি এসেছে।বলেই

চিঠি দিয়ে লোকটি চলে যায়।বেড়িয়ে আসে অপূর্ব,এলিজার হাত থেকে চিঠি টা নিয়ে দেখলো, অপূর্বর মা অসুস্থ। তারাতাড়ি ফিরতে বলা হয়েছে। জয়ার হার্টে সমস্যা। অপূর্ব বিশ্বাস করলে, তৎক্ষানিক রওনা হয় ঢাকার উদ্দেশ্যে।

এলিজা যেতে রাজি হলো না।তার বোনের পরিক্ষা।

অপূর্ব বললো তুমি পাখিকে আমাদের সাথে নিয়ে চলো।অর্পার সাথে টিউশন করবে। এলিজা বললো, আপনার সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিলাম। কিন্তু আজ নয় আমরা একদিন পর যাবো। আর মা অসুস্থ নয়।

অপূর্ব অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে এলিজার দিকে কি বলছে এসব।

অপূর্ব: কি বলছো এসব তুমি এতটা নিশ্চিত কি করে হতে পারো ?

এলিজা : আমার মানুষ চিনতে সময় লাগে না। যদিও কিছুটা সময়ের ব্যবধানে হয় তবে চিনতে পারি। আপনার বাবা আপনাকে এখান থেকে নেয়ার জন্য মিথ্যা বলেছে।

অপূর্ব কি বলবে বুঝতে পারলো না।

এলিজা: পাখির স্কুলে আজ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান।ঐখানের ম্যাডাম

আমাদের যেতে বলেছে। যাবেন তো ?
অপূর্ব: যাবো তো অবশ্যই।কারন সেখানে গান গাওয়ার জন্য যে শ্রাবন কে বলা হয়েছে। তা দেখতে তো যেতেই হবে।
সবাই মিলে আড্ডা বসিয়েছে। এলিজা রান্না করছে। রমজান বাজার থেকে অনেক কিছু নিয়ে আসছে।

মেহমানদের শেষ আপ্যায়ন করতে হবে।

অপূর্ব সূর্য ঘরের সামনে চৌকিতে বসে আছে।

সূর্য: পরশু রেখা যখন এখানে এসেছে তখনই আমার সন্দেহ হয়েছে।

অপূর্ব: কিন্তু এই রেখার সাথে চীপস ডুপিয়ালির সম্পর্ক কি।আর সব থেকে বড় কথা হলো। রেখা আমার

থেকে একটা জিনিস নিতে এসেছিল।সুর্য : কি বলছিস ? কি নিতে এসেছিল?

অপূর্ব: চীপস ডুপিয়ালির পরে পাওয়া ওয়ালেট।

সূর্য : কি করে বুঝলি ?

অপূর্ব: রেখাকে যেদিন প্রথম দিন দেখেছি সেদিন ই সন্দেহ হয়েছিল । আর রেখা মুসলিম নয় খ্রিষ্টান।

সূর্য: কি বলিস ? কি করে বুঝলি?
অপূর্ব: সেদিন আমি ওর বাম হাতে একটা চিন্হ দেখতে পেয়েছি। তখনই বুঝেছি।আর এই জন্য হাশেম সম্পর্ক ভাঙে।
আর আমি ইচ্ছে করেই চীপস ডুপিয়ালির ওয়ালেট টা ওকে দেখিয়ে চৌকির নিচে রেখেছি।

এবং ইচ্ছে করেই ঘর থেকে বেড়িয়ে রাস্তায় গিয়েছি।সেই সুযোগে এখান থেকে চলে যায় রেখা।

সূর্য : ও মাই গড। ইউ আর এ সাচ্চা ব্রিয়িলান্ট। কিন্তু এতে কি লাব হলো।

অপূর্ব: কারন আমি দেখতে চেয়েছিলাম । রেখা চীপস এর লোক কিনা। আর চীপস ডুপিয়ালির হাতেও একই চিন্হ ছিলো। আমি

চাইলে গতকাল ওদের ধরতে পারতাম কিন্তু বেখেয়ালির জন্য পিস্তল টা রেখে যাই।

তবুও সমস্যা নেই ।ধরে ফেললো।

কারন যার শুরু আছে তার শেষ ও আছে।

বলেই অপূর্ব উঠে দাড়ায় ।

পাশ থেকে শ্রাবন হা করে অপূর্বর দিকে তাকিয়ে আছে।কি বুদ্ধি মত্তা।

আমার তো মনে হচ্ছে অপূর্ব মনে

মনে কোন ফন্দি আটছে।সকাল হয়ে যায়। সবাই তিলকনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে হাজির হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে শহর থেকেও অনেক মানুষ আসছে।

সন্ধ্যা নাগাদ সবাই তৈরি হয় অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য।

এলিজা,শ্যামলী , অপূর্ব সূর্য সবাই যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়। শ্রাবন সে আগেই চলে যায়।

পাখি শ্রাবন এর কথা মত।পায়ে আলতা নূপুর,হাতে চুরি পরেছে। মনে মনে ভাবছেও রাতে পরলে এগুলো কিভাবে দেখবে। লোকটা আসলেই অদ্ভুত।

একে একে সবাই হাজির হয় অনুষ্ঠানে। অনেক মানুষ জমেছে।

অনেক মেয়েরা শ্রাবন কে নিয়ে আলোচনা করছে। শ্রাবন কে অনেক ই চিনে।বলতে গেলে অনেক মেয়েরাই তাকে দেখার জন্য আসছে। এবং তার গান শোনার জন্য।

শুরু হয় অনুষ্ঠান।শিক্ষকদের সম্মান, বক্তৃতা থেকে শুরু হয় অনুষ্ঠান। সবাই খুব চুপচাপ। কেমন জানি আমেজ নেই।

৩ নাম্বার সিরিয়ালে বসে আছে ,পাখি এলিজা সহ সবাই।

হঠাৎ উপস্থাপক বলে উঠলো,এবার আমাদের মাঝে সংগীত গেয়ে শোনাবে। শ্রাবন চৌধুরী।

এটা বলা মাত্রই সমস্ত ছেলে মেয়েরা হইহই করে উঠে। চারদিকে কোলাহল পরে যায়।

মঞ্চে উপস্থিত হয় শ্রাবন।সবাই তার দিকে চেয়ে। কিন্তু সে এদিক সেদিক

পরোক্ষ করে খুজছে অন্য কাউকে। হঠাৎ ই চোখ পরে ৩ নম্বর সাড়িতে। পাখি তার কথা মত , সেজেছে। হাতে লাল চুরি,আলতা, নূপুর।হাজারো নারীদের ভিরে শ্রাবন এর চোখ যেন পাখির নিশানায়।

গান গাইতে শুরু করবে ঠিক তখনই বলে উঠলো,

লাল চুরি,পায়ে আলতা, সাথে নূপুরে আপনাকে অসম্ভব সুন্দর লাগছে।

শ্রাবন এর মুখে এরকম কথা শুনে সবাই অবাক দৃষ্টিতে এদিক সেদিক দেখে কাকে বলছে।–শ্রাবন বললো,তাই – গানটি আপনার জন্য –

সবাই অবাক হয়ে যায়। কাকে বলছে। এদিক ওদিক সবাই দেখতেই।

শ্রাবন গাইতে শুরু করে

*তোর লাগি পরান আমার একা একা কান্দি।কোথায় যেন সে লুকিয়ে আছে, গহিন বনে।

ও পরান বন্ধুয়া ,ও পরান বন্ধুয়া।

ও পরান বন্ধুয়া আমায় ভুইলো না। কাছে থাকো না ,দূরে যাই ও না ।

লাল চুরি হাতে , নূপুর ও পরে ,নেবো যে তোকে ,আলতা রাঙা পায়ে। তোর লাগি পরান আমার

একা একা কান্দি ,কোথায় যেন সে লুকিয়ে আছে

গহিন বনে.........

গানটা শেষ করেই শ্রাবন বলে উঠলো,হেই পিচ্চি বেয়ান সেদিন বলেছিলে, লুকোচুরি তোমার পছন্দ নয়।যা বলবো সবার সামনে। তাই আজ হাজারো মানুষের সামনে বলছি।—

আমি তোমাকে ভালোবাসি পাখি – আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। সবাই কোলাহল শুরু করে দিয়েছে। কাকে বলছে সবাই চারদিক খুঁজছে। পাখি লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। মনে মনে বলতে থাকলো,, ছেলেটা সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। অপূর্ব সূর্য এলিজা সবাই থম মেরে পাখিকে দেখছে।

শ্রাবন গিটার , মাইক্রো টা রেখে। দৌড়ে
নিচে চলে আসে ।সবাই শ্রাবন কে দেখছে ।শ্রাবন সবাইকে উপেক্ষা করে। পাখির সামনে হাটু ঘেরে বসে বলে উঠলো,,
ভালোবাসি আমি আপনাকে,, এভাবে সারাজীবন ভালোবাসতে দিবে? আমিতো আমার কথা রেখেছি হাজারো মানুষের মাঝে আমার প্রেম

উৎসর্গ করেছি। শুধু মাত্র আপনার জন্য।

আশপাশ থেকে সবাই কোলাহল সৃষ্টি করে। কে সেই মেয়েটা তাকে দেখার জন্য ।দেখতে দেখতে কেটে যায় (১.৫) দের মাস ---

চারদিকে শষ্য বিন্যাস। সূর্যের কিরন। বসন্তের আহ্ববান। বসন্ত প্রতিটা মানুষের জীবনের রং- কেই পরিবর্তন করে নতুন এক পরিচ্ছেদ

আনে।কেউ পায় নতুন জীবন।তো কেউ নতুন বন্ধু।আর আমার জীবনে এসেছে। পাখি। সেদিন প্রথম যখন ওকে রাস্তার বাকে দেখি। তখনই ভালো লেগে গিয়েছিল। বলতে গেলে ভালোবাসার প্রথম ধাপ। পাখিকে পেয়ে জীবন টা যেন নতুন ভাবে শুরু হলো। হয়তো জীবনের অধ্যায় প্রিয় মানুষের জায়গাটা অপূর্ন রাখা যায় না। সময়ের সাথে সাথে পূর্ন

করতেই হয়। কখন যে কে বসন্তের ফুলের মত সুবাস নিয়ে আসে তা বলা যায়না।

এতগুলো দিন যে কিভাবে কেটে গেলো জানা নেই। সেদিন বিয়ের প্রস্তাব দিলে পাখির বাড়ির লোক রাজি হয়।

আমার বাড়ির লোক অমত ছিল। কিন্তু ভালোবাসার জন্য রাজি করিয়ে নিতেই হয়। ভালোবাসা দিবসের

দিন বিয়ের তারিখ। তারপর পাখির পরিক্ষা তাই তার আগেই বিয়েটা সেড়ে ফেলতে চেয়েছি। তারাও রাজি হয়।

শ্রাবন এসব ভাবতে ভাবতে,পেছন থেকে জাহাঙ্গীর গলায় কাশি দিয়ে বললো,

জাহাঙ্গীর : কি শ্রাবন আজকাল একা একাই দেখছি হাসিস। থানাতে যাস না।

শ্রাবন : অপূর্ব আছে তো ও সামলে নেবে।আমি ছুটি নিয়েছি।

জাহাঙ্গীর: ছেলেটাকে একা একা রেখে এলি?

শ্রাবন কৌতুহল নিয়ে বললো , আচ্ছা কাকা তুমি সারাদিন অপূর্ব কে নিয়ে চিন্তায় থাকো কেন। কি হয়েছে ওর। কি সমস্যা বলবে?

জাহাঙ্গীর সিগার টা টানতে টানতে চলে যায়। কোন কথার জবাব দিলো না।

শ্রাবনের অদ্ভুত লাগলো।

ডিসি সাহেব: অপূর্ব আমরা খোঁজ পেয়েছি একটা সংস্থান থেকে।

অপূর্ব: স্যার কিসের খোঁজ?ডিসি সাহেব: যা হচ্ছে চারদিকে,সিরি,য়াল কি,লার কে নিয়ে।

সেই সংস্থানে কেউ নাকি ৫ কোটি টাকা দিয়েছে। শুধু মাত্র হৃদ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করার জন্য । তবে এই টাকা কে বা কারা দেয় তা নাকি তাদের অজানা।

অপূর্ব: স্যার আমরা খুব শীঘ্রই একে ধরে ফেলবো। বেশি একটা দিন সে যেই হোক লুকিয়ে থাকতে পারবে না।

ডিসি সাহেব চেয়ারে বসলো।

অপূর্ব বললো,স্যার একটা কথা বলার ছিল, আমার ভাইয়ের বিয়ে তো আমি কয়দিন দায়িত্ব থেকে অব্যাহিত থাকতে চাই।

ডিসি সাহেব: অবশ্যই। ভালো করে আনন্দ করো।— আগামীকাল শ্রাবনের বিয়ে। তবে ঘটা করে হচ্ছে না। কারন পাখির পরিক্ষা আর , শ্রাবনের বাবাও চলে যাবে বিদেশ।

ছেলে পক্ষ থেকে শুধু শ্রাবন আর ও মা বাবা।

অপূর্ব মেয়ে বাড়ির ভূমিকা পালন করবে।কারন রমজান একা সবকিছু সামলাতে পারবে না।

বিয়ের তারিখ ঠিক করা হয় পহেলা ফাল্গুন। (১৪ ই ফেব্রুয়ারি)

শ্রাবন মহাখুশি, আগামীকাল তার প্রিয় মানুষ টা নিজের হয়ে যাবে। সমস্ত রাত সে জেগে আছে । আর

মাত্র কয়েকটা। বসে বসে সময় গুনছে।অবশেষে নতুন দিনের আলোয় আলোকিত হয় পূর্ন সকাল। চৌধুরী বাড়ি ঘটা করে না হলেও অল্প করে সাজানো। বউ দেখতে ইতিমধ্যে অনেক এ চলে আসছে। শ্রাবন ঘুম থেকে উঠে শেরওয়ানি পরে নেয়।

খুব উৎফুল্ল সে। জয়া জাহাঙ্গীর তাদের কাজ থেকে বিদায় নিলো।

জাহাঙ্গীর কে সাথে নিতে চাইলে কোন মতেই তিলকনগর যেতে রাজি হলো না।

শ্রাবন,পলাশ,মিদুল ও শ্রাবনের বাবা রওনা হয়।

যেতে যেতে শ্রাবন,পলাশ সবাই মিলে হাজারো কথায় আচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ সময়ের মধ্যে পৌছে যায় তিলকনগর।

কিন্তু, শ্রাবন সহ সবাই অবাক হয়ে যায়। বিয়ের গেঁটে কোন মানুষ নেই। আমাদের নিতে কেউ আসলো না। অপূর্ব ও বা।কৌতূহল বসোতো ভেতরে গেলেই যা দেখে তা দেখার জন্য শ্রাবন মোটেই প্রস্তুত ছিল না। শ্রাবনের পায়ের তলার থেকে মাটি সরে যায়। সমুদ্র টা আচরে পরেছে। এটাই হয়তো জীবনের শেষ দিন।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে পাখির দিকে।

পাখি বধু সেজে বসে আছে। জামাই হিসেবে বসে আছে অন্য কেউ। রমজান তাদের দুজনকে হাতে হাতে তুলে দিলো।পাশে দাঁড়িয়ে অপূর্ব,এলিজা । তারা সবাই হাসছে। শ্রাবন থমকে দু কমদ পেছনে সরে যায়।এ আমি কি দেখছি।এটা কি করে হতে পারে। এটা দুঃস্বপ্ন

নয়তো। পাখি তো আমাকে ভালোবাসতো। আমার কিছু হলে যে পাগল হয়ে যেতো সে অন্য কারো সাথে বধু বেসে বসে আছে......। পূরো পৃথিবীটা ভস্য হয়ে গেছে। ভেতর থেকে রুহ টা বের হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি ও যেন থমকে গেছে। অপূর্ব আমার দিকে দেখলো। আমার চোখে চোখ পরতেই।চোখ আচমকা সরিয়ে ফেলে।অপূর্ব বলে

উঠলো,বিয়ে সম্পুর্ন। এবার বিদায়ের পালা।

এ আমি কি শুনছি। কি বলছে ওরা। পাখি কে একটা পালকিতে উঠিয়ে দিলো।সে চলে যাচ্ছে। একটা নজর আমার দিকে ঘুরেও তাকায় নি।কি হলো এটা।

শ্রাবন মাথার পাগড়ি টা ফেলে পালকি থামিয়ে দেয়। সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়।

পাখি কে পালকি থেকে শ্রাবন জোর করে নামায়।

শ্রাবন ঘৃনার ভঙ্গিতে বলে উঠলো, ছলনাময়ী, কালনাগিনী তুই আমার সাথে বেইমানি করলি। আমার বিশ্বাস নিয়ে খেলা করলি।

রাগে শ্রাবণের চোখ থেকে র'ক্ত ঝরছে।

পাখি কিছু বললো না।

শ্রাবন আবার বলতে শুরু করলো,

কিভাবে এটা করলি জবাব দে! জবাব দে!
শ্রাবণ অপূর্বর কাছে গিয়ে ভেজা কন্ঠে বললো,,এই অপূর্ব ,ভাই আমার বলনা এখানে কি হয়েছে? বউমনি তুমি বলো না কি হয়েছে।
সবাই চুপ কেউ কোন কথা বলছে না।পাখি: আমাকে যেতে দিন।আর আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করার আপনার কোন অধিকার নাই।আর

আমি আপনাকে ভালোবাসি না।সবই অভিনয় ছিলো।কারন আমি রাশেদ কে ভালোবাসি।ওর সাথে ঝামেলা হয় তাই কিছুদিন কথা হয়নি। কিন্তু এখন আবার সব ঠিক হওয়াতে ওকেই বিয়ে করলাম। পথ ছাড়ুন যেতে হবে।

শ্রাবন থমকে যায়। ভেতরটা দুমরে মুচড়ে যাচ্ছে। শরীরের সমস্ত শক্তি

মূহুর্তে ফুরিয়ে গেছে। পাখি চলে যায়।

এটা কি করে হতে পারে।আমি কি তোমায় চিনতে ভুল করেছিলাম। সত্যি ই কি ভালোবাসার মাঝে ছলনা ছিলো।

বলেই চোখ থেকে অঝরে পানি পরতে থাকে।অপূর্ব: ভেঙে পরিস না।সব ঠিক হয়ে যাবে।

শ্রাবন ঘৃনা জড়িত কন্ঠে বললো, তুই কি করে পারলি।বলনা কি হয়েছে হঠাৎ।

অপূর্ব কি বলবে বুঝতে না পেরে ঘরের ভেতর চলে যায়।

শ্রাবন নিজেকে সামলাতে পারছে না।

ঘৃনা হচ্ছে পাখির জন্য, মুখোশোর আড়ালে থাকা ছলনাময়ী কে আমি চিনতে পারিনি।

শ্রাবন বাড়ি ফিরে সমস্ত জিনিস ভেঙে চুরে একাকার করে ফেলে।
কি করবে বুঝতে পারছে না।
অভিমানী ভঙ্গিতে বললো,তুমি যদি একবার আমার জীবন টা চাইতে,আমি নির্দ্বিধায় আমার বুক পেতে দিতাম।
আমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য মায়ার ছলনা করার কি দরকার ছিলো।

মৃত্যুর থেকেও যে এই যন্ত্রনা বিষাক্ত ।

তিলকনগর —অপূর্ব ভারি একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেলে বললো, শ্রাবন এর সাথে এটা করা কি আমাদের উচিত হয়েছে?

এলিজা: আর কোন উপায় ছিলো না আমাদের। শ্রাবন ঘৃনা করে তার প্রিয় মানুষ টিকে হয়তো ভুলতে পারবে । কিন্তূ ভালোবেসে হারালে

সেই বেথা যে সহ্য করতে পারতো না।

শ্রাবন ঘরের এক কোনেতে বসে আছে।কারো সাথে কথা বলছেনা। পলাশ কে দিয়ে অনেক গুলো সিগারেট,ও এ্যালকোহ,ল আনিয়েছে। একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে থাকে,

পাখি এমনটা কেন করলো কেন মিথ্যা মায়ায় জড়িয়ে এভাবে আমাকে

হ’ত্যা করলো।আমাকে কষ্ট দেয়ার হলে অন্য ভাবে দিতো।কতটা গভীর ভালোবাসার অভিনয় করেছিলে। আমি সত্যিই বোকা।

বলেই অদ্ভুত হাঁসি দেয়,আমি তোমার অভিনয়ে হার মেনে গিয়েছি। একবার যদি বলতে আমার হৃ,দয়টা কে,টে দিয়ে আসতাম । তবুও এভাবে কেন কাঁদালে।

শ্রাবন এর আহা,জারি তে চারদিক নিশ্চুপ হয়ে গেছে।

অপূর্ব ঢাকাতে চলে আসে।থানা থেকে খবর পাঠানো হয়। অপূর্ব রাতেই বাড়ি ফিরে আসে। সর্ব দিক ঘোলাটে লাগছে। শ্রাবন এর জন্য অনেক খারাপ লাগছে। শ্রাবন এর ঘরের সামনে এসেও অপূর্ব থমকে দাঁড়ায়। শ্রাবনকে ডাকার আর সাহস

হলো না। কি উত্তর দিবো ।কোন উত্তর নেই।চলে যায় নিজের ঘরে।

অপূর্ব ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,নিজের চোঁখের সামনে তার প্রিয় মানুষটি কখনো অন্যের না হয়ে যায়।

রাত অনেক কিন্তু কেউ ঘুমোয়নি। অপূর্বর মাথায় অনেক কিছু ঘোরপাক খাচ্ছে। কি হচ্ছে এসব । চারদিক যেন কারো অভিশাপে লিপ্ত।

সবসময় মনে হয় , সমস্ত রহস্যের সূত্র এক সুতোয় বাঁধা। কিন্তু ছুঁতে পারছি না। আদোয় কি আমার ভাবনা সঠিক।এসব ভাবতেই, অপূর্বর পেছন থেকে কেউ কাঁদে হাত রাখে। পেছন ঘুরে দেখে তার মা।

অপূর্ব শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলো, মা, বাবা কেন আমাকে এক মুহুর্তের জন্য দূরে রাখতে চাননা ? দু- দুবার

আমাকে মিথ্যা বলে তিলকনগর থেকে এনেছে কেন মা?

জয়া কি বলবে বুঝতে না পেরে বললো, বাবা তোর ভালোবাসায় অন্ধ।সে চায়না তোকে দূরে রাখতে ।তাছাড়া চারদিকে যা হচ্ছে।অপূর্ব খেয়াল করলো,জয়া চোঁখে চোখ রেখে কথা গুলো বলতে পারলো না।

কি লুকোচ্ছো মা।মা কি সত্যি বলেছে। না মিথ্যা।নাকি আমার ধারনা ভুল।

এসব ভাবতেই, অপূর্ব তার মাকে এড়িয়ে ছাঁদে চলে যায়।

আজ খুব একাকিত্ব অনুভব হচ্ছে,এলিজা আমার সাথে ফিরলো না।বলে এনজিও থেকে লোক যাবে তিলকনগর। ম্যাডাম কে ছাড়া যে থাকতে, খুব কষ্ট হয়। কিন্তু ম্যাডাম

বুঝলো না।অপূর্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।তারা গুলো দেখছে আর ভাবছে, তারাদের মধ্যে একটা তারা রায়হান,একটা সাদিক। ওরা আমাকে উপর থেকে দেখছে।কত স্মৃতি ওদের সাথে ।কি করে ভুলে যাবো। এতদিন হয়ে গেলো আজ ও ভুলতে পারলাম না।আর ভুলতে চাই ও না।

খুব মনে পরে সাদিক কে, নিজের জীবন কে কোরবান করে আমার জিবন টাকে দিয়ে গেলো।কি করে সোধ করবো এই ঋন?....সূর্যর দর্পনে নিয়ে হাজির হলো নতুন একটি দিন। অপূর্ব অফিসে চলে যায়।অর্পা পরিক্ষা দিতে গিয়েছে। মনোরা রান্না করছে।মনজুরা বাড়িতে নেই। না বলে বলেই হুটহাট অদৃশ্য হয় বলতে গেলে। কাউকে কিছু না

বলেই চলে যায়।মমতাজ সকাল থেকে গম্ভীর মুখে বসে আছে। ভেতরটা তার কাঁদছে। শ্রাবন তার একমাত্র ছেলে।কত আনন্দেই না ছিল ছেলেটা । সারাদিন হইহই করে বেড়াতো।গান গাইতো। কিন্তু গতকাল এর পর থেকেই ছেলেটা নিশ্চুপ।ঘর থেকে এখন পর্যন্ত বের হয়নি।ছেলের এমন অবস্থা যেন আমাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

আমার হাসিখুশি ছেলেটার মুখ থেকে যে হাঁসি কেড়ে নিয়েছে আল্লাহ যেন ওর জীবন থেকে ও সুখ কেড়ে নেয়।

বলেই ভারি একটা দ্বীর্ঘশ্বাস ফেলে মমতাজ।জয়া : আমার কোথাও গড়মিল মনে হচ্ছে।পাখি মেয়েটা খারাপ নয়। এলিজা যেমন ভদ্র,নম্র সৎ তেমনি পাখিও। অপূর্বর কাছে শুনেছি পাখি , শ্রাবন এর জন্য

পাগল ছিল ।কিন্তু হঠাৎ এমন করলো ,বিষয়টা মাথায় আসছে না। মমতাজ কর্কট মেজাজে বললো,পাখি একটা কালনাগিনী। আমার ছেলেটার জীবন থেকে হাঁসি কেড়ে নিলো। শ্রাবন ঘর থেকে বের ই হচ্ছে না। সকালের খাবার দরজার সামনে পরে আছে।

সিগারেট টানতে টানতে উপরের দিক ধোঁয়া ছেড়ে কাঁপা কন্ঠে বললো,

ঐ পিচ্চি বেয়ান, তোমার ঐ বিষা’ক্ত ছোবলে আমি সত্যি ই মরে যাচ্ছি। কতটা নিষ্ঠুর তুমি। আমি এতটা বোকা।যে,আমি তোমাকে চিনতে পারলাম না। বলেই অশান্ত মন নিয়ে হেঁসে দেয়।

তোমার ঐ শরীরের ঘ্রাণ যখন অন্য পুরুষ শুকবে তখনই কেন আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হলো না।

শ্রাবন এর আর্তনাদ এ যেন চারদিক একাকার। শ্রাবন এর দর্পনে সব নিস্তার।ওর দীর্ঘশ্বাস এর আগুনে যেন সব পুড়ে যাচ্ছে।তিলকনগর

—–

রমজান জয়তুন কে উদ্দেশ্য করে বললো,আমরা যা শ্রাবন ছেলেটার সাথে করেছি তা কি ঠিক করেছি। জয়তুন পান বানাতে বানাতে উত্তর দিলো,আমরা কি করতাম পাখির

সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিলো!!যা হবার হয়েছে।

রমজান আতংক স্বরে ফিস ফিস করে বললো, শুনেছো আমি একটা জিনিস খেয়াল করেছি!

কি হয়েছে আবার?

রমজান: শ্যামলী আজ অনেকদিন ধরে বাড়িতে নেই। কোথায় যেন যায়।দুদিন পর পর আবার ফিরে

আসে। কিন্তু এবার অনেক থেকে ই দেখছি না।

জয়তুন: তা দিয়ে আমাদের দরকার কি! বাদ দেও।শ্যামলী কেমন আমরা তো জানি। উল্টো পাল্টা কিছু বলার দরকার নেই।রমজান,শান্ত স্বরে বলল, এলিজা কোথায়?

জয়তুন বললো- শুনেছি এনজিও তে কারা এসেছে। তাদের নিয়ে দূরে মিটিং হবে। সেখানে হয়তো।

ঢাকা–

অপূর্ব থানাতে একটা কেস নিয়ে ঘাটছে।ঠিক তখনই একজন মহিলা কনস্টেবল তার কাছে আসে।

অপূর্বর পা থেকে মাথা পর্যন্ত পরোখ করে।কত সুদর্শন পুরুষ।লম্বাটে শরীর,হাতে লোম,জোড় ভ্রু,চোখ গুলো সবসময় লাল হয়ে থাকে। দেখে মনে হয় নেশা'ক্ত চোখ । কত

বুদ্ধিমত্তা অপূর্ব।তার নামের মতই দেখতে অপূর্ব।

অপূর্ব খেয়াল করলো, কনস্টেবল রুমা তার দিকে আড় চোঁখে তাকিয়ে আছে।

অপূর্ব না তাকালেও বুঝতে পারলো।

অপূর্ব বললো,

কিছু বলবেন?রুমার চট করে যেন জ্ঞান ফিরে। এতক্ষণ জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিলো।

আমতা আমতা করে রুমা বললো, একটা প্রশ্ন করবো?

অপূর্ব মনোভাব নিয়ে বললো, প্রশ্ন করতেই তো এসেছেন। বলেন কি বলবেন?

রুমা,বললো,শুনেছি বিয়ে করেছেন। কিন্তু আপনার সহধর্মিণী কে দেখার সৌভাগ্য হলো না।তিনি দেখতে কেমন?

অপূর্ব এলিজার কথা শুনতেই বুকের ভেতর ধুকবুকানি শুরু হয়। এলিজার ভাবনায় গহীন হয়ে, মৃদু হেসে বললো

তার রূপের কোন বর্ননা হয়না। তার রুপের ঝলকানিতে অন্ধকার রাত আলোকিত হয়ে যায়। সে যে , নিখুঁত। দাগহীন ত্বক , ভি,আকার ধুতনী,টানা চোখ,সেই চোখ যতবারই আমার দিকে পরোখ করে, ততবার

ই আমি নতুন পথ দেখতে পাই।
রুমা কিছুটা অবাক হয়ে বললো,
আপনি ও কম সুদর্শন না।
অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,তার
সৌন্দর্যর কাছে আমার মত হাজার
টা পুরুষ হার মানতে বাধ্য।
রুমা : তাকে কি কখনো দেখতে
পারবো?

অপূর্ব বললো, দাওয়াত রইল কোন একদিন আসবেন। আমার ম্যাডাম কে দেখতে।

বলেই অপূর্ব থানা থেকে বের হয়।

এরকম প্রেমিক পুরুষ আমি আর দেখিনি।যে কিনা সামনে থাকা কোন নারীর দিকে ও দেখে না। এতক্ষণ কথা বললো অথচ আমার দিকে একবার দেখলোই না।

অহংকার অনেক।

বলেই মুখ কুঁচকে দেয় রুমা।সন্ধ্যা হয়ে যায়। অপূর্ব বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা হবে ঠিক তখনই মনে পরে। হিমেল এর কথা। হিমেল কে কিছুদিন আগে চীপস ডুপিয়ালির সাথে দেখেছি।কি করছিলো ওরা আমাকে জানতে হবে। অপূর্ব গাড়ি ঘুরিয়ে হিমেল দের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

অপূর্বর হঠাৎ সমস্ত রহস্যর সূত্রের কথা মনে পরে।

ভাবলো, আমি হয়তো আমার বন্ধুদের সন্দেহ রে ভুল করছি। অন্য কেউ এসবের সাথে জড়িত।

ভাবতে ভাবতে অপূর্বর গাড়ি থামে হিমেল দের ঘরের সামনে।

দরজায় কড়া নাড়লে হিমেলের মা দরজা খোলে।আমি জিজ্ঞেস করলাম হিমেল কোথায়। হিমেলের মা শান্ত

স্বরে বললো, হিমেল তো ওর মামা বাড়িতে। তুমি কি জানো না?
অপূর্ব কিছুটা অবাক হয়। তবে যে আমাকে বলেছে টুরে গেছে।
অপূর্ব বললো,ও হা মনে ছিলো না। বলেই চলে যায়।কিছুদূর আসতেই মনে পরে সূর্যর কথা। সূর্য কোথায় গেলো। ওর যে কোন খবর নেই। ভাবতে ভাবতে অপূর্ব রওনা হয় সূর্যের বাড়ির উদ্দেশ্যে। অপূর্বর

বুকের ভেতর যেন ধুকবুকানি টা হঠাৎ বেড়ে যায়। কোন অজানা কারনে ভয় হয়। এসে পৌঁছায় সূর্যর বাড়ির সামনে।কিছুটা শুনশান । অপূর্ব ভেতরে প্রবেশ করে। কাউকে দেখলো না। অদ্ভুত বিষয় হলো ঘরের দরজাটা খোলা ছিলো।

অপূর্ব ধৈর্য হারা হয়ে,ডাকতে শুরু করে।

সূর্যর মা আসে।কি হয়েছে অপূর্ব তুমি এখানে? সূর্য আসেনি?

অপূর্ব অবাক হয়ে বললো, সূর্য তো আমার কাছে আসেনি।আজ অনেক দিন দেখা হয়নি। সূর্যর মা অবাক হয়ে বলল,

আমিতো জানি ও তোমাদের সাথে তিলকনগর।

অপূর্ব থমকে যায়। চোখে রক্ত উঠে যায়।কি শুনছি এ আমি। অপূর্ব

কোন কথার জবাব না দিয়ে দ্রুত পায়ে সূর্যর বাড়ি থেকে চলে আসে। সূর্য তারমানে আমাকে মিথ্যা বলেছে। কিন্তু কেন? সূর্য কি লুকিয়েছে ।আর কেনোই বা লুকিয়েছে।

এসব ভাবতে ভাবতে অপূর্ব গাড়ি নিয়ে রওনা হয় তিলকনগর। কিন্তু হঠাৎ ই দেখে রাস্তা বন্ধ। সামনে কিছু গাছ পরে আছে।অপূর্ব গাড়ি

রেখেই তিলকনগর এর উদ্দেশ্য হাটা শুরু করে।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে যায়।

রাত প্রাই ১০ টা —

চারদিক নিশ্চুপ। একদমই নিরব। কোথাও কেউ নেই।এই তিলকনগর রাতে কেউ বের হয়না। কিন্তু কেন তা অজানা।

অপূর্ব মনে মনে চিন্তা করতে থাকে আজকেই এই রহস্য বের করতে হবে।

আর এই সূর্য ই বা কোথায়।অপূর্ব অন্ধকার রাতে উত্তপ্ত হয়ে হাঁটছে, রঞ্জনার কব,রের উদ্দেশ্যে। হয়তো সূর্য ওখানে থাকতে পারে।

চারদিক থেকে শেয়াল এর ডাক আসছে।বাদুর উড়ে যাচ্ছে।গা

ঝিমঝিম।তবুও যে সামনে এগোতেই হবে।

হঠাৎ সামনে এগোতো যা দেখলাম তা দেখার জন্য যেন অপূর্ব মোটেই প্রস্তুত ছিলো না।

অপূর্ব পুরোপুরি থম মেরে যায়।গা থেকে অঝোরে ঘাম ঝরছে।বুকের ভেতর ধুকবুকানি পরিস্কার শোনা যাচ্ছে।

আমার ভাবনাই সঠিক, সূর্য, রঞ্জনার কব,রের কাছে কিন্তু সূর্য একা নয় সাথে রেখা। নিজের চোখ কে যেন অবিশ্বাস করতে পারছি না।আমি গাছের আড়ালে লুকিয়ে পরলাম।ওরা দুজন কোন কিছু নিয়ে পরিকল্পনা করলো।বেশ কিছুক্ষণ পর ওরা দুজন উল্টো দিকে হাঁটা শুরু করে। আজ এর শেষ আমাকে দেখতেই হবে। আমি ওদের পিছু নিলাম। ওরা

যেতে যেতে পৌছে যায় রুশরাজ্যে। আমি থমকে যাই। সেদিনের মত আজকেও দিগন্ত নদীর তীরে একটা বোড আসে। এবং রেখা উঠে যায়। সূর্য গেলো না। সূর্য কে খুব অদ্ভুত দেখাচ্ছে। সেদিনের মত কালো,জ্যাকেট,গলায় চেন, ।ভাব ভঙ্গি মা একদমই ভিন্ন। সূর্য রেখাকে স্পিড বোডে উঠিয়ে দিয়ে।

রুশরাজ্যের ঝোপঝাড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

অপূর্ব পিস্তল টা বের করে পিছু নিতে থাকে সূর্যের।হেঁটে অনেক দূর গেলো।

গিয়ে থামলো ঝোপঝাড় এর ভেতরে।তবে কোন আস্তানা দেখতে পাচ্ছি না।

হঠাৎ কোথা থেকে বেড়িয়ে আসলো মুখোশধারী দুটো লোক। কিছু বলছে সূর্যের সাথে।

আমি শুনতে পেলাম না।

এভাবে অনেকক্ষন ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকলাম। সূর্যর সাথে থাকা লোক দুটো কথা শেষ করে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করে।অপূর্ব মনস্থির করলো এই সুযোগ, এবার সূর্য কে সত্যিটা বলতেই হবে।

সূর্য অনুভব করলো ওর পিছনে পায়ের চপর চপর আওয়াজ। সূর্য থমকে যায়। সূর্য পিস্তল টা বের করলো।বুঝতে পারলো পেছনে কেউ আছে। সূর্য তৎখানিক বন্ধুকটা তাক করে পেছনে ঘুরতেই দেখে অপূর্ব। অপূর্ব পিস্তল টা সূর্যর দিকে তাক করে রেখেছে।

সূর্যর হাত থেকে ধপাস করে পিস্তল টা পরে যায়। সূর্য থমকে যায়।

কপাল থেকে ঘাম ঝরতে থাকে। অপূর্বর উপস্থিতি সূর্য কে নাড়ালো। অপূর্ব কর্কট কণ্ঠে বললো,কি করছিস তুই? এখানে কেন? কি লুকোচ্ছিস? রেখার সাথে তোর কি? বল আমাকে।

সূর্য শান্ত স্বরে বললো যেতে দে আমাকে।বলেই নিচ থেকে পিস্তল টা তুলে নিজের আয়ত্তে নেয়।

অপূর্ব কে এড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলেই , অপূর্ব সূর্যর বা কাঁদে হাত দিয়ে আটকে দেয়।

সূর্য আবারো থমকে দাঁড়ায়।

অপূর্ব বললো, সত্যিটা বল কি লুকোচ্ছিস?

সূর্য ভয়ংকর ভঙ্গিতে বললো,যেতে দে আটকাস না।

অপূর্ব ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠলো,সত্যিটা বল নয় সুট করে দেবো।

সূর্য এক ভয়ংকর হাঁসি দিয়ে বলে উঠলো,

আমাকে মারবি ? আমাকে? আমি তো অনেক আগেই মরে গেছি আর এটাতো একটা দেহ মাত্র ।

অপূর্ব সূর্যর কথা শুনে অবাক হয়ে যায়।অপূর্ব মেজাজ দেখিয়ে বললো,

কি বলতে চাইছিস ? হেয়ালি না করে বল?

সূর্য ভয়ংকর ভঙ্গিতে বললো, যেতে দে আমাকে।আমি বন্ধুদের মাঝে র'ক্তা"রক্তি পছন্দ করি না।

অপূর্ব কাট গলায় বললো তুই খু'নি।

কথাটা শুনেই সূর্য থমকে গিয়ে,হাহাহাহা করে এক ভয়ংকর হাঁসি দিয়ে উঠে।এই হাসি দেখলে যে কেউ ভয় পাবে।

অপূর্ব ভেজা কণ্ঠে বললো,
সূর্য বলনা ভাই কি করছিস তুই? কি লুকোচ্ছিস? তোর এই রূপ আমাকে ভেতর থেকে মেরে ফেলছে!!
সূর্য কিছুক্ষন থম মেরে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো,সত্যিটা জানতে চাস? জানতে চাস সত্যিটা?,তবে শোন,আমি আমার রঞ্জনা কে বাঁচাতে পারিনি।আমি আমার রঞ্জনা কে বাঁচাতে পারিনি,আমি আমার প্রেয়সী

কি বাঁচাতে পারিনি,আমি যে নিষ্ঠুর।
বলেই হাটু ঘেরে বসে পরে।
অপূর্ব থমকে যায়।কি বলছে সূর্য।
রঞ্জনা তো দুর্ঘটনায় মারা গেছে।তবে ও কি বলছে।
সূর্য হাঁটু গেড়ে বসে অদ্ভুত রকম কান্না শুরু করে।
অপূর্ব আতংকিত হয়ে বললো,
কি বলছিস? রঞ্জনা তো দুর্ঘটনায় নি,হত হয়েছে।তবে....

সূর্য মাথার চুল গুলো টেনে কর্কট মেজাজে বললো, আমার রঞ্জনা দুর্ঘটনায় মারা যায়নি।

আমার রঞ্জনা কে মেরে ফেলা হয়েছে। হায়,না গুলো আমার রঞ্জনা কে বাঁচতে দেয়নি।

অপূর্ব অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে সূর্য কে।সমস্ত পৃথিবী আজ কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। অপূর্ব চোখগুলো ছানাবড়া হয়ে গেছে।

হাতের পিস্তল টা ধব করে পরে যায়। পেছনে লতায় মোড়ানোর হেলানো গাছের উপর বসে পরে।
পূরো আকাশ নিঃস্ব। চারদিক নিশ্চুপ।পাশেই বয়ে গেছে দিগন্ত নদী। শান্ত দিগন্ত নদী। কিন্তু অশান্ত তাঁরা দুজন।
কি বলছে আর কি হচ্ছে সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

অপূর্ব হেলানে গাছের এক কোনে বসে আছে। অপর প্রান্তে সূর্য ।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর।

অপূর্ব বলল ,সেদিন তাহলে মিথ্যা বললি কেন? যে ও দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে?

সূর্য ভারি একটা দ্বীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, বলতে চাইনি সত্যিটা।

বলেই চুপ হয়ে যায়।অপূর্ব , আতংক স্বরে বলল,

রঞ্জনা কে ? ওর আসল পরিচয় কি ছিল? কারা মেরেছে? তোর সাথে রেখার সম্পর্ক কি ? তবে ওদিন কেন মিথ্যা বললি? কি লুকিয়ে আছে? এই ভরাকান্ত সত্যিটা কি

রঞ্জনা কে কারা মেরেছে কেন?? নিঝুম রাতের আঁধারে দুজন হতাশায় নিস্তেজ মানুষ বসে আছে।। চারদিকে ঝোপঝাড়।লতা পাতায়

আচ্ছন্ন। ভ,য়ংকর এক পরিবেশে নিশ্চুপ দু'জন মানুষ।

অপূর্ব এই পর্যন্ত হাজার বার প্রশ্ন করেছে। কিন্তু সূর্য নিশ্চুপ।কি যেন কি ভাবছে।

সূর্যর হঠাৎ এরকম আচরণ অপূর্ব কে ভেতর থেকে ভাবনার আগুনে জ্বলিয়ে দিচ্ছে ।ইচ্ছে করছে সূর্যর ভেতরে কি লুকিয়ে আছে।সেটা ওর বুকটা ছিরে দেখি।

হঠাৎ সূর্য শান্ত স্বরে বলে উঠলো, আজ থেকে ১০ বছর আগে।

১০ বছর আগের ঘটনা——————(অতীত)

শষ্য শ্যামল,ক্ষেত ভরা ধান, মিষ্টি মধুর বাতাস। ছোট ছোট বাঁচ্চারা দলবেঁধে স্কুলে যাচ্ছে। কৃষকরা মনের শুখে গান গাইছে আর ক্ষেত বনছে।

চারদিকের জমজমাট আমেজে ভরপুর হয়ে আছে বাবর রাজ্য।

সত্যিকার অর্থে কোন রাজাদের রাজত্ব নয়।তবে এই মোহত পূর্ণ,ভুবন ভরা গ্রামকে নাম দিয়েছে বাবর রাজ্য।

চারদিক থেকে মাইকিং এর শব্দ ভেসে আসছে।

সু - খবর সু - খবর বলতেই কৃষকরা কাজ ফেলে মাইকিং করে

কি বলা হচ্ছে সেদিকে কান খাড়া করে রেখেছে।সবাই উত্তেজিত। মাইকিং এ বলা হচ্ছে, আগামীকাল গ্রামের গরিব অসহায়দের মাঝে বাবর সিকদার ত্রাণ বিতরণ করবে। তবে এটা নতুন কিছু নয়।বাবর সিকদার গ্রামের সবাইকে, কিছুদিন পর পর,ত্রান বিতরণ করে, অসহায় মানুষের পাশে থাকে,।যারা ভূমিহীন তাদের নিজের জমি দিয়ে চাষাবাদ

করার সুযোগ দেয়।বিদ্যালয়ের খরচ তিনি বহন করেন।বাবর সিকদার অন্যায় কে প্রশ্রয় দেয়না,তিনি অন্যায় করেন ও না। ভালো কাজে তিনি মহান। কিন্তু খারাপ চোখের সামনে পরলে হিং,স্র হয়ে ওঠে। গ্রামের সবাই তাকে ভরসা করে।

মাইকিং করা মাত্রই সবাই খুশিতে আপ্লুত হয়ে ওঠেছে।

– বাবর সিকদার এর স্ত্রী,তার মা,ভাই, এবং তার চার সন্তান নিয়ে এক আনন্দময় শুখি সংসার।

“মালকিন কেউ এসেছে,আপনারে ডাক পারে,(বললো মিনারা বেগম বাড়ির মহিলা।

উপর থেকে নিচে আসলো কল্যানি সিকদারীনি,বাবরের স্ত্রী।

কল্যানি : কে এসেছে।ডাকলে কেন? ছোট মেয়েটা খুমোচ্ছে। তারমধ্যে চেঁচামেচি।

আসসালামুয়ালাইকুম,

আমিই আপনাকে ডেকেছি! (বললো একজন ঘটক)

কল্যানি শান্ত স্বরে বলল,

ঘটক সাহেব আপনি? এখানে কেন ? আমরা তো ডেকে পাঠায়নি!

ঘটক সাহেব আমতা আমতা করে বললো, না আমিই আসছি। আপনার তো ঘরে দু দুটো জওয়ান মেয়ে। বিয়ে দিবেন না!কল্যানি পানের পিক ফেলে বললো,মেয়ে আমার হলেও সিদ্ধান্ত ওদের বাবার। তিনি চাননা এত তাড়াতাড়ি কোন সমন্ধ্য করতে। ঘটক সাহেব একটু হেয়ালি করে বললো, মেয়ে মানুষ তারাতাড়ি বিয়ে

দেওয়াই ভালো কখন কি দুর্ঘটনা ঘটায়।

” কে আমার মেয়েদের নিয়ে বাজে কথা বলে!কে আসছে সম্বন্ধ নিয়ে!

(পেছন থেকে সিড়ি দিয়ে নামতে নামতে কর্কট মেজাজে বললো বাবর সিকদার)

ঘটক সাহেব চট করে বসা থেকে উঠে দাঁড়ায়। বাবর সিকদার বাড়ি আছে জানলে উনি আসতেন না।

কারন বাবার সিকদার তার মেয়েদের দূরে করতে চাননা।বিয়ের কথা শুনলেই তার মাথায় রক্ত উঠে যায়।

বাবর শান্ত স্বরে বললো,শুনুন ঘটক সাহেব, আমার মেয়েরা অন্য দশটা মেয়েদের মত না।যে দূর্ঘটনা ঘটাবে।আর যদি করেও কিছু তা দিয়ে আপনাদের সমস্যা কি।মেয়ে আমার বিয়ে দিবো আমি,খরচা হলে

আমার হবে,ঘরে রাখলেও তা আমাকে বহন করতে হবে। পারা প্রতিবেশীদের তো তা নিয়ে ভাবতে বলিনি।

আমার মেয়েরা পরাশুনা করবে অনেক বড় হবে। এটাই আমার স্বপ্ন।আপনি এখন আসতে পারেন।

ঘটকটি দ্রুত পায়ে বেড়িয়ে যায়।

বিক্রমপুর রেলওয়ে স্টেশন

তারেক,বাবু,শাওন সবাই ঘুমে। ট্রেন এসে পৌঁছেছে সেই কখন। বাবররাজ্য,এসেছে ছুটি কাটাতে।

তারেকের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

বাবু ও শাওন কে ঘুম থেকে উঠায়।

কিন্তু ঘুম থেকে দেখে দুর্জয় নেই।

এদিক সেদিক খুঁজতে লাগলো।

এই দূর্জয় টা কোথায় যে যায়।

হুটহাট উধাও।

প্যান্টের চেন আটকাতে আটকাতে আসলো দূর্জয়।বললো,তোরা কি আমার খোঁজ করছিলিস? তোদের জন্য কি ওয়াশরুমেও যাওয়া যাবে না।তারেক : তা কি আমরা বলেছি। চল এখন নেমে পরি।

দূর্জয় : আরে এত তারা কিসের ধিরে ধিরে যাই।

দূর্জয় এর হঠাৎ চোখ পরে ডান দিকের কিছুটা দূরে সরিষা ক্ষেত।

তাকাতেই দেখে কয়েকটা মেয়ে দৌড়াচ্ছে।খিল খিল করে হাসছে। দূর্জয় আগ্রহ নিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। দৌড়াচ্ছে কেন। সামনে তাকাতেই দেখে।একটা মেয়ে পরনে,লাল স্কার্ট,চুল গুলো অনেক টা বড়, হাসছে আর দৌড়াচ্ছে।কি অপূরুপ মোহময় দেখাচ্ছ।দূর্জয় চোখ গুলো বড় বড় দেখতেই,ব্যগটা নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে মেয়েটাকে

দেখার উদ্দেশ্যে তাদের পেছন পেছন দৌড়াতে থাকে।

তারেক : আরে ও আমাদের রেখে কোথায় যাচ্ছে। পাগল হয়ে গেলো নাকি।চল ওর সাথে।

বলেই দূর্জয় এর পেছন দৌড়াতে থাকে।

মেয়েরা থেমে যায়।সবাই একসাথে বলাবলি করছে।ছেলে গুলো কারা আমাদের দিকেই আসছে।

হয়তো এখানে নতুন।
দূর্জয় ওর বন্ধুরা এসে মেয়ে গুলোর সামনে দাড়ায়।
দূর্জয় আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো,দূরে যে মেয়েটি দাড়িয়ে আছে,ও কে??
কর্কট মেজাজে, একজন বলে উঠল, আমাদের রাজ্যের মেয়ের দিকে একদম নজর দিবে না।
দূর্জয় মুখ কুঁচকে বললো,

হুম, এখানে তোমাদের নাম লেখা আছে। সরে যাও সামনে থেকে। আমিই দেখে নিচ্ছি কে।

কি অসভ্য ছেলেরে বাবা (বলল তিলকা)

দূর্জয় বলে উঠলো,দিবো একটা কানের নিচে।

ওমনি পাশ থেকে একজন, মেয়ে

বলে উঠলো, এই রঞ্জনা দেখ আমাদের সাথে কেমন আচরণ করছে।

দূর্জয় থম মেরে যায়। তারমানে মেয়েটার নাম রঞ্জনা। অপলক ভাবে তাকিয়ে আছে উল্টো ঘুরে দাড়ানো রঞ্জনার দিকে। রঞ্জনা চুল গুলো পেছনে আঝাপটা মেরে ঘুরে তাকায়।

দূর্জয় সহ বাকি বন্ধুরা হা করে তাকিয়ে থাকে।এ যে এক ভুবনমোহিনী সুন্দরী নারী। যার চাহনি ই যথেষ্ট একটা ছেলেকে কাবু করার জন্য।

রঞ্জনা দৌড়ে কাছে এসে বলতে শুরু করলো, আমাদের রাজ্যে এসে আমাদের ই কথা শোনানো হচ্ছে। খুব সাহস আপনাদের তাইনা। আপনি জানেন আমার বাবা কে!!

আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে রঞ্জনা কথা গুলো বলছে। কিন্তু সেদিকে দূর্জয় এর কোন হুশ ই নেই । রঞ্জনার রুপের ঝলকে সে হারিয়ে গেছে। কিছুক্ষণ বক বক করার পর রঞ্জনা হাতে তুরি মেরে দূর্জয় এর ধ্যান ভাঙ্গিয়ে দেয়।

রঞ্জনা অহংকারী স্বরে বলল,আর যেন আমাদের পেছন পরতে না

দেখি। বলেই হাত দিয়ে সতর্ক ইঙ্গিত দিয়ে উল্টো দিকে চলে যায়।

দূর্জয় ও ওর বন্ধুরা থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে।

দূর্জয় বললো,

এত সুন্দরী মেয়ে আর কোনদিন দেখিনি।

বাবু: এরকম সুন্দরীর পেছনে হাজার টা ছেলেরা ঘুরে।তুই পাত্তা পাবি না। চল যাওয়া যাক।

দূর্জয় বললো, কোথায় যাবো। আমার মামা বাড়ি এখানেই। কাউকে জিজ্ঞেস করলেই পাবো চল।

রঞ্জনা যা করে দৌড়ে দৌড়ে। ছোটবেলা থেকেই অভ্যাস। ভারী চঞ্চল।

বাবরের ডাক পরেছে। দৌড়ে বাবার ঘরে আসতেই।

বাবর : আহ পরে গিয়ে আঘাত লাগবে তো মা, সবসময় এত

তোরঝোপ কেন করিস,তোর যদি কিছু হয়ে যায়।(বললো আদুরে গলায়)রঞ্জনা: বাবা, তুমি থাকতে আমার কিছু হবে না।বাবা মানেই তো ছায়া তাই না তাইনা।পরে গেলে হাত ধরে তোলার জন্য যে তুমি সর্বদা আছো।

বাবর বললো,

বোস এখানে আমি তোর মাথায় তেল দিয়ে দিচ্ছি।

পাশ থেকে কল্যানি বলে উঠলো, আল্লাদ দিয়ে দিয়ে মেয়ে টাকে মাথায় উঠিয়ে রেখেছো।বলি আরো তো তিনজন আছে ওদের দিকে তো দেখো।

বাবর মৃদু হেসে বলল, আমি আমার ৪ সন্তান কেই ভালোবাসি।অন্তিম তো বড় হয়েছে । দায়িত্ববান হয়েছে।

প্রিয়া এখনো বাচ্চা। বাকি থাকলো মালাইকা।মালাইকা তো সারাদিন পরাশুনা নিয়েই থাকে।

কল্যানি উঠে বেড়িয়ে যায়। বাড়িতে অনেকে কাজ করে তাদের প্রতিদিন বকশিশ দেয়। এটা বাবর সিকদার এর নিয়ম।রঞ্জনার মাথায় তেল দিতে দিতে বাবর উপদেশ স্বরে বললো,

জানিস মা জীবন টা অতি ক্ষুদ্র তম। তবে তা সবসময় না। যখন দেখবি জীবনে দুঃখ গ্রা,স করেছে,তখন মনে হবে জীবনের সময় যেন যাচ্ছে না।

আর যখন জীবনে সুখ চলে আসে,তখন দেখবি সময় খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে।

রঞ্জনা অবাক ভঙ্গিতে বললো, বাবা তুমি হঠাৎ এরকম বলছো কেন?

বাবর মৃদু হেসে বললো, কারন আমি চাই আমার মেয়েরা নিজের পায়ে দাড়াক।ওদের নিজের একটা পরিচয় হোক। কারন সবাই বলে মেয়েদের কোন পরিচয় হয়না।বিয়ের আগে বাবার , এবং বিয়ের পর স্বামীর পরিচয় বাঁচতে হয়।

আমি চাই তোদের নিজেদের পরিচয় নিজেরা গড়বি।

রঞ্জনা থম মেরে বললো, বাবা আমি পরাশুনা তো করছি। কিছুদিন পর ইন্টারমিডিয়েট পরিক্ষা। কিন্তু তার পাশাপাশি আমি নৃত্য নিয়ে এগোতে চাই।বাবর রঞ্জনার চুল গুলো বেনুনি করতে করতে বললো, তাতো আমি জানি পাগলী।আমি তোদের ঘর বন্দি ঘরে রাখবো না।আমি স্বাধীনতা দিবো। আমার বিশ্বাস আমার

মেয়েরা কোনদিন ভুল কাজ করবে না।
রঞ্জনা বাবর কে জড়িয়ে ধরে বললো,বাবা তোমার মত একজনের মেয়ে হয়ে আমি গর্বিত। কোনদিন কাউকে তোমার দিকে আঙুল তুলতে দিবো না।
বাবর মৃদু হেসে রঞ্জনার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে দেখলো, দরজার কোনে মালাইকা দাঁড়িয়ে আছে।

মালাইকা রঞ্জনার জমজ বোন। কিন্তু তাদের পার্থক্য অনেক। মালাইকা খুবই শান্ত স্বভাবের। একটু হলেই ভয় পেয়ে যায়।বাবর হাতের ইশারায় ডাকলো।মালাইকা কাছে আসে।

বুকের ডান পাশে মালাইকাকে জড়িয়ে ধরে বামপাশে রঞ্জনা কে। মালাইকাকে উদ্দেশ্যে করে বললো, সাহসী হতে হবে। বাহাদুর হতে

হবে।এত ভীতু হলে ,অন্যরা পায়ে ঠেলে যাবে। দুর্বলতার সুযোগ নিবে। তোমার আপুকে দেখো।কত সাহসী। জীবনে একটু তো সাহসী হতেই হবে তাই না।

এবার দুজনে হাতে হাত মিলাও দেখি। রঞ্জনা হাত বাড়িয়ে দেয়,মালাইকা ইতস্তত বোধ করে। বাবর ইশারা করে । হাত রাখে রঞ্জনার হাতে।

বাবর অহংকারী স্বরে বলল, রঞ্জনা তোমার বোনকে সাহসী করে তুলতে হবে। একদম তোমার মত।— রাত ৮ টা নাগাদ সবসময় ই সিকদার বাড়ি জমজমাট থাকে।

রঞ্জনা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রংডং করছে ।

ট্যাপে একটা গান চালু করে এরপর একা একা নাচছে।ঘরের দরজা খোলা তা খেয়াল ই নেই।

আনমনে নাচ করছে।

হঠাৎ দেখে ঘরের ভিতর কেউ ঠুকে পরেছে।

তাকাতেই দেখে সেই ছেলেটা ,যে আজকে আমাদের সাথে ঝগড়া করেছে,। রঞ্জনার চোখ গুলো বড় ছানবরা হয়ে যায়।দূর্জয় ও রঞ্জনা কে দেখার পর অবাক,এই মেয়েটা এখানে কি করছে।

রঞ্জনা হঠাৎ করে আহহহ করে এক চিৎকার। দূর্জয় কি করবে বুঝতে না পেরে দেখলো সবাই চলে আসছে। বাবর শিকারী করার বন্ধুক নিয়ে হাজির হয়।

কি হয়েছে মা ? চিৎকার করলি কেন? এই কে কোথায় আছিস ? বাবর উত্তেজনা স্বরে বলতেই

রঞ্জনা বললো, বাবা এই ছেলেটা কে ? এখানে কি করছে?

বাবর নিঃশ্বাস ছেড়ে,বন্ধুক টা নিচে নামিয়ে শান্ত স্বরে বলল, ও এ হচ্ছে দূর্জয়। আমার একমাত্র বোনের ছেলে। ও আসছে বেড়াতে । সাথে ওর কিছু বন্ধুরা।

এখানে কিছুদিন থাকবে।রঞ্জনা অভিমনী স্বরে বললো, তুমি আমাকে জানাও নি কেন ? যে বাড়িতে মেহমান আসতে চলেছে।

লক্ষী মা আমার,এই কান ধরেছি ভুল হয়েছে। এবারের মত ক্ষমা করো। (বললো আদুরে গলায় বাবর)

তারমানে রঞ্জনা বাবর মামার মেয়ে। বাপরে কার দিকে নজর দিলাম।সে তো তার মেয়েদের জন্য ১০ টা খু,ন মিনিটে করে ফেলতে পারবে। যাইহোক চেষ্টা করতে হবে। মনে মনে ভাবতেই দূর্জয় স্থানত্যাগ করে

চারদিকে কো'লাহল সৃষ্টি হয়েছে। সবার কোলাহলে সবার ঘুম ভেঙ্গে যায়।সবাই চারদিকে ছুটছে।কি যেন কি হয়েছে।চট করে দূর্জয় সহ সবার ঘুম ভেঙ্গে যায়।বাহির থেকে দেখতে পায় সবাই একদিকে ছুটছে। তারেক দূর্জয় কে প্রশ্ন করে,সবার ডাকাডাকি তে সুন্দর ঘুম টাই ভেঙে গেলো।কি হয়েছে ।সবাই দৌড়াচ্ছে কেন।

দূর্জয় বললো,আজকে আমার মামা ত্রান বিতরণ করবে। উনি কিছুদিন পর পরই ত্রান বিতরণ করে। গ্রামের সবাই তাকে ফেরেশতা রুপে দেখে।কৌতূহল নিয়ে বাবু বললো,তোর মামা এত ধনসম্পদ অর্জন করলো কিভাবে?

দূর্জয় ঘরে প্রবেশ করে খাটে বসতে বসতে বলল,সে অনেক কথা। আমার মামা তার জীবনে অনেক

কষ্ট করেছে। অনেক সংগ্রাম করেছে।অতংপর সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।তাই উনি সবার কষ্ট বুঝতে পারেন। ওনার বাবা মানে আমার,নানা তিনিও অন্যদের পাশে থাকার চেষ্টা করতেন।তিনি মৃত্যুর আগে বলেছেন যেন,তিনিও অন্যের পাশে থাকে।

তারেক বিষয় পাল্টে দিয়ে বললো,তোর বোন গুলো হেব্বি। একটা পটাই দে।

দূর্জয় আর চোঁখে বললো, খবরদার নজর দিসনা।

মামা কে দেখেছিস কেমন,তাছারা রঞ্জনার বড় ভাই অন্তিম সে কিন্তু তার বোনদের জন্য সবাইকে শেষ করে দিতে পারবে।কিন্ত মামাকে

এখনো ভয় পায়। সম্মান করে তাকে অনেক।

তারমানে এখানে তার অনেক প্রভাব। (বললো তারেক)

বাবু : আমার তো তাকে দেখলেই ভয় লাগে। তার মেয়েরা আ থেকে উ করলেই বন্ধুক নিয়ে আসে।

বাবুর কথা শুনে সবাই খিল খিল করে হেসে উঠে।

এই গ্রামে এত সুন্দরী মেয়ে তাও আবার আমার মামাতো বোন। কি তার কথা বলার ভঙ্গিমা।কি তার তেজ।যার চোখের চাহনি তে যে কেউ চাপসে যাবে।যার চুলের ঝলকানি,দৌড়ের দর্পন থেকে ট্রেন থেকে ছুটে আসলাম।তাকে এত কাছে পেয়েও হাত ছাড়া করবো। তাও কিনা তার বাবার ভয়ে। আজ একবার রঞ্জনার সাথে কথা বলবো।

তার বান্ধবীদের সাথে ওরকম আচরণ করার জন্য মাফ চাইবো। হুমম এটাই একটা কথা বলার উপায়।এসব ভাবতে ভাবতে দূর্জয় বাড়ির কাজের লোক মিনারাকে জিজ্ঞেস করলো,

বাড়িতে এখন কারা কারা আছে? সবাই কি ত্রান দিতে গেছে।

বাড়িতে রঞ্জনা আফা,মালাইকা,আর প্রিয়া,আর দাদি আছেন।

তাদের ফিরতে কতক্ষন লাগবে?
বড় মালিক ফিরে আইতে আইতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবো।
সব বান্ধবীদের নিয়ে রঞ্জনা নৃত্য করছে।তিলকা ভাবছে,।মেয়ে হয়েও মেয়েদের সুন্দর্য নিয়ে আলোচনা করতে এই প্রথম দেখছি। সত্যি বলতে রঞ্জনার রুপের তুলনা হয়না। দু পায়ে নূপুর,কালো স্কার্ট, সাথে লম্বা চুল।কি দারুন লাগছে।বেলা

ফুরিয়ে বিকেল হয়ে গেলো। দূর্জয় ও তার বন্ধুরা বাহিরে বের হয়েছে। আশেপাশে মুগ্ধ হয়ে দেখছে। কত সুন্দর রাজকীয় বাড়ি। বিভিন্ন কাজের লোক বিভিন্ন কাজ করছে। বাড়ির গেটের বাইরে আসতেই দেখে রঞ্জনা তার বন্ধুদের বিদায় জানাচ্ছে।

দূর্জয় ভাবলো এই সুযোগ কথা বলার। কিন্তু ভয় ও হচ্ছে কোথা

থেকে ওর রা,ক্ষুসে বাবা আর ভাই চলে আসে বলা যায়না। ওর বন্ধুদের বললো পাহাড়া দিতে।

দূর্জয়: বাবু তুই ঐদিক টায় যা।যদি মামা বা অন্তিম ভাই আসে তো তুই গান গাইতে শুরু করবি। তাহলেই আমি বুঝবো তারা আসছে।

আর তারেক তুই যদি কাউকে আসতে দেখো তো ,বার বার ওঠা

বসা করবি তাহলে বুঝবো বিপদ কাছে।

যেই চিন্তা সেই কাজ।দূর্জয় রঞ্জনার কাছে যায়।

রঞ্জনা তোমার সাথে কথা বলার ছিল। বলতেই নক কুটতে শুরু করে।

রঞ্জনা ঘুরে তাকায় দূর্জয় এর দিকে। অহংকারী স্বরে বলল, আপনার সাথে কথা বলতে আমার বয়েই গেছে।

দূর্জয় বললো,ঐদিনের ঘটনার জন্য দুঃখিত।

রঞ্জনা কিছু বললো না।দূর্জয় ভাবলো এবার ওর রুপের প্রশংসা করতে হবে।মেয়েরা নাকি প্রশংসা শুনতে ভালো বাসে।

দূর্জয় কিছু বলবে,ঠিক তখনই বাবু বেসুরো গলায় গান গাইতে শুরু।

দূর্জয় পেছনে তাকিয়ে দেখে বাবর সিকদার আসছে।

তিনবন্ধু মিলে কোথায় যাবে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। রঞ্জনার সাথে কথা বলছি দেখলে এখানেই শেষ।

এদিক সেদিক করতেই দেখে পাশে অনেক বড় গোয়াল ঘর। (বড় খামার)

দূর্জয় কাপা কণ্ঠে বললো,চল গোয়াল ঘরে কাজ শুরু করি।

তারেক; কি বলছিস তুই?দূর্জয়: কথা বারাস না,গুলি খেতে না চাইলে চল।

বন্ধুরা মিলে গোয়াল ঘরে কাজ শুরু করে দিছে।গরুর লাথিও খাচ্ছে।

রঞ্জনা ওদের ভয় দেখে অট্টহাসি তে তলিয়ে যাচ্ছে। বাবার ভয়ে শহরের ছেলে গুলো গোয়াল ঘরের কাজ করছে।

অন্যরাও হাসতে হাসতে ঠলে পরছে।

রাত ২ টো নাগাদ —-পাশের ঘর থেকে নূপুরের আওয়াজ আসছে।

আর তবলার আওয়াজ। চারদিক নিশ্চুপ।পূরো বাড়ি শুনশান।

তারেকের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

ভয়ে চাপসে গেছে।এতবড় বাড়ি তার উপর এত রাতে।তবলার আওয়াজ।

বাকিদের ফিস ফিস করে জাগিয়ে নিয়েছে।

চোখ ঠলতে ঠলতে প্রশ্ন করলো দূর্জয়, কি হয়েছে?

তারেক :বাহির থেকে নুপুরের আওয়াজ আসছে।

সবাই একটু চমকে যায়। রঞ্জনা নৃত্যের পাগল তার মানে এই নয় যে এত রাতে নাচবে । চল বাহিরে গিয়ে দেখি।

সবাই বাহিরে বের হয়। হঠাৎ আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়।কোন দিক থেকে আওয়াজ আসছে কেউ বুঝতে পারছে না।

সবাই মিলে এদিক সেদিক দেখছে। পূরো বাড়ি নিস্তব্ধ। হঠাৎ চোখ পরে। নিচের তলায়। তা যা দেখলো সবার অবস্থা খারাপ। কেউ একজন সাদা কাপড় মুরি দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়িতে ঠুকছে।তারেক কাঁপতে কাঁপতে বলতে শুরু করে,ভাই শুনেছি বড় বাড়িতে ভুত থাকে।এটা হয়তো ভুত ই হবে।

বাবু , দূর্জয়, তারেক তিনজন ই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে একসাথে হাদিসের সব দোয়া পরতে শুরু করে......উল্টা পাল্টা দোয়া পরতে পরতে তিনজনই লুকিয়ে যায়। রেলিং এর আড়ালে।

চোখ বুঝে বুঝে দোয়া পরছে।এমন সময় ই কেউ পেছন থেকে গায়ে হাত দেয়।দূর্জয় তারেক,বাবু কেউ পেছনে ফিরছে না।

বাবু ফিস ফিস করে বলছে।তাকাস না ওটা জ্বীন। আমরা ফিরবো না দেখিস এমনিতেই চলে যাবে। ওমনি দূর্জয় সাহস নিয়ে পেছনে ঘুরে দেখে অন্তিম।

আরে ভাইয়া আপনি! এত রাতে নিজের বাড়িতেই লুকিয়ে লুকিয়ে ঠুকছেন কেন! আমরা তো ভয় পেয়ে গেছি! (বললো দূর্জয়)অন্তিম ;

হুসসসসস। বাবা জেগে যাবেন। যাইহোক,তোরা কখন এলি?

আমরা সেই কখন এসেছি। কিন্তু আপনাকে তো দেখলাম না।

অন্তিম সহ সবাই অতিথি ঘরে চলে যায়। অন্তিম বরাবর ই খুব রাগী। কিন্তু সবার সাথে রাগ দেখান না। বোনদের প্রচুর ভালোবাসে।কেউ চোখ তুলে তাকালে সেই চোখ উপরে ফেলে।

এখন খুব শান্ত হয়ে সবার সাথে বসে আছে। আমাদের সাথে এটা ওটা বলছে।

কালকে আমার জন্মদিন।ঘটা করে আয়োজন করা হবে। গ্রামের অসহায় মানুষদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে।সাথে গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবে।

সাথে আমার কিছু বন্ধুরা।

তোরাও কিন্তু থাকবি। আলাদা করে বলে দিলাম।(বললো অন্তিম)— পাখিদের কিচিরমিচির আওয়াজ। নতুন সূর্যর আগমন। সাথে নতুন একটি দিন।গ্রামের সবাই একে একে সিকদার বাড়ি আসছে। সবার জন্য প্যান্ডেল করা হয়।

অন্তিম এর কিছু বন্ধু এসেছে।

চারদিকে ছোট ছোট বাঁচ্চারা দৌড়া দৌড়ি করছে। সব মেয়েরা বউয়ের মত সেজে ঘোরাফেরা করছে।

তবে কেউ অন্তিম কে খুঁজে পাচ্ছে না।

অন্তিম এর বন্ধুরা এদিক সেদিক খুঁজলেও কোথাও পাচ্ছে না।

এই ঘর ঐ ঘর খুঁজতে খুঁজতে চোখ পরে রঞ্জনার ঘরের দিকে।

সবাই দেখে অবাক। অন্তিম ওর বোনের ঘরে।

নিজের হাতে ওর বোনদের সাজাচ্ছে।মালাইকাকে সাজিয়ে বসিয়ে রেখেছে।প্রিয়াও সাজিয়েছে। যদিও প্রিয়া এখন পর্যন্ত নাবালিকা মেয়ে।সবার আদুরে। কিন্তু তাকেও অন্তিম পাহারা দিয়ে রাখে।

অন্তিম রঞ্জনা কে সাজাচ্ছে। উপদেশ স্বরুপ অনেক কিছু বলছে। ওদের

ভাইবোনের সম্পর্ক এতটা অটুট সবাই অবাক হয়।আমরা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখছি।

হঠাৎ চোখ পরে অন্তিম এর তার বন্ধুদের দিকে।

অন্তিম শান্ত স্বরে বললো,দাড়িয়ে কেন ভেতরে আয়।

আমি আমার রাজকন্যাদের সাজাচ্ছি।

কেমন লাগছে বল।

অন্তিম ওর বোনদের এমন ভাবে আগলে রাখে।যেমনটা বাবা রাখে। বলা হয় বড় ভাই বাবার সমতুল্য। আপুদের অনেক ভালো লাগছে। আসলে তোকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এসেছি। এসেই দেখলাম তুই ওদের সাজাচ্ছিস।তাই আর ডাকলাম না। (বললো নয়ন অন্তিম এর বন্ধুদের মধ্যে একজন)

রঞ্জনা বললো,দাদাভাই আজকে আমি রান্না করবো।

এটা শুনে অন্তিম এর বন্ধুরা কানা ফিসফিস শুরু করে দিয়েছে।অন্তিম মৃদু হেসে বললো, আচ্ছা করিস। তবে তেলের বা আগুনের আচ যেন শরীরে না লাগে।

নয়ন সহ সবাই বাহিরে বের হয়ে ফিসফিস করছে। অন্তিম ওদের উদ্দেশ্য করে বললো,আমি জানি

তোরা কি বলছিস। আমার বোনের রান্নার স্বাদ ভালো না। কিন্তু তোরা খেয়ে কিন্তু প্রসংশা করবি।

নয়ন: এই ভাই বি'ষ খেতে পারবো কিন্তু তোর বোনের রান্না......

অন্তিম বললো, একটা দিবো কানের নিচে সা*লা।ও যা রান্না করবে চুপচাপ খেয়ে

নিবে।নয়ন সহ সবাই অন্তিম এর দিকে আ করে তাকিয়ে ছিল।

বোনের জন্য এত দরদ তো রান্না করতে দেয়ার দরকার কি! তাও আমাদের খেতে হবে।

বলেই মুখ কুঁচকে দেয় নয়ন।

অন্তিম এর জন্মদিন বাবর রাজ্য আজ উল্লাসিত।

আনন্দে ভরপুর। গ্রামের প্রতিটি মানুষ আজ খুব আনন্দিত। কারন, সিকদার বাড়ি কোন অনুষ্ঠান হলে তারা পেট পূরে ভালো মন্দ খেতে

পারে।তবে জন্মদিন উপলক্ষে কারো কাজ থেকে বাবর কোন উপহার নেননা।সবাই বলে এটা তার বাবার নিয়ম। কাউকে নেমন্তন্ন করলে , কাউকে আহার করালে অনেক বড় সওয়াব,তাই এটার বিনিময় বাবর কিছু নেননা।চারদিকে জমজমাট । কেউ নাচচে।তো কেউ গাইছে। কেউ লুকোচুরি খেলছে।

আনন্দে উল্লাসে দিন গড়িয়ে রাত হয়ে যায়। সিকদার বাড়ির ভির ধিরে ধিরে কমে গেলো।

বাবর সিকদার, একজন উকিলের সাথে বসে কথা বলছে।

কল্যানি পান চিপোচ্ছে। আর শাশুরির সাথে কথা বলছে।

ওমন সময় হাজির হয় রঞ্জনা। সবাই দাদির ঘরে আড্ডা দিচ্ছে। কল্যানি ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়।

প্রিয়ার শরীর ভালো না তাই ওর ঘরে যায়।রঞ্জনা,মালাইকা , সাথে রঞ্জনার বান্ধবীরা দাদীর ঘরে বিভিন্ন গল্পে মশগুল হয়ে আছে।

জয়গুন বিবি রঞ্জনা কে উদ্দেশ্য করে বললো,মনা, আমার অনেক ইচ্ছা। আমার মৃত্যুর আগে তোর বিয়েটা দেখে যেতে পারলে হয়।তুই বউ সাজবি ।পায়ে আলতা দিবি,টিকলি পরবি ,লাল বেনারশী পরবি।

রঞ্জনা দাদির উদ্দেশ্যে বললো, আঁচ্ছা দাদী তুমি কোনদিন কাউকে ভালোবেসেছো ?

কাপা কণ্ঠে জয়গুন বিবি বললো, বাসছি ই তো।আর সেই ছিলো তোদের দাদা। কত ভালোবাসতো আমায়। আমি একবার বলছিলাম আমার বিয়েটা যদি নদীর তীরে হয়। আর তোদের দাদু আমারে ঠিক তেমন ভাবেই বিয়ে করে।

রঞ্জনা মসৃন হাঁসলো। বললো,তারমানে তুমি ভালো ই রোমান্টিক ছিলা বুড়ি !

পাশে থাকা সবাই খিল খিল করে হেসে উঠে।

তৎক্ষণাৎ ঘরে উপস্থিত হয় বাবর। বাবর বললো,- –রঞ্জনা,আর মাত্র ৭ দিন বাকি। এরপর তোমার পরিক্ষা। আর তুমি পরাশুনা বাদ দিয়ে গল্পগুজব করছো?

রঞ্জনা কথা না বাড়িয়ে।পড়ার ঘরে চলে যায়।

এদিকে দুর্জয় বার বার রঞ্জনা কে খুঁজছে।ভয় ও হচ্ছে যদি কোথাও থেকে রাক্ষুসে মামা,আর ভাইটা চলে আসে।এতবড় বাড়ি কোথায় থাকে বলাতো যায়না।

এদিক সেদিক খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখে রঞ্জনা পড়ার টেবিলে পড়ছে।

ছোট জানালা দিয়ে দেখতে পেলো ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে।

খাটের উপর মালাইকা ঘুমোচ্ছে। তাও বই বুকের মধ্যে জড়িয়ে। হয়তো পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেছে। দূর্জয় ঘরের ভেতর প্রবেশ করার জন্য, আশেপাশে পরোখ করলো, কেউ আছে কিনা দেখলো। কেউ নেই। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে রঞ্জনার ঘরের ভেতর ঢুকতেই

দেখলো দরজা খোলা।ছোটবেলায় একবার ঘরের ভেতর থেকে দরজা লক হয়ে যায়।সেদিন রঞ্জনা অনেক ভয় পেয়েছিলো ।অজ্ঞান ও হয়ে যায়। তারপর থেকে ঘরের দরজা খোলা রাখে। দূর্জয় ঘরের ভেতর প্রবেশ করে পেছনে দাঁড়িয়ে রইলো।
কি বলবে ভাবতে ভাবতে
রঞ্জনা হঠাৎ বলে উঠলো, কিছু বলবেন? দূর্জয় অবাক হয়ে যায়।

ভাবলো,আমি আসলাম সেটা ও কি করে বুঝলো?

রঞ্জনা কাট গলায় বললো,

আমি সবার উপস্থিতি অনুভব করতে পারি।

আপনি কি বলতে চান তাও আমি জানি । তবে আপনার সেই কথা গুলো না বলাই ভালো।কারন আমি আমার বাবার মুখে কখনো চুলকানি মাখাতে পারবো না।

আমার বাবা আমার সবকিছু।তার শিক্ষা আমার আমার মধ্যে আছে। আমি চাই জীবনে সফল হতে।আর এই সফলতার বাঁধা হিসেবে কেউ দাড়াক তা আমি চাই না। আপনি আমার ভাই হন।আমি আপনাকে সম্মান করি।ব্যাস এতটুকু যথেষ্ট। আপনি আর দ্বিতীয় বার আমার চোখের সামনে আসবেন না। তাহলে আমি আমার বাবার কাছে বলতে

বাধ্য হবো।দূর্জয় কথা গুলো শুনে থম মেরে যায়। কি বলবে না বলবে বুঝতে না পেরে রঞ্জনার ঘর থেকে পদত্যাগ করবে,ঠিক তখনই পেছন ঘুরে দেখে অন্তিম দাড়িয়ে আছে । তৎক্ষণাৎ দূর্জয়ের শরীর থেকে ভয়ের আচ্ছন্নে অঝরে ঘাম ঝরতে থাকে।

অন্তিম চোখ দুটো লাল করে, হিংস্রের মত ফস ফস করতে

করতে , দূর্জয়ের শার্টের কলার ধরে টানতে টানতে নিচে নামিয়ে ফেলে।

দূর্জয় বার বার বলতে ছিল ভাইয়া একবার আমার কথাটা শুনোন, একবার আমার কথাটা শুনোন।

অন্তিম দূর্জয় এর কথায় গ্রাহ্য না করেই পেটাতে থাকে।

বাড়ির সকলে বেড়িয়ে আসে।বাবর সহ বাড়ির কাজের লোক সবাই।

বাড়ির বললো,

ওকে মারছিস কেন ? কি হয়েছে ?

অন্তিম বললো,ও আমাদের রঞ্জনার দিকে খারাপ নজর দিয়েছে।

কথাটা শোনা মাত্রই বাবর ও পেটাতে শুরু করে।সবাই ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখছে।

দূর্জয়ের সব বন্ধুরা নিচে নেমে আসে।

বাবর কর্কট মেজাজে বললো,

আমার মেয়েদের দিকে যে দৃষ্টি খারাপ করে তাকাবে। তার এরকম অবস্থা হবে।সে আমার যেইহোক।

বাবর সিকদার তার মেয়েদের দিকে কেউ খারাপ নজর,বা খারাপ মন্তব্য করলে তাকে শেষ করে দেয়।

তৎক্ষণাৎ দূর্জয়ের বন্ধু সহ ওদের গ্রাম থেকে বের করে দেয়া হয়।

অন্তিম শেষ বারের মত দূর্জয় কে হুঁশিয়ারি সংকেত দেয়।

অন্তিম খেয়াল করলো,সিড়ির কর্নারে মালাইকা বসে বসে ফোপাচ্ছে।অল্প কিছুতেই মালাইকা আতং'কিত হয়ে যায়।ভয়ে কাঁপতে থাকে।অন্তিম মালাইকাকে বুকে জড়িয়ে নেয়।

শান্ত স্বরে বললো, সবকিছুতে ভয় পেতে নেই। কখনো কখনো হিং,স্র ও হতে হয়।এত ভীতু কেন তুই?

মালাইকা কাঁদতেই থাকে।এভাবে দেখতে দেখতে কেটে যায় অনেক দিন।

রঞ্জনার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন এর ফলাফল প্রকাশ করেছে।

বাবর রাজ্য খুশিতে আপ্লুত হয়ে উঠে।

গ্রামের সবাইকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে অন্তিম। চারদিকে মানুষের

কোলাহল। সবাই এসে রঞ্জনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

রঞ্জনা বরাবরই মেধাবী।

তার বাবার স্বপ্ন,তার দুই মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবে কিন্তু মালাইকা একদম যেতে রাজি নয়।সে শহরে যাবে না।তাই আর কেউ মালাইকাকে জোড় করেনি।

আজকে আবেদন এর ফলাফল দিয়েছে। রঞ্জনা ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। সেই খুশিতে গ্রামের সবাই উৎসব পালন করছে।

কারন বাবররাজ্য থেকে এই প্রথম বার কেউ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরাশুনার সুযোগ পেয়েছে। তাও বাবর সিকদার এর মেয়ে।আজ বিকেলের ট্রেনে রঞ্জনা কে ঢাকায় নিয়ে যাবে,অন্তিম। ঢাকার শহরে রঞ্জনা একা। তাবে রঞ্জনা কে

অনেকেই চিনে শুধুমাত্র তার নাচের জন্য। ঢাকাতে এই পর্যন্ত অনেক বার প্রোগ্রাম হয়েছে।

বিকেলে শহরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। রঞ্জনার সব বন্ধুরা আসে বিদায় জানাতে।

মালাইকা এক কোনে দাঁড়িয়ে ফোপাচ্ছে।প্রিয়া কোন মতেই রাজি নয় তার বোন দূরে যাবে।

বাবরের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু রঞ্জনাকে বুঝতে দিচ্ছে না।কারন সে চায় তার মেয়েরা জীবনে অনেক বড় হোক।তাদের পরিচয় তারা বাচুঁক।

(বর্তমান)

সূর্য থেমে যায়। রুশরাজ্যে কোন কারনে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। কিছু দূরে শেয়াল ডাকছে। বাদুর গুলো একটু পর পর এইগাছ থেকে ঐ-গাছে যাচ্ছে।

শীতল হাওয়া বইছে।

কিন্তু তারমাঝে অপূর্ব ঘেমে একাকার হয়ে যাচ্ছে। সূর্য বলছে না কেন। তারপর কি হয়েছিল । অপূর্বর ভেতর যে আগুন জ্বলছে। অপূর্ব ধৈর্য হারা হয়ে সূর্য কে প্রশ্ন করেই ফেললো,কি হয়েছিল তারপর?

সূর্য ভারি একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেললো। পকেট থেকে সিগারেট ধরায়।চোখ গুলো জ্বলজ্বল করছে ।

সূর্য শান্ত স্বরে বললো,, যেদিন রঞ্জনা ঢাকায় আসে সেদিন ই রঞ্জনার জীবনে কালো ঝড় নেমে আসে।

রঞ্জনা ঢাকায় চলে আসে।আমি আর রায়হান, সাথে সৈকত সবাই ঢাকা কলেজে যাচ্ছিলাম।বাসে ছিলাম। গরমে ঘেমে একাকার হয়ে

যাচ্ছিলাম। জ্যামে বসা ছিলাম।গরম সহ্য করতে না পেরে জানালা টা খুলে দেই।

তখনই আমার চোখ পরে বাস স্টেশনে। আমার হৃদয় সেদিন থমকে যায়।ভেতরে ধুকবুকানি টা হঠাৎ বেড়ে যায়।এ যেন স্বর্গের পরি নেমে এসেছে মানুষের রুপ ধারন করে। আমি রায়হান সৈকত কে, কিছু না বলেই বাস থেকে নেমে

রঞ্জনার বাসের পেছনে ছুটতে থাকি। তবে রঞ্জনা আমাকে দেখছিলো। বাস গিয়ে থামে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। কিভাবে রঞ্জনার জীবনর বৃত্তান্ত জানবো সেই ভেবে কিছু মেয়েদের প্রশ্ন করি।তারা আমাকে না বললেও আমি ওর ব্যাপারে জানতে পারি।ওর পরিবারের ব্যাপারে জানতে পারি।

সেদিন রঞ্জনা আমাকে সবার সামনে অপমান করলেও ওর চোখের কোন এক কোনে আমার জন্য এতটুকু হলেও ঘৃনা দেখতে পাইনি। আমি খেয়াল করলে দেখতে পাই ওর পিছনে অন্তিম ভাই। তবুও আমি কিছু বুঝতে পারিনি।

প্রতিদিন বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতাম। একনজর আমার প্রেয়সী কে দেখার জন্য।

এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পরে , একদিন একটা পার্সেল আসে।আমি অবাক হই।কৌতূহল নিয়ে পার্সেল টা খুললে দেখতে পাই একটা চিরকুট।

সেই চিঠিটা আর কারো নয়
রঞ্জনার ছিল।ওর চিঠি পেয়ে পূরো শরীর কেঁপে উঠে ছিলো। তবে যা দেখেছিলাম তাতে আমি পুরোপুরি অবাক হই।

ভুবনমোহিনী সুন্দরী*রঞ্জনা সে কিনা আমার সুন্দর্য প্রকাশ করেছে।সেদিন নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হয়েছিল। রঞ্জনা আমাকে অচিন পাহাড়ে ডেকে ছিলো।

আমি গিয়েছিলাম,তবে একা নয় , রায়হান আর সৈকত কে সাথে নিয়ে যাই। রায়হান আমাকে উৎসাহ দিতো।

অচিন পাহাড়ে রঞ্জনা আমার অপেক্ষায় ছিলো। লাল রঙের স্কার্ট,সাথে লম্বা চুলের বেনুনি।ভারী মিষ্টি লাগছিল দেখতে। সবার নজরে ছিলো রঞ্জনার দিকে।সবাই রঞ্জনার রুপে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলো। আমি রঞ্জনার সাথে কথা বলতে পারিনি।ওর সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারিনি ।

আমার অপেক্ষায় না থেকে রঞ্জনাই বলতে শুরু করে। রঞ্জনা কথায় কথায় আমার প্রশংসা করতো।আমি অবাক হতাম।স্বর্গপরী রঞ্জনার মুখে যেদিন সু-দর্শন কথাটি শুনেছিলাম সেদিন থেকে নিজেকে সু দর্শন মনে করতাম।শ্যামবর্ন সূর্য সেদিন হয়ে ওঠে সুদর্শন।রঞ্জনার সাথে অনেকক্ষন কথা বলি।খুব শান্তি পাচ্ছিলাম।

এভাবে কিছুদিন কেটে যায়।আমি নিজেকে দুনিয়ার সব থেকে ভাগ্যবান পূরুষ মনে করতাম। কিন্তু এই সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

“বলেই সূর্য ভারি একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেললো। হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখের পানি মুছে। অপূর্ব আড় চোখে সূর্য কে পরোখ করে।

সাপে,র মত ফসফস করছে।অথয রঞ্জনাকে হারানোর বেদনা ভেতর থেকে সূর্য কে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

সূর্য কিছুক্ষন চুপ থেকে আবার বলতে শুরু করে ।

আমাকে রঞ্জনা ওর পরিবার সম্বন্ধে সবকিছু বলে। রঞ্জনা কখনোই চাইতো না ওর মা বাবাকে না জানিয়ে একা একা বিয়ে করবে। আমিও চাইতাম না।তবে হঠাৎ

রঞ্জনার মনে আমার মায়া, ভালোবাসা গ্রা,স করে। আমাকে ছাড়া এক মুহুর্ত থাকতে পারতো না।একদিন কলেজের ল্যান্ডলাইন থেকে রঞ্জনা আমাকে ফোন দিয়ে বিয়ের কথা বলে।আমি অবাক হই মনে মনে খুব খুশিও হই। মনে মনে নিজেকে নিয়ে অনেক গর্ব হতো। হাজারো সুদর্শন

পুরুষ কে উপেক্ষা করে শ্যামবর্ন সূর্য কে বেছে নিয়েছে।

আমি রাজি হই বিয়ে করতে। রঞ্জনার খুব ইচ্ছে ছিল সমুদ্রের তীরে বিয়ে হবে।আমিও রঞ্জনা কে না জানিয়ে ঘটা করে বিয়ের আয়োজন করি।

সেদিন আমার জন্মদিন ছিল। রঞ্জনা আমার জন্য কিছু উপহার দিতে আসতে চায়।ঠিক তখনি রঞ্জনার

নাচের প্রোগ্রাম চলে আসে।সেটাও ঠিক সেদিন। আমি রঞ্জনা কে জানাই তুমি প্রোগ্রাম শেষ করে তবেই এসো।

নাচের প্রোগ্রাম শেষ করতে করতে রাত হয়ে যায়।আমরা সেই রাতেই বিয়ের আয়োজন করি।যমুনা নদীর তীর চাক চমৎকার করে সাজাই। বিভিন্ন লাইট বসাই।যাতে আমার রঞ্জনা দেখা মাত্রই অবাক হয়।

নাচের প্রোগ্রাম শেষ হবে রাতে,তাই ভেবে আমি রায়হান সৈকত কে ওর কাছে পাঠিয়ে দেই যাতে ওর কোন সমস্যা না হয়।যমুনা নদীর তীরে আমরা সবাই অপেক্ষা করতে থাকি। জমজমাট ছিলো যমুনা নদীর তীর। এক ঘন্টা – দু ঘন্টা এরকম কয়েকঘণ্টা কেটে যায়। রঞ্জনার কোন খবর নেই।

রাত অনেক হয়ে যায়।আমি ভেবেছিলাম হয়তো নাচের প্রোগ্রাম শেষ হয়নি।

এরকম কয়েক প্রহর অপেক্ষায় থাকার পর। চলে আসে রায়হান আর সৈকত।

ওদের একা আসতে দেখে আমার ভেতরে যন্ত্রনা শুরু হয়ে যায়। রায়হান আমাকে যা বললো তাঁতে আমার ভেতরটা জ্বলে পুড়ে শেষ

হয়ে যাচ্ছিল। রায়হান বললো,আজকে রঞ্জনার কোন নাচের প্রোগ্রাম ছিলো ই না। আমি থমকে গিয়েছিলাম।পূ্রো শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকে।হৃ্রদয়ের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আশেপাশের সবাই আমার হাকা,কার দেখতেছিলো।ঠিক তার কিছুক্ষণ পর। যমুনা নদি থেকে একটা টলার এসে আমাদের কাছেই ভীরে।

টলারে থাকা লোকগুলো কালো মুখোশধারী ছিলো।চিনতে পারিনি। তারা কয়েকজন মিলে আমাদের দিকে একটা মমি ছুরে দেয়।

সবাই আতংকিত হয়ে যাই।

সবাই কৌতুহল নিয়ে মমিটির দিকে এগোয়।কেউ মমিটি খুলে দেখতে সাহস পায়নি। তৎক্ষণাৎ রায়হান মমিটি খুললো। তারপর আমি যা

দেখেছিলাম ঠিক ঐ মুহুর্তেই যেন আমি জীবন্ত লা,শ হয়ে গিয়েছিলাম।

সেই মমিতে আর কারো নয় রঞ্জনার লা,শ ছিলো, রঞ্জনার লা,শ।

সূর্য অঝরে কান্না শুরু করে।

অপূর্ব অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে।

অপূর্ব অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়িয়।

পায়চারি করতে শুরু করে।

সূর্য হিংস্র ভঙিতে বললো,ওরা বন্ধু নয় বিশ্বাস ঘাতক ছিল। বিশ্বাসঘাতক।

অপূর্ব অবাক হয়ে যায়,ভেতরের ধুকবুকানি টা বেড়ে যায়। রাত হয়ে যাচ্ছে অথচ সূর্যর সত্যটা যেন শেষ ই হচ্ছে না।

অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে, তারপর কি হয়েছিল।

সূর্য কাপা কণ্ঠে বলতে শুরু করে, আমার হাহা,কার সবাই দেখছিলো। আমার বুকফাটা কান্না। আমার কান্নায় সেদিন যমুনা নদী শান্ত হয়ে গিয়েছিল।

রায়হান পুলিশ টিমকে ফোন দিয়ে শা,শ ময়নাত,দন্তের জন্য নেয়া হয়। রিপোর্ট আসে। রঞ্জনা কে একাধিক-জন ধর্ষ,ন করে।এরপরে মে,রে ফেলে।আমার জীবন টা সেদিন ই

থমকে গিয়েছিল।আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

রঞ্জনা কে,মৃত দে,হ ছুয়ে প্রতিক্ষা করেছিলাম।ওর সাথে যারা খারাপ করেছিল তাদের সবাইকে দেখে নিবো। কিন্তু আমি কোন ভাবেই জানতে পারছিলাম না ,যে কারা এরকম টা করেছে। আমি মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে যাই। সুস্থ হয়ে উঠতে ৬ মাস সময় লেগেছিল।

তারপর আমি রঞ্জনার মৃত্যু নিয়ে তদন্ত শুরু করি।

তবে সৃষ্টিকর্তা চেয়েছিলেন কিনা জানিনা। হঠাৎ এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে, হাঁটতে ছিলাম রাস্তায়। তখন আমার দেখা হয় মজিবুল চাচার সাথে। যিনি ছিলেন রঞ্জনাকে আনতে যাওয়া গাড়ির ড্রাইভার। আমি তাকে পাঠিয়ে ছিলাম রঞ্জনাকে আনতে কিন্তু সেদিন তাকে জিজ্ঞেস

করলে উনি অস্বীকার করেন।আমি জোর করিনি।
কারন উনি ছিলেন আমাদের বিশ্বস্ত ড্রাইভার।
তবে অবাক করা বিষয় ছিল উনি ৬ মাস ধরেই নিখোঁজ ছিলেন।মানে কোথাও খোজ পাচ্ছিলাম না।সেদিন হঠাৎ তার সাথে আমার দেখা হয়।
উনি আমাকে নির্জন রাতের আহ্বান জানান।আমি আগ্রহ পাই।হয়তো

কিছু বলবে।তবে উনি যা বললো তাতে আমি অবাক হয়ে যাই।সেদিন উনি রঞ্জনা কে নিয়ে আসতেই মাঝপথ থেকে দূর্জয় ও ওর বন্ধুরা মিলে সেই গাড়ি আক্রমণ করে। চাচার মেয়েকে আগেই অপহরণ করে নেয়।

মজিবুল চাচাকে ভয় দেখিয়ে, রঞ্জনা কে এক গহীন বনে নিয়ে যাওয়া হয়।

চাচা বলেন, পেছনের ছেলে গুলো কথা বলতে গিয়ে মুখ ফসকে দূর্জয় নামটা বেড়িয়ে আসে। তখনই আমি জানতে পারি ওরাই রঞ্জনা কে হ,ত্যা করে।

আমি মনস্থির করি এর প্রতিশোধ আমি নেবোই।

এক প্রহর ও আমি ঘুমোতে পারিনি। প্রতিশোধের আগুনে ধীরে ধীরে পুড়ে উঠছিলাম। প্রতিদিন বারে

যেতাম- নে,শা করতাম।আর ঠিক সেখানেই আমার রেখার সাথে পরিচয় হয়।আমি টাকা দিয়ে রেখাকে কিনে নেই। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি দূর্জয় ওরা ঢাকা কলেজে পরে।

রেখা দেখতে আকর্ষণীয়।তাই রেখা ওর রুপের ফাঁদে ফেলে। এরকম অনেক দিন কেটে যায়।ওরাও ধীরে ধীরে রেখার প্রতি আকৃষ্ট হয়।এই

সুযোগ কাজে লাগালাম। একদিন রেখা একটা পার্টির নাম করে ওদের ডাকে। ম,দের সাথে অতিরিক্ত ঘুমের ঔষধ খাইয়ে কাবু করে ফেলে। ওদের নিয়ে যাওয়া হয় সেই জঙ্গলে যেখানে রঞ্জনা কে হ,ত্যা করা হয়।সেই জঙ্গল আর অন্য কোন জঙ্গল নয়।এই রুশরাজ্যে।

ওদের আনা হয়। দূর্জয়ের চোখের সামনে ওর তিন বন্ধু কে হ,ত্যা করি।

ঠিক তখনি আমার কানে যা শুনেছি, তৎকালীন সময় আমি নিস্তেজ হয়ে যাই।

দূর্জয় উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো, রঞ্জনাকে ধর্ষন করার পেছনে তোর বন্ধুদের হা,ত ও আছে।

আমি অবাক হয়ে যাই।আমি হাঁটুঘেরে বসে পরি।

বার বার জিজ্ঞেস করি কে ছিলো।

দূর্জয় বললো না।

আমি দূর্জয় কে বললাম,তুই সত্যি বললে,তোকে ছেড়ে দেবো। দূর্জয় নিজের প্রানের লোভে আমাকে সত্যিটা বলে।

সেদিন রঞ্জনার গলা নকল করে আমাকে সৈকত ফোন করেছিলো ।

ওর সাথে ছিলো রায়হান,ওর সাথে ছিলো মুন্না

অপূর্ব দাঁড়ানো থেকে ধপাস করে মাটিতে বসে পরে।কি শুনছে এসব। সূর্য কর্কট স্বরে আবার বলতে শুরু করে, এটা জানার পর আমার রাগ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আমি ধিরে ধিরে হায়,না ওয়ে উঠি।দূর্জয় কে এলোপাথাড়ি ছু,রি দিয়ে খু,ন করে ফেলি।

এরপর আমার পরবর্তী পরিকল্পনাতে ছিল রায়হান।

সেদিন তোরা যখন টুর থেকে ফিরেছিলিস আমি খোঁজ পাই। রায়হান সকালে বাড়ি পৌঁছাবে ঠিক তার আগেই মিথ্যা বলে এই রুশরাজ্যে নিয়ে আসি। তারপর ওকেও শেষ করে দেই।একে একে মুন্না আর সৈকত কেও শেষ করি।

অপূর্ব থম মেরে বসে আছে ।কোন কথা বলার শক্তি নেই। চারদিকের সবকিছু অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। অপূর্বর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে ।

সূর্য নিশ্চুপ, অপূর্ব হতভাগ হয়ে আছে।

রাত শেষ হওয়ার দিকে।সূর্য আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকে।

অপূর্ব ভেজা কন্ঠে প্রশ্ন করলো, ২৭ বছরের ছেলেদের অপহরণ, তারপর ওদের হা,র্ট বের করে নৃশংস মৃত্যু, এর পিছনে কি তুই আছিস??

সূর্য খিল খিল করে হেসে

বললো, রঞ্জনার হত্যা,র পেছনে কোন বয়স ছিল না।

এসবের পেছনে কে আছে তা আমার জানা নেই।

রায়হান কে, অপহ,রণ করার পরিকল্পনা আগেই করেছিলাম কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ততদিনে ওর ২৭ তম বয়স হয়। তবে আমি জানি না এর পেছনে কে বা কারা!!

এই পর্যন্ত ৪০ টা হৃদয়হীন লা,শ পাওয়া গেছে তারমধ্যে

৬ টা, আমার হত্যাকা,ন্ড।বাকিদের পেছনে কে আছে সেটা অজানা।

অপূর্ব অবাক দৃষ্টিতে সূর্যর দিকে তাকিয়ে আছে।কতটা সহজে কথাগুলো বলছে।

কে এই সূর্য তার রুপের কি এর নির্মম পরিবর্তন।

যদি সূর্যর সবকিছুর পেছনে হাত না থাকে তবে কে আছে???—অপূর্ব পায়চারি করতে থাকে। সূর্য লতায় মোড়ানো গাছের টুকরোর উপর বসে আছে। আনমনে সিগারেটে টা”নছে।

হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখের পানি মুছছে। অপূর্বর ভেতরে নতুন করে আবার ভাবনা জন্ম নিলো।যদি সূর্য সবকিছুর পেছনে না থাকে,তবে এই নির্মম মৃত্যু খেলার পেছনে কে আছে? অপূর্ব ভাবতে থাকল।

____আজকে রাত শেষ ই হচ্ছে না। রাতের গভীরতা বাড়ছে।অপূর্ব কিছুক্ষন চুপ থেকে সূর্যর পাশে বসে।কি বলবে বুঝতে পারছে না।

তার বন্ধু একজন খু,নি।একটা প্রা,নের বিনিময়ে হাজার টা প্রান নেয়া অপরাধ।তবে রঞ্জনার সাথে যা হয়েছে সেটাও নির্ম,ম । বন্ধুর হাতে হাতকড়া পরাবো,নাকি সুযোগ দেবো? অপূর্বর এসব চিন্তা করতে করতে মাথা ব্যথা হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর শান্ত স্বরে বললো, সেই বাবর রাজ্য কোথায়? আর রঞ্জনার মা বাবা কোথায়?

সূর্য চোখের দৃষ্টি মাটির দিকে পরোখ করে বললো, ওনারা বেঁচে নেই। বাবর তার মেয়ে হারিয়ে হার্ট অ্যাটাক করে মৃত্যু বরন করে। সেই শোক সহ্য করতে না পেরে ‘ কল্যানি , তার দু মেয়েকে নিজের হাতে হ,ত্যা করে নিজেই নিজেকে শেষ করে।বাকি ছিলো অন্তিম । বাবর সিকদার মৃত্যুর পর অন্তিম ছিলো একা।জানা যায় অন্তিম কে

শেষ করে সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়া হয়। তবে তারপর থেকে সিকদার বাড়ি পরিত্যাক্ত হয়ে যায়।কেউ আর যায়না সেখানে।

অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করে ,সেই জায়গাটা কোথায়?সূর্য ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, এখান থেকে অনেক দূর। সকালে বের হলে যেতে যেতে বিকেল।

অপূর্ব কিছুক্ষন চুপ থেকে বললো,
মৌলবী কে কারা মেরেছে?
সূর্য ঠোঁট কুঁচকে হাসি দিয়ে বলল ‘,
মৌলবী কে কারা মেরেছে সেটাও আমার অজানা।
অপূর্ব কি বলবে বুঝতে পারলো না।
অপূর্ব আতংক স্বরে জিজ্ঞাসা করলো,
তোর পরবর্তী পরিকল্পনা কি?
সূর্য শান্ত হয়ে স্বরে বললো,

কিছু না।রাত শেষের দিকে।কোথাও থেকে কোন জ,ন্তু- জা,নোয়ার এসে আক্র,মণ ,করবে তার কোন ভয় নেই।

অপূর্ব সুর্য কে বার বার পরোক্ষ করছে। সূর্য কে দেখে সহজ মনে হলো না।মনে মনে কোন ফন্দি আট,ছে এটাই অপূর্বর মনে হচ্ছে। কিন্তু কোন প্রশ্ন করলো না।

অপূর্ব দাড়িয়ে যায়। কিছু ভাবতে থাকে।ঠিক তখনই সূর্য অপূর্বর সামনে হাঁটুঘেরে বসে পরে।

অপূর্ব হতভম্ব হয়ে যায়।

সূর্য জ্বল জ্বল চোখে,হাত দুটো মুঠো করে অপূর্বর দিকে এগিয়ে দেয়।

কাঁপা কণ্ঠে বলে উঠলো, তুই চাইলে আমায় গ্রেফতার করতে পারিস। আমি পাপ করেছি।এই পাপের শা,স্তি তো আমাকে পেতেই হবে।

অপূর্ব থম মেরে দু কদম পেছনে স্বরে যায়।বুকের ভেতর টা জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

তাদের বন্ধুত্বের বাধন আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

অপূর্ব কিছু ভেবে ভেজা কন্ঠে বললো,সময় সবকিছু বলে দেবে।

বলেই হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখের পানি মুছে।

ভোর হয়ে যায়। অপূর্ব ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফেরে।সবাই ঘুমিয়ে আছে। দরজা খুলে দেয় মনোরা।

নিস্তেজ শরীর নিয়ে ঘরে যায়।খাটের উপর ধপাস করে বসে পরে। কি থেকে কি হয়ে গেলো। মনকে কোন ভাবে শান্ত করতে পারছে না।

ঠিক তখনি চোখ পরে আয়নার দিকে। অপূর্ব চমকে যায়।চোখ দুটো বড় বড় করে দেখতেই দেখে,কালো

রঙের শাড়ি পরে কেউ চুল মুছছে। চুল গুলো এপাশ ওপাশ করে ঝাপটাচ্ছে।আয়না থেকে বারান্দা সোজাসুজি। অপূর্ব বা দিকে ঘুরতেই দেখে এলিজা।এলিজাকে দেখা মাত্রই অপূর্বর সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। অপূর্ব পেছন থেকে গিয়েই এলিজাকে জড়িয়ে ধরে।

এলিজা আচমকা জড়িয়ে ধরাতে হকচকিয়ে ওঠে,

অপূর্ব বললো,আমার মহারানি আমাকে না জানিয়ে চলে আসছে যে,আমাকে অবাক করার জন্য?

এলিজা মৃদু হেসে বললো, কখনো কখনো হঠাৎ করে এসেই কিছু মানুষ কে অবাক করতে হয়।

অপূর্ব বললো,ম্যাডাম আপনার মধ্যে হয়তো জাদু আছে।যখনি আপনাকে দেখি পৃথিবীর সমস্ত ক্লান্তি যেন দূর হয়ে যায়।এলিজা অপূর্বর দিকে ঘুরে

মৃদু হেসে বললো,আপনাকে খুব মনে পরছিলো। কতদিন হয় আপনার বুকে মাথা রেখে ঘুমোয়নি। ভালো লাগছিল না তাই চলে আসলাম।

আপনাকে ছাড়াও আমার আমার একাকি লাগছিল।আজকে আপনি না আসলেও আপনাকে আমি গিয়ে নিয়ে আসতাম।

এলিজা হঠাৎ, উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।কোন ভাবনায় গ্রা,স করেছে।

অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো,কি হয়েছে কি ভাবছো?

এলিজা, উল্টো দিকে ফিরে ই বললো, শ্রাবন এর কথা ভাবছি । আমি রাতেই ফিরেছি। একবার শ্রাবন এর ঘরে গিয়েছিলাম। আমার সাথে কথা বলেনি। কিন্তু....

কিন্তু কি?এলিজা বললো,শ্রাবন ওর সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে। যেখানে যা ছিল সব ব্রিফকেস করে রেখেছে।হয়তো চলে যাবে। আপনি একবার ওর সাথে কথা বলুন।

অপূর্ব এলিজার দুই স্বিনার হাত দিয়ে মৃদু হেসে বললো,এসব নিয়ে তুমি চিন্তা করো না।আমি কথা বলে নেবো।আর তুমি আজ আমার জন্য

রান্না করবে। কতদিন হয় তোমার হাতের রান্না খাইনি।

এলিজা ভেজা তোয়ালে টা দড়িতে রেখে বললো,এখনি রান্না বসাচ্ছি। ততক্ষণে আপনি গোসল করে আসেন সারারাত বাহিরে ছিলেন।

অপূর্ব শ্রাবনের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।ভেতরে যাবে কিনা ভাবছে। কি জবাব দেবে। ইতস্তত বোধ করতেই , দরজায় কড়া নাড়ে।

শ্রাবন কাট গলায় বলল, দরজা খোলা আছে।

অপূর্ব ভেতরে যায়।৩ টা ব্রিফকেস করা। বুঝতে পেরেছে ,বিদেশ চলে যাওয়ার জন্য তৈরি।

অপূর্ব গলায় কাশি দিয়ে বললো,

কি চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ?

অপূর্ব মনে মনে খুশি ও।যদি বিদেশ গিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে তবে শ্রাবনের জন্য ই ভালো।

শ্রাবন স্বাভাবিক ভাবে বললো,
হ্যা চলে যাচ্ছি।কারো সাথে কথা বলার ইচ্ছে নেই। তুই আসতে পারিস।
অপূর্ব কথা না বাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।শ্রাবন বিদেশ যাওয়ার জন্য ভিসা করতে দিয়েছে। ,২দিন পরেই ভিসা আসবে। শ্রাবন মনস্থির করে তার আগে শেষ বারের মত একবার তিলকনগর যাবে। যদিও

সে আমার কেউ নয়।তার উপর আমার কোন অধিকার নেই।সে এখন অন্যর অর্ধাঙ্গিনী। ভাবতেও খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কষ্ট হলেও এটাই বাস্তব ।

আজকেই একবার তিলকনগর যাবো।দূর থেকে পাখিকে এক নজর দেখে আসবো। ওর সাথে কাটানো দিন গুলির কথা ভাবলে বুকের ভেতর ধুকবুকানি টা বেড়ে যায়।

মনের অজান্তেই চোখে পানি চলে আসে।

শ্রাবন তিলকনগর এর উদ্দেশ্য বের হয়। ঠিক তখনই দেখে এলিজা-হাতে একটা মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে হয়তো মেডিকেল ই যাচ্ছে। আমি কোন প্রশ্ন করলাম না।যার যা ইচ্ছা হোক।

শ্রাবন বেড়িয়ে পরে।গাড়ি মাঝপথে থামিয়ে হাটা শুরু করে। যতই রাস্তা

এগোচ্ছে ততোই বুকের ভেতর কম্পন টা বেড়ে যাচ্ছে। শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকে ।

পাখির কোথায় বিয়ে হয়েছে সেটাও অজানা।তবে মামির কাছ থেকে জেনে নেয়া যাবে। যদি একটা বার পাখি বলে,আমাকে নিয়ে যাও আমি নিয়ে আসবো।যদি কোন মিরাক্কেল হতো।

তবে যে আমার প্রিয় মানুষ টিকে ফিরে পেতাম।এসব ভাবতে ভাবতে শ্রাবন হেঁটে কিছুদূর যেতেই রাস্তায় দেখা মিলে রাশেদের সাথে। শ্রাবন ভ্রু কুঁচকে দেয়। এই সেই রাশেদ যার সাথে পাখির বিয়ে হয়েছে। ইচ্ছে করছে এখানেই পুঁতে ফেলি।

শ্রাবন

রাশেদ কে উপেক্ষা করে যেতেই, রাশেদ উত্তেজনা স্বরে বলে উঠলো,

আরে শ্রাবন ভাই না! আপনি এইহানে? আপনি খুব ভালো গান করেন! আপনার গান ঐদিন স্কুলে আমি হুনছি অনেক ভালো লাগছে।(রাশেদ নিরক্ষর)শ্রাবন অবাক হয়, রাশেদের বয়স ও একটু বেশি তার উপর নিরক্ষর ।পাখি এরকম একজনকে বিয়ে করেছে।

ভাবতেই শ্রাবন মৃদু হেসে আমতা আমতা করে বললো, ধন্যবাদ। কোথায় যাচ্ছেন ভাবি কোথায়?

রাশেদ মৃদু হেসে বললো,আমি তো বিয়া করিনাই ভাই। কারন আমি একজনরে ভালোবাইসা বিয়ে করছি। পরে বাচ্চা প্রসবের সময় মারা যায় তারপর আর দ্বিতীয় বিয়ে করি নাই।

শ্রাবন অবাক হয়ে যায়।কি বলছে রাশেদ এসব !বিয়ে তো সেদিন ই করলো।

শ্রাবন রাশেদের দুই স্বিনাতে হাত দিয়ে,কিছুটা কর্কট মেজাজে বললো, আপনার তো পাখির সাথে বিয়ে হয়েছে।সেদিন ই তো বিয়ে হয়েছিল।রাশেদ মৃদু হেসে বললো,আরে ভাই ওটাতো একটা নাটকিয় বিয়ে ছিল।আর তারজন্য

আমারে বড় জামাই অপূর্ব স্যার মোটা অঙ্কের টাকা দিছিলো।

শ্রাবন রাশেদের কাদ থেকে হাতটা সরিয়ে দু- কদম পেছনে স্বরে যায়।

কি বলছে এসব।কি শুনছি আমি।

তবে ওদিন পাখির বিয়েই হয়নি।

আমি পাখিকে ভুল বুঝেছি।

তবে সবাই মিলে আমার সাথে এই মিথ্যা নাটক কেন করলো।কি হয়েছিল সেদিন।

শ্রাবন অপেক্ষা না করে উল্টো দিকে দৌড়াতে থাকে।চোখ থেকে অঝরে পানি পরছে।চিন্তায় মাথাটা ফেটে যাচ্ছে। অপূর্ব কে আমায় জিজ্ঞেস করতেই হবে।কি লুকিয়েছে ওরা।

শ্রাবন দৌড়াতে দৌড়াতে গাড়ির কাছে চলে আসে।কিছুক্ষণ এর মধ্যে ই পৌছায় চৌধুরী বাড়ি।

খুব অস্থির শ্রাবন। কি করবে না বুঝতেই পারছে না।

দ্রুত পায়ে হেঁটে অপূর্বর ঘরে যায়। অপূর্ব ডিউটিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।

শ্রাবন তৎক্ষণাৎ কর্কট মেজাজে বললো,পাখি কোথায়? অপূর্ব থমকে যায়। শ্রাবন কে এড়িয়ে যেতে চাইলে আবারো প্রশ্ন করে। পাখি কোথায়??

অপূর্ব কিছু না বলে ওয়াকিটকি টা হাতে নিয়ে বের হতেই শ্রাবন বাধা হয়ে দাঁড়ায় ।

বললো,

সত্যিটা বল।কেন বিয়ের নাটক করলি? কিসের জন্য রাশেদ কে মোটা অংকের টাকা দিলি।কেন আমাকে এভাবে পোড়ালি?অপূর্ব উত্তেজিত হয়ে হাত থেকে

ওয়াকিটকি টা বিছানার উপরে ফেলে দেয়।

শ্রাবন অপূর্বর উত্তর এর অপেক্ষায় থাকতে না পেরে অপূর্বর পা ধরে বসে পরে।

ভেজা কণ্ঠে বললো,বলনা ভাই। তুই তো আমার বড় ভাই।বড় হয়ে কিভাবে আমার কষ্ট সহ্য করিস। একবার সত্যটা বল।

অপূর্ব কিছুক্ষন থম মেরে থেকে কর্কট মেজাজে বললো,সত্যিটা জানতে চাস তো! সত্যিটা জানতে চাস! চল আমার সাথে।

শ্রাবন অবাক হয়ে যায়। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে অপূর্ব। কোথায় পাখি ! শ্রাবনের ভেতরটা যে জ্বলে যাচ্ছে।

অপূর্ব শ্রাবন কে গাড়িতে বসিয়ে নিজেই ড্রাইভ করতে থাকে। শ্রাবন কোন প্রশ্ন করলো না। শুধু ভেতরে

ভেতরে একটু পরপর জ্বলে উঠছে। বেশ কিছুক্ষণ পর গাড়ি এসে থামে ঢাকা পিজি হাসপাতালের সামনে । শ্রাবন থমকে যায়। শরীর থেকে সমস্ত শক্তি নিমেষেই শেষ হয়ে যায়। অপূর্ব শ্রাবনের ডান হাত টা ধরে নিয়ে যায় ভেতরে।

শ্রাবনের শরীর ধিরে ধিরে অবস হয়ে যাচ্ছে।

যেখানে সব আইসিইউ। সেখানে এসে থামে।

অপূর্ব শ্রাবন কে একটা আইসিইউর রুমের সামনে নিয়ে আচরে ছেড়ে দেয়।

শ্রাবন কাপা কণ্ঠে বললো, এখানে কেন নিয়ে এসেছিস ভাই।

অপূর্ব শ্রাবন কে মেজাজ দেখিয়ে বললো,পাখি কোথায় জানতে চেয়েছিস না! ঐ দেখ পাখি শুয়ে

আছে। আঙুলের ইশারায় অপূর্ব দেখিয়ে দিলো।শ্রাবন নিমিষেই শেষ হয়ে যায়। হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে।ভেতরটা দুমরে মুচড়ে যাচ্ছে। আইসিইউর দরজায় থাকা ছোট গ্লাসের দিকে পরোখ করলো ।পাখি শুয়ে আছে। নাকে অক্সিজেন । শ্রাবনের কথা বলার সর আটকে যাচ্ছে। মস্তিষ্কের নিউরন গুলো ছিরে যাচ্ছে।

এ আমি কি দেখছি। একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করলে দেখতে পায় এলিজা পাখির কাছে বসে আছে। তারমানে মেডিকেল রিপোর্ট নিয়ে এলিজা এখানেই আসছিলো। শ্রাবন এক কমদ দু কদম করতে করতে পেছনে দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়ে নিস্তেজ হয়ে দেয়াল ঘেঁষে বসে পরে।

কথা বলার কোন শক্তি নেই।তবুও কাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে আমার পাখির?

অপূর্ব এদিক ওদিক পায়চারি করতে করতে বললো,পাখির ব্রেন টিউমার। শ্রাবনের মাথার উপর সমুদ্র টা আচরে পরে।গোটা পৃথিবীর সমস্ত ভার শ্রাবণের শরীরে বহন করে। উৎফুল্ল মন, নিমিষেই নিঃস্ব হয়ে যায়সকাল থেকে নামাজে বসে

কাঁদছে জয়তুন। ফজরের নামাজ শেষ করে আর ওঠেনি। সন্তান না থাকায় পাখি আর এলিজাকে নিজের সন্তানের মত আগলে রেখেছে। ভালোবেসেছে।পাখি খুব ছোট থেকে ই রোগে ভুগছিল।৯ বছর বয়স থেকে হঠাৎ হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যেতো।ভাবতো এটা হয়তো সাধারণ কোন সমস্যা হবে। ধিরে ধিরে সমস্যা টা মারাত্মক হয়।এক সময়

ডাক্তার দেখালে তারা জানায় ব্রেন টিউমার।

অপারেশন করালে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি।কারন তখন রোগটা সবে মাত্র বাসা বেঁধেছিল। কিন্তু টাকার অভাবে হয়নি।

জয়তুন অঝরে কাঁদছে।রমজান ভেজা কন্ঠে বললো, কেঁদো না। দোয়া করো। আল্লাহ আমগো বাড়ি

মারে ঠিক সুস্থ করবো।ওর কাছে যে এলিজা আছে।এত চিন্তা কইরো না।

শ্রাবন মেঝেতে বসে আছে। পাখির কাছে যাওয়ার শক্তি নেই।ভেতরটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। নিঃস্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।পূরো হাসপাতাল নিস্তব্ধ। অপূর্ব পাশের সিটে বসে আছে।

শ্রাবন কান্না জড়িত কন্ঠে প্রশ্ন করলো, কি হয়েছিল? বিয়ের নাটক

সত্যটা লুকিয়ে রাখা,এসব কেন করেছিলিস তোরা?
অপূর্ব ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করলো,
যেদিন তুই সবার সামনে পাখিকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলিস আমরা সবাই খুব খুশি হয়েছিলাম।কারন তোকে আমরা চিনি জানি।তুই কতটা মহান মনের মানুষ।এলিজা খুব খুশি হয়েছিলো।একজন বিশ্বস্ত

ছেলের হাতে পাখিকে তুলে দিতে পারলেই শান্তি।

সেদিন রাতে তুই থাকাকালীন ই তো মামা মামী রাজি হয়। তারপর দিন আমরা সেখান থেকে চলে আসি। সবকিছু ঠিকঠাক ই ছিলো।অপূর্ব থেমে যায়,বলতে গিয়েও থমকে যাচ্ছে।

“এলিজা বলেছিলো ওর এনজিওর কাজের জন্য থেকে যাবে আমি রেখে

আসি। ঠিক তার ১৫ দিন পর এলিজা আমাকে চিঠি পাঠায় পাখি অসুস্থ হয়ে পরেছে।আর তোকে যেন সেটা না জানাই।আমি থানা তে যাওয়ার নাম করে তিলকনগর যাই। পাখি অজ্ঞান ছিল।আমি পুলিশ গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। পাখিকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আশা হয়।ডাক্তার চেকআপ করে জানায় পাখির ব্রেন টিউমার। ধিরে ধিরে রোগটা এক

থেকে অধিকে চলে গেছে। অবস্থা খুব ভালো না। যদি অপারেশন করা হয় বাঁচার সম্ভাবনা ২০ পার্সেন। তার ও কম। এলিজা রাজি হলো না।

পাখির জ্ঞান ফিরে।

পাখির জ্ঞান ফেরা মাত্র শুধু তোকেই খুজছিলো।

পাখির অবস্থা মোটামুটি ভালো ছিল। ডাক্তার বললো বাড়িতে নিয়ে যেতে

পারেন। আমরা বাড়িতে নিয়ে যাই। এলিজা প্রচন্ড ভেঙে পরেছিলো। সাথে ওর মামা মামী।

সবার ভেতরটা ভেঙে চুরে যাচ্ছিল। আমি তোকে মিথ্যা বলে তিলকনগর থেকে গিয়েছিলাম । তাদের পাশে থাকাটা দরকার ছিলো।সেই সময় তোদের বিয়ের তারিখ ঠিক করা হয়।

পাখি খুব হতাশ ছিল।পাখি তোকে ওর জীবনের থেকেও বেশি ভালোবাসে।

পাখি সারাক্ষন তোর কথাই ভাবতো। কি করিস না করিস। কেমন আছিস । সারাদিন শ্রাবন শ্রাবন বলেই মাতিয়ে থাকতো।

পাখি তোর ভালোবাসা টা বুঝতে পারতো।ও বুঝতে পারতো তুই ওর জন্য কতটা দূর্বল। একদিন পাখি

বললো তোমাদের সাথে আমার কিছু কথা আছে।আমরা চিন্তিত হই কি বলবে। রাতে আমরা সবাই এক হই।তখন পাখি বললো,তোমরা কি আমাকে সত্যিই ভালোবাসো! আমরা তখন অবাক হই।হ্যা বলি।

তখন পাখি ওর কাপা হাত টা আমাদের দিকে এগিয়ে বললো,আমাকে ছুয়ে কসম কাটো আমি যা বলবো,তোমরা তাই

করবে।আমরা ইতস্তত বোধ করি। তবুও ওর হাতে হাত রেখে ওয়াদা করি।ও যা বলবে তাই করবো।
তখন পাখি,পাখির পরিকল্পনা বলতে শুরু করলো, ১৪ ই ফেব্রুয়ারি আমার বিয়ে হবে।তবে শ্রাবন নয় অন্য কারো সাথে।সত্য বিয়ে নয় নাটকিয় বিয়ে হবে। যাতে তুই পাখিকে ঘৃনা করিস।

এবং খুব দ্রুত তুই ওকে ভুলেও যেতে পারিস।

আমি ওর কথা মত, রাশেদ কে ঠিক করি। রাশেদ ছোটখাটো নাট্যমন্চ অভিনেতা।কিছু টাকা দিয়ে ওকে রাজি করাই।

এরপর,ওর পরিকল্পনা মত তোর চোখের সামনে ওর বিয়ে হয়।

তবে তোর থেকে পাখির বেশি কষ্ট হচ্ছিল। তুই সেদিন ফিরে আসার

পর পাখি আবারো অজ্ঞান হয়ে যায়। আমরা আবারও হাসপাতালে নিয়ে আসি।

আর তখন থেকে পাখি এভাবেই আছে।ডাক্তার জানায়।ডিপ্রেশন পাখিকে গ্রা,স করে রেখেছে। তোর ভাবনায় ও আরো দূর্বল হয়ে গেছে। পাখি এখন ও হয়তো সুস্থ থাকতো। যদি না তোর চিন্তা থাকতো।পাখি চায়নি ওর ক্ষুদ্রতম জীবনে তোকে

জড়াতে। ডাক্তার সময় দিয়েছে ৬ মাস এর আগেও কিছু হতে পারে। অথবা তার পরে বলেই অপূর্ব থেমে যায়।

আমি কতটা বোকা।আমি আমার প্রিয় মানুষটিকে ভুল বুঝেছি।কতটা নিষ্ঠুর আমি।আমার প্রিয় মানুষ নির্বাচন করায় আমি ভুল করিনি।ভুল ছিল আমার।

এসব ভাবতে ভাবতেই শ্রাবন চোখের পানি মুছে উঠে দাড়ায়। ধিরে ধিরে রুমের দিকে এগোয়। সাথে অপূর্ব ।

শান্ত স্বরে বললো,এখন কেমন আছে?

অপূর্ব শ্রাবন এর কাঁদে হাত রেখে বললো,খুব একটা ভালো নয়।তবে তুই ওর কাছে যা।হতে পারে তোর

উপস্থিতি,স্পর্শ, ভালোবাসার টানে মিরাক্কেল হতেও পারে।

শ্রাবন ।তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় একজন নার্স। উনি শ্রাবন কে ভেতরে যেতে দেখে বললো,

আপনি যাবেন না।ভেতরে একজন আছেন উনি বের হলে আপনি যাবেন।আমি চেকআপ করে পরে জানাচ্ছি।

এলিজা শ্রাবন কে দেখে বাহিরে বের হয়ে আসে।

অপূর্বর সাথে চোখে চোখে কিছু বললো। অপূর্ব ভরসা সূচক ইঙ্গিত করলো।

শ্রাবন ধিরে ধিরে পাখির কাছে যায়।

হাতে ক্যামো,সাথে অক্সিজেন।

নিস্তেজ দেহ নিয়ে সুয়ে আছে।

শ্রাবন পাখির পাশে টুলের উপর বসে।

বুকের ভিতর তোলপাড় হচ্ছে।পাখির হাতের উপর হাত রাখে। কান্না জড়িত ধির কণ্ঠে বলতে শুরু করলো, পিচ্চি বেয়ান, পিচ্চি বেয়ান। একবার চোখ খুলে দেখো, তোমার শ্রাবন এসেছে। বদমাইশ শ্রাবন এসেছে। তোমার শরীরে হাত দিয়েছি,তোমাকে পিচ্চি পিচ্চি বলছি। কিছু বলবে না আমাকে।ধমকাবে না।তখন তো খুব জোড় তেজ

দেখাতে আমাকে পিচ্চি বলে ডাকবে না। তুমি পিচ্চি নও। তাহলে এখন কেন চুপ করে আছো! উঠো ঝগড়া করো আমার সাথে।

শ্রাবন ফোপাতে থাকে।

হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখ মুছতে থাকে।অপূর্ব, এলিজা বাহির থেকে দেখছে। এলিজা অপূর্বর হাতটা শক্ত করে ধরে আছে।

শ্রাবন কাপা কণ্ঠে বলতে শুরু করে,ঐ পিচ্চি বেয়ান।আমাকে একা করে দূরে যাবে না।সহ্য করতে পারবো না । এতদিন তোমায় ছাড়া থাকতে আমার ভিষন কষ্ট হয়েছে। এবার আর তোমাকে হারাতে চাই না। সৃষ্টিকর্তা আমার প্রানের বিনিময় তোমার প্রান টা দিয়ে যাক।

না, এরকম হলে তো আবার তুমি থেকে যাবে।আমি চলে যাবো।তখন তো তোমার তো কষ্ট হবে।

“তার চেয়ে আমার আয়ুর অর্ধেক তোমার হয়ে যাক। দুজনে মিলে একসাথে কিছুটা সময় আকাশের তারা গুনবো। একসাথে কিছুটা পথ চলবো। দিগন্ত নদীর তীরে একসাথে বসে গল্প করবো। উঠো না বেয়ান। চোখ খুলো

বলেই শ্রাবন নিচের দিকে তাকিয়ে চোখের মানি মুছতে থাকে।

ঠিক তখনি পাখির দিকে তাকিয়ে দেখে পাখি চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।

পাখি শ্রাবন কে দেখছে কিছু বলছে না।পাখির চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পরছে। পাখি শ্রাবন কে ভালো ভাবে পরোখ করছে।দাড়ি ,বড় বড় চুলে একাকার হয়ে আছে।হয়তো নিজের

যত্ন নিতেই ভুলে গেছে।সেই সু দর্শন শ্রাবন আজ কত পাল্টে গেছে। ভাবতেই পাখির হুহু করে কান্না করতে ইচ্ছে করছে কিন্তু পারছে না।

শ্রাবন পাখির মাথায় হাত বুলিয়ে ভরসা কন্ঠে বললো, আমি চলে এসেছি, আমি সব জেনে গেছি। এখন দেখবে ধিরে ধিরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

নার্স শ্রাবন কে তারা দেয়।

অনেকক্ষন হয় বেড়ে এসেছে। শ্রাবন চোখ মুছে উঠে আসে।পাখি শ্রাবন এর যাওয়া অপলকে দেখতে থাকে। নার্স পাখির পাল্স পর্যবেক্ষন করলে দেখে আগের থেকে অনেক টা দ্রুত চলছে।নার্স কিছুটা অবাক হয়ে ভাবলো,

ভালোবাসার ক্ষমতা অনেক ‘অসুস্থ মানুষ টাকেও খুব সহজে সুস্থ করে তুলতে পারে।

শ্রাবন অনেকক্ষন নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

অপূর্ব দাড়িয়ে আছে। এলিজা শ্রাবন এর কিছুটা দূরে বসে আছে।

শ্রাবন ভারি একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেলে বললো,

আমি পাখিকে বিয়ে করতে চাই —- জাহাঙ্গীর ভোর বেলা বেরিয়েছে। তারপর থেকে আর খবর নেই। তার হাবভাব সাধারণ নয়। আজকাল ভিষন উদাস থাকে।কোন না কোন ভাবনা তাকে গ্রা’স করে রেখেছে। তবে তা অজানা। মনোরা রান্না করছে।মনজুরা বাড়িতে নেই। সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে।

এসব ভাবতে ভাবতে,জয়া মমতাজ কে উদ্দেশ্য করে বললো, আমাদের একবার যাওয়া দরকার হাসপাতাল। পাখি মাকে দেখতে। বলছিলাম না, পাখি অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারে না নিশ্চয়ই কোন গরমিল আছে।

মমতাজ কিছু বললো না।মুখ কুঁচকে অন্য দিকে ফিরলো।চারদিকে যা হচ্ছে তার কোন সুত্র পেয়েও হারিয়ে

ফেললাম। সেদিনের পর থেকে সূর্য কে বিশ্বাস করতে পারছি না।সিভিল পোশাকে অফিসার রাখা হয়েছে। যদিও তারা আমার ঠিক করা কনস্টেবল। সূর্য কে ২৪ ঘন্টা নজরদারি করার জন্য রাখা হয়েছে। তবে তারাও কোন তথ্য দিলো না যা থেকে সূর্য কে সন্দেহ করবো।তবে কে আছে এর পেছনে। এসব ভাবতে ভাবতে অপূর্বর বা কাঁদে

হাত রাখে শ্রাবণ।সান্ত স্বরে বললো,কি ভাবছিস! কোন সমস্যা?

অপূর্ব না সূচক মাথা নাড়ে।

সূর্যের কথা কাউকে বলা যাবে না। অযথা চিন্তা করবে।

অপূর্ব মৃদু হেসে বলল,তুই কি সত্যি ই পাখিকে বিয়ে বিয়ে করতে চাস?

শ্রাবণ অমৃদু হাঁসি দিয়ে বললো, আমি পাখিকে হারাতে চাইনা।যখন ভেবেছি পাখি অন্যর হয়ে গেছে

তখন শুধু ভাবতাম এমন কোন মিরাক্কেল হতো ,যাতে পাখিকে ফিরে পাই।সেই আমি পাখিকে ফিরে পেয়েছি।আর হারাতে চাইনা।ওর ছয় মাস ক্ষুদ্র জীবনে আমি আমার পরবর্তী ৬০ বছর দেখতে পাচ্ছি। আমি ওর ছয় মাসের ভালোবাসা নিয়েই বেঁচে থাকবো। তবে প্রতি মুহূর্তে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

করি, যাতে আমার আয়ুর অর্ধেক ওর হয়ে যায়।

অপূর্ব শ্রাবণের কাঁদে হাত রেখে মৃদু হেসে বলল,তোর মতন জীবনসঙ্গী প্রতিটি মেয়ের জীবনে আসুক। এবং শেষ অবধি থেকে যাক। ভাই হিসেবে তোকে নিয়ে আমার গর্ব হয়।

রাত হয়ে যায়। এলিজা কে জোড় করে অপূর্ব বাড়ি পাঠায় । কিছুতেই যেতে চাচ্চছিলো না।

পাখির অবস্থা আগের থেকে কিছুটা ভালো।তবুও ডাক্তার কাছে যেতে দিচ্ছে না।বেস কিছুক্ষণ ডাক্তার চেকআপ করার পর অপূর্ব আর শ্রাবন কে ভেতরে ডাকে।

পাখির মুখে অক্সিজেন নেই। শ্রাবন কিছুটা সস্তি পেলো।শুয়ে আছে ক্লান্ত শরীর নিয়ে পাখি।

শ্রাবন টুলের উপর বসে ,পাখির ডান হাতের উপর হাত রাখে। শ্রাবন সান্ত স্বরে প্রশ্ন করলো,আগের থেকে কিছুটা ভালো লাগছে?পাখি মৃদু হেসে হ্যা সুচক মাথা নাড়ে।

অপূর্ব মৃদু হেসে বলে উঠলো,ভাই তোরা প্রম কর আমি আসছি।

শ্রাবন অপূর্বর দিকে ফিরে প্রশ্ন করলো, কোথায় যাচ্ছিস?

অপূর্ব সান্ত স্বরে বলল, কিছু কাজ আছে। তুই থাক আমি আসছি। পাখির খেয়াল রাখিস।

অপূর্ব দ্রত পায়ে হেঁটে হাসপাতাল থেকে বের হতেই চোখ পরে হাতের ডান দিকে কিছুটা দূরে।

অপূর্ব তৎখানিক থম মেরে যায়। ডাঃ ইব্রাহিম এর সাথে চীপস

ডুপিয়ালি কথা বলছে। অপূর্ব অবাক দৃষ্টিতে দেখতে থাকে।ঠিক তখনই পেছন থেকে অপূর্বর শরীরে কেউ হাত রাখে। অপূর্ব পেছন ঘুরতেই দেখে একজন নার্স।

কি হয়েছে ? গায়ে হাত দিলেন কেন?

নার্স টি অপূর্বর হাতে একটি কাগজ দিয়ে বললো,এই ঔষধ টা লাগবে। আপনাকে শ্রাবন স্যার আনতে

বলেছেন। তখন বলতে ভুলে গিয়েছে।

অপূর্ব নার্সটির আপ্রোনের উপর নাম টি পরোখ করলো। নার্সটির নাম রিয়া।

অপূর্ব হাত থেকে কাগজ টি নিয়ে হ্যা সুচক মাথা নারে। নার্সটি চলে যেতেই পেছনের দিকে , চীপস ডুপিয়ালি আর ডাঃ ইব্রাহিম কে পরোখ করতেই দেখে তারা নেই।

অপূর্ব এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে। ডাঃ ইব্রাহিম,চীপস ডুপিয়ালি কেউ নেই।এত কম সময় কোথায় যাবে। আর আমি যদি ভুল না করে থাকি তবে ডাঃ ইব্রাহিম এর সাথে ঐ কিলা,র এর কি সম্পর্ক কি।আমাকে এর খোঁজ নিতেই হবে।তবে এখন না।

অপূর্ব স্থান ত্যাগ করে বাহিরে বের হয়। অপূর্ব থানাতে যাবে।সেই

উদ্দেশ্যে গাড়িতে উঠবে ঠিক তখনি দেখে চীপস ডুপিয়ালি একটা মাইক্রো তে উঠে চলে যাচ্ছে,আর এটা সেই মাইক্রো যেটার বর্ননা অর্পা দিয়েছিলো। এই গাড়িতে করেই বর্ষা কে তুলে নেয়া হয়। অপূর্ব গাড়িতে উঠে অনুসরণ করতে থাকে।

অপূর্বর সমস্ত শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকে।শীতের দিন অথচ অপূর্ব ঘামছে।

অনুসরন করতে করতে রেড সিগন্যাল পরে,ততক্ষনে গাড়িটা ট্রেনের রাস্তা অতিক্রম করে যায়। অপূর্ব ট্রেনের রাস্তার এপার। মাঝখান থেকে ট্রেন যাচ্ছে। অপূর্ব ক্রোধে স্টেরিংএ জোড়ে এক ঘুষি মেরে বললো,এবারো আমি ব্যার্থ

হলাম। তবে কতদিন ওরা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকবে।ঠিক ধরে ফেলবো।অপূর্ব গাড়ি ইউ টার্ন নিয়ে থানাতে চলে যায়।

রাত অনেক হয়।অর্পা ঘুমোচ্ছে। মমতাজ ছেলের চিন্তায় মশগুল। একটা মেয়ের জন্য দিনরাত হাসপাতালে পরে আছে।এটা তার মোটেই ভালো ই লাগছে না। তাদের ভিসা চলে আসবে । বিদেশ ফিরতে

হবে। মমতাজ ভাবতে থাকে তার ঘরে বসে।

জয়া তার ঘরের বারান্দায় বসে বাড়ির গেটের দিকে তাকিয়ে আছে। জাহাঙ্গীর ভোর বেলা বেড়িয়েছে। এখনো খবর নেই।ফ্যাক্টরিতেও নেই। তাহলে কোথায় যাবে। জয়া এসব ভাবতে ভাবতে তৎক্ষণাৎ ঘরে উপস্থিত হয় মনোরা।

পানি চেয়েছিলো জয়া।

জয়াকে পানি দিতে দিতে শান্ত স্বরে মনোরা প্রশ্ন করলো,আফা আপনারা আগে তিলকনগর থাকতেন! তারপর শহরে আইলেন কেন! আর বড় দাদাবাবু সবসময় গম্ভীর হয়ে থাকে কেন?

জয়া পানি হাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভারি একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেলে বললো, মনোরা তুই বলতে পারিস! সব পাপ কি মোছা যায়?মনোরা

কিছুটা অবাক হল।এই কথার এমন প্রশ্ন মনোরা কে ভাবালেও মনোরা উপেক্ষা করে বললো, কিছু কিছু পাপ আছে যা কোনদিন মোচন হয়না। নিজের মধ্যে পুশে রাখতে হয়। নিজের পাপে নিজেই পুড়ে যায়।

জয়া আড় চোখে মনোরা কে দেখলো। সান্ত স্বরে বলল, তুই যা

ঘুমিয়ে পর।আমি পরে দরকার পরলে ডেকে নেবো।

শ্রাবন পাখির কাছে। পাখি খুব কষ্টে উঠে বসলো। শ্রাবন বেডের উপর বসে পাখিকে দেখছে। এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেন কয়েক যুগ পর দেখছে।

পাখি কাপা কণ্ঠে বললো, অসুস্থ হওয়ার পর নিজের যত্ন নিতে পারেনি।সুন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে। তাও

ওভাবে কি দেখছেন?শ্রাবন মৃদু হেসে বললো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।হয়তো ভালোবাসা টা শুরু হয় ভালোলাগা থেকে। কিন্তু যখন এটা ধিরে ধিরে ভালোবাসাতে রূপ নেয় তখন,তার রুপ,যৌবন শেষ হয়ে গেলেও ভালোবাসা শেষ হয়না।যখনি তুমি কারো মায়ায় পরবে তখন তার এলোমেলো চুল,ফ্যাকাসে মুখ, অসুস্থ

শরীর,চোখের নিচের কালো দাগ সব কিছুতে তার জন্য কষ্ট হবে।মায়াটা আরো বাড়বে। আর যখন তুমি কারো রুপ ,গুনের প্রেমে পরবে , তারপর যখন সে অক্ষম হয়ে যাবে তখনই মুগ্ধতা কেটে যাবে।তখন আর তাকে চাইবে না।ছুরে ফেলে দিতে চাইবে।

আর আমার তোমার প্রতি সেই মায়া কাজ করে,যে মায়া কোনদিন ও ফুরাবে না।

আমি তোমার শরীর নয়, মনকে স্পর্শ করে সারাজীবন থাকতে চাই।

পাখি শ্রাবন এর কথা শুনে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। একটা মানুষ কিভাবে এতটা ভালো বাসতে পারে।

পাখি মৃদু হেসে বললো, আপনাকে এলোমেলো চুল,ঘন দাড়িতে খুব সুন্দর লাগে।

শ্রাবন সব চুল গুলো এলোমেলো করে বললো,দেখোতো এখন জোকারের মত লাগছে না?

পাখি কিছুটা আওয়াজ করে হেসে দেয়।

শ্রাবন জ্বল জ্বল চোখে পাখিকে পরোখ করে বললো, তোমার এই

হাসি দেখার জন্য হাজার বার জোকার হতে পারবো।

কিছুক্ষণ পর হাজির হয় অপূর্ব। কিছু খাবার আর ঔষধ নিয়ে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় একজন ডাক্তার।

শ্রাবন উঠে সরে দাড়ায়।ডাক্তার আদুরে গলায় পাখিকে বললো,এখন কেমন আছো মা!

পেছন থেকে অপূর্ব ঔষধ টা ডাক্তার এর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো,এটা

আনতে বলেছিলো।দেখেনিন ঠিক আছে কিনা।

ডাক্তার টি ঔষধ টা হাত থেকে নিয়ে অবাক দৃষ্টিতে বললো,এটা তো আমরা কেউ আনতে বলেনি।

অপূর্ব বললো, শ্রাবন বলেছে।

শ্রাবন অবাক হয়ে বললো,আরে ইয়ার আমি কখন বললাম।

অপূর্ব থমকে যায়।কি বলছে এরা।

অপূর্ব আতংক নিয়ে প্রশ্ন করলো, ডক্টর আপনাদের হাসপাতালে রিয়া নামে কোন নার্স আছে?

ডাক্তার অবাক বললেন, ছিলো তবে ও এখন নেই।

অপূর্ব অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, নার্স রিয়াই আমাকে এই ঔষধ টা আনতে বলেছে।

ডাক্তার থম মেরে বললো,এটা কি করে সম্ভব! নার্স রিয়া তো মারা

গেছে।আর ওর শেষ চিকিৎসা আমি নিজের হাতে করেছি।অপূর্ব দু কদম পেছনে সরে যায়।

তবে কে ছিলো! যে আমাকে বোকা বানিয়েছে।

তৎক্ষণাৎ ডাক্তার কিছু একটা ভেবে বললো, মি.অপূর্ব দুদিন আগে রিয়ার আপ্রোন টা স্টোর রুম থেকে গায়েব হয়ে গিয়েছিল। কেউ নিয়ে গিয়েছিল

তবে আমরা মাথা ঘামায়নি। হয়তো সেই আপনাকে বোকা বানিয়েছে। অপূর্ব থমকে যায় কে ছিলো রিয়ার ছদ্মবে,শে? এইখানে কি করছিলো? পাখি কিছু বুঝতে পারলো না। শ্রাবন কৌতুহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে এই রিয়াই বা কে? তোকে মিথ্যা কেন বললো।

অপূর্ব কোন উত্তর দিচ্ছে না। চিন্তায় ছাপ নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে ।

শ্রাবন আর কোন প্রশ্ন করলো না।

শ্রাবন বললো,তোর এখানে থাকার দরকার নেই।বাড়ি ফিরে যা।একটু বিশ্রাম নে। দেখবি ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।

নিজেদের খেয়াল রাখিস। খাবার টা খেয়ে নিস।বলেই অপূর্ব চলে যায়।

অপূর্বর ভেতরে নতুন করে চিন্তা গ্রা,স করেছে।তখন নার্স মেয়েটা কে ছিলো।কেনোই বা ছদ্মবেশে আসলো।তবে কি এও এই মৃ,ত্যু খেলার সাথে জড়িত।অপূর্ব এসব ভাবতে ভাবতে ডাঃ ইব্রাহিম এর খোঁজ করে। একজন নার্স কে জিজ্ঞেস করলো।নার্সটি উত্তরে বললো,উনি তো আজকে তারাতাড়ি

বাড়ি ফিরেছেন।শুনেছি তার মেয়ে অসুস্থ।

অপূর্ব মনস্থির করলো ডঃ ইব্রাহিম এর বাড়িতে যাবে।

তার সাথে যে কথা বলতেই হবে। চীপস ডুপিয়ালির সাথে তার কিসের সম্পর্ক।

অপূর্ব পুলিশ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পরে।

রাত ঠিক ১১ টা—

জয়া জাহাঙ্গীর এর কথা ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণ এর মধ্যে ই হাজির হয় জাহাঙ্গীর।

খুব আতংকিত জাহাঙ্গীর।

জয়া প্রশ্ন করলো। কোথায় ছিলে জাহাঙ্গীর কোন উত্তর দিলো না।

জয়াকে উপেক্ষা করে ভেতরে চলে আসে।

জয়া দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে আজকাল সকলকে

এড়িয়ে যাও কেন? কিসের চিন্তা এত তোমার মধ্যে?জাহাঙ্গীর কোন প্রশ্নের উত্তর দিলো না।

জয়া ঠিক আন্দাজ করতে পারলো কিছু হয়েছে। কিন্তু সে বলছে না।

জাহাঙ্গীর কাপড় চোপড় পাল্টে নেয়। হাত মুখ ধুয়ে

হাতে একটা সিগার নিয়ে চেয়ারে বসে পরে।

জয়া জাহাঙ্গীর কে অপলকে দেখছে,কত হাসিখুশি ছিল মানুষ টা। সারাদিন সবাইকে মাতিয়ে রাখতো। হঠাৎ মানুষ টা কতটা চুপ হয়ে গেলো। কি যেন কি ভাবছে।তবে সাধারণ কোন বিষয় নয়। জয়া খাটের এক কোনে বসে আছে। জাহাঙ্গীর বারান্দার দিক মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে। সিগারের ধোঁয়া বাতাশে এদিকেই আসছে।

জয়া শান্ত গলায় প্রশ্ন করলো , আমি নিশ্চিত নই, তবে আমি আপনার ভাবনাকে কিছুটা অনুভব করতে পারি।হয়তো আপনি ফেলে আশা অতীতের কথা ভাবছেন।

যেটা করেছিলেন সেটা অন্যায়।

জয়া মাঝপথে কথা থামিয়ে ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,সেদিন সেটা না করলে হয়তো ....

বলতেই জাহাঙ্গীর উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

জয়া কথা থামিয়ে দেয়।জাহাঙ্গীর অহংকারী স্বরে বলল, দেয়ালের ও কান আছে। এসব নিয়ে ভাবতে বারন করেছি না।

জয়া থম মেরে চুপ হয়ে যায়।

জয়া প্রতিদিন ঘুমানোর আগে অর্পা কে একনজর দেখে ঘুমায়।

জয়া ঘরের বাহিরে আসবে ঠিক তখনি দেখে দরজা বাহির থেকে আটকানো । কিছুটা অবাক হয়ে যায় কে আটকালো।নাকি বাহির থেকে কোনভাবেই লক হয়ে গেছে। জয়া বাহিরে আশার চেষ্টা করলো না।রাত অনেক হয়েছে তাই ভেবে জয়া শুয়ে পরে। জাহাঙ্গীর হাতের সিগার টা ফেলে জয়ার পাশের এসে সুয়ে পরে।

“”’অপূর্ব গাড়ি নিয়ে ডাঃ ইব্রাহিম এর বাড়িতে চলে আসে। অপূর্ব দরজায় কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দেয় তার স্ত্রী। অপূর্ব বলল, ডক্তার কি বাড়িতে আছেন?

ডাক্তারের স্ত্রী সাধারণ ভাবে বললো,উনি তো আজ দুদিন ধরে বাড়ি ফিরেনি । অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় সে?সে-তো মেডিকেল। রোগী অনেক তাই

আসতে পারেনি। আপনি পিজি হাসপাতাল যান তাহলে ই পাবেন।

অপূর্ব তার কথা শুনে থমকে যায়। ডাঃ ইব্রাহিম কেন এরকম করছে। অপূর্বর মাথা ধরে যায়। ভেতরে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।

অর্পা বিছানার এপাশ ওপাশ করছে। প্রতিদিন মা ঘুমানোর আগে একবার আমায় দেখে যায়।আজ কেন

আসলো না। চিন্তা হলেও উপেক্ষা করে।

অর্পার প্রচুর পানির পিপাসা লাগে। জগের দিকে তাকিয়ে দেখলো জগে পানি নেই।রাত অনেক হয়েছে কাউকে ডাকতেও ইচ্ছা করছে না। পানিও খেতে হবে। তৎক্ষণাৎ অর্পা পানির জগ হাতে নিয়ে নিচে নামে। বাড়িটাতে জন্ম,ছোট থেকে বড় হওয়া।তবে কেমন জানি আজ খুব

অচেনা লাগছে।পূ্রো বাড়িটা নিস্তব্ধ। অর্পার ভিষন ভয় ও হচ্ছে। চারদিকে পরোখ করে ভয়কে উপেক্ষা করে রান্না ঘরে গিয়ে পানি নেয়।পানি নিয়ে উপরে উঠবে ঠিক তখনি পেছন থেকে কারো হাটার আওয়াজ পায়।অর্পা ভয়ে চাপসে যায়।এত রাতে কে বাড়ির ভেতর হাটছে। অর্পা পেছনের দিকে এগোতো থাকে। পরিস্কার শুনতে

পেলো,হাটার আওয়াজ টা বা দিক থেকে আসছে।অর্পা বার বার ঢেকুর গিলতে থাকে। অর্পা কান খাড়া করে শুনতে পেলো কোন মানুষের হাঁটার আওয়াজ নয়।কোন কাঠের পুতুল এর হাটার আওয়াজ। অর্পার পূরো শরীর কেঁপে উঠে।

অর্পা পেছনের দিক থেকেই উপরে যেতে থাকে। হঠাৎ দেখতে পায় পেছন থেকে একটা কাঠের পুতুল

নেমে আসছে হাতে ছু,রি নিয়ে।অর্পা ভয়ে ছিটকে পড়ে যায়।পানির জগটা পরে যায়।অর্পা ভয়ে কথা বলতে পারছে না কাউকে ডাকতে পারছে না । অর্পা।বসা অবস্থায় পেছনে যেতে থাকে। কাঠের পুতুল টি অদ্ভুত ভাবে হেঁটে অর্পার দিকে আসছে। কাঠের পুতুল টির হাতে একটা ছু,রি।সেটা দেখে অর্পা আরো আতংকিত হয়ে যায়। বুকের ভেতর

তোলপাড় শুরু হয়ে যায়।অর্পা বুঝতে পেরেছে। পুতুল টি কেউ রিমোর্ট দিয়ে কন্ট্রোল করছে। এদিক সেদিক দেখছে তবে কাউকে দেখছে না। অর্পা পেছনে এগোচ্ছে,কাপা কণ্ঠে বলছে আমাকে মেরো না,
পুতুল টি ধীরে ধীরে অর্পার দিকে এগোতে থাকলে অর্পা মনস্থির করে। দরজা খুলে বাহিরে দৌড় দিবে।

অর্পা কাপারত অবস্থায় দরজা খুলে বাহিরে যেতেই কারো সাথে ধাক্কা খেয়ে পরে যায়। অর্পা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে পেছনে দেখলে দেখে অপূর্ব। অপূর্ব অর্পাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

অবাক ভঙ্গিতে বললো,তুই এত রাতে এখানে কি করছিস?ভয়ে কাপছিস কেন? কি হয়েছে বল।

অর্পা , জ্বল জ্বল চোখে বললো,ঐ পুতুল টা আমায় মে,রে ফেলবে।

অপূর্ব অবাক হয়।এত রাতে অর্পা একা বাকিরা কোথায়। অর্পা ভেতরে আসতে ভয় পেলেও অপূর্ব জোড় করে নিয়ে আসে।অপূর্ব চারদিক পরোখ করলে দেখে, কিছু নেই। সবকিছু ঠিকঠাক।

অর্পা আতং,কিত হয়ে

চারপাশ টা দেখছে কোথাও তো কিছু নেই।

এত কম সময় পুতুল টি গেলো কোথায়।আর ওটা কন্ট্রোল কে করছিলো?-

অপূর্ব এদিক সেদিক ভালো করে পরোখ করলো ।কোথাও কিছু নেই। শুধু জাগটা নিচে পরে আছে। অপূর্ব নিশ্চিত যে অর্পা দুঃস্বপ্ন দেখেছে। বর্ষা কে হারিয়ে ওর এই অবস্থা। হয়তো ওর ঘোর কেটে উঠতে পারেনি।

এসব ভাবতে ভাবতে অর্পাকে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দেখে দরজা বাহির থেকে দেয়া। অপূর্ব চমকে ওঠে।এলিজার ঘর বাহির থেকে দেয়া কেন। অপূর্ব চট করে দরজাটা খুলতেই এলিজা অপূর্বর বুকে ঝাপটে পরে।

অপূর্ব আতংকিত হয়ে যায়।

কাপা কন্ঠে বললো,কি হয়েছে? দরজা বাহির থেকে কে দিয়েছে?

এলিজা অস্থির ভঙ্গিতে বললো, একটা কাঠের পুতুল এসেছিল,আমাকে মারতে চেয়েছে। এই দেখুন হাত থেকে র'ক্ত বের হচ্ছে। অপূর্ব অবাক হয়ে যায়। এলিজার হাতে সত্যিই কাটা দাগ। তবে অর্পা সত্যিই বলেছে।পাখিদের কিচিরমিচির আওয়াজ। সূর্যের ঝলক।

শীতল হাওয়া। আকাশে কিছুটা মেঘ আছে। সকালের সূর্যের আলো এলিজার চোখে পরতেই ঘুম ভেঙে যায়।

ঘুম ভাঙতেই দেখে অপূর্বর বুকের উপর সুয়ে আছে। অপূর্বর বুক ছাড়া এলিজা-ঘুমোতে পারে না।চুল গুলো এলোমেলো। অপূর্ব তার পোশাক ও পাল্টায়নি। রাতে সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে পরে।কেউ এলিজাকে আঘাত

করতে চায়।সেই চিন্তায় অপূর্ব বিষন্ন হয়ে যায়।কে বা কারা এলিজার ক্ষতি করতে চায় । সেসব ভাবতে ভাবতে অপূর্ব এলিজা দু'জনেই মনের অজান্তে ঘুমিয়ে পরে।

এলিজা ঘুম থেকে উঠতেই , অপূর্বর বোতামে চুল আটকে যায়।

এলিজা চুল ছুটাতে গেলে ব্যার্থ হয়। কিছুক্ষণ চুল গুলো ছুটাতে চাইলে, অপূর্ব ঘুম রত অবস্থায় বলে উঠলো,

আমাকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে যাচ্ছ।এত তারা কিসের ম্যাডাম।

এলিজা মৃদু হেসে বললো, তারমানে আপনি জেগে আছেন। এতক্ষণ ধরে আমি চুল গুলো ছুটানোর চেষ্টা করছি আর আপনি দেখেছিলেন। অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, ভালো ই লাগছিলো।

চুল গুলো অপূর্ব বোতাম থেকে বের করতে করতে বললো, ম্যাডাম আপনাকে নিয়ে আমার চিন্তা হচ্ছে। কাল যা হলো। শুনলাম এর আগেও একদিন এমন হয়েছে খুব চিন্তা হচ্ছে।

এলিজা চুল গুলো খোঁপা করতে করতে বললো, আমার কোন শত্রু নেই।আমি তো কারো ক্ষতি করেনি।

তবে তারা, কারা যারা আমার ক্ষতি করতে চায়।

অপূর্ব বলল,হতে পারে আমার কোন শত্রু , অনেক আসামি আছে যারা পুলিশ দের উপর প্রতিশোধ নিতে চায়।তারাই হবে। এই নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি ভয় পেও না।

এলিজা অপূর্বর দিকে আর চোঁখে তাকিয়ে ভেজা কণ্ঠে বললো,আমি

আমার মৃত্যুকে ভয় পাইনা। আপনার বুকে মাথা রেখে মরতেও রাজি। অপূর্ব এলিজাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বললো ,, আমি থাকতে আমার ম্যাডামের কিছু হবে না। এলিজা অপূর্বর দিকে ফিরে বলল, আমাকে হাসপাতাল যেতে হবে। শ্রাবন গতকাল থেকে সেখানে।যদি পাখির অবস্থা আগের থেকে ভালো হয় তবে বাড়িতে নিয়ে আসবো।

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,পাখিকে ওর বাড়িতেই নিয়ে আসবে এখন থেকে এটাই ওর বাড়ি।

এলিজা গোসলে চলে যায়। অপূর্ব বিছানার এপাস ওপাস করছে। তারমধ্যে ভয় ঢুকে গেছে।কে তার এলিজাকে মার'তে চায়।এলিজার সামনে সাধারণ আচরণ করলেও ভেতরে ভেতরে চিন্তায় পুড়ে যাচ্ছে।

মনোরা সকালে অনেক কিছু রান্না করেছে। আজকে পাখিকে বাড়িতে আনা হবে।

অর্পা ঘুমোচ্ছে।জয়া আতং'কিত। গতকাল রাতে কে দরজা বাহির থেকে আটকেছে। বাড়ির মেয়েদের উপর একটা কাঠের পুতুল হামলা করেছে।কি হচ্ছে এসব চিন্তায় তার মাথা ফেটে যাচ্ছে।

এলিজা রান্না ঘরে অপূর্ব কে খাবার

দিচ্ছে।তখন জাহাঙ্গীর এসে অপূর্বর পাশে বসে।এলিজা অপূর্ব কে খাবার দিয়ে জাহাঙ্গীর কে খাবার দিতে যাবে ঠিক তখন ই জাহাঙ্গীর কর্কট মেজাজে বলে উঠলো,আমাকে তোমার খাবার দিতে হবে না। তোমার হাতে খেতে চাইনা ।জয়াকে ডেকে নিয়ে এসো।

অপূর্ব অবাক হয়। সেদিন ই তো বাবা বললো এলিজাকে মেনে

নিয়েছে। তবে আজ আবার এরকম করছে কেন।

অপূর্ব উপেক্ষা করে। জাহাঙ্গীর এর রুপ বদলাতে সময় লাগে না তা সে জানে।

তবুও জবাব না দিলেই নয়,

অপূর্ব বলল, বাড়ির বউয়ের সাথে এরকম আচরণ করাটা অন্যায়। এলিজা ওর সবকিছু ছেড়ে চলে আসছে শুধু মাত্র আমাকে

ভালোবেসে। এলিজার দুনিয়াতে কেউ বেঁচে নেই। আমাদের উচিত ওর সেই শুন্যস্থান টা পূরন করার। এলিজা অপূর্বর কথা শুনে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

রান্নাঘর থেকে মনোরা উকি মেরে দেখে।যেই অপূর্ব কোনদিন বাবার মুখের কথা বলেনি সে আজ বউয়ের জন্য বাবার মুখের উপর কথা বলছে।এলিজা কিছু না বলে রান্না

ঘরে চলে যায়। জাহাঙ্গীর অপূর্বর কথায় ভ্রুক্ষেপ ই করলো না।

খাবার না খেয়ে উপরে চলে যায়।

অপূর্ব রান্না ঘরে যায়।

এলিজা উল্টো দিকে ঘুরে পাখির জন্য কিছু খাবার তৈরি করছে।

অপূর্ব এলিজাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে।

অপূর্ব শান্ত স্বরে বলল, বাবার কথায় কিছু মনে করো না।উনি এমন ই। বাবার হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি।

এলিজা মৃদু হেসে বললো, সংসারের সবার ধারালো কথা উপেক্ষা করা যায়।যদি আপনার মত স্বামী থাকে।

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,আমি সবসময়, সমস্ত পরিস্থিতিতে আপনার সাথে আছি ম্যাডাম।

তৈরি হও শ্রাবন পাখি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

-পিজি হাসপাতাল--যাকে দেখলে মানসিক শান্তি পাওয়া যায় সেই তো প্রিয় মানুষ।আমি আমার প্রিয় মানুষ টাকে হারিয়েও ফিরে পেয়েছি।কতটা যন্ত্রনা সহ্য করতে হয়েছে আমাকে। প্রতিটা মুহূর্তে ভাবতাম সে যদি ফিরে আসতো।সেই আমার পাখি

ফিরে এসেছে। হারাতে চাই না আর।

এসব ভাবতে ভাবতে শ্রাবন হাসপাতাল থেকে বাহিরে বের হয়। এদিক ওদিক পরোখ করছে। কিছুদূরে দেখতে পায়। একজন ফুল বিক্রেতা ভ্যানে ফুল বিক্রি করছে। পাখির ফুল ভিষন পছন্দ। শ্রাবন পাখির জন্য ফুল কিনে নেয়।

একজন নার্স পাখির কাছে বসে আছে। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার এসে চেকআপ করবে।উনি রিলিজ করলে পাখিকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে।

পাখি মেডিকেলের পোষাক পরে,দু পাশে বেনুনি করে ক্লান্ত শরীরে বসে আছে।

নার্স এটা সেটা প্রশ্ন করছে।

তৎক্ষণাৎ হাজির হয় শ্রাবন

হাতে ফুল নিয়ে।

পিচ্চি বেয়ান তোমার জন্য গোলাপ ফুল এনেছি। তোমার পছন্দের।পাখি মৃদু হেসে বললো,

আমার গোলাপ পছন্দ সেটা আপনার মনে আছে?

শ্রাবন বেডের উপর বসে বলল, তোমার বলা প্রতিটি অক্ষর আমার মনে আছে।আর তোমার পছন্দ মনে থাকবে না।

শ্রাবন একটা ফুল পাখির চুলে গেথে দেয়।

পাখি ভ্রু কুঁচকে বললো, ফুল গাছে সুন্দর। আমার চুলে তো একদম ই না।

শ্রাবন মৃদু হেসে বললো,

সবার কাছে ফুল গাছে সুন্দর। কিন্তু আমার কাছে তোমার চুলে।

শ্রাবন ফুল গুলো পাখির কাছে দিয়ে অমৃদু হাঁসি দিয়ে বললো, আমার

কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ফুল”আমার পাখি।তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে হাজির হয় অপূর্ব,এলিজা।

শ্রাবন উঠে দাড়ায়।

এলিজা পাখির কাছে গিয়ে বসে। পাখির মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, আমার পাখির কিছু হবে না।আমরা আছিতো তাই না।

পাখি কিছু বলছে না।চোখ জ্বল জ্বল করছে।

এলিজা ব্যাগ থেকে খাবারের বাটি বের করে।

স্যুপ বানিয়ে এনেছে।

পাখি কে খাওয়াতে খাওয়াতে কাপা কন্ঠে বললো, তুই এবার পুরোপুরি ঠিক হলে, আমরা একসাথে সিনেমা দেখবো।তোকে এই শহর ঘুরিয়ে দেখাবো।

অপূর্ব হাসপাতালে নিয়ে আসা জিনিস গুলো গুছিয়ে নিচ্ছে।

অপূর্ব মৃদু হেসে শ্রাবন কে উদ্দেশ্য করে বললো, তোর ভালোবাসার জোড় অনেক।পাখিকে সোয়া থেকে উঠিয়ে বসিয়ে দিলে।এলিজা আওয়াজ করে হেসে দেয়। শ্রাবন মৃদু হেসে হাতটা মুখের উপর দেয়।

তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়,ডাক্তার। তবে আগের ডাক্তার নন। নতুন একজন জোওয়ান ডাক্তার।

সাথে একজন নার্স।

পাখির সমস্ত রিপোর্ট দেখে,পাখির শরীরে স্পর্শ করে,পাল্স,চোখ,শ্বাসরোধ পর্যবেক্ষন করছে।

শ্রাবন তা দেখে অপূর্বর কানের কাছে ফিসফিস করে বলে উঠলো,

এত দেখার কি আছে!দেখ, কিভাবে শরীরে হাত দিচ্ছে ।

অপূর্ব মুখে হাত দিয়ে মৃদু হেসে বললো, হিংসে হচ্ছে!

রোগী এখন অনেক টা সুস্থ।আজকে ই চাইলে বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। একজন আমার সাথে আসুন।বলেই চলে যান ডাক্তার। সাথে অপূর্ব ও শ্রাবন যায়।

ডাক্তারের চেম্বারে গেলে,

শ্রাবন কাপা কন্ঠে প্রশ্ন করে , পাখি ঠিক হয়ে যাবে তো!!!
ডাক্তার টেবিলের দিক দৃষ্টি স্থাপন করে বললো, দেখুন এই রোগ তো সেরে ওঠার নয়।তবে হয়তো হাসিখুশি থাকলে কিছুদিন বেশি
....
বলেই থেমে যায়।
শ্রাবন এর মুখে কালো ছায়া নেমে আসে। ভেতরে ভেতরে ভেঙে চুরে

যাচ্ছে।এলিজা এনজিওর কাজে চলে গেছে।জয়া অর্পা সবাই পাখির কাছে। শরীরের কি অবস্থা,এখন কেমন আছে , নানান কথায় মশগুল। মমতাজ একটু দূরে বসে আছে। পাখি অন্য কাউকে বিয়ে করে নিয়েছে শুনে পাখিকে কত অভি'শাপ দিলো। তার ছেলের কষ্ট হয় বলে।এখন সব সত্যি জানার পর,পাখি ফিরে এসেছে এটাও তার

ভালো লাগছে না। চোখ ভ্রু কুঁচকে বার বার অন্য দৃষ্টিতে পাখি কে দেখছে।

অপূর্ব আজ থানাতে যায়নি। পৃথিবীতে মা বাবা মানে দুনিয়াতে বেঁচে থাকা অবস্থায় জান্নাত পাওয়া। সফল হওয়ার জন্য মা বাবার দোয়া অতি প্রয়োজনীয়।তাদের ঋণ কখনো সোধ করা যাবে না। বাবার অনেক আদরের ছেলে আমি।কখনো তাদের

সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলি না। কিন্তু আজ বাবাকে কিছু কথা বলায় বুকের ভেতর কেমন চাপ চাপ বেথা হচ্ছে।

বাবার কাছে একবার মাফ চাওয়া উচিত।এসব ভাবতে ভাবতে অপূর্ব জাহাঙ্গীর এর ঘরের উদ্দেশ্যে যায়। জাহাঙ্গীর বারান্দায় বসে আছে । চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে । হাতে একটা সিগার।

অপূর্ব দরজার বাহিরে দাড়িয়ে আছে।যাবে কি যাবে না ভাবতে ভাবতে,ভেজা কণ্ঠে বললো,বাবা আসবো!

জাহাঙ্গীর মেরুদন্ড সোজা করে বসে।আড় চোখে পেছনে একবার দেখে হাত ইশারায় বললো আসতে। অপূর্ব পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাঙ্গীর বলল, দাড়িয়ে কেন বোস।

অপূর্ব খাটের এক কোনেতে বসলো। জাহাঙ্গীর সিগার টা এক পাশে রেখে।

মৃদু হেসে বললো, সকালে ওভাবে কথা বলার পর অনুশোচনা হচ্ছে!

অপূর্ব কিছু বললো না।জাহাঙ্গীর ভেজা কণ্ঠে বললো, জানিস খোকা যখন তুই খুব ছোট তখন থেকে তোকে নিয়ে তোর মায়ের সাথে আমার ঝগড়া হতো।

আমি তোর মাকে তোর কাছে আসতেই ল

দিতাম না । শুধু বলতাম ছেলেটা আমার । আমি নিজ হাতে তোকে মানুষ করবো।তোকে তোর মায়ের মতই আমি লালন করতাম। খাওয়াতাম, খেলা করতাম, খুনসুটি করতাম। আর তোর মা বলতো, ছেলে পেয়ে সবাইকে ভুলে যাচ্ছ

জাহাঙ্গীর কথা থামিয়ে হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখ মুছে।

অপূর্ব অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।কত কর্কট মেজাজের মানুষ সে কি না নিস্তেজ হয়ে আছে।

অপূর্বর খটকা লাগলো।কারন, কিছু বলতে চেয়েও জাহাঙ্গীর থেমে গেছে।

অপূর্ব ভাবনা উপেক্ষা করে কাপা কণ্ঠে বললো, বাবা সকালে ওভাবে কথা বলার জন্য....

অপূর্ব থম মেরে থেমে যায়।জাহাঙ্গীর অপূর্বর দিকে ঘুরে ,হাত দুটো বাড়িয়ে জ্বল জ্বল চোখে বললো আয় বুকে আয়।

অপূর্ব জ্বল জ্বল চোখে জাহাঙ্গীর কে জড়িয়ে ধরে।

জাহাঙ্গীর কাপা কণ্ঠে বললো ,আমরা বাবারা কখনো সন্তানের উপর রাগ করে থাকি না।

জয়া অর্পা সবাই পাখির কাছে। মনোরা রান্না করছে।

অপূর্ব শ্রাবন কে খুঁজতে শ্রাবণের ঘরে যায়। সেখানে না পেয়ে ছাঁদে যায় সেখানেও নেই।

দ্রুত পায়ে হেঁটে নিচে আসলে দেখে শ্রাবন রান্না ঘরে। অপূর্ব অভাক হয়।

শ্রাবন রান্না করছে। গুনগুন করে গান গাইছে।মনোরা পাশ থেকে বললো, ছোটদাদা আপনি সরেন আমি বানাই দিতেছি।শ্রাবন অহংকারী স্বরে বলল,নো, আমার পাখির খাবার আমি ই বানাবো।
অপূর্ব রান্না ঘরের দরজার সাথে হেলান দিয়ে দেখছে আর মিটিমিটি হাসছে।

অপূর্ব গলায় কাশি দিয়ে বললো, আমি বাড়ির মহিলাদের হাতের রান্না খেতে খেতে বোর হয়ে গেছি।যদি কেউ একটু খাবার বানিয়ে দিতো।
শ্রাবন চোখ দুটো বড় করে আমতা আমতা করে বলল, আরে ভাই মজা নিসনা।বউমনি বাড়ি নেই তাই আমি তার ভূমিকা পালন করছি।
অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,

বউমনির ভূমিকা পালন করার জন্য তো অনেকেই ছিলো। এত লজ্জা পাচ্ছিস কেন।

অপূর্ব উঁকি মেরে বললো,কি রান্না করছিস দেখি! ও সুপ।

তা কি কি দিয়েছিস সুপে! হলুদ মরিচ আর কি! ঐদিকে লঙ্কা আছে ওটাও দিস।

পেছন থেকে মনোরা হেসে উঠে। অর্পা পাখিকে তাদের ছোটবেলার

ছবি দেখাচ্ছে।পূরানো এ্যালবাম। ভালো দেখা যাচ্ছে না। অর্পা পাখির সাথে এটা সেটা বলছে তৎকালীন ঘরে উপস্থিত হয় শ্রাবন।হাতে সুপের বাটি নিয়ে। শ্রাবন পাখির পাশে গিয়ে বসে।পাখি কিছুটা দূরে সরে যায়।

শ্রাবন মৃদু হেসে বললো, কতদিন আর দূরে সরবে। শিঘ্রই একদম কাছে নিয়ে আসবো।

শ্রাবন পাখিকে সুপ টা খাওয়া তে চাইলে পাখি নাকচ করে ।

শ্রাবন মৃদু হেসে বললো,আমি নিজের হাতে বানিয়েছি। কেমন হয়েছে জানি না ।আগে কখনো রান্না করেনি। তাছাড়া তোমার দুলাভাই রান্নায় বা হাত দিয়েছে। খারাপ হতেও পারে।

পাখি আওয়াজ করে হেসে উঠে।

শ্রাবন অপলকে দেখলো।

শ্রাবন রান্না করেছে শুনে।পাখি সূপ টা খেয়ে নেয়।

শ্রাবন খেয়াল করলো পাখির চুল গুলো উষ্কখুস্ক। এলোমেলো হয়ে আছে।

ঘরের এদিক সেদিক পরোখ করে অর্পা কে বললো, চিরুনি কোথায়?

অর্পা হাতের ইশারায় দেখিয়ে দেয়।

শ্রাবন চিরুনি হাতে নিয়ে

বলে উঠলো, খুলে ফেলো।

পাখি চমকে ওঠে।

আরে চুল খুলতে বলেছি।পাখি ইতস্তত বোধ করে বললো, বাড়িতে অনেকে আছে। দেখবে তারা।

শ্রাবণ শান্ত স্বরে বলল, আমার বউয়ের চুল আমি বাধবো।তাতে অন্যের কি।

চুল টা খুলো বলছি। শ্রাবন বাধ্য ছেলে যা বলবে তা না করা পর্যন্ত থামবে না।

শ্রাবন আনমনে চুল আঁচড়ে দিচ্ছে।
অর্পা এ্যালবাম হাতে হা করে তাকিয়ে আছে।
মমতাজ দরজার ওপাশ থেকে শ্রাবণের কার্যকলাপ পরোখ করছে।
বিড়বিড় করে বললো,
এই মেয়েটা আমার ছেলের মাথা খেয়ে নিচ্ছে।বস করে নিয়েছে আমার ছেলেকে।এই বস আমাকে কাটাতে হবে।

শ্রাবন ভাবনারত অবস্থায় পাখি কে বললো, আচ্ছা বেনুনি কিভাবে করে? চুলকে কয় খন্ড করবো? অর্পা পাখি দুজনেই হেসে উঠে। পাখি চুল গুলো সামনে এনে।কিছুটা বেনুনি করতে করতে বললো, এভাবে বাধদে হয়।
শ্রাবন পূরো চুলটা বেঁধে দেয়।
শ্রাবন পাখিকে বলল, চলো ছাঁদে যাবো।

পাখি : কেন?চলোই না। একসাথে তারা গুনবো।

এলিজা বাড়ি ফিরেছে।

পাখি অসুস্থ থাকায় তারাতাড়ি চলে এসেছে।

রাত হয়ে যায়। রাত প্রাই ৯ টা নাগাদ---

ল্যান্ডলাইনে ফোনের আওয়াজ।

অপূর্ব ফোন টা রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে ডিসি সাহেব বললো, অপূর্ব থানাতে এসো দরকার আছে। অপূর্ব সিভিল পোশাকে ই বেড়িয়ে পরে।

অপূর্ব থানাতে উপস্থিত হলে দেখে সমস্ত অফিসার রা একসাথে আলাপ আলোচনা করছে। অপূর্ব কিছুটা হতভম্ব হয়।ডিসি সাহেব বললো,আরে অপূর্ব এসো।

অপুর্ব আতংক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, স্যার কিছু হয়েছে!

ডিসি সাহেব বললো, ঘাবরাচ্ছ কেন,কিছু হয়নি।

তোমার জন্য সু খবর আছে।অপূর্ব চোখ বড় করে বললো। কিসের সু খবর?

তোমার প্রোমোশন হয়েছে।

তুমি এত বছর সৎ ভাবে দায়িত্ব পালন করেছো।নিজের জীবনের

ঝুঁকি নিয়ে সাধারণ জনগণের পাশে থেকেছো। তাই আগামীকাল আমরা সবাই মিলে পার্টির আয়োজন করেছি।সেখানে তুমি তোমার পরিবার সহ উপস্থিত থাকবে।

অপূর্ব খুশীতে আপ্লুত হয়।

একে একে সবাই এসে অপূর্ব কে অভিনন্দন জানায়।

সব শেষে আসলো রুমা। রুমার স্বভাব একটু অন্য রকম। অপূর্বকে

দেখলেই তার সাথে কোন না কোন বাহানায় কথা বলবেই।রুমা হাত বাড়িয়ে দেয় বললো, অভিনন্দন স্যার, অপূর্ব ইতস্তত বোধ করেও হাত বাড়িয়ে ধন্যবাদ জানায়।

অপূর্ব খেয়াল করলো রুমা হাতটা ধরেই রেখেছে।

অপূর্ব হেসে বললো, হাতটা ছাড়ুন এবার যেতে হবে তো।

রুমা চট করে হাত টা ছেড়ে দেয়।

অপূর্ব বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। হঠাৎ দেখলো হিমেল কোথাও যাচ্ছে। অপূর্ব অবাক হয়। হিমেল এর খবর নেই অনেক দিন থেকে। বলা হয়েছে টুরে গেছে। কিন্তু ওতো ঢাকাতেই আছে।

তৎক্ষণাৎ অপূর্ব খেয়াল করলে দেখে ,একটা মটরসাইকেলে করে হিমেল তিলকনগর এর উদ্দেশ্য যাচ্ছে।

অপূর্বর খটকা লাগলো।এত রাতে কোথায় যাচ্ছে।

অপূর্বর সন্দেহ হওয়াতে অনুসরণ শুরু করে।

অপূর্ব, হিমেল দু'জনের দূরুত্ব অনেক।

মোটরসাইকেল রেখে হিমেল এবং ,সাথে থাকা অচেনা লোকটি হাঁটতে শুরু করে।

অপূর্ব ও পেছন নেয়।চারপাশ নিস্তব্ধ। শেয়াল ডাকার আওয়াজ । শীতল হাওয়া বইছে। কোথাও থেকে কালো ধোঁয়া আসছে।

অপূর্ব ঘামছে। বুক ধরফর করছে। কোথায় যাচ্ছে এরা।

অপূর্ব খেয়াল করলো ঝোপঝাড়ে কেউ আছে।

ঝোপঝাড় তার হাতের বা দিকে খুব কাছে। হিমেল অনেক দূরে।

ঝোপঝারের দিকে এগোবে না সামনে তা বুঝে ওঠার আগেই ঝোপঝাড় থেকে একটা রক্তা,ক্ত লোক অপূর্বর দিকে দৌড়ে আসে। লোকটার অবস্থা নৃশং,স। অপূর্ব ভয়ে চাপসে যায়। নিজের চোখের সামনে এরকম একটা মানুষ,দেখে মনে হয় কোন মৃ,ত মানুষ কবর থেকে উঠে এসেছে।

অপূর্ব লোকটিকে আঝাপটা দিয়ে ধরে।
কি হয়েছে, এরকম অবস্থা কারা করেছে,কোথা থেকে এসেছেন?
অপূর্ব এসব জিজ্ঞেস করলে,লোকটি কোন জবাব দিতে পারলো না।কথা বলার মত অবস্থায় নেই। কিন্তু তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে সে কিছু বলতে চায়।লোকটি কাপারত অবস্থায় তার প্যান্টের পকেট থেকে

কিছু একটা বের করে অপূর্বর হাতে দেয়।

অপূর্ব হাতে নিয়ে দেখতে চাইলে দেখলো একটি স্বর্নের কয়েন তবে কোন টাকার কয়েন নয়।

লোকটি কাঁপতে কাঁপতে বললো, নকশা।

আর কিছু বলে ওঠার আগেই অপূর্বর মাথায় কেউ পেছন থেকে

আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ অপূর্ব মাটিতে লুটিয়ে পরে।

পরদিন জ্ঞান ফিরতে দেখে অপূর্ব হসপিটাল। সাথে গোলাকার সবাই। বা দিকে ডাঃ ইব্রাহিম......অপূর্ব চোখ খুলে দেখে সবাই তার পাশে।

এলিজা জাহাঙ্গীর,অর্পা , জয়া, মমতাজ, সাথে ডিসি সাহেব। অপূর্ব ধিরে ধিরে উঠে বসে।

ডিসি সাহেব বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো , অপূর্বর এখন কি অবস্থা?

ডাঃ বললো,

ওর মাথায় হঠাৎ আঘাত লাগাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

এখন কোন সমস্যা নেই।

ডিসি সাহেব বললো,

তাহলে আমি আসি। থানাতে আমাকে যেতে হবে। অপূর্ব তুমি

বিশ্রাম নাও। বলেই ডিসি সাহেব চলে যান।সাথে ডাঃ ইব্রাহিম এবং জাহাঙ্গীর।

এলিজা কাছে এসে বসে।

অপূর্ব এদিক ওদিক দেখতেই দেখে সূর্য দরজার কাছে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে আছে। সূর্য অপূর্বর কাছে আসে। এলিজা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পানির বোতল টা হাতে নিয়ে পানি আনতে যায়। অপূর্ব কে

ঔষধ সেবন করানোর জন্য।সূর্য অপূর্বর সামনে এসে বসে। অপূর্ব শান্ত স্বরে বললো, আমাকে তিলকনগর থেকে কে এনেছে?

সূর্য মৃদু হেসে বললো, আমি এনেছি।

অপূর্ব চিন্তিত হয়। সূর্য ওত রাতে ওখানে কি করছিলো।

আর আমাকেই বা কে আঘাত করেছে।

অপূর্ব কিছুটা কর্কট মেজাজে বললো, তুই ওখানে কি করছিলিস?

আর আমাকে কে আঘাত করেছে।

আর ঐ রক্তা,ক্ত লোকটা কে ছিলো?

সূর্য ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, তোর এখন সবকিছুর জন্য আমাকে দায়ী করতে হচ্ছে। অবশ্য তোর জায়গায় আমি থাকলে এটাই করতাম হয়তো।

আমি তোর সাথে কিছু কথা বলার জন্য থানাতে গিয়েছিলাম।তখনই জানতে পারি তুই মাত্র ই থানা থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হয়েছিস। আমিও তোর গাড়ি অনুসরণ করে আসতে থাকি।পেছনে রিকশায় ছিলাম। তখনি দেখি তুই তিলকনগর এর দিকে যাচ্ছিস। ওদিকে রিকশা যায়না। তাই হেটে হেটে যাচ্ছিলাম ততক্ষনে গিয়ে

তোকে অজ্ঞান অবস্থায় পাই।আর তোর আশেপাশে বা- দূরে আমি কাউকে দেখেনি।

অপূর্ব সূর্য কে বিশ্বাস করলো, ঐখানে কি হয়েছিল তা ভাবতে থাকলে অপূর্বর হঠাৎ নকশার কথা মনে পরে। অপূর্ব তৎক্ষণাৎ বা পকেটে হাত দেয়। কয়েন টা দেখতে পায়। অপূর্ব ক্লান্ত শরীর নিয়ে ই মনস্থির করলো, এটা নিয়ে

ফরেন্সিক ল্যাবে যাবে। সূর্য জিজ্ঞেস করে এটা কি ! অপূর্ব সত্যিটা বললো না।

কথা এড়িয়ে চলে যায়।

চারদিকে যা হচ্ছে এসব কিছুর রহস্য বের করতেই হবে। একের পর এক নিরীহ মানুষের মৃ'ত্যু। আর এই মৃ'ত্যু খেলা হতে দেয়া যাবে না। কিন্তু কিভাবে আমি সূত্র পাবো। বা হাতে কয়েন টা দেখছে আর ভাবছে,

এটা দিয়ে কি হবে।এটা কিসের চিন্হ। অপূর্ব ফরেন্সিক ল্যাবের উদ্দেশ্যে বের হয়।বেশ কিছুক্ষণ এর মধ্যে ল্যাবে পৌছে যায়। গ্লাসকোফ ফরেন্সিক ল্যাবে।দ্রুত পায়ে ডাঃ জাকির এর কাছে যায়।

অপূর্ব কয়েনটি দিয়ে জিজ্ঞেস করে। এটা কিসের কয়েন।এটা দিয়ে কি পেতে পারি! জাকির কয়েনটি ভালো ভাবে দেখে বললো।কিছুতো খালি

চোখে দেখা যাচ্ছে না। ওয়েট, অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখি।

জাকির কয়েনটি দেখছে। অপূর্বর হঠাৎ মাথা বেথা শুরু হয়। চেয়ারের উপর বসে পরে। মাথায় আঘাত লাগায় সব ঝাঁপসা দেখছে।

ডাঃ জাকির অস্থির কণ্ঠে বললো , অপূর্ব এটাতে একটা ম্যাপ দেখা যাচ্ছে।কোন গ্রামের ম্যাপ।

অপূর্ব অবাক ভঙ্গিতে বললো, মানে এতটুকু একটা কয়েনে ম্যাপ!

হ্যাঁ এটা ম্যাপ। তাও কোন গ্রামের।

অপূর্ব আতং'ক স্বরে বলল, কিন্তু এটা আমরা দেখবো কিভাবে? সবসময় কি অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়।

জাকির বললো, একটা উপায় আছে। ব্লু লাইট আছে। সাধারণ কোন ব্লু লাইট নয়। এটার ক্ষমতা অনেক।

সেই লাইটের আলো যখন বস্তর উপর পর্যবেক্ষন করা হয়,তখন ওটা সেই বস্তুটি ভেদ করে সেটার প্রতিফলন সৃষ্টি হয়। আমরা এই কয়েনটির এই প্রান্ত থেকে যদি লাইটটি পর্যবেক্ষন করি তাহলে এটার নকশাটি সাদা পর্দায় পরলে এটার নকসা টা আমরা পেয়ে যাবো।

অপূর্ব তাই করতে বললো।

জাকির অপূর্ব কে একধরনের সানগ্লাস পরিয়ে দেয়।

এটা পরালেন কেন?

এটা একধরনের লেজার লাইট।এটা না পরলে চোখে সমস্যা হবে।

কিছুক্ষণ এর মধ্যে নকসাটি পেয়ে যায়।অপূর্ব বললো,এটা তো খুবই অদ্ভুত একটা নকসা। এটা থেকে যায়গাটি কিভাবে পাবো!

ডা জাকির বললো, নকশা অভিজ্ঞ ইমরুল এটা বলতে পারবে। তবে উনি এখন নেই। ইন্ডিয়া আছেন। শুনেছি দু এক দিনের মধ্যে দেশে ফিরবে।

অপূর্ব মনে মনে ভাবলো এখন ও দু একদিন অপেক্ষা করতে হবে।

অপূর্ব ল্যাব থেকে ফিরে আসতেই পেছন থেকে ডাঃ জাকির বলে উঠলো, অপূর্ব অভিনন্দন। তোমার

প্রমোশন হয়েছে। রাতে পার্টিতে দেখা হচ্ছে। অপূর্ব মৃদু হেসে হ্যাঁ সুচক মাথা নেড়ে চলে যায়।

অপূর্ব বাড়িতে ফিরলে দেখে সবাই তার অপেক্ষায় বসে আছে। জাহাঙ্গীর কর্কট মেজাজে বললো, অসুস্থ শরীর নিয়েও তোর ডিউটিতে যেতে হবে। যদি তোর কিছু হয়ে যায় তবে আমাদের কি হবে।

অপূর্ব জাহাঙ্গীর এর কথা উপেক্ষা করে বললো,বাবা আমার প্রমোশন হয়েছে।শ্রাবন এসে সাথে সাথে অভিনন্দন জানায়। অপূর্ব জয়ার পা ধরে সালাম করে।

সবাই খুশিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে। অপূর্ব এদিক ওদিক দেখলে দেখে এলিজা নেই।হয়তো উপরে।

এলিজা আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে।

অপূর্ব পেছন থেকে এলিজার দুই স্থিনাতে হাত দেয়। এলিজা আয়নায় অপূর্ব কে দেখে অস্থির হয়ে বললো, আপনার কি নিজের জন্য এতটুকু ও মায়া নেই ।যদি আপনার কিছু হয়ে যেত?

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,ম্যাডাম আপনার ভালোবাসা থাকলে কিছু হবে না। আপনি যে আমার অনন্ত শান্তি।

এলিজা মৃদু হাসে।

অপূর্ব এলিজাকে পরোখ করে বললো, তোমাকে কালো রঙে খুব সুন্দর দেখায়। আপনার সুন্দর্যর কাছে আকাশের চাঁদ ও যে হার মানবে।এলিজা হেয়ালি করে বললো, খুব বেশি বলছেন নাতো।

অপূর্ব এলিজাকে জড়িয়ে ধরে বললো, আমার প্রমোশন হয়েছে।

আজকে সন্ধ্যায় পার্টি আছে।সবাইকে উপস্থিত হতে হবে।

এলিজা অপূর্ব কে জড়িয়ে ধরে বললো, অভিনন্দন পুলিশ বাবু, আপনি যে আমার গর্ব। আপনার স্ত্রী হয়ে সত্যিই আমি গর্বিত।

সন্ধ্যা হয়ে যায়।সবাই পার্টিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।

শ্রাবন পাখির কাছে। পাখি যেতে চাচ্ছে না। কিন্তু শ্রাবন তো নিয়ে যাবেই।

অনেক ক্ষন পাখিকে বোঝানোর পর যেতে রাজি হয়।

পাখি শ্রাবন এর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো, কি কাপড় পরে যাবো। আমার সব জামা কাপড় আমাদের বাড়িতে। শ্রাবন ভাবনায় পরে যায়।

পাখি খাটের উপর বসা।

শ্রাবন পায়চারি করতে করতে ভেবে বললো, পেয়েছি বউমনির শাড়ি় পরে যাবে।

পাখি ভ্রু কুঁচকে বললো,আমি শাড়ি় পরতে পারি না।

শ্রাবন অমৃদু হাঁসি দিয়ে বলল, তো কি হয়েছে আমি আছি তো।আমি পরিয়ে দেবো। বলেই দৌড়ে এলিজার ঘরে যেতেই মমতাজ এর সাথে ধাক্কা খায়।

শ্রাবন ভ্রুক্ষেপ ই করলো না। মমতাজ বলে উঠলো,মাথার সাথে সাথে মেয়েটা আমার ছেলের চোখ ও খেয়েছে।বলেই মুখ কুঁচকে দেয়। শ্রাবন দেখলো অপূর্বর দরজা খোলা। শ্রাবন ভেতরে ঢুকতেই দেখে, অপূর্ব এলিজার শাড়ির কুঁচি ধরে বসে আছে। এলিজা পেছন ঘুরে যায়। শ্রাবন উল্টো ঘুরে বললো,আমি কিছু দেখেনি,আমি কিছু দেখেনি।

অপূর্ব উঠে দাঁড়িয়ে বললো, শা,লা তোর জন্য দেখছি ঘরেও থাকা যাবে না।

বেশি কথা না বলে বউমনির একটা সাড়ি দে।পাখির দরকার। এলিজা দ্রুত একটা শাড়ি বের করে দেয়। শ্রাবন পাখিকে শাড়ি এনে দেয়। কিন্তু পাখি তো শাড়ি পরতে পারে না।

পাখিকে এখনো বিয়ে করেনি তাই তার শরীরে স্পর্শ না করে। শ্রাবন নিজেই শাড়ি পরতে থাকে।

জয়া , মমতাজ, মনোরা, অর্পা সবাই জানালার ওপাশ থেকে দেখতে থাকে ছেলের কান্ড।

শ্রাবন শাড়ি কিভাবে পরে,প্রথম কিভাবে তারপর কিভাবে, নিজেই পূরো শাড়িটা পরে পাখিকে দেখায়।

পাখি খিল খিল করে হেসে উঠে। হাসি কোন ভাবেই থামাতে পারছে না।

জানালার ওপাশ থেকে মুখ চেপে সবাই হেসে উঠে।

শ্রাবন মাথা চুলকায়।শাড়িটা খুলে পাখিকে দিয়ে বললো , এবার পরে নাও।আমি বাহিরে অপেক্ষা করছি।

পাখি শাড়িটা পরে নেয়।

চুল গুলো ছেড়ে দেয়। কপালে একটা টিপ পরে।সাথে কাজল। সবাই নিচে নেমে অপেক্ষা করছে পাখি আর এলিজার জন্য।

দুইভাই বারে বারে সময় দেখছে কখন আসবে।

জাহাঙ্গীর জয়া সবাই অপেক্ষা করছে।

তৎক্ষণাৎ চোখ পরে সিড়ির দিকে সবাই হা করে তাকিয়ে থাকে ।

এলিজা পাখি, দুজনে একই রঙের শাড়ি পরে,একই ভাবে সেজে নামছে। দুইভাই হা করে দেখছে। সাথে অন্যরাও।

কারো নজর না লাগুক (বললো জয়া)

শ্রাবন, অপূর্ব দুজন একসাথে বলে উঠল মাশাআল্লাহ.

নিচে নামতেই দুই ভাই হাত বাড়িয়ে দেয়। দুই বোন একসাথে দুজনার হাতে হাত রাখে।

সবাই বেড়িয়ে পরে পার্টির উদ্দেশ্যে। চারদিকে রঙিন বাতি। মানুষের কো'লাহল। বাচ্চাদের ছোটাছুটি। ওয়েটার রা হাতে পানিয় নিয়ে এদিক সেদিক যাচ্ছে।

সবকিছু মিলিয়ে পার্টি জমজমাট।

তৎক্ষণাৎ এসে উপস্থিত হয় অপূর্ব সহ পূরো পরিবার।
সবাই এসে অপূর্বর পরিবারের সবার সাথে পরিচিত হয়। পার্টিতে আসা অন্যান্য অফিসারদের স্ত্রী-রা এলিজা পাখির সাথে কথা বলছে। এলিজা পাখির রুপে পূরো পার্টি আলোকিত হয়ে গেছে এমনটি বলছে।
শ্রাবন অপূর্ব অন্য অফিসার দের সাথে কথা বলছে।

অপূর্বর চোখ পরে সামনের দিকে। অপূর্ব চোখ গুলো বড় করে ফেলে, অপূর্ব মনে মনে বলতে থাকে আল্লাহ বাঁচাও,সাথে আমার বউ আছে। শ্রাবন অপূর্ব কে জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে ভাই?

অপূর্ব সামনের দিকে দেখিয়ে দেয়। সোনালী রঙের একটা পাতলা শাড়ি পরে এদিকেই কেউ আসছে।

শ্রাবন বললো কে সে ?

অপূর্ব বললো ,রুমা , আমার পিছনে সবসময় পরে থাকে।

রুমা আসছে।হাতে একটা ব্যাগ, হাতাকাটা ব্লাউজ,চুল গুলো ছাড়া,শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখাচ্ছে।

এসেই অপূর্বর সামনে দাড়ায়।

অপূর্ব ঢেকুর গিলছে।

রুমা ঢং করে বললো, স্যার ইউ আর লুকিং সো গর্জিয়াস।

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, ধন্যবাদ।

শ্রাবন কে দেখিয়ে বললো এই কে?
অপূর্ব বললো,একে ভুলে গেলেন শ্রাবন।
রুমা হেসে বললো,ও আচ্ছা হাই শ্রাবন, বলেই হাত বাড়িয়ে দেয়।
শ্রাবন ও হ্যান্ডসেক করে।
অপূর্ব মিটিমিটি হাসছে।শ্রাবন: হাসছিস কেন?

অপূর্ব ইশারায় পাখির দিকে দেখিয়ে দিলো। পাখি আর চোখে তাকিয়ে আছে।

শ্রাবন দ্রুত হাতটা ছেড়ে রুমাকে বললো , আসসালামু আলাইকুম- আন্টি ঐ যে আমার বউ।

অপূর্ব হেসে বললো, আর বলে দরকার নাই । বাড়ি ফিরে চল পরে বোঝা যাবে।

রুমা চাপ গলায় বললো,রাবিস বলেই চলে যায়।

শ্রাবন পাখির কাছে এসে আমতা আমতা করতে থাকে।

তৎকালীন পার্টির সমস্ত লাইট বন্ধ হয়ে যায়।

মিউজিসান রা মিউজিক ধরে, একজন কণ্ঠশিল্পী কে আনা হয়। তিনি আরাবিক গান করে। সবাই তালে তালে নাচচে।

পার্টি জমজমাট।

এদিকে পাখি শ্রাবন এর সাথে কথা বলছে না।

শ্রাবন ভেজা কণ্ঠে বললো, ওনার সাথে হাত মিলিয়েছি বলে হিংসা হচ্ছে।

পাখি মুখ ঘুরিয়ে নেয়। শ্রাবন পাখির আচরন উপভোগ করে।

কিছুক্ষণ পর শ্রাবন বললো,এই যে কানে ধরেছি এবার ক্ষমা করো।

চারদিকে বিভিন্ন ঝাড়বাতি।

আরাবিক গান। মানুষের কো'লাহল। ছোট বাচ্চাদের ছোটাছুটি সব মিলিয়ে পার্টি আরো জমজমাট হয়ে ওঠেছে।

লাইট দ্বিতীয় বারের মত বন্ধ হয়ে যায়।কিছুক্ষণ পর সবার দৃষ্টি চলে যায় স্টেজে।

সবাই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। স্টেজে উপস্থিত হয় রুমা। সাথে কিছু মেয়েরা। নৃত্য পরিবেশন করবে।

পাখি ,এলিজা , অপূর্ব, শ্রাবন এক সাথে দাঁড়ানো।

পাখি এলিজার কানে ফিসফিস করে বলছে, মহিলাটি কি ধরনের শাড়ি পরে আছে। সমস্ত পুরুষ তো আকর্ষিত হবেই।

এলিজা মৃদু হেসে বললো, পোশাক সবার পছন্দের একটা বস্ত্র। যার যেমন টা ভালো লাগে সে তেমন টাই পরবে।

হঠাৎ দুজন অফিসার এসে অপূর্ব, শ্রাবন এর সাথে হ্যান্ডসেক করে। বিভিন্ন কথায় মশগুল।তৎক্ষণাৎ এলিজা-পাখি আশপাশ ঘুরে ঘুরে দেখছে।

পাখির হঠাৎ চোখ যায় রাস্তার দিকে। পাখি এলিজাকে বললো, আপু ঐ দেখ একটা পাগলি একা একা হাসছে।চল পাগলিটার কাছে যাই। এলিজা ইতস্তত বোধ করে বললো, একদমই না আঘাত করে দিবে।

পাখি নাছোড়বান্দা,এলিজার হাত ধরে নিয়ে গেলো।

পাগলী মেয়েটা হাতে ঈটের টুকরো নিয়ে এটা সেটা লিখছে।এলিজার খটকা লাগলো। খুব চেন চেনা লাগছে। ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলে দেখে এটা মিরা।হাতে শায়ানের ছবিটা।এলিজার ভেতরটা হটাৎ দুমরে মুচড়ে ওঠে।এলিজার হঠাৎ ভাব ভঙ্গিমা অন্য রকম হয়ে যায়।

পাখি এলিজাকে পরোখ করে বললো,আপু কি হয়েছে। এলিজা না সূচক মাথা নেড়ে পাখির হাত ধরে ভেতরে চলে যায়।শ্রাবন দৌড়ে আসে।বললো,

কোথায় ছিলে তোমরা ? খুঁজতে ছিলাম!

এলিজা মৃদু হেসে বললো, ঘুরে ঘুরে চারপাশ টা দেখছিলাম । তোমার ভাই কোথায়?

শ্রাবন এদিক সেদিক পরোক্ষ করে বললো,আছে হয়তো এখানেই।

অপূর্ব যা কিছু করে, সবকিছুর মধ্যে সেই রক্তা'ক্ত লোকটির দেয়া কয়েন এর কথা ভাবছে। কে সে ! কি বলতে চেয়েছিলো! তার এরকম অবস্থা কারা করেছে।

এসব নিয়ে পার্টিতে উপস্থিত জাকির এর সাথে কথা বলছে।

ডাঃ জাকির বললো, কয়েনটির সাথে র’ক্ত লেগে ছিল,আমি রক্ত গুলো পরিক্ষা করে জানতে পেরেছি, কয়েনে দুজন মানুষের র’ক্ত লেগে আছে। অপূর্ব ডা জাকির এর কথা শুনে,ভ্রু কুঁচকে দেয়।অবাক ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো, কি বলছেন! তারমানে ঐ লোকটি যেখান থেকে আসছিল, সেখানে একাধিক লোক ছিলো?

তুমি একদম ঠিক বলেছো।অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, নকশা অভিজ্ঞ ইমরুল কবে আসবে?

ডাঃ জাকির বললো, আমি ফোন দিয়েছিলাম। বললো , ৩/৪ দিন দেরি হবে।ইন্ডিয়াতে কাজে আটকে গিয়েছে ।

অপূর্ব দীর্ঘশ্বাস ফেললো। অপূর্ব এলিজার কাছে আসেতেই সামনে পরে রুমা। অপূর্ব থমকে দাঁড়ায়।

মনে মনে বললো,এই মহিলা দেখছি আমার পিছু ছাড়বে না। রুমা অপূর্বর সামনে দাঁড়িয়ে অপূর্বর পা থেকে মাথা অব্দি পরোক্ষ করতে থাকে।

অপূর্ব মনোভাব নিয়ে বললো,কিছু বলবেন?

রুমা মৃদু হেসে বললো, বলতে চাই অনেক কিছু। কিন্তু আপনার কি শোনার সময় হবে।

অপূর্ব চোখের ইশারায় এলিজার দিকে দেখিয়ে দিয়ে বললো, আমার বউ যদি অনুমতি দেয়,তবে একদিন বউ কে নিয়ে আপনার বাড়িতে গিয়ে সব শুনবো।

বলেই অপূর্ব পাশ কেটে চলে যায়। রুমা কিছুটা কর্কট ভঙ্গিতে বললো, সারাক্ষন বউ বউ বউ। আমি কি কম সুন্দরী একটা বার ঠিক মত

তাকালো ও না। যাইহোক দেখে নিবো।বলেই মুক কুঁচকে দেয়।
পার্টির ভির কমতে থাকে। যে যার গন্তব্যে চলে যাচ্ছে।
অপুর্ব ডিসি সাহেব এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সবাই মিলে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়।
রাত অনেক সবাই পার্টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করছে। মনোরা রান্না করছে।

সবাই অপূর্ব কে বাহবা দিচ্ছে। ততক্ষণাৎ মমতাজ বলে উঠলো , অপূর্ব নিজের যোগ্যতায় আজ কতদূর। প্রমোশন হয়েছে। কত সুনাম অর্জন করেছে। আর আমার ছেলেটিকে দেখো , একটা পরিচয়হীন মেয়ের পেছনে পরে আছে। মা বাবা ছিলো না। কোথায় কি করেছে বলা যায় না।

অপূর্ব তার কাকির কথার জবাবে বললো, দেখুন কাকি, মা বাবা বেঁচে থাকলেই,তারা সঠিক পথে বড় হবে এমন নয়। এলিজা পাখির , ওদের মা বাবা বেঁচে নেই কিন্তু তারপরও ওদের চরিত্রে কোন দাগ নেই। যথেষ্ট আত্মসম্মান বোধ আছে।পাখি যথেষ্ট ভালো মেয়ে। তার থেকেও বড় কথা ওরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে। ভালোবাসা কখনো

পরিচয় দিয়ে হয়না।শ্রাবন অপূর্বর কথা শুনে খুশি হয়। মমতাজ মুখ কুঁচকে দেয়।

জাহাঙ্গীর উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত স্বরে বলল, তাহলে আর কি যদি ছেলে মেয়ে রাজি থাকে,আমরা ওদের বাধা না দিলেই নয়। জাহাঙ্গীর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো, তোমরা বিয়ের আয়োজন করো। আমি শ্রাবনের বাবার সাথে কথা বলে দেশে

আসতে বলি।যদি আসতে পারে তো আসবে।না হয় বিয়ের কার্যক্রম আমরাই সেরে ফেলবো।

শ্রাবন মৃদু হাসে। অপূর্ব শ্রাবন কে চোখে ইশারা করলো।

জয়া এলিজাকে উদ্দেশ্য করে বললো, এলিজা তোমার কোন আপত্তি নেই তো। এলিজা অপূর্বর দিকে একবার দৃষ্টি স্থাপন করে বললো, আপনারা সবাই যখন চান

তবে তাই হোক।আর তাছাড়া পাখিও শ্রাবন কে খুব ভালোবাসে। শ্রাবনের মত সৎ কারো হাতে পাখিকে তুলে দিতে পারলেই আমি শান্তি পাবো।

জয়া রান্না করে চলে যায়।রাত অনেক সবার খেতে হবে।পার্টিতে তারা কিছু খায়নি। কারন জাহাঙ্গীর বাহিরের খাবার খেতে স্বাচ্ছন্দবোধ

করেন না। এবং কাউকে খেতেও দেননা।শুধু পানিয় ছাড়া।

মমতাজ চোখ মুখ এক করে ঘরে চলে যায়।শ্রাবন পাখির হাতটা ধরে। পাখি চট টরে সরিয়ে নেয়।কানের কাছে ফিসফিস করে শ্রাবন বললো, লজ্জা পাচ্ছ।

অপূর্ব গলায় কাশি দিয়ে মৃদু হেসে বললো, আমরা এখানে।প্রেম করলে নিজেদের ঘরে গিয়ে কর।

পাখি লজ্জা মুখে উপরে চলে যায়। পেছনে শ্রাবন।

এলিজা সোফা থেকে উঠে রান্না ঘরে যাবে। তখন ই অপূর্ব পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে।

এলিজা মৃদু হেসে বললো,সুযোগ পেলেই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে!

অপূর্ব বললো,আমার বউকে যখন ইচ্ছা জড়িয়ে ধরবো।

এলিজা হাত সরিয়ে বললো,মা একা রান্না করছে।আমাকে যেতে হবে। অপূর্ব মৃদু হেসে ধুতনি টা এলিজার কাদের উপর রেখে বললো, ঐ শোনোনা চলো আর একবার বিয়ে করে নেই। তুমি লাল বেনারশী পরবে।আমি শেরওয়ানি পরবো। নতুন করে বাশর হবে। প্রথম দিনের মতন দুজনে একসাথে চাঁদ দেখবো। সবকিছু নতুন করে হবে।

এলিজা অমৃদু হাঁসি দিয়ে বলল, আপনাকে যখনই দেখি ,তখনই নতুন মনে হয়।প্রতিটা দিন ই স্মৃতিময় হয়।

তৎক্ষণাৎ সিড়ির উপর থেকে গলায় কাশি দেয় জাহাঙ্গীর। পানি চাইতে আসে।

অপূর্ব হুট করে এলিজা-কে ছেড়ে দেয়। এলিজা রান্না ঘরে চলে যায়।

অপূর্ব উল্টো দিকে ঘুরে

মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো, সবাই আমার প্রেমে কাবাব মে হাড্ডি হবেই। এদের জ্বালায় প্রেম ও করা যাবে না।

অর্পা পাখির ঘরে। পাখির সাথে এটা ওটা আকছে।অর্পা পাখি বিভিন্ন কথা বলছে।আর হাঁসছে ।

শ্রাবন পাখির ঘরে আসতে আসতে আনমনে অনেক কিছু ভাবছে আর একা একা হাসছে।নক খুটতে খুটতে

হাঁটছে । তখনই সামনে পরে মমতাজ। মমতাজ পান চিপোচ্ছে। সবসময় সেজে থাকে। শ্রাবন কে দেখে দু হাত দুই দিকে ছড়িয়ে বললো, এই বেটা দারা। শ্রাবন থমকে দাঁড়ায় ।শ্রাবন মৃদু হেসে বললো,কি বলবে মা বলো। মমতাজ ফিসফিস করে বললো,ঐ মেয়েটা ভালো না। আমি তোকে ওর থেকে

ও সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে করাবো।
হুমম।
শ্রাবন মমতাজ এর গলায় হাত দিয়ে বললো, মা আমি ওর সুন্দর্যর প্রেমে পরেনি।যে তুমি ওকে ওর থেকে ও সুন্দর কাউকে নিয়ে আসলে ভুলে যাবো।
মমতাজ চোখ দুটৌ বড় করে বললো, তুই বুঝতে পারছিস না। তোর সাথে পাখিকে মানায় না।

শ্রাবন কাদ থেকে হাত দুটো সরিয়ে বললো, মানিয়ে নিতে হয়। আর তুমি দেখছি আজ খুব সেজেছো।খুব সুন্দর লাগছে।বলেই হাঁটতে শুরু করে।

মমতাজ পেছন থেকে থেকে শ্রাবন কে পরোখ করে বললো, ছেলে আমার পাগল হয়ে গেছে।জলদি ওর বাবাকে জানাতে হবে।

অপূর্ব সোফাতে বসে আনমনে কিছু ভাবছে। তৎক্ষণাৎ ল্যান্ডলাইনে ফোন বেজে ওঠে । অপূর্ব ভ্রু কুঁচকে দেয়। এত রাতে কে।কোন খারাপ খবর নয়তো।

কাপা হাতে ফোনটা তুললে,

ওপাশ থেকে একজন মহিলা বলে উঠলো, অপূর্ব, সূর্য গতকাল থেকে বাসা থেকে বের হয়েছে আর ফেরেনি।ফোনটা হুট করেই কেটে

দেয়।অপূর্ব কন্ঠ শুনে বুঝতে পেরেছে। সূর্যর মা ফোন করেছে। অপূর্ব হতভম্ব হয়ে যায়। কোথায় সূর্য। দ্রুত পায়ে অপূর্ব ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়। গাড়ি নিয়ে অজানা পথে বের হয়।অঝরে ঘামছে। সূর্য একজন খু,নি,একটা প্রানে,র বিনিময় হাজারা টা প্রা,ন নিয়েছে। তবুও মনের এক কোনেতে সূর্যর জন্য ভালোবাসা টা রয়ে গেছে।

হাজারহোক ছোট বেলার বন্ধুত্বর বাঁধন খুব সহজে ছুটে যাওয়ার নয়। অপূর্ব সিভিল পোশাকে সূর্যর উপর যাদের কে নজরদারি করার জন্য রেখেছে তাদের কাছে পৌছায়। তারা জানায়,বিকেল পর্যন্ত নজরে রাখতে পেরেছে। তারপর কোথায় গিয়েছে... বলেই মাথা নিচু করে কনস্টেবল। অপূর্ব এক ধমক দেয়।ক্রোধে বলে

উঠলো,একটা কাজ ঠিক মত করতে পারো না।
অপূর্ব শান্ত হয়ে বললো, শেষ কোথায় দেখেছো?তিলকনগর থেকে ঢাকার দিকে এসেছে।তবে ওনাকে থেকে খুব হতাশ মনে হয়েছে ।
অপূর্ব গাড়ি নিয়ে সোজা চলে যায় যমুনা নদীর তীরে । অপূর্ব গাড়ি তে বসেই দেখছে। দূরত্ব কিছুটা। সূর্য যমুনা নদীর তীরে বসে আছে।

অপূর্ব যখনই শুনেছি সূর্য তিলকনগর থেকে হতাশা অবস্থায় ফিরেছে তখনি বুঝতে পেরেছে, রঞ্জনার কবরে,র কাছে গিয়েছিল। ওর কথা মনে পরলেই যমুনা নদীর তীরে আসে। অপূর্ব গাড়ি থেকে নেমে ধির পায়ে সূর্যর পেছনে এসে দাড়ায়। সূর্য পেছন না ঘুরেই বললো, খুঁজতে এসেছিস ! ভেবেছিস কোথায় না কোথায় চলে গিয়েছি।নয় কাউকে

খুন করছি। নয় আমি ই খুন হয়ে গেলাম এসব ই ভেবেছিস তাই না। অপূর্ব অবাক হয়।আমাকে না দেখেই আমার উপস্থিতি বুঝতে পেরেছে। অপূর্ব সূর্যর পাশে এসে বসে।শান্ত যমুনা নদী। শীতল হাওয়া বইছে। জোনাকির আলোয় চারপাশ টা আলোকিত হয়ে গেছে। নিশ্চুপ চারপাশ।

অপূর্ব বলল, এখানে কি করছিস! দুদিন বাড়ি ফিরিসনি। কিছু হয়েছে! সূর্য ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশের তাকিয়ে বললো, রঞ্জনা কে দেখতে এসেছি।

অপূর্ব অবাক হয়ে বললো, কিসব উল্টো পাল্টা বকছিস।

সূর্য হাত দুটো সামনে নিয়ে হাটুর উপর এক হাত আরেক হাত দিয়ে ধরে বললো, খুব মনে পরে ওর

সাথে কাটানো দিনগুলি।ওর স্মৃতি যে আমাকে গ্রা'স করে রেখেছে।ওর চাহনি, কথা,চুলের দর্পন।তার রাগ অভিমান খুব মনে পরে।আমাকে যে একা করে রেখে গিয়েছে।ওর শূন্যতা আমায় প্রতি মুহূর্তে পূড়িয়ে দেয়।

বলেই হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখের পানি মুছে স্বাস ছেড়ে বললো,ঐ যে তারা গুলো দেখতে

পাচ্ছিস না। ওর ভিতরে একটা রঞ্জনা। ও প্রতিদিন সন্ধ্যা হলে আমার জন্য অপেক্ষা করে। তাই আমিও চলে আসি একটা বার ওকে দেখতে।অপূর্ব অপলক দৃষ্টিতে সূর্য কে দেখছে।কতটা ভালোবাসলে একটা ছেলে এমন করতে পারে। অন্যকে হ,ত্যা করতে পারে।

অপূর্ব সূর্যের ডান কাদের উপর হাত রেখে বললো, মানুষ চলে যায়। কিন্তু

তাদের স্মৃতি গুলো রেখে যায়। মানুষ হ,ত্যা করা যায় তবে স্মৃতি না। যদি স্মৃতি হ,ত্যা করা যেত তবে আত্মহ,ত্যা নামক শব্দ থাকতো না, হাসপাতালে মানসিক রোগী থাকতো না ..দক্ষিনা শীতল হাওয়া বইছে। কুয়াশায় আচ্ছন্ন। সূর্য মামার আজ কোন খবর নেই । সকাল অনেক কিন্তু সূর্য ওঠার নাম নেই । আকাশে মেঘের হাতছানি।

অপূর্ব ঘুমোচ্ছে। গতকাল রাতে অনেক দেরি করে বাড়ি ফিরেছে। ঠান্ডায় বাহিরে থাকায় জ্বর হয়েছে। রাতে শরীর আগুনের মত গরম ছিলো। এলিজা সারারাত ঘুমোয়নি। রাতে একটু পর পর অপূর্বর শরীরে হাত দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা দেখেছে। অপূর্বর কিছু হলে এলিজা নিস্তেজ হয়ে যায়।অস্থির হয়ে যায় কি করবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে

অপূর্বর পায়ের কাছে বসে আছে। সরিষার তেল ম্যাসাজ করছে।আর বিড় বিড় করে কিছু বলছে।পরনে মিষ্টি রঙের শাড়ি।সাথে চাদর।চুল গুলো বেনুনি করা। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় মনোরা হাতে গরম দুধ নিয়ে এলিজা বলে আনিয়েছে। মনোরা খেয়াল করলো এলিজার চোখ থেকে পানি পরছে।আর বিরবির করে কিছু বলছে। মনোরা

এলিজার পেছনে এসে দাড়ায় । ইতস্তত বোধ করেই প্রশ্ন করলো, বউমনি কি হয়েছে কি বলছো? সামান্য জ্বর হয়েছে । ঠিক হয়ে যাবে। এলিজা মনোরার দিকে একবার দৃষ্টি স্থাপন করলো। মনোরা পরিস্কার দেখতে পেলো,এলিজার চোখের রক গুলো একদম লাল হয়ে আছে।এলিজা তেল হাতে নিতে নিতে বললো, আমার আয়ু আমার

স্বামীর হয়ে যাক। আমার সুস্থতা তার হয়ে যাক।তার অসুস্থতা আমার হয়ে যাক। এই প্রার্থনা করছিলাম। মনোরা এলিজা কে বললো, ভাগ্যগুনে অপূর্ব তোমার মতন বউ পেয়েছে। যে স্বামীর সামান্য জ্বরে নিজের মৃত্যু কামনা করে,তার জীবন ভিক্ষা চায়। তোমাদের এই বন্ধন কোনদিন ছিন্ন না হোক।বলেই মৃদু হেসে চলে যায় মনোরা।অপূর্ব

ঘুমাচ্ছে। এলিজা তেলের বাটিটা দূরে রেখে অপূর্বর শরীরের তাপমাত্রা দেখে। আগের থেকে শরীর শিতল হয়েছে।রাতে অনেকবার জলপট্টি দেয়া হয়েছে। এলিজা অপূর্বর কপালে চুমু খায়। মৃদু হেসে বললো,পরপারেও যেন আমি আপনার সাথে থাকতে পারি। অপূর্বর শরীর ক্লান্ত থাকায় কোন কিছু অনুভব ই করলো না। এলিজা

চাদরটা শক্ত করে পেঁচিয়ে বারান্দায় যায়।শীতল হাওয়াতে তার কপালের সামনে থাকা চুল গুলো উড়ছে। সামনে কিছু বড় বড় গাছ পালা। বাতাসে হেলে দুলে পাতাগুলো নড়ছে।হঠাৎ আওয়াজ পায় বাহিরে কোলা'হল। এলিজা নিচে নামে। চারদিক পরোখ করতে দেখতে পায়।সবাই বিয়ের আয়োজন করছে। মমতাজ সোফাতে বসে একা একা

বক বক করছে।তার ছেলের বিয়েতে সে একদমই খুশি নয়। এলিজা উপেক্ষা করলো।বাড়ির বাহিরে নামলো। বায়েজিদ বসে বসে লাকরী কাটছে। বায়েজিদ এর একটা চোখ নেই। এলিজাকে দেখেই বায়েজিদ মৃদু হাসে। বায়েজিদ এর বয়স ১৯ । অপূর্ব কাজ দিয়েছে। তবে জাহাঙ্গীর এসব পছন্দ করেন না। তিনি কারো উপর

দয়া দেখান না বরং কেউ দেখালেও তাতে রাগান্বিত হয়। এলিজা বায়েজিদ কাছে আসতেই বায়েজিদ অমৃদু হাঁসি দিয়ে ওঠে।হাসি মুখে বললো, বউমনি আপনে এইহানে। কন কি করতে হইবো!

এলিজা মৃদু হেসে বললো, কিছু করতে হবে না।বাহিরে কে কি করছে দেখতে আসলাম।

বায়েজিদ আমতা আমতা করে বললো, বউমনি সকাল থেইকা কিছু খায়নি যদি...

এলিজা ভ্রু কুঁচকে বললো, সকাল থেকে না খেয়ে আছিস।আমাকে আগে বলবি না।তুই বোস আমি খাবার নিয়ে আসছি।

এলিজা রান্না করে চলে যায়। বায়েজিদ এর জন্য খাবার বাড়ছে। বাড়িতে অনেক মানুষ জড় হয়েছে।

সবাই কোন না কোন কাজ করছে। বাহিরে প্যান্ডেল করছে।কেউ ঘর সাজাচ্ছে।এলিজা খাবার টা রেখে মনস্থির করলো একবার অপূর্ব কে দেখে আসবে।ঘুম থেকে উঠেছে কিনা।উপরে যেতেই সামনে পরে জাহাঙ্গীর হাতে সিগার নিয়ে। কর্কট মেজাজে বললো,বাহিরের মানুষের জন্য দরদ দেখানো ভালো নয়।

এলিজা মনোভাব নিয়ে বললো, নিজেকে ভালো রাখার জন্য কখনো,কখনো,অন্যকেউ ভালো রাখতে হয়। বাড়ির কাজের লোকদের সাথে সবসময় সদাচরণ করতে হয়। জাহাঙ্গীর কিছু বললো না। এলিজা উপরে চলে যায়। অপূর্ব ঘুমোচ্ছে। এলিজা ডাকলো না। টেবিলের উপর থেকে দুধ টা নিয়ে

নিচে নামলো।গরম করে পরে নিয়ে যাবে।

বায়েজিদ এর জন্য রুটি ,ভাজি দিয়ে যায়।সাথে পানি। বায়েজিদ খুব খুশি হয়। বায়েজিদ এলিজার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাঁসি দিয়ে বলল, বুউমনি তুমি না খুব ভালো।এলিজা তৎক্ষণাৎ ঘরে এসে দুধ নিয়ে উপরে চলে যায়। অপূর্বর কপালে হাত দিয়ে জ্বর পর্যবেক্ষন করে দেখে

শরীর অনেক টাই শীতল হয়ে আসছে। জানালা থেকে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। জানালা বন্ধ করতে যাবে ঠিক তখনই অপূর্ব পেছন থেকে এলিজার ডান হাত ধরে টেনে ধপাস করে বুকের উপর সুইয়ে দেয়।

এলিজা লাজুক মুখে বললো, কি করছেন । তারমানে আপনি সজাগ! আপনি না অসুস্থ! শরীর একদম নিস্তেজ তাই ভেবে ডাকিনি।আর

আপনি...অপূর্বর চোখ গুলো লাল। ডান হাত দিয়ে নিজের চুল গুলো খাড়া করে বললো,ঘুম সেই কখন ভেঙেছে।জ্বর তো কি হয়েছে।আমি এতক্ষন সব দেখেছি শুনেছি।

এলিজা লাজুক মুখ নিয়ে অপূর্বর বুকের উপর দিয়ে সরতে চায়। অপূর্ব শক্ত করে ধরে রেখেছে।

এলিজা মৃদু হেসে বললো, কি শুনেছেন আর কি দেখেছেন শুনি।

অপূর্বর এলিজাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বুকের উপর থেকে সড়িয়ে বিছানার উপর সুইয়ে দিয়ে বললো, এই যে নিজের আয়ুর অর্ধেক যেন আমার হয়ে যায়। আমার যাতে কিছু না হয়। অঝরে কেঁদেছেন। জ্বর হয়েছে ভালো ই হয়েছে।না হয় আপনার এই ভালোবাসা গুলো তো প্রকাশ হতো না ।

এলিজা দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বললো, আপনি সবসময় আমার সাথে মজা করেন। অপুর্ব আওয়াজ করে হেসে বললো, লজ্জা পেলে তোমাকে খুব সুন্দর লাগে।তার উপর মিষ্টি রঙের শাড়ি। তোমার সুন্দর্যর কাছে যে পরিরাও হার মানবে ম্যাডাম।এলিজা অপূর্ব কে সড়িয়ে উঠে দাড়ায়। উল্টো দিকে ঘুরে বললো, অনেক কাজ পরে

আছে।পাখির বিয়ের আয়োজন করতে হবে।

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, যখনি আমার প্রেম প্রেম পায় তখনি তোমার কাজ চলে আসে।

হাত মুখ ধুয়ে নিন।দুধটা গরম আছে খেয়ে নিন। আমি নিচে যাচ্ছি।বলেই এলিজা-চলে যায়।

অপূর্ব জাহাঙ্গীর এর সাথে বিয়ে নিয়ে আলোচনা করছে।বিয়েটা এই

বাড়িতে বসেই হবে।পাখির বাড়ির লোকদের এখানে আনা হোক। সাথে পাখির কিছু বন্ধু বান্ধব। জাহাঙ্গীর অপূর্বর প্রস্তাবে রাজি হয়।সবাই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। মমতাজ শেষ বারের মত চাচ্ছে তার ছেলের সাথে কথা বলে যদি বিয়েটা ভাঙানো যায়।এইঘর ওঘর খুঁজলে শ্রাবন কে কোথাও পেলো না ।পাখি কে খুঁজলো পাখিও কোথাও নেই।

মমতাজ দ্রুত পায়ে জয়ার কাছে যায়।জয়া কাজে ব্যস্ত মমতাজকে উপেক্ষা করলো।অর্পার কাছে গেলেও অর্পা মমতাজ কে এড়িয়ে যায়।কেউ ই কিছু বলছে না তাহলে শ্রাবন পাখি কোথায় গেলো। হঠাৎ মাথা থেকে এসব ভাবনা ছেড়ে মমতাজ পানের বাটা নিয়ে বসে। বিয়ের আগে কিছু স্মৃতি রাখতে চাই।যা মনে করে বিয়ের পর

হাসতে পারি। বাচ্চাদের ও যাতে বলতে পারি তোদের মাকে নিয়ে কোথায় কোথায় ঘুরেছি,কি কি করেছি।প্রতিটা দিন,প্রতিটা মুহূর্ত স্মৃতি করে রাখতে চাই। শ্রাবন সকাল সকাল এসব ভেবেই পাখিকে নিয়ে বাহিরে বের হয়।সাথে স্প্লেনডর বাইক।শীতের সকালে দুজন অজানা পথে বের হয়।পাখি পেছনে বসা। অনেকক্ষন বাইক

চলার পর থামে যমুনা নদীর তীরে। সকাল বেলা এখানে ধমকা হাওয়া বইছে।শীতল পরিবেশ। পাখি কালো রঙের থ্রিপিছ পরা।সাথে শীতের চাদর। শ্রাবন কালো রঙের জ্যাকেট পরনে। দুজনে নদীর তীরে বসে। শ্রাবন এটা সেটা অনেক কথা বলতে থাকে।পাখি শুনছে।পাখি কিছুক্ষণ চুপ থেকে শ্রাবনের কাদে মাথা রেখে ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে আপনি আপনার জীবন জড়ালেন কেন? শ্রাবন মৃদু হেসে বললো, তোমার এই ক্ষুদ্র জীবনে আমি আমার পরবর্তী দিনের বেঁচে থাকার শুখ ,আশা আকাঙ্ক্ষা পাই। জীবন দৈর্ঘ্যের আকারে বড়।তবে যখন মানুষ সুখ পায় তখন জীবন খুব দ্রুত কেটে যায়।আর যখন দুঃখ গ্রা,স করে তখন জীবন থেমে যায়।

সাথে সময় ও থমকে যায়। শ্রাবন পাখির হাত দুটো ধরে বললো, আর তোমার কিছু হবে না। তুমি ঠিক সুস্থ হয়ে যাবে।

বেলা বারতে থাকে।ধিরে ধিরে সূর্যর দর্পন দেখা যাচ্ছে। আশেপাশে মানুষ ভির করছে। তৎক্ষণাৎ শ্রাবন পাখি উঠে দাড়ায়। শ্রাবন এদিক সেদিক পরোখ করে একটা ফুলের দোকান দেখতে পায়। শ্রাবন পাখিকে

বাইকের কাছে দাড় করিয়ে বললো,তুমি এখানে দাঁড়াও আমি আসছি। শ্রাবন দৌড়ে চলে যায় ফুলের দোকানে।একটা গোলাপ কিনে। শ্রাবনের ভাব ভঙ্গিবা খুব অস্থির। সারাদিন মুখে হাসি এটে থাকে। ফুল টা নিয়ে পাখির কাছে চলে আসে।

পাখি ফুলটা নিতে চাইলে শ্রাবন এক হাত থেকে অন্য হাতে টপকে মারে।

পাখি ইতস্তত বোধ করলো।শ্রাবন অমৃদু হাঁসি দিয়ে বলল,এত সহজে কি করে দেই। শ্রাবন এদিক সেদিক দেখে।পাখির সামনে হাঁটুঘেরে বসে পরে।পাখি ভ্রু কুঁচকে দেয়।কি করছে ছেলেটা।পাখি ফিসফিস করে বলল সবাই দেখছে।

শ্রাবন মৃদু হেসে ফুলটা পাখির দিকে বাড়িয়ে বললো, তোমার জীবন টা ক্ষুদ্র। কিন্তু তোমার ঐ ক্ষুদ্র জীবনের

ভালোবাসা নিয়েই আমি সারাটা জীবন থাকতে চাই।তোমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখের অংশীদার হতে চাই।দিবে কি সেই সুযোগ!

আশেপাশের সবাই শ্রাবনের দিকে তাকিয়ে আছে।পাখি মৃদু হেসে ফুলটা শ্রাবনের হাত থেকে নিতে নিতে বলল, আপনি না।পাখি তারা দিলে শ্রাবণ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা

হয়। লুকিং গ্লাস দিয়ে বার বার পাখিকে পরোখ করছে।
অপূর্ব জাহাঙ্গীর দুজনে মিলে বাড়ির সমস্ত কাজে সহযোগিতা করছে।
গ্রাম থেকে আসে রমজান জয়তুন। এলিজা তাদের দেখে খুশিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে। অপূর্র তাদের সালাম করে। মৃদু হেসে প্রশ্ন করে শ্যামলী আসেনি।ওকেও তো আসতে বলা হয়েছে। জয়তুন আমতা আমতা

করে বলল, ওর বাবার শরীর টা ভালো নেই।তাই আসেনি।

রমজান জয়তুন,জয়া, এলিজা সবাই মিলে বিভিন্ন আড্ডায় মশগুল হয়। কিছুক্ষণ পর হাজির হয় শ্রাবন পাখি। সকালে কাউকে কিছু না বলে বেড়িয়েছে।পাখি ভেতরে যেতে ভয় পাচ্ছে। শ্রাবন মৃদু হেসে বললো, আমার সাথেই তো বের হয়েছো। অন্য কারো সাথে না। ভয় পাওয়ার

কি আছে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় অপূর্ব,সাদা পাঞ্জাবি,কালো জুতো পরিধান করা। অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে,হুমম। কাউকে কিছু না বলেই বের হয়ে গেলি।এদিকে সব কাজ আমাকে করতে হচ্ছে।

শ্রাবন বললো,তুই আমার বড় ভাই। সবকিছু তো তোকেই সামলাতে হবে তাই না।পাখি দৌড়ে ভেতরে যেতেই

সামনে পরে মমতাজ।পাখি থমকে দাঁড়ায়। মমতাজ চোখ গুলো বড় বড় করে বললো, সারাদিন পাখির মত ফরফর করছো দেখছি।নাম তো পাখি।পাখির মত উড়ে চলে যেতে পারো না আমার ছেলের জীবন থেকে। অন্তত আমার ছেলেটা মুক্তি পেতো। পাখি মমতাজ এর কথা উপেক্ষা করে মৃদু হেসে বললো, উড়ে চলে গেলেও আপনার ছেলে

ঠিক শিকার করে নিয়ে আসবে। বলেই চলে যায় পাখি। মমতাজ মুখ কুঁচকে দেয়।।বাড়িতে এক এক করে সমস্ত অতিথি আসতে থাকে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়।সবাই বৈঠকখানায় বিয়ে নিয়ে বিভিন্ন আলোচনায় মশগুল। তৎক্ষণাৎ জাহাঙ্গীর এর ম্যানেজার বলে উঠলো,একই বাড়িতে দুজনার বিয়ে এটা একটু অন্যরকম।তবে আমার

কাছে বিষয়টা ভালো লেগেছে।অপূর্ব সোজা হয়ে বসে বললো,আমরা সবাই মিলে দুটো দুল করবো।

অর্পা বললো,তারমানে কি ভাইয়া ?

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, ছেলে পক্ষ আলাদা আর মেয়ে পক্ষ আলাদা হবে।

জয়া বলে উঠলো,এটা দারুন হবে। তবে তাই করা হোক।

অপূর্ব বললো, আমাদের দলে থাকবে , আমাদের সকল বন্ধু বান্ধব এবং কাকি। মমতাজ মুখ অন্য দিকে ঘুরোয়।আর দলের কর্তা থাকবে আমার বাবা ।

জাহাঙ্গীর মৃদু হাসে। অপূর্ব জাহাঙ্গীর এর হাসির দিকে পরোক্ষ করলো।

এলিজা মৃদু হেসে বললো,আর আমাদের দলে থাকবে সকল

মেয়েরা। আমাদের দলীয় নেত্রী হবে আমার আম্মা।

জয়াকে জড়িয়ে ধরে বললো এলিজা।জয়া হেসে বললো পাগলি মেয়ে।সবাই বের হয় বিয়ের কেনাকাটার উদ্দেশ্যে।

সবাই ঢাকা বসুন্ধরা মার্কেটে উপস্থিত হয়।সবাই এটা ওটা,গহনা শাড়ি থেকে সবকিছু কিনছে। অপূর্ব তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠায় সূর্য কে।

বিয়ের বাহানায় সূর্য কে নিজের কাছে রাখতে পারবে।বিয়ের কিছু দায়িত্ব সূর্য কে দেয়া হয়েছে। সূর্য সহজেই রাজি হয়। অপূর্বর খটকা লাগে। সূর্যর যদি সবকিছুর পেছনে হাত থাকতো তবে কনস্টেবল রা সন্দেহ জনক কিছু পেতো। কিন্তু তারা কিছুই পেলো না ।তবে কে আছে। অপূর্ব মাথা থেকে হঠাৎ এসব চিন্তা ছুরে ফেলে দেয়।

অপূর্ব শান্ত স্বরে সূর্য কে বললো, তুই ও কিছু কিনে নে পছন্দ মত। সূর্য মৃদু হাসে।

পরদিন সকালে —-চারদিকে ঝাড়বাতি। বিভিন্ন ফুলের বাহার। চারদিকে বাচ্চাদের ছোটাছুটি।নাচ গানে চৌধুরী বাড়ি জমজমাট হয়ে ওঠেছে। জয়ার বাবার বাড়ি থেকে সবাই এসেছে। মমতাজ এর ভাই বোন সবাই উপস্থিত হয়।

অপূর্ব শ্রাবন থানার কিছু কিছু অফিসার দের দাওয়াত করে।
সমস্ত মহিলারা একসাথে বসে হলুদ বাটছে।তারসাথে গান গাইছে। প্যান্ডেল এর মাঝখান দিয়ে আলাদা কাপর দেয়া হয়। একপাশে মেয়ে পক্ষর অন্য পাশে ছেলে পক্ষর গায়ে হলুদ হবে।
এলিজা আজ খুব আনন্দিত তার একমাত্র ছোট বোনের বিয়ে।ছুটে

ছুটে কাজ করছে। হলুদের অনুষ্ঠানে হাজির হয় অপূর্ব শ্রাবনের সব বন্ধুরা। প্যান্ডেলে কলা গাছ দিয়ে বানানো ছাদনতলায় নিয়ে যায় শ্রাবন কে। এলিজা পাখিকে শাড়ি পরিয়ে তৈরি করছে।সাথে অতিথি মেয়েরা ।সব মেয়েরা হলুদ শাড়ি পরে নেয়। পাখিকে ছাদনতলায় নেয়ার জন্য নিচ তলায় নামানো হয়।ঠিক তখনি একজন প্রতি বেশি পাশ থেকে বলে

উঠলো, ছাদনাতলায় নিজে হেটে গেলে অমঙ্গল হয়।

পাশ থেকে আরো একজন তার সাথে সহমত জানায়। পাশ থেকে অর্পা বলে উঠলো আমাদের দলে তো কোন ছেলেই নেই।তৎক্ষণাৎ অপূর্ব, সূর্য হাজির হয়। অপূর্ব অহংকারী স্বরে বললো, ছেলেদের অভাব বুঝি। আমাদের দরকার বললেই হতো। পাশ থেকে একজন

মেয়ে ঢং করে বলে উঠলো, আমাদের কনেকে আমরা হাটিয়েই নিয়ে যাবো কোন পুরুষের দরকার নাই।

সূর্য জ্যাকেটের হাতা কাচাতে কাচাতে বললো,খুব তেজ তো দেখছি। অপূর্ব সব মেয়েকে উপেক্ষা করে এলিজার কানে কানে এসে বললো,আজ তোমাকে হলুদ শাড়ি তে খুব সুন্দর লাগছে।চলোনা

আরেকবার বিয়ে করি।সব মেয়েরা অপূর্বর কান্ড দেখে খিলখিল করে হেসে উঠে। তখন ই জয়া এসে বললো, ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে। কনেকে তারাতাড়ি নিয়ে চল। এলিজা জয়াকে উদ্দেশ্য করে বললো, আম্মা পাখি কি হেটে যাবে,বলতেই অপূর্ব পাখিকে পাজা কোলে করে নেয়। সবাই হা করে তাকিয়ে থাকে।এলিজা চুপ হয়ে

যায়। অপূর্ব সবার দিকে পরোখ করে বললো,হা করে দেখার কি আছে পাখি আমার ছোট বোন।অর্পা যেমন আমার বোন পাখিও তেমনি। বলেই ছাদনাতলায় পাখিকে নিয়ে যায়। শুরু হয় পাখির গায়ে হলুদ। একে একে সবাই হলুদ দেয়া শুরু করে।একে অপরের গালে হলুদ দিচ্ছে।সবাই সেই নিয়ে ব্যাস্ত।কিছু মেয়েরা নাচ গান করছে। এলিজা

সবার সাথে,হলুদ মাখাচ্ছে।ঠিক তখনি অপূর্ব হুট করে এসে এলিজার কমড় ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেয়। এলিজা হতভম্ব হয়ে যায়। এলিজা লজ্জা মুখে বললো,কি করছেন সবার সামনে জড়িয়ে ধরলেন কেন! সবাই দেখছে।

অপূর্ব মুখে হাসি নিয়ে বললো,সবাই আছে কিন্তু কেউ দেখছে না।সবাই নতুন কনে কে নিয়ে ব্যাস্ত।আর

এদিকে আমি আমার কনেকে নিয়ে একটু....

এলিজা মুখ ঘুরিয়ে নেয়।অপূর্ব কপালের সামনে দিয়ে এলিজার চুল গুলো সরিয়ে বললো,সবার হলুদ গালে লাগালে আমার টা লাগাবে না। এলিজা ছুটে যেতে চাইলেই অপূর্বর বা গালে থাকা হলুদ,এলিজার গালের সাথে নিজের গাল লাগিয়ে হলুদ দেয়। এলিজা

মৃদু হেসে বললো, আপনি না।

সবাই পাখিকে গোসল করায়। অপরদিকে শ্রাবন কেও গোসল করায়।শীতের দিনে গোসল। শ্রাবন কাঁপতে কাঁপতে বললো,আমি আর কোনদিন বিয়ে করবো না।সেই শুনে সব বন্ধু বান্ধব আওয়াজ করে হেসে উঠে।

একে একে সব অতিথি উপস্থিত হয়। রাত বিয়ের আয়োজন করা

হয়।রাতের বিয়ের পরিকল্পনা অপূর্বর।গানের তালে তালে নাচছে মেয়েরা। বিভিন্ন বাতির আলোয় চারদিক আলোকিত।গেটের সামনে দাঁড়িয়ে অপূর্ব সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ অপূর্বর চোখ পরে রুমার দিকে।বিয়েতে রুমাও এসেছে।পাশে থাকা সূর্য মিটিমিটি হাসছে। সূর্য রুমার ব্যাপারে আগে থেকেই জানে। সূর্য পাশ থেকে

বললো, ভাই ভয় পাচ্ছিস। অপূর্ব উল্টো দিকে ঘুরে বললো,চেপে যা। রুমা পাতলা জর্জেট শাড়ি পরা। অপূর্বর সামনে এসেই হাত বাড়িয়ে দেয়। অপূর্ব হাতটা না দিতে চাইলেও,সূর্য অপূর্বর হাত টা বাড়িয়ে দেয়।

চারদিকে নাচ গান, এরপর খাওয়াদাওয়া মিলিয়ে বিয়ে জমজমাট। কিছুক্ষণ এর মধ্যে ই

শুরু হয় বিয়ের কার্যক্রম। কাজী প্রথমে পাখির কাছে আসে।পাখি লাল বেনারশী পরে বসে আছে। কাজি বড়দের উদ্দেশ্য করে বললো, দেনমোহর কত টাকা ধার্য্য করবো? এলিজা কিছু বললো না।জয়া এলিজার দিকে পরোখ করে। তৎক্ষণাৎ পাখি বলে উঠলো, দেনমোহর হিসেবে আমি আমার স্বামীকেই চাই। সবাই পাখির দিকে

তাকিয়ে হেসে ওঠে। এলিজা শান্ত স্বরে বললো, কিছু তো ধার্য্য করতে হবে। আপনি ১ টাকা লিখেন।কাজী দেনমোহর লিখে কবুল বলতে বললে পাখি কবুল বলে।সবাই আলহামদুলিল্লাহ বলে ওঠে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। চৌধুরী বাড়ির ভির কমতে থাকে।

এলিজা বাসর ঘর আগেই সাজিয়ে রেখেছে। সাজানোটা আরেকবার দেখতে আসে।ঘর টা ভালো করে পরোখ করে ঘর থেকে বের হতেই দেখে, অপূর্ব।

এলিজা হতভস্ব হয়ে যায়।

এলিজা অপূর্ব কে উপেক্ষা করে যেতেই অপূর্ব এলিজার হাত ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেয়। এলিজা

লাল রঙের শাড়ি পরা।চুল গুলো খোপা তার সাথে ফুল।
অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, মাশাআল্লাহ*আজ তোমাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে ইচ্ছা করছে আরো একবার বিয়ে করি। এলিজা মৃদু হেসে বললো, আমার মহারাজাকেও যে অসম্ভব সুন্দর লাগছে।তবে শুধু আজ না আপনি আমার চোখে সবসময় সুন্দর।অপূর্ব হেসে

বলল,ধরে নিলাম ,আজ থেকে আমিও সু-দর্শন।যখন আমার স্ত্রী বলেছে।

আমার কাজ আছে বলেই,এলিজা অপূর্ব কে সরিয়ে চলে যায়। অপূর্ব নিচে নামে। সূর্য মিদুল শ্রাবন সহ সবাই বৈঠকখানায় আড্ডা দিচ্ছে।

অপূর্ব একবার বাহিরে বের হয়। এখনো কিছু অতিথি আছে। তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একজন দ্রুত

পায়ে হেঁটে যেতেই অপূর্বর সাথে ধাক্কা লাগে।অপূর্ব লোকটির দিকে ঘুরলে লোকটি হাত উঠিয়ে সরি,বলে চলে যায়। লোকটির বড় বড় দাড়ি সাথে পাঞ্জাবি পরা। অপূর্ব সামনের দিকে ঘুরে চোখ বুজে কিছু মনে করার চেষ্টা করলেই, অপূর্বর খেয়াল হয় একটু আগে যে লোকটির সাথে ধাক্কা লাগে তার হাতে একটা চিন্হ ছিলো।এটা সেই চিন্হ যেটা চীপস

ডুপিয়ালির হাতে ছিল।অপূর্বর চোখ বড় হয়ে যায়।ভাবতে থাকে আমার বাড়িতে চীপস কি করছে?তাও ছদ্মবেশে কেন। অপূর্ব তৎক্ষণাৎ বৈঠকখানায় উপস্থিত হয়।যা সন্দেহ করছিলো তা নয়। সূর্য সবার সাথে বিভিন্ন কথায় মশগুল।তবে চীপস এখানে কি করছিলো?নাকি সূর্য আমার চোখে ধুলো দিয়ে ওর সাথে কথা বলেছে। এসব ভাবতে ভাবতে

ই শ্রাবন অপূর্ব কে ডাকে। অপূর্ব সবার সাথে আড্ডায় যুক্ত হয়। কিন্তু অপূর্ব কে নতুন করে চিন্তা গ্রা,স করে।জমজমাট বিয়ে বাড়ি কিছুক্ষণের মধ্যেই নিরব হয়ে যায়। সমস্ত নেমন্তন্ন লোক চলে গিয়ে বাড়ি নিরব।যারা চৌধুরী বাড়ির অতিথি তারাই থেকে গেছেন।সবাই বিভিন্ন গল্পে মশগুল।ছোট বাচ্চারা ছোটাছুটি করছে। এলিজা পাখির জন্য দুধ

গরম করছে। সকাল থেকে পাখির তেমন কিছু খাওয়া হয়নি। সাথে ঔষধ আছে। এলিজা দুধ গরম করে নিয়ে যায় পাখির ঘরে।পাখিকে জয়ার ঘরে এখন অবধি রাখা হয়েছে। এলিজা দুধ নিয়ে উপরে যেতেই চোখ পরে অপূর্বর দিকে। সাথে সব বন্ধুরা আড্ডা দিচ্ছে কিন্তু সে কিছু ভাবছে। অপূর্বর চিন্তা মুখ এলিজার ভালো লাগে না। কিছুক্ষণ

অপূর্বর দিকে পরোক্ষ করে উপরে চলে যায়।পাখি জয়ার ঘরে বসে আছে। সাথে অর্পা , চাঁদনী এবং কিছু মেয়েরা।পাখি নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে। এলিজা দুধ টা টেবিলের উপর রেখে,পাখির কাছে বসে। পাখির চোখে পানি।এলিজা নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে দেয়। এলিজা ভেজা কন্ঠে বললো,কাদছিস কেন?পাখি জ্বল জ্বল চোখে এলিজার

দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো, মা বাবার কথা খুব মনে পরছে। এলিজার মা বাবার কথা শুনে মুখের রঙ বদলে ফেলে।এলিজার বুকের ভেতর জ্বলে ওঠে।অতি কম বয়সে মা বাবা কে হারায়।আজ বেঁচে থাকলে কতটা না খুশি হতো। আমাদের ছোট্ট পাখির আজ বিয়ে হয়েছে।মা বাবার কত আদুরে ছিলো পাখি।এসব ভেবেই,এলিজা হাতের

উল্টো দিক দিয়ে চোখ মুছে। এলিজা মৃদু হেসে বললো, আমি আছি না আমি ই তোর মা-আমিই তোর বাবা।তোর কোন ইচ্ছা আমি অপূর্ন রেখেছি!বল!আর আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন পর্যন্ত তোর সমস্ত চাওয়া পাওয়া পূর্ণ করবো। পাখি মৃদু হেসে এলিজাকে জড়িয়ে ধরে।পাশ থেকে চাঁদনী বললো, বউমনি আপনার মা বাবা কিভাবে

মারা যায়। এলিজা কিছুক্ষন চুপ থেকে কাপা কণ্ঠে বললো, বাবা জেলে ছিলেন। কালবৈশাখীর ঝড় বাবাকে কেড়ে নেয়।বাবার মৃত্যু তে মা খুব শোকাহত হয়। চিন্তায় চিন্তায় একদম শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিভাবে সংসার চালাবে, কিভাবে আমাদের মানুষ করবে। এভাবে কিছুদিন চলার পর মায়ের ডায়রিয়া হয়। চিকিৎসা ব্যাতিত মাও মারা

যায়।এলিজা চোখের পানি মুছে।পাখি ফোপাচ্ছে। চাঁদনী পাখির কাদে শান্তনা মূলক হাত রাখে। এলিজা আদুরে গলায় কাদদে বারন করে। পাখি কান্না থামায়।এলিজা পাখিকে দুধ টা দেয়। সাথে খাওয়ার ঔষধ। পাখি খেয়ে নেয়। এলিজা দ্বিতীয় বার পাখির চোখের পানি মুছে অহংকারী স্বরে বলল, চোখের পানি ফেলতে নেই।জীবনে যে পর্যায় ,যত

কঠিন পরিস্থিতিতে থাকিস না কেন, ভেঙে পরতে নেই।কারন চোখের পানি দূর্বলতা। পরিস্থিতি যেমন হোক মুখে হাঁসি রাখতে হয়।কারন হাঁসি আমাদের শক্তি জোগায়।পাখি মৃদু হেসে হ্যা সূচক মাথা নাড়ে। এলিজা মৃদু হেসে বললো,এখন থেকে তুই সবসময় আমার চোখের সামনে থাকবি। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।তুই বোন থেকে আমার জ্বা-

হয়ে গেলি।বলেই পাখিকে জড়িয়ে ধরে।
অপূর্ব সমস্ত কেস, তদন্ত সবকিছু মাথা থেকে ফেলে বিয়ের আনন্দে মন দেয়। নিজের হতাশার জন্য সবার আনন্দ নষ্ট হোক সেটা অপূর্ব চায়না। সূর্য কে চীপস ডুপিয়ালির কথা জিজ্ঞেস করে, দ্বিতীয় বার ওকে সন্দেহ করে ওর আনন্দ টা মাটি করতে চাইনা।এসব ভাবতে

ভাবতে অপূর্ব সূর্য কে বললো,চল নতুন কনের সাথে একবার কথা বলে আসি।এলিজা পাখি সবাই মিলে বিভিন্ন কথায় মশগুল।তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় অপূর্ব ও সূর্য।দরজায় ওপাশে দাঁড়িয়ে অপূর্ব গলায় কাশি দিয়ে বললো,আমরা কি মহিলা মহল্লায় আসতে পারি। অর্পা হাত ধরে নিয়ে আসে।

অপূর্ব ভেতরে আসে।এলিজার দুই স্বিনাতে হাত দিয়ে মৃদু হেসে বললো, কনেকে কি তোমরাই রেখে দিবে। আমার ভাই তো তার বউয়ের জন্য দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। এলিজা মৃদু হেসে বললো,সবাই খেয়েনিক। অতিথিদের খাওয়ানোর চক্করে তো বাড়ির লোকদের খাওয়া হয়নি। তারপর আম্মা কে বলে পাখিকে শ্রাবনের ঘরে দিয়ে আসবো।

এলিজা সবাইকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে চলে যায়। অপূর্ব,পাখির কাছে বসে।সূর্য চেয়ার টেনে বসে। অপূর্ব পাখির সাথে নানান কথা বলছে।পাশে কিছু মেয়েরা হাজারো কথায় মশগুল। সূর্য জানালার দিকে ঘুরে,দাত দিয়ে ডান হাতের নক কাটছে।পাশেই বসা চাঁদনী, চাঁদনীর সাথে চাঁদনীর বান্দবি ডালিয়া।

অপূর্বর হঠাৎ চোখ পরে ডালিয়ার দিকে।ডালিয়া অপলক দৃষ্টিতে সূর্যর দিকে তাকিয়ে আছে।কালো বুট,কালো হুডি জ্যাকেট,শ্যমবর্ন শরীর,গোপ গুলো সূর্যর কিছুটা বড়,দুদিকে নোয়ানো,গলায় চেন চোখ গুলো সূর্যর সবসময় লাল থাকে। ডালিয়ার ভাব ভঙ্গিমা দেখেই অপূর্ব বুঝতে পেরেছে, সূর্যর উপর ফিদা হয়ে গেছে। সূর্য অপলকে

দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাহিরে দেখছে। অপূর্ব গলায় কাশি দেয়। সূর্য অপূর্বর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে। পরে কথা হবে বলে , অপূর্ব পাখির কাছ থেকে বিদায় নেয়। অপূর্ব সূর্য কে নিয়ে নিচে আসে।অপূর্ব সূর্যর দিকে পরোখ করে ভাবতে শুরু করলো,যদি সূর্য নিজের অতিত ভুলে নিজের জীবনটা নতুন করে সাজাতো কতই না ভালো হতো।আমাকে সূর্যর

অতিত ভুলিয়ে দেয়ার জন্য আমাকে চেষ্টা করতে হবে।অপূর্ব তৎক্ষণাৎ সূর্য কে কিছু বললো না।ভাবলো এই বিষয় পরে কথা বলবে।সবাই রাতের খাবার খেতে বসে। এলিজা খাবার পরিবেশন করছে। অপূর্ব খাচ্ছে আর বার বার এলিজার দিকে পরোখ করছে।সবাই এলিজার রান্নার প্রশংসা করছে। তৎক্ষণাৎ অপূর্ব অহংকারী স্বরে বলে উঠলো,

আমার বউয়ের রান্না ভাল তো হতেই হবে। সূর্য পাশ থেকে বলে উঠলো,দেখতে হবে না বউটা কার, আমার বন্ধুর।সবাই খিল খিল করে হেসে উঠে। অপূর্ব খেতে খেতে বুঝতে পারলো কেউ পা দিয়ে অপূর্বর পায়ে আলাপ করছে।অপূর্বর খটকা লাগলো।সামনের দিকে খেয়াল করলো। টেবিলের অপর প্রান্তে বসা,অর্পা,ওর দুটো বন্ধু,

চাঁদনী,আর ডালিয়া।ডালিয়া অপূর্বর মাঝ বরাবর। অপূর্বর বুঝতে আর বাকি নেই।পাশেই বসা সূর্য,তার পা মনে করে আমার পায়ের সাথে আলাপ করা হচ্ছে। অপূর্ব ডালিয়ার দিকে পরোখ করলো,সে খাওয়া ছেড়ে সূর্যর দিকে তাকিয়ে আছে। অপূর্ব মিটিমিটি হাসছে। তৎক্ষণাৎ এলিজা-এসে অপূর্বর কাছে দাড়ায়। অপূর্ব দৃষ্টি সরিনে নেয়।এলিজা

সবাইকে এড়িয়ে অপূর্বর প্লেটে মাংস দেয়ার বাহানায় ফিসফিস করে বলল, খাওয়ার সময় ও অন্য মেয়েদের দিকে তাকানো হচ্ছে তাই না।ঘরে এসো।

সমস্ত মেয়েকে তোমার সামনে এনে দিবো।অপূর্ব তৎক্ষণাৎ কাশি দিয়ে উঠে।জয়া বললো,ভিষন লেগেছে। এলিজা পানি ঠেলে দিলো।

বিয়ে বাড়ি পুরোপুরি শান্ত।চারদিক নিশ্চুপ। কোন কোলা'হল নেই। শীতের শীতল হাওয়া বইছে। পাখি অপেক্ষা করছে। কখন শ্রাবন আসবে। শ্রাবনের ঘরে এই প্রথমবার এসেছে।তাও বউ হয়ে। পাখির খুব আনন্দ হচ্ছে। শ্রাবন কে দেখলেই পাখি এক অন্যরকম শান্তি অনুভব করে।যে শান্তি আর কোথাও

নেই। শ্রাবনের পাগলামি পাখিকে নতুন করে হাসতে শিখায়।

পাখি শ্রাবনের দেয়া ফুলটা হাতে নিয়ে জ্বল জ্বল চোখে একা একা বির বির করে বলছে, আমার কেন এই মরনব্যাধী রোগ হলো।যদি আরো কয়েকটা দিন আমার প্রিয় মানুষটির সাথে বাঁচতে পারতাম। আরো কিছু টা পথ তার সাথে চলতে পারতাম। তাকে দেখলেই যে

আমার বাচার ইচ্ছা টা বেড়ে যায়। যতই সবার সামনে হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করি না কেন।ভেতর ভেতর জ্বলছে। আমিই কি সেই হতভাগী,যার প্রিয় মানুষটির সাথে জীবন কাটানোর সময় টা বোধহয় বলতেই...শ্রাবন ঘরে ঠুকে।পাখি বা হাতের উল্টো দিক চোখের পানি মুছে। শ্রাবন এসেই ধপাস করে পাখির সামনে কাথ হয়ে শুয়ে পরে।

পাখি চমকে উঠে। পাখি লাল বেনারশী পরনে,ঠোটে লাল লিপস্টিক,ভারী গহনা সাথে ধবধবে ফর্সা ত্বকে একদম পরীর মত লাগছে।পাখি মাথানত করে নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে। শ্রাবন পাখি কে পরোখ করে মৃদু হেসে বললো, মাশাআল্লাহ।পাখি মুচকি হাসে। শ্রাবন এক হাতের উপর ভর দিয়ে শুয়ে শুয়ে পাখিকে দেখছে, অমৃদু

হেসে বললো, আমি হেরে গিয়েও জিতে গিয়েছি। শেষ পর্যন্ত আমি আমার পিচ্চি বেয়ান কে আমার করে পেলাম।আজকে একটা কথা বলতেই হচ্ছে,ভাগ্যে থাকলে সৃষ্টিকর্তা তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের কাছে নিয়ে আসবেই। তাই না পিচ্চি বেয়ান!

পাখি বিছানা থেকে নেমে যায়। শ্রাবন উঠে বসে।পাখি শ্রাবনের পা

ধরে সালাম করে। শ্রাবন হাসি দিয়ে পাখিকে জড়িয়ে ধরে।

বার বার বলতে থাকে,আজ আমি ভিষন খুশি।ভিষন খুশি। আমার পাখিকে আমি পেয়ে গেছি।পাখি আওয়াজ করে হেসে উঠে।শ্রাবন পাখিকে পাজা কোলে করে বসিয়ে দেয় ফুলের বিছানায়। শ্রাবন পাখির সামনে বসে পরে। হাঁটুর উপর, বা হাতের উপর,থুতনি টা রেখে শ্রাবন

পাখির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।পাখি লাজুক মুখে বললো,এভাবে তাকিয়ে থাকবেন না আমার লজ্জা লাগে। শ্রাবন মৃদু হেসে বললো, তোমার লাজুক মুখের হাঁসি আমাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়।যতই দেখিনা কেন তোমাকে ,দেখার ইচ্ছা যে মিটে না।বুঝলে পিচ্চি বেয়ান। রাত বেরে চলেছে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে । অপূর্ব,

সূর্য,মিদুল এক ঘরে।জয়া, চাঁদনী,অর্পা ডালিয়া একঘরে। মমতাজ, এলিজা সাথে দুজন অতিথি মেয়ে তারা একঘরে। রাত ১ টা নাগাদ।এলিজা যে ঘরে সে ঘরের বারান্দা থেকে বাড়ির সামনের দিকটা পরিষ্কার দেখা যায়।এলিজার জীবনে অপূর্ব আশার পর থেকে, অপূর্বর বুকের উপর ছাড়া এলিজার ঘুম আসেনা ।এলিজা বিছানার

এপাশ ওপাশ করতেই কানে আসে লাকরী কাটার আওয়াজ।এলিজা থমকে ওঠে।এত রাতে কে লাকরী কাটছে।এলিজা ভিষন চিন্তায় পরে যায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো এটা ভেবে যে,হয়তো ভুল শুনছি সারাদিনের তোরঝোপ এর জন্য। কিন্তু না এলিজার ধারনা ভুল নয় । সত্যিই কেউ লাকরী কাটছে।এলিজা শরীরের উপর থেকে লেপ টা

সরিয়ে উঠে জানালার কাছে আসে। এলিজা জানালা টা খুলে। ভালো করে পরোখ করতেই দেখে কালো চাদর পরে উল্টো দিকে মুখ ঘুরে কেউ লাকরী কাটছে। এলিজার খটকা লাগলো। চারদিক নিস্তব্ধ। শুনশান । কোথাও কেউ নেই।এত রাতে কারো থাকার কথাও নয়। লোকটি কিছুটা দূরে বসে লাকরী কাটছে।যতদূর পর্যন্ত ঠিক মত

বাড়ির সামনের বাতির আলো পৌছায় না। এলিজা মনস্থির করলো লোকটিকে দেখবে। কে সে? এত রাতে লাকরী কাটছে।ভারী অদ্ভুতচারদিক নিশ্চুপ। শীতল হাওয়া বইছে।পূরো বাড়ি যেন হঠাৎ শুনশান হয়ে গেছে। এলিজা এদিক সেদিক পরোক্ষ করে।কেউ

ষড়'যন্ত্র করে, পরিকল্পনা মোতাবেক কিছু করছে না তো। বিভিন্ন ভাবনা

,এলিজা উপেক্ষা করে,হাতে রাম,দা সাথে টর্চ নিয়ে দরজাটা খুলে বাহিরে বের হয়। আশেপাশে দেখছে । কোথাও কেউ নেই।বাড়ির দারোয়ান সে ছুটিতে গেছে।

এলিজা সাহস করে এক কদম দু কদম এগোতে থাকে।

লোকটির কাছে এগোতেই লোকটি লাকরী কাটা বন্ধ করে দেয়। এলিজা থেকে লোকটি কিছু দূরে। অচেনা

লোকটি এলিজার উপস্থিতি বুঝতে পেরেছে। এলিজা তেজ দেখিয়ে বলে উঠলো,কে তুমি এত রাতে কাঠ কাটছো কেন?লোকটি উল্টো দিকে ঘুরে আছে। এলিজা দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলো,কে আপনি চুপ করে আছেন কেন?লোকটি আবার কাঠ কাটতে শুরু করে।এলিজার রাগ উঠতে থাকে।কি অদ্ভুত লোক। এলিজা আবার প্রশ্ন করতেই লোকটি

বলে উঠলো, বউমনি খিদে পেয়েছে। এলিজা চমকে উঠে।এটা তো বায়েজিদ। কিন্তু বায়েজিদ শীতের ভিতর এত রাতে কি করছে।এলিজা চিন্তিত কন্ঠে বললো, এত রাতে তুই এখানে কি করছিস। এরকম অদ্ভুত আচরণ কেন করছিস।তোর খিদে পেয়েছে তুই ঘরে এসে একটা বার বলতিস। বায়েজিদ কোন কথার উত্তর না দিয়ে বিৎঘট কন্ঠে

বললো,বউমনি খিদে পেয়েছে। এলিজা কথা না বাড়িয়ে বললো তুই অপেক্ষা কর আমি নিয়ে আসছি। এখানে বসে খেতে হবে না।তুই ঘরের সামনে আস।এলিজা ভেতরে চলে যায়। এলিজা বায়েজিদ এর জন্য খাবার বাড়ছে। কিন্তু এলিজার ভেতর বায়েজিদ কে নিয়ে নতুন চিন্তা গ্রা,স করে। বায়েজিদ হঠাৎ করে এরকম আচরণ কেন করছে।

কিভাবে কথা বললো। এলিজা ভাবনা ছেড়ে বায়েজিদ এর জন্য খাবার নিয়ে যায়। রাত ১:৩০ মিনিট। বায়েজিদ একটু পেটুক। এলিজা নিজের ছোট ভাইয়ের মত দেখে। কিন্তু আজকের আচরণ এলিজাকে ভাবাচ্ছে। খাবার নিয়ে আসে এলিজা। বায়েজিদ কিছুটা এগিয়ে বসেছে। চাদর মুড়ি দেয়া। এলিজার অনেক মায়া হলো।একই

তো এক চোখে দেখে না তার উপর এত শীতে বাহিরে।যদিও অপূর্ব কাজের লোকদের জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এলিজা খাবার টা বায়েজিদ কে দেয়। এলিজা আতংক স্বরে বলল,তুই আমাকে এখন থেকে শুধু আপা ডাকবি। বউমনি না। বায়েজিদ হ্যা সুচক মাথা নারে।মাছ ভাত সাথে মাংস পেয়ে বায়েজিদ দ্রুত খেতে

শুরু করলো।এলিজার গড়মিল মনে হচ্ছে। বায়েজিদ হঠাৎ এরকম আচরণ করছে কেন।

এত রাতে আর বাহিরে থাকা যাবে না। “তুই খেয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পর আমি আসছি”বায়েজিদ খাওয়া বন্ধ করে অদ্ভুত স্বরে বলল,আপা তুমি খুব ভালো। এলিজা ঘরের দিকে চলে যেতেই চট করে অপূর্ব সামনে পরে। এলিজা চমকে উঠে। এলিজা

আমতা আমতা করে বলল, আপনি এখানে এত রাতে?

একই প্রশ্ন তো আমার।তুমি এত রাতে কি করছো। আমার তোমাকে ছাড়া ঘুম আসছিল না।তাই নিচে আসি।এসে দেখি দরজা খোলা।(বললো শান্ত স্বরে অপূর্ব)

এলিজা মৃদু হেসে বললো, বায়েজিদ এত রাতেও কাঠ কাঠছিলো।আমি শুনতে পেয়ে নিচে আসি।তখন ও

আমাকে বলে ওর খিদে পেয়েছে । তাই আমি খাবার নিয়ে আসি।

অপূর্ব ভ্রু কুঁচকে রেগে বললো, তোমার সাহস অনেক দেখছি।যদি কোন অঘটন ঘটতো। তাহলে কি হতো! তুমি না সত্যিই পাগল! এত রাতে কেউ একা বের হয়।এলিজা মৃদু হেসে বললো, আমাকে নিয়ে এত চিন্তা হয় আপনার।

তোমার তো কাজ ই আমাকে চিন্তায় ফেলার।বলেই অপূর্ব এলিজার হাত ধরে ভেতরে চলে যায়। এলিজা যেতে যেতে একবার বায়েজিদ এর দিকে ঘুরে দেখে, বায়েজিদ অদ্ভুত ভাবে এলিজার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা চোখ না থাকায় ভারী অদ্ভুত দেখাচ্ছে। এলিজা বিষিন্নত হলো।এলিজাকে বায়েজিদ এর অদ্ভুত আচরন ভাবাচ্ছে।

অপূর্ব এলিজার হাত থেকে রাম, দা টা নিয়ে দূরে রাখে।সোফাতে দুজন বসে পরে। অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, অসহায়দের জন্য তোমার ভালোবাসা আমার খুব ভালো লাগে।কারন যার অন্যর জন্য ভালোবাসা থাকে সে সর্বদা পবিত্র থাকে।তার মনে খারাপ চিন্তা গ্রা,স করতে পারে না।

এলিজা অপূর্বর দিকে এগিয়ে বসলো। আতংক স্বরে বলল,একটা কথা বলবো?

হ্যাঁ বলো!আমি এই বাড়িতে আশার পর থেকেই বায়েজিদ কে দেখছি। ওর আচরণ আমি ভালো করে জানি। কিন্তু আজকে আমি এক অন্য বায়েজিদ কে দেখলাম।ওর আচরণ বড্ড অন্য রকম ছিলো।

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,এসব তোমার মনের ভুল।ও সবসময় এরকম। আর তুমি এরকম একা একা বাহিরে বের হবে না।কি না কি হয় বলা যায়না। এলিজা মৃদু হেসে বললো, আমার কিছু হবে না।যতদিন আপনার ভালোবাসা আছে।এখন গিয়ে শুয়ে পরুন। অনেক রাত হয়েছে।

অপূর্ব ঘরে চলে যায়। এলিজা বায়েজিদ এর চিন্তায় মশগুল ।কি হয়েছে ওর কিছু বলতে চাচ্ছে।নাকি অন্য কিছু।এসব ভাবতে ভাবতেই মমতাজ এর ঘরের জানালা আর একবার খুললো। এলিজা দেখতে পায় বায়েজিদ এখনো বসে আছে। এলিজা ভাবনা ছেড়ে ঘুমাতে যায়। কিন্তু কোনভাবেই ঘুম আসছে না।

সকাল হয়ে যায়। মনোরা রান্না ঘরে চলে যায়। সাথে মনজুরাও। সকাল সকাল মনজুরা এসে হাজির। মনোরা প্রশ্ন করলো, কোথায় থাকো , হুটহাট না বলেই চলে যাও। মনজুরা বলল, ছেলেটার শরীর আগের থেকে খারাপ হয়েছে।তাই কোন কিছুতে মন বসাতে পারি না। মনোরা বললো, তা বাড়ির মালকিন কে বলে তো যেতে পারো!

মনজুরা জবাবে বললো,আমি কবেও বা বলে গিয়েছিলাম।

মনোরা কথা বাড়ালো না। এলিজা হাত মুখ ধুয়ে রান্না ঘরে চলে আসে।এলিজার চোখে মুখে চিন্তার ছাপ। মনোরা মৃদু হেসে প্রশ্ন করলো, বউমনি কিছু হয়েছে। এলিজা চা পাতা নামাতে নামাতে না সূচক মাথা নাড়ে। মনোরা এড়িয়ে যায়।ঘুম থেকে উঠে অপূর্ব সূর্য

মিদুল ছাঁদে যায়।কড়া রোদ উঠেছে আজ।শীতের মাত্রা কিছুটা কম। সূর্য উল্টো দিকে ঘুরে ব্যায়াম করছে।অপূর্ব ভাবছে কিভাবে সূর্য কে বলা যায়,যে তোর জীবনের পথ এখনো অনেক বাকি। এভাবে নিজেকে সবসময় একাকিত্ব ভরে রাখিস না। কিন্তু সূর্য এত সহজে রঞ্জনা কে ভুলে যাবে,সেটাও অসম্ভব। অপূর্ব মনস্থির করলো

আগে সূর্য কে কিছু বলবো না। ডালিয়া মেয়েটাকে দেখি,সত্যিই সূর্য কে পছন্দ করে কিনা। যদি করেও থাকে , তবে আমার ওকে কিছু কৌশল শিখিয়ে দিতে হবে।যে, কিভাবে সূর্যর কাছে আসা যায়। মিদুল হাতে তুরি দিয়ে অপূর্বর ভাবনা ভাঙিয়ে দেয়।

মিদুল হেসে বললো,কিরে কি ভাবছিস?অপূর্ব উল্টো ঘুরে ভারী

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, নতুন ভাবনা।তৎক্ষণাৎ অর্পা ছাদে দৌড়ে আসে। অপূর্ব কে উদ্দেশ্য করে বললো, ভাইয়া ল্যান্ডলাইনে তোমাকে কেউ ফোন করেছে।সে লাইনেই আছে তোমাকে চাচ্ছে।

অপূর্ব দ্রুত পায়ে হেঁটে নিচে নামে। অপূর্ব হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে ডাঃ জাকির বললো তুমি ফরেন্সিকল্যাবে আসো। বলেই ফোন

কেটে দেয়। অপূর্ব চমকে উঠে।কি হয়েছে,এত সকাল সকাল ফোন করলো।কোন খারাপ খবর নয়তো। অপূর্ব চলে যায় থানার উদ্দেশ্যে।

শ্রাবন, সূর্য, মিদুল, চাঁদনী সহ সকলে বসে বসে আড্ডা দিচ্ছে। শ্রাবন গিটার নিয়ে গাইছে। সবাই তালে তালে হাততালি দিচ্ছে। এলিজা সবাইকে খাবার এনে দেয়। সবাইকে আড্ডার আশরে বসেই

খেতে বললো। এলিজা চোখ বুলিয়ে দেখলো অপূর্ব নেই। অর্পাকে জিজ্ঞেস করলো তোমার ভাই কোথায়, অর্পা খেতে খেতে বললো, ভাইয়া থানাতে গেছে।_গ্লাসকোব ফরেন্সিক ল্যাব_

অপূর্ব কিছুক্ষন এর মধ্যেই হাজির হয় ল্যাবে।ডাঃ জাকির কপালে হাত দিয়ে বসে আছে। অপূর্ব তাকে ডাকলে সাড়া দেয়। অপূর্ব কাপা

কণ্ঠে বললো,কি হয়েছে কোন খারাপ খবর নয়তো।

ডাঃ জাকির বেশকিছু ক্ষন নিশ্চুপ থেকে কাপা কণ্ঠে বললো, অপূর্ব আমাকে ক্ষমা করে দাও।

অপূর্ব ভ্রু কুঁচকে দেয় বললো,কি হয়েছে আমাকে খুলে বলুন।

ভেজা কণ্ঠে ডাঃ জাকির বললো, তুমি যে কয়েনটা আমার কাছে

রাখতে দিয়েছিলে সেটা কেউ চু,রি করে নিয়ে গেছে।
অপূর্ব থমকে দু কদম পেছনে স্বরে যায়।চোখ গুলো বড় বড় করে ফেলে। শরীর থেকে ঘাম ঝরতে তাকে। অপূর্ব আতং,ক স্বরে বললো,কি বলছেন, এখানে এত পাহারাদার থাকতে কি করে সম্ভব!!
ডাঃ জাকির নিশ্চুপ থাকে।কোন কথার উত্তর সে দিতে পারছে না।

শুধু আফসোস করছে। অপূর্ব চিন্তিত হয়ে পরে। কিভাবে এটা হলো। অপূর্ব এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে রাত হয়ে যায়।চৌধুরী বাড়ির সবাই ঘুমে। কিন্তু এলিজা জেগে আছে অপূর্বর জন্য। এখনো আসছে না কেন। সকালে না বলেই বেড়িয়ে গেলো। এলিজা চেয়ারে বসে দোল খেতে খেতে, শুনতে পেলো কেউ গেইট খুলছে। এলিজা গেটের

আওয়াজ পেয়েই বারান্দায় এসে। কিন্তু এলিজা যা দেখলো, তাতে পুরোপুরি অবাক হয়ে গেলো। অপূর্ব বায়েজিদ এর সাথে কি যেন বলছে। এলিজার

খটকা লাগলো।এত কি বলছে।তাও রেগে কেন?এলিজা জানালার কাছে অনেকক্ষন দাড়িয়ে দেখছে অপূর্ব বায়েজিদ এর সাথে কথা বলছে। এলিজা ভিষন চিন্তায় পরে যায়।

কিছুক্ষণ পর অপূর্ব বায়েজিদ এর সাথে কথা শেষ করে ঘরের উদ্দেশ্যে আসে। এলিজা দৌড়ে নিচে নামে। বায়েজিদ গতকাল যা আচরণ করলো , হঠাৎ ওর কি হয়েছিল তা জানতে হবে। অপূর্ব দরজায় কড়া নাড়লে এলিজা সাথে সাথে খুলে দেয়। অপূর্ব এলিজাকে দেখেই মৃদু হেসে সালাম দেয়। এলিজা সালামের উত্তর দেয়। অপূর্বর মুখে হাসির ছাপ

থাকলেও কোথাও যেন হতাশার ছাপ দেখা যাচ্ছে। এলিজা কিছু জিজ্ঞেস করবে তার আগেই অপূর্ব বলে উঠলো, প্রচন্ড খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও। এলিজা অপূর্ব কে খাবার দেয়। অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,আমি জানি তুমিও আমার জন্য খাওনি। বোসো আমি খাইয়ে দিচ্ছি। এলিজা অপূর্বর পাশে বসলো।এলিজার ভেতরে বায়েজিদ

এর চিন্তা গ্রা,স করে রেখেছে ।কখন প্রশ্ন করবে।নাকি প্রশ্ন করা উচিত হবে না।অপূর্বর খেতে খেতে হঠাৎ বিশন লাগে,এলিজা অপূর্বর মাথায় হাত দেয়।যাতে বিশন কমে যায়। অপূর্ব অপলকে এলিজার দিকে পরোখ করে। এলিজা মৃদু হেসে বললো,এত কি ভাবছেন কি হয়েছে, আমার সাথে ভাগ করুন। আপনার ও ভালো লাগবে।আমি জানি আপনি

চিন্তায় আছেন।অপূর্ব এলিজার দিকে একবার দৃষ্টি স্থাপন করে।ভাত মাখাতে মাখাতে শান্ত স্বরে বলল, এক অচেনা লোক আমায় একটা কয়েন দিয়েছিল।লোকটি অচেনা। আমি ফরেন্সিক ল্যাবে কয়েনটা নিয়ে যাই।ডাঃ জাকির জানান কয়েনটিতে একটা জায়গার নকশা আছে। কিন্তু কোন জায়গায় সেটা জানার আগেই কয়েনটি ল্যাব থেকে কেউ চু,রি

করে। এলিজা মৃদু হেসে বললো,এটার জন্য আপনি এত চিন্তা করছেন।যা কিছু হবে তারজন্য আমাদের সর্বদা মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হবে। অপূর্ব হ্যা সুচক মাথা নাড়ে। অপূর্ব এলিজাকেও খাবার খাইয়ে দেয়।

অপূর্ব সারাদিন বাহিরে থাকায় ক্লান্ত শরীর নিয়ে তারাতাড়ি ঘুমিয়ে পরে। এলিজার ঘুম আসে না বায়েজিদ

হঠাৎ ওরকম আচরণ কেন করলো? ওনাকেও জিজ্ঞেস করা হয়নি। এলিজা এসব ভাবতে ভাবতে মনের অজান্তে ঘুমিয়ে পরে।রাত প্রাই অনেক।

শ্রাবন ঘুমোয়নি পাখিকেও ঘুমাতে দেয়নি। শ্রাবন পেইন্টিং এর যাবতীয় কিছু জিনিস স্টোর রুম থেকে সংগ্রহ করে। পাখির ছবি আঁকবে বলে। পাখির চুল গুলো ছেড়ে সাদা

রঙের থ্রিপিছ পরিয়ে কাদ হয়ে শুয়ে আছে। শ্রাবন এর আব্দার পূরন করতেই হবে। শ্রাবন যেভাবে বলেছে সেই ভঙ্গিমাই সুয়ে আছে। যতক্ষন না পাখির ছবি আঁকা হবে ততক্ষণ শুয়ে থাকতে হবে।পাখি শ্রাবন কে দেখছে আর মিটিমিটি হাসে। বাচ্চাদের মত কত পাগলামি করতে পারে শ্রাবন।

পাখি মৃদু হেসে বললো, এই ছবি এঁকে কি হবে?শ্রাবন ছবি আঁকাতে আঁকতে বলল,যাতে আমার বাচ্চারা তাদের বাচ্চাদের বলতে পারে,যে দেখ তোদের নানি কত সুন্দরী ছিল। পাখি আওয়াজ করে হেসে উঠে। শ্রাবন আর চোখে পাখিকে দেখে। মৃদু হেসে বললো, ওয়ে পিচ্চি এভাবে হেসো না।পাগল হয়ে যাবো যে। পাখি সোয়া থেকে উঠে দুই

কমড়ে হাত দিয়ে বললো, আমাকে পিচ্চি ডাকবেন না।আমি ছোট নই। আপনার থেকে অনেক বড়। শ্রাবন পাখির কাছে এসে মৃদু হেসে বললো,ঘার উচু করে আমার সাথে কথা বলতে হয় দেখেছো।পাখি চট করে খাটের উপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এই দেখেন এবার আমি কত বড় হয়ে গেছি। আপনি আমার কমড় পর্যন্ত।হুমম বলেই মুখ কুঁচকে

দেয়। শ্রাবন বা হাত দিয়ে পাখিকে খাট থেকে নামিয়ে জড়িয়ে ধরে বললো, তেজ দেখছি তোমার অনেক।পাখি মৃদু হেসে বললো , কত তেজ দেখবেন বলেই শ্রাবনের হাত থেকে পেইন্টিং করার রং নিয়ে শ্রাবনের শরীরে মাখিয়ে দেয়। শ্রাবন আওয়াজ করে বলে উঠলো, আরে পিচ্চি কি করছো।আর বলবো না পিচ্চি।পাখি পেছনে সরে যায়।

শ্রাবনের শরীর রঙে মাখা।শ্রাবন নিচে পরে যাওয়া রং উঠিয়ে দু হাতে মেঘে পাখিকে উদ্দেশ্য করে বললো, এবার কে বাঁচাবে তোমাকে। তোমাকেও একটু রং মাখিয়ে দেই। আমাকে মাখিয়েছো,তুমি কেন বাদ যাবে। শ্রাবন পাখির দিকে এক কদম দু কদম সামনে এগোতেই পাখি দরজা খুলে বাহিরে দৌড় দেয়। আওয়াজ করে হেসে

বললো,পারলে আগে আমাকে ছুঁয়ে দেখান। শ্রাবন পেছনে দৌড়াতে থাকে। তৎক্ষণাৎ রান্না ঘরে মমতাজ পানি নিতে আসে। মমতাজ এর চোখে ঘুম।পানির পিপাসা লাগাতে মাঝরাতে পানি খেতে আসতে হলো। মমতাজ রান্না ঘর থেকে বের হতেই, চোখ পরে দোতলায়। মমতাজ এর চোখ গুলো বড় বড় হয়ে যায়।পূরো শরীর ভয়ে কেঁপে উঠে। মমতাজ

দেখতে পায়।একটা মেয়ে সাদা রঙের জামা পরে দৌড়াচ্ছে তার পেছনে শ্রাবন দৌড়াচ্ছে । মমতাজ কাঁপতে কাঁপতে আওয়াজ করে বললো, বাবা শ্রাবন তুই ভুতের পেছনে দৌড়াচ্ছিস কেন।ওটা ভূত ওটা ভূত।আরে কে কোথায় আছো, তারাতাড়ি এসো, আমার ছেলে ভূতের পেছনে দৌড়াচ্ছে। তোকে মেরে দেবে তো।পাখি নিচে নেমে

মমতাজ এর সামনে এসে দাড়ায়। পেছনে শ্রাবন।পাখি শ্রাবন দুজনেই মমতাজ কে দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। পাখি মমতাজ কে দেখে মৃদু হেসে বললো, শ্বাশুড়ি মা আমি আপনার বউমা।ভূত না। মমতাজের হাত থেকে জগটা পরে যায়। মমতাজ কাপতে কাপতে বললো,আমার ছেলেকে ছেড়ে দাও।আমাকেও ছেড়ে দেও। আজকের পর আর তোমাকে

কটূ কথা শোনাবো না। তোমার সাথে ভূত আছে আগে জানতাম না। মমতাজ দেখলো পাখির জামায় লাল রঙ তা থেকে আরো ভয় পেয়ে আমতা আমতা করে বললো,তু তু তুমি কাকে মেরে এসেছো।তোমার জামায় র,ক্ত কেন। শ্রাবন সামনে এসে মৃদু হেসে বললো মা তুমি উলটো পাল্টা কি বলছো ও পাখি। মমতাজ শ্রাবন কে চুপ করতে

বললো। তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সবাই। জাহাঙ্গীর,জয়া,অর্পা,এলিজা অপূর্ব। সবাই হাই তুলতে তুলতে বেড়িয়ে আসে।সবাই পাখি আর শ্রাবনের অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। এলিজা পাখির কাছে এসে আতং'ক স্বরে বলল, কি হয়েছে তোর? তোর গায়ে র,ক্ত কেন? পাখি হেসে বললো, আপু এটা র,ক্ত নয়।

পেইন্টিং রং। জাহাঙ্গীর কর্কট মেজাজে বললো,এত রাতে রং দিয়ে কি করছো?পাখি মাথা নিচু করে। অপূর্ব সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো,সবাই ঘুমাতে যাও। এখানে কিছু হয়নি।আর কাকি ও তোমার বউমা কোন ভূত না।যাও যাও। ঘুমাতে যাও।সবাই চলে যায়। অপূর্ব এলিজা শ্রাবনের কাছে। অপূর্ব মুখে হাত দিয়ে বললো, এত রাতে তোরা

রঙ খেলছিস।আগে জানলে আমি আর আমার ম্যাডাম ও খেলতাম। শ্রাবন হাঁসি দিয়ে বলল,আরে ইয়ার লজ্জা দিচ্ছিস। পেইন্টিং আকছিলাম। এলিজা পাখিকে বললো,ঘরে গিয়ে জামা পরিবর্তন করে শুইয়ে পর। এলিজা অপূর্ব ঘরে চলে যায়।পাখি আলমারি থেকে থ্রিপিস বের করে। শ্রাবন বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে বের হয়। পাখি বাথরুমে যেতেই

শ্রাবন পথ আটকে দেয়।পাখি ইতস্তত বোধ করে বললো,সড়ুন না। কাপড় পরিবর্তন করতে হবে। শ্রাবন মৃদু হেসে বললো, চলো আমিও যাই। আমারও কাপড় পরিবর্তন করতে হবে।পাখি চোখ সরিয়ে বললো, ছিঃ।

শ্রাবন পাখিকে জড়িয়ে ধরে বললো, আমার বউটা কত লজ্জাবতী।

পাখি বললো,এবার তো যেতে দিন। রাত অনেক হচ্ছে।

শ্রাবন পাখিকে ছেড়ে দেয়।পাখি বাথরুমের ভেতর যেতেই শ্রাবন উল্টো ঘুরে অহংকারী স্বরে বলল, পিচ্চি , তোমার দেহের প্রতি আমার কোন লোভ নেই।এটা সবসময় মাথায় রেখো।

সকাল হয়ে যায় —চারদিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন।দিন হলেও কুয়াশার জন্য

অন্ধকার হয়ে আছে।সূর্য মামার কোন হদিস নেই। এলিজা সকালে উঠেই রান্না ঘরে চলে যায়। মনোরা সবকিছু কেটে ধুয়ে গুছিয়ে দেয়। এলিজা সবার জন্য খাবার তৈরি করে।

চাঁদনী, ডালিয়া দুজনে ছাঁদে বসে চৌধুরী বাড়ি় নিয়ে কথা বলছে। দক্ষিনা হাওয়া বইছে। শীতল পরিবেশ। চাঁদনী ডালিয়া দুজনে

চাদর পরা। ডালিয়া হঠাৎ করে চাঁদনী কে প্রশ্ন করলো, একটা কথা বলবো।

চাঁদনী হ্যা সুচক মাথা নাড়ে।ডালিয়া শান্ত স্বরে বলল,তোর আর অপূর্ব ভাইয়ের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল না।

চাঁদনী কথাটাই শুনেই উল্টো দিকে ঘুরে ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, প্রিয় মানুষ টা অন্যর হয়ে যাওয়া এবং তাকে অন্যর সাথে সুখি

দেখাটার মধ্যে ও এক ধরনের তৃপ্তি পাওয়া যায়।ডালিয়া চাঁদনীর দিকে কিছুটা এগিয়ে ভেজা কণ্ঠে বললো, তুই এখনো অপূর্ব কে ভালোবাসিস আমি জানি।তাই তো তুই তোর বাবার পছন্দের ছেলেকে বার বার প্রত্যাখান করিস।

চাঁদনী প্রসঙ্গ পাল্টে নেয়। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় অপূর্ব সূর্য।ডালিয়া সূর্য কে দেখেই ভ্রু কুঁচকে দেয়।

সূর্য ব্যায়াম শুরু করে। অপূর্ব চাঁদনী ও ডালিয়ার কাছে আসে। চাঁদনী কে হানতান বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে অপূর্ব। চাঁদনী উপেক্ষা করে বললো,তোরা কথা বল আমি আসছি।ডালিয়া দেখতে অনেক টা সুন্দর। চুলগুলো কিছুটা কোকরানো। অপূর্ব ডালিয়ার সাথে এটা ওটা অনেক কথা বলে।ডালিয়া কথা বলতে বলতে বার বার সূর্যর দিকে

দেখলো। অপূর্ব খেয়াল করে। অপূর্ব মনে মনে ভাবলো সূর্য কোনদিন কাউকে আর ভালোবাসবে না। সেটা আমি জানি।কিন্তু একবার চেষ্টা করে দেখি। অপূর্ব ডালিয়াকে উদ্দেশ্যে করে বললো, সূর্য কে ভালো লাগে? ডালিয়া চমকে উঠে। হতভম্ব হয়ে যায়।কি বলছে সে।ডালিয়া রেলিং ধরে সামনে ফিরে না সূচক মাথা নাড়ে। অপূর্ব মৃদু হেসে

বললো,আমাকে বলতে পারো।আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো। ডালিয়া অপূর্বর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো, সূর্য খুব মায়াবি যে কেউ তার মায়ায় পরবে। অপূর্ব ফিস ফিস করে বললো,খুব সহজে সূর্য কে পটানো যাবে না। এরজন্য কৌশল দরকার ।ডালিয়া ভ্রু কুঁচকে বললো, যেমন ?যেমন, সূর্যর সাথে তুমি এটা ওটা বিভিন্ন কথা বলবে।

ওর ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করবে। তোমাকে খুব চঞ্চল হতে হবে। সূর্য চঞ্চল মেয়ে পছন্দ করে।ডালিয়া হ্যা সুচক মাথা নাড়ে।ডালিয়া নিচে চলে যায়। অপূর্বর হঠাৎ করে চিন্তা গ্রা,স করে।কে কয়েনটা চুরি করলো, আর এটা তো আমি ছাড়া আর কেউ জানতো না যে,এটা গ্লাসকোফ ফরেন্সিক ল্যাবে রেখেছি।তবে কিভাবে গায়েব হলো। ভাবনা ছেড়ে

অপূর্ব সূর্য কে নিয়ে নিচে খেতে নামে। তৎক্ষণাৎ ল্যান্ডলাইনে ফোনের আওয়াজ। অপূর্ব দ্রুত পায়ে ফোনটা রিসিভ করে।ওপাশ থেকে ডাঃ জাকির বললো,আমরা সিসিটিভি ফুটেজ টা গতকাল দেখতে তো ভুলেই গিয়েছি ।আমরা জানতে পেরেছি এটা কে চু,রি করেছে। অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো,কে দ্রুত বলুন।ডাঃ জাকির

বললো, মেয়েটার নাম রিয়া। এবং মেয়েটা মেডিকেল এ্যাপ্রন পরে গতকাল তোমার নাম করেই ল্যাবে আসে।আর ঐ মেয়েটাই কয়েনটি চু,রি করে।

অপূর্ব থমকে যায়।এই রিয়া সেই ছদ্ম,বেশী যে পিজি হাসপাতালে ও আমাকে বোকা বানিয়েছে। কে এই মেয়েটা কি চায়? আর এদের আস্তানাই বা কোথায়?এলিজা

টেবিলে সবার জন্য খাবার বাড়ছে। মনোরা এলিজা-কে সাহায্য করছে। জয়ার শরীর ভালো না।কমড়ের বেথা টা বেরেছে। এলিজা জয়ার জন্য আলাদা করে খাবার রেখে দেয়।। তৎক্ষণাৎ পাখি উপস্থিত হয়। পাখি বলল, আমিও কাজ করবো আমাকেও কিছু কাজ দাও। এলিজা মৃদু হেসে বললো,আমি থাকতে তোর কিছু করতে হবে না।তুই সবাইকে

ডেকে নিয়ে আয়। অপূর্ব দ্রুত পায়ে রান্না ঘরে এসে এলিজার কপালে চুমু খেয়ে বললো,ম্যাডাম আমাকে যেতে হবে।ল্যাব থেকে আমাকে ফোন করেছে। এলিজা আপত্তি স্বরে বলল,যেতেই হবে।বাড়িতে এত মেহমান।মা অসুস্থ।আজকে আমার মামা মামি চলে যাবে। আপনার সবার সাথে থাকাটা জরুরি। অপূর্ব এলিজার কথায় ভাবতে শুরু

করলো,এলিজা তো ঠিক ই বলেছে। যেয়েও বা কি হবে।কয়েন টা তো আর ফিরে পাবো না। এরজন্য অন্য কোন রাস্তা বের করতে হবে। অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, ঠিকি বলেছো। আজকে সবার সাথে আড্ডা দেয়া যাক।এলিজা হাতে খাবার নিয়ে জয়ার ঘরে উপস্থিত হয়।জয়া উল্টো ঘুরে শুয়ে আছে। জাহাঙ্গীর বারান্দায়, চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে।

হাতে সিগার। গহিন ভাবনায় মশগুল সে। এলিজা নরম কণ্ঠে জয়াকে ডাকে।জয়া ঘুরে সোয়।ক্লান্ত শরীর। এলিজা মৃদু হেসে বললো, আম্মা খাবার এনেছি।উঠে খেয়েনিন। তারপর আমি গরম সেঁক দিয়ে দেবো আপনার কমড়ে। দেখবেন ভালো লাগবে।জয়া উঠে বসে।চোখে চশমা পরে।এলিজা খাবার টা সামনে দেয়।জয়া মৃদু হেসে বললো,মা তোর

মত ছেলের বউ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।যে সবার কথা চিন্তা করে। এলিজা মৃদু হাসে।বললো,আপনি খেয়েনিন।আমি নিচে যাই।এলিজা যেতেই জাহাঙ্গীর এর দিকে নজর পরে। জাহাঙ্গীর আর চোখে এলিজার দিকে তাকিয়ে ছিলো।এলিজার চোখ পরতেই ,চোখ সরিয়ে ফেলে।এলিজা উপেক্ষা করে চলে যায়।দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়।সবাই ছাঁদে বসে দিনের

শেষ রোদ পোহাচ্ছে।ডালিয়া, চাঁদনী,অর্পা, মমতাজ।আড্ডার আশর বসিয়েছে। তৎক্ষণাৎ পাখি তাদের মধ্যে থেকে উঠে চলে আসে। সবাইকে খুব অচেনা মনে হচ্ছে। তাদের সাথে সময় কাটাতে পাখির একদম ভালো লাগছে না।পাখি এলিজার ঘরে চলে আসে।এলিজা তার শ্বাশুড়ি কে গরম সেঁক দিয়ে ঘরে এসে বিশ্রাম করছে।পাখি

এলিজার ঘরে আসে।আপু বলে ডাকতেই এলিজা পেছন ঘুরে। মৃদু হেসে বললো হঠাৎ আমার ঘরে ,আয় বোস।পাখি খাটের উপর বসে। এলিজা মৃদু হেসে বললো, ছাঁদ থেকে চলে এলি যে?

আমার ভালো লাগছে না। তোমার জায়গা অন্য কাউকে দিয়ে পূর্ন হয়না। এলিজা বললো,শশুর বাড়ী তে প্রথম প্রথম এমন ই হয়।

আমার ও হয়েছিল। কিন্তু তুই তো এই বাড়িতে প্রথম না তো আরো এসেছিস!যদিও বিয়ের আঁচ টা এমনই ধিরে ধিরে ঠিক হয়ে যাবে। পাখি মৃদু হাসে।

এলিজা পাখিকে নিজের কোলে সুইয়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললো, শ্বশুর বাড়ীর কেউ আপন হয়না।আপন করে নিতে হয়।সবার মন জয় করে চলতে হয়।সবার

মানসিকতা এক নয়।যে যেমন,তার সাথে সেভাবে ই মানিয়ে নিতে হয়। আর তোর শাশুড়ি,ছোট কাকি,সে একটু খিটখিটে কিন্তু তার মন টা ভালো। তার যা পছন্দ সেগুলো করবি।যেমন,সে সাজতে পছন্দ করে মাঝে মধ্যে তার রুপের প্রসংশা করবি।

পাখি ভেজা কন্ঠে বললো, আপু তুমি কতকিছু জানো।

এলিজা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছু জানতে হয়।তবে কখনো কখনো কিছু জিনিস অজানা থাকলেই হয়তো ভালো হতো।

পাখি অনুভব করলো ওর গালে কিছু পরেছে।হাত দিয়ে দেখে পানি। বুঝতে পেরেছে এলিজার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পরছে।পাখি প্রশ্ন করলো,আপু কাঁদছো কেন?

এলিজা হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখের পানি মুছে বললো, খুশির কান্না এটা। আমার ছোট্ট পাখি আজ কত বড় হয়েছে।বিয়ে হয়েছে।আর তার থেকেও বড় কথা আমার জ্বা হয়েছে।

অপূর্ব ফ্যাক্টরিতে। জাহাঙ্গীর যেতে বলেছে।এখনো ফিরেনি। এলিজা সন্ধ্যায় কিছু নাস্তা তৈরি করে মেহমানদের দিয়েছে।সবাই জয়ার

ঘরে। এলিজা বৈঠকখানায় বসে আছে । হঠাৎ ই মনে পরে বায়েজিদ এর কথা। আশেপাশে কেউ নেই এখন একবার বায়েজিদ ঘরে যাওয়া যাক।

এলিজা বাহিরে বের হয়। আশেপাশে পরোখ করে। ধিরে ধিরে বায়েজিদ এর ঘরে যায়। হঠাৎ করে এলিজাকে দেখে বাড়ির দারোয়ান,মকবুল হোসেন চমকে

উঠে।মকবুল বললো, মা তুমি এইহানে? এলিজা আমতা আমতা করে বলল,চাচা এমনি এসেছি।ছুটি কেমন কাটিয়েছেন?

মকবুল বললো,হ মা ভালো ই। তোমার চাচীর শরীর টা ভালো না। এলিজা এদিক ওদিক পরোখ করে। বায়েজিদ কে দেখতে পাচ্ছে না। এলিজা মৃদু হেসে বললো,চাচা বায়েজিদ কোথায়?

চাচা অবাক হয়ে বললো, বায়েজিদ তো গত পরশুদিন,বিকেলে গ্রামে যায়। আবার গতকাল বিকেলে ফিরা আইছে।এখন আবার কই গেছে জানি না।এলিজার খটকা লাগলো। এলিজা স্থান ত্যাগ করে।ঘরে এসে বৈঠকখানায় বসে ভাবছে।যদি গত পরশুদিন বিকেলে বায়েজিদ গ্রামে ফিরে থাকে তবে,রাতে কাঠ কে কাটছিল আর আমি খাবার কাকে

দিয়েছিলাম।সে কে ছিলো।এসব ভাবতে ভাবতেই দরজায় কেউ করা নাড়ে। এলিজা দ্রুত খুলে দেয়। অপূর্ব আর সূর্য এসেছে।

ম্যাডাম , আপনি একা একা এখানে? আপনার জন্য ই অপেক্ষা করছিলাম।

অপূর্ব এলিজাকে নিয়ে উপরে যায়। সূর্য বৈঠকখানায় বসলো

। অপূর্ব সূর্য কে বললো, তুই বোস আমি আসছি।
সূর্য এদিক সেদিক পরোক্ষ করছে। অপূর্ব দোতলায় থেকে বললো, সূর্য উপরে চলে আয়। সূর্য দ্রুত পায়ে উপরে উঠতেই, ধাক্কা লাগে ডালিয়ার সাথে।ডালিয়া পা পিচলে পরতেই সূর্য হাতটা ধরে ফেলে।ডালিয়া অপলক দৃষ্টিতে সূর্য কে দেখে। সূর্য ডালিয়াকে দাড় করিয়ে বললো,

চোখে দেখে হাঁটতে পারো না। ডালিয়া ভ্রু কুঁচকে বললো, ধাক্কা আপনি দিলেন আর দোষ আমাকে দিচ্ছেন। সূর্য কর্কট মেজাজে বললো, যেই না চেহারা নাম রাখছে পেয়ারা,এই রুপের ঝলকে নাকি আমি আবার ধাক্কা দিবো।কত শখ। বলেই উপরে চলে যায়। রেলিং এর আড়ালে থাকা অপূর্ব বেড়িয়ে ডালিয়ার কাছে আসে। অপূর্ব

বললো, কেমন লাগলো?ডালিয়া ভ্রু কুঁচকে বললো,খুব সহজে সূর্য কে বাগে আনা যাবে না।

বলেই দুজন খিল খিল করে হেঁসে উঠে।

অপূর্ব সূর্য কে নিজের কাছে রাখার মনস্থির করলো। সূর্যর সারাদিন কোন কাজ নেই। সূর্যর বাবা একজন রিটায়ার্ড সেনাবাহিনী । একমাত্র ছেলে, কিছু করার প্রয়োজন

পরে না। সূর্য পরাশুনা টাও শেষ করতে পারেনি। রঞ্জনার জন্য। রঞ্জনা চলে যাওয়ার পর সূর্য সব দিক থেকেই নিজেকে গুটিয়ে নেয়। সূর্য ছাদের এক কোনেতে বসে আছে। আকাশের তারা গুনছে। অপূর্ব এসে পাশে দাঁড়ায়। ভাবতে থাকে নতুন করে জীবন সাজানোর কথা বলবো নাকি। অপূর্ব সেসব

প্রসঙ্গ না তুলে কেসে নিয়ে কথা তুলে।

এলিজা রান্না ঘরে তৎক্ষণাৎ ল্যান্ডলাইনে ফোন বেজে ওঠে।কার না কার ফোন, তুলবে কিনা ভাবতেই ফোনটা কেটে যায়। দ্বিতীয় বার ফোন বাজে , এলিজা ফোনটা তুলে হ্যালো বলার আগেই ওপাশ থেকে কাপা কণ্ঠে কেউ বললো, অপূর্ব দ্রুত ল্যাবে আসো দ্রুত। তোমার সাথে

আমার জরুরী কথা আছে।আমি জেনে গেছি সেই কয়েন চু,রি করা ছদ্মবেশী কে। ফোনটা কেটে যায়। এলিজা পেছন ঘুরতেই দেখে জয়া দাড়িয়ে।

জয়া জিজ্ঞেস করল,কে ফোন করেছে।এলিজা বললো, আম্মা কেউ আপনার ছেলেকে ল্যাবে ঠেকেছে। আমি তাকে গিয়ে বলে আসবো?

জয়া বললো, না বলিস না।এই পুলিশের চাকরি আমার একদম ভালো লাগে না। সারাদিন ছেলেটা চিন্তায় থাকে।বলিস না তুই।তুই আমার কমড়ে সেক দিয়ে দে। এলিজা তাই করলো।

গ্লাসকোফ ফরেন্সিক ল্যাব–ডাঃ জাকির একা আজ ল্যাবে।রাত অনেক। প্রাই ১১ টা। খুব অস্থির জাকির।ঘাম ঝরছে অঝরে। কোন

অচেনা ভয় তাকে গ্রা,স করে রেখেছে। হঠাৎ করেই ল্যাবের বিদ্যুৎ চলে যায়।জাকির হতভম্ব হয়ে যায়। এটা কি করে সম্ভব।ল্যাবের বিদ্যুৎ তো কখনো যায় না। জেনারেটর আছে। বিদ্যুৎ চলে গেলেও, সাথে সাথে জেনারেটর চালু হয়।আজ হয়নি। জাকির ভয়ে চাপসে যাচ্ছে। ল্যাবে ১১ টার পর কেউ থাকে না। কিন্তু উনি আজ অপূর্বর জন্য

অপেক্ষা করছে।জাকির একটা টর্চ ওন করে। চারদিক নিস্তব্দ।জাকির এর বুকের ধুকবুকানি হঠাৎ বেড়ে যায়। এদিক সেদিক পরোক্ষ করে। জাকির অনুভব করছে তার আশেপাশে কেউ আছে।কারো উপস্থিতি সে বুঝতে পারছে।জাকির এদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে দেখে। জাকির এর বয়স ৪০। শরীরে জোড় শক্তি ভালো কিন্তু আজ হঠাৎ

নিস্তেজ।জাকির বাহিরে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে এগোয়।ধিরে ধিরে এগোতে থাকে। এর ভিতরেই কেউ দরজায় কড়া নারে।জাকির চমকে উঠে।কে আসলো এত রাতে,জাকির ভাবলো হয়তো, অপূর্ব এসেছে। জাকির দরজা খোলার আগে ,দরজার সেইফটি গ্লাস থেকে বাহিরে পরোখ করতে দেখে কেউ একজন জোকারের মুখোশ পরে

দাড়িয়ে আছে।জাকির ছিটকে পেছনে পরে যায়।কে এই মুখোশধারী? জাকির ভয়ে একাকার। সূর্য অপূর্ব বেশ কিছুক্ষণ ছাঁদে গল্প গুজব করে। চারদিক নিস্তব্দ। শীতল হাওয়া বইছে। চাঁদনী রাত। চারদিক জোসনায় আলোতে আলোকিত হয়ে আছে। অপূর্ব হঠাৎ করে বলে উঠলো, আমার বিশ্বাস করতে অনেক টা কষ্ট হচ্ছে।যে,রায়হান

একজন ধ’র্ষক। ছোটবেলা থেকেই একসাথে বড় হওয়া। রায়হান কে কখনো ওরকম মনেই হয়নি। আমার কোথাও একটা গড়মিল মনে হচ্ছে। সূর্য ভারি একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেলে। অপূর্ব সূর্যর দিকে পরোখ করে। সূর্য কিছু বলতে চাচ্ছে হয়তো, কিন্তু পারছে না। সবসময় কোন না কোন ভাবনায় মশগুল থাকে। অপূর্ব গলায় কাশি দিয়ে বললো, চুপ আছিস যে!

সূর্য বলল,অতীত কে নিয়ে কিছু বলতে চাইনা।যা হবার হয়েছে। নিয়তি হয়তো এটাই চেয়েছিল । রঞ্জনার জন্য আজ ও বুকের ভেতর টা পুড়ে।ওর হাঁসি,কান্না,ওর বলা প্রতিটা শব্দ গুলো কানের কাছে ভাসে।কি করে ভুলে যাবো রঞ্জনা কে।

অপূর্ব চুপ হয়ে যায়।কি বলবে বুঝতে পারছে না। সূর্য কে শান্ত না

দেয়ার মত কোন শব্দ পাচ্ছে না। অপূর্ব সূর্য কে নিয়ে নিচে আসে। অনেকক্ষন ছাঁদে ছিল। একবার অর্পা ডেকে গেছে। কিন্তু অপূর্ব যায়নি। অপূর্ব নিচে আসলে মনোরা খেতে দেয়। অপূর্ব আর সূর্য কে। এলিজা জয়ার ঘরে।জয়ার কোমড়ে সেক দিচ্ছে। এলিজা জয়া বিভিন্ন কথায় মশগুল। এলিজা জয়াকে একটু পর পর জিজ্ঞেস করছে, আম্মা আগে

আপনি কেমন ছিলেন?দেখতে কেমন ছিলেন? স্বভাব কেমন ছিলো? বাবার সাথে পরিচয় কিভাবে? জয়া হেঁসে হেসে উত্তর দেয়।জয়া মৃদু হেসে কথা বলছে।এলিজা অপলকে দেখছে।এলিজা জয়ার দিকে মায়ার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।জয়া খেয়াল করলো, এলিজা-একমনে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে।জয়া এলিজার দিকে ঘুরলো।জয়া আদুরে গলায়

বলল,কি হয়েছে মা কি ভাবছিস? এলিজা জ্বল জ্বল চোখে বললো,কই কিছু নাহতো।বলনা কি ভাবছিস ? আমিতো তোর মায়ের মত? এলিজা ভেজা কণ্ঠে বললো, আম্মা আপনাকে দেখতে কিছুটা আমার মায়ের মত। আপনাকে দেখলেই মায়ের কথা খুব মনে পরে।জয়া হাত থেকে পানের কৌটাটা রেখে দেয়। এলিজা কে কাছে টেনে বললো,আমি তোর মা।

হয়তো আমি তোটে পেটে ধরেনি। কিন্তু তোকে আমি আমার ছেলের বউ নয়, আমার মেয়ের মতই দেখি। এলিজা মৃদু হেসে জয়াকে জড়িয়ে ধরে,হুহু করে কান্না শুরু করে।জয়া বিষিন্নত হয়।হয়তো এলিজার ওর মায়ের কথা মনে পরছে।এলিজা জড়িয়ে ধরে বললো, আম্মা আপনার শরীর থেকে আমি আমার মায়ের গন্ধ পাই। আপনার কাছে আসলে

খুব শান্তি পাই।জয়া এলিজার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো,পাগলী মেয়ে আমি তোর মা ই তো।কখনো বলবি না যে তোর মা নেই।জয়া তার শাড়ির আঁচল দিয়ে এলিজার চোখের পানি মুছে দেয়। তৎক্ষণাৎ ঘরে উপস্থিত হয় জাহাঙ্গীর।চোখে মুখে হতাশার ছাপ।ঘরে এসেই হাত থেকে কিছু কাগজপত্র টেবিলে রেখে হাত মুখ ধুতে যায়। এলিজা জয়াকে

ঘুমাতে বলে স্থান ত্যাগ করে। জাহাঙ্গীর ঘরে আসে। তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মুছে।জয়া কাপা কণ্ঠে বললো,কি হয়েছে ? কোথায় ছিলেন?

জাহাঙ্গীর কর্কট মেজাজে বললো,কাজ ছিল ফ্যাক্টরিতে।তাই আসতে দেরি হয়ে গেলো।

এলিজা ঘরে আসে। অপূর্ব সূর্য কে অতিথি ঘরে ঘুমাতে বলে চলে

আসে।অপূর্বর কিছুদিন ধরে হালকা হালকা জ্বর হয়।সাথে সর্দি। এলিজা অপূর্বর জন্য,হলুদ দেয়া গরম দুধ আনে। অপূর্ব খেয়ে নেয়। হলুদ দেয়া দুধ খেয়ে অপূর্ব কিছুক্ষণ এর মধ্যে ই ঘুমিয়ে যায়। এলিজা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পেছন ঘুরে দেখে তার মহারাজা ঘুমিয়ে পরে। এলিজা অপূর্ব কে পরোখ করে মৃদু হাসে। হঠাৎ এলিজার মনে পরে

বায়েজিদ এর কথা। অপূর্বর সাথে বায়েজিদ কে নিয়ে কথা বলবে, কিন্তু তার আগেই অপূর্ব ঘুমিয়ে পরে।

এলিজা চিন্তায় পরে যায় সেদিন কে ছিল বায়েজিদ এর ছদ্ম,বেশে।নাকি বায়েজিদ ই ছিল।যদি বায়েজিদ না হতো।অন্য কেউ হলে তার কন্ঠ ও ভিন্ন হতো। তাছাড়া বায়েজিদ তো

দেখেও ছিলাম। এলিজা এসব ভাবতে ভাবতে সুয়ে পরে।

ফরেন্সিক ল্যাব।——জাকির দরজা খুললো না।কে এই ছদ্ম,বেশী এখানে কি চায়।জাকির ঘেমে একাকার। শীতের দিন অথচ সে ঘেমে যাচ্ছে। জাকির ডকডক করে পানি খেয়ে নেয়।টর্চ নিয়ে এক কোনে ঘাপটি মেরে বসে আছে। কিছুক্ষণ পরে বিদ্যুৎ চলে আসে। জাকির আলো

দেখে একটু সাহস পায়।জাকির এক কদম দু কদম সামনে এগোতে থাকে। দরজার সেইফটি গ্লাস দিয়ে দেখলো,লোকটি নেই।ভালো করে পরোখ করলো যতদূ্র পর্যন্ত চোখ যায়। জাকির মনে মনে ভাবলো,হয়তো চলে গেছে।জাকির দ্বিতীয় বার দরজার দিকে দেখতেই , চট করে জোকার এর মুখোশ পরা লোকটি চট করে দরজার সামনে

চলে আসে।জাকির ভয়ে হতভম্ব হয়ে যায়। হঠাৎ করে কিছু বাতির আলো নিভে যায়।জাকির বার বার ঢেক গিলতে থাকে।জাকির বা” দিকে গ্লাসের দিকে দেখলো , কারো ছায়া।জাকির থমকে যায়।কার ছায়া,কে আছে আমি ছাড়া এখানে! জাকির কাঁপা কণ্ঠে প্রশ্ন করলো,কে ওখানে। কোন উত্তর নেই। দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলো কে ওখানে?

কোন জবাব নেই। জাকির হেটে হেটে ছায়াটার কাছে যায়।হাতে একটা সিজা,র নিয়ে।কাছ থেকে টর্চটা মারলে দেখতে পায় কেউ নেই।ডাঃ জাকির ভয়ে , আতংক বিষিন্নত হয়ে পরে। জাকির কর্কট স্বরে বললো, আরে কে আছো সাহস থাকে তো বেড়িয়ে আসো। চারদিক নিশ্চুপ কারো কোন সাড়া শব্দ নেই। জাকির আশপাশ দেখে।কোথাও

কেউ নেই।জাকির এদিক ওদিক পায়চারি করতে থাকে। ল্যান্ডলাইনে থেকে পুলিশ কে ফোন করবে মনস্থির করলো,ফোন টা কানের কাছে নিতেই,,জাকির এর পেছন থেকে কেউ একজন বিৎকট কন্ঠে বলে উঠলো, পুলিশ কে ফোন দেয়ার দরকার কি,আমরা আছিতো!জাকির থম মেরে যায়। চোখ গুলো বড় বড় হয়ে যায়।ফোনটা হাত থেকে পরে

যায়।জাকিরের কপাল থেকে অঝরে ঘাম ঝরতে থাকে।মনে হচ্ছে চারদিকে কালো ছায়া নেমে এসেছে। জাকির ধিরে ধিরে পেছন ফেরে। ঢেক গিলতে থাকে।পেছন ঘুরেই দেখে কেউ একজন জোকারের মুখো,শ পরা।জাকির এর বুকের ভেতর ধুকবুকানি পরিস্কার শোনা যাচ্ছে।জাকির কাপা কন্ঠে প্রশ্ন করলো, কে তুমি এখানে কি চাও?

মুখোশধারী বিৎকট কন্ঠে বললো,জানা টা কি খুব জরুরী? বলেই হাতে পিস্তল নিয়ে জাকির এর দিকে এগোতে থাকে।জাকির এক কদম দু কদম, পেছনে স্বরে দরজা টা খুলে দেয়। হঠাৎ দেখতে পায় নিচতলা থেকে আর একজন মুখোশধারী উপরে উঠছে।জাকির কি করবে বুঝতে না পেরে উপরে দৌড়াতে থাকে।সিড়ি বেয়ে দ্রুত

পায়ে উপরে উঠে। জাকির হাপাচ্ছে। কোথায় যাবে বুঝতে পারছে না । কিছুক্ষণ থম মেরে দাড়ায়। পেছনে মুখো,শধারী দুজন ধাওয়া করছে। জাকির ল্যাবের ছাঁদে চলে যায়।ছাদে এদিক সেদিক পরোক্ষ করতে যা দেখে , তাতে ডাঃ জাকির পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে যায়।একটা মেয়ে রেলিং এর উপর বসে বসে সিগা,রেট খাচ্ছে,এই মেয়েটি সেই

মেয়ে টা যে, কয়েন চু,রি করে। জাকির থমকে যায়।পূরো শরীর ভয়ে কাঁপছে।মেয়েটি উল্টো দিকে ঘুরেই বিংকট কন্ঠে বললো, পালাচ্ছিস কেন এখন? খুব সখ আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিবি। তাইনা!!বোকা তুই বোকা,কারন তুই আমাদের খেলায় পা দিয়ে ফেলেছিস।আর যে এই খেলায়

একবার ভুল করে পা দিয়ে ফেলেনা সে,আর বেঁচে ফিরতে পারে না।

জাকির কাঁপা গলায় বললো, আমার ভুল হয়ে গেছে ছেড়ে দাও আমায়। আমি কাউকে কিছু বলবো না।

মেয়েটি মুখোশধারী ছেলে দুটোর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে, তোরা কি বলিস ছেড়ে দেবো?

প্রশ্ন ই ওঠেনা।কারন পথের কাটা রাখতে নেই।

মেয়েটা সিগারেট ফেলে,নিচে চলে যেতে যেতে বললো,কাজ শেষ করে চল আস!

জাকির ছেলে দুটোকে দ্বিতীয় বার অনুরোধ করলে, একজন মুখোশধারী গু,লি করে জাকির এর বুকে।জাকির লুটিয়ে পরে।জাকির কয়েকবার খিচুনি দেয়।ছেলে দুটোর হাতের দিকে খেয়াল করে।খুব পরিচিত মনে হচ্ছে।জাকির এর নিঃশ্বাস বেড়িয়ে

যাচ্ছে।জাকির কিছু একটা র,ক্ত দিয়ে ফ্লোরে লিখে। ধিরে ধিরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

সকাল ৮ টা নাগাদ —সবাই ঘুম থেকে উঠে যায়। এলিজা ঘুম থেকে উঠে অপূর্বর কপালে হাত দিয়ে তাপমাত্রা দেখে। এরপর জয়ার ঘরে চলে যায়।তার শরীরের অবস্থা এখন কেমন সেটা জানতে। শ্রাবন তৎক্ষণাৎ অপূর্বর ঘরে উপস্থিত হয়।

শ্রাবন অস্থিরতা ভাব নিয়ে অপূর্ব কে ঘুম থেকে জাগায়। অপূর্ব চোখ ডলতে ডলতে প্রশ্ন করলো কি হয়েছে,? শ্রাবন কাপা কন্ঠে বললো,কেউ ডাঃ জাকির কে খু,ন করেছে।আর তার ল্যাপটপ সহ,পেইনড্রাইপ সবকিছু গায়েব। অপূর্ব চট করে উঠে বসে। অপূর্বর চোখ গুলো ছানা,বরা হয়ে ওঠে। আতং,ক স্বরে বলল,কি বলছিস

এসব কখন হলো? শ্রাবন বললো, গতকাল রাত ১১:৩০ এর দিকে। অবাক করা বিষয় হচ্ছে উনি ওনার র,ক্ত দিয়ে লিখে গেছেন,

অপূর্ব চোখ বড় করে বললো,কি লিখেছে।

The Gold...অপূর্ব দ্রুত ঘুম থেকে উঠে।হাত মুখ কোনভাবে ধুয়ে ল্যাবে চলে যায়। অনেক পুলিশ জড়ো হয়েছে।লা,শ এখনো ছাঁদে।জাকির

এর মেয়ে ল্যাবের সামনে বসে অঝরে কাঁদছে। পুলিশ বাহিরের কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না। শ্রাবন অপূর্ব তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়। চারপাশে অনেক মানুষ।সবাই আতংকি,ত।ল্যাবে ঢুকে কাউকে হ,ত্যা করেছে এটা কোন সাধারণ বিষয় নয়। অপূর্ব শ্রাবন উপরে যায়। চারপাশে পুলিশ।অন্যান্য ফরেন্সিক ডাঃ রা জাকির কে দেখছে।কোন

এবিডেন্স যদি অপরাধীরা রেখে যায়। দূরেই পরে আছে জাকির এর মৃ,ত দেহ।কতই না কষ্ট পেয়েছে। বাচার জন্য কত না চেষ্টা করেছে। হায়,না গুলো একেও বাঁচতে দেয়নি। এসব ভাবতে ভাবতে শ্রাবন পাশ থেকে বললো, ভাই, আমার মনে হয় এটা সম্পুর্ন পরিকল্পনা করে করা হয়।, সে জেনে গিয়েছিল,কে কয়েনটা চু,রি করে।আর এরপর

সমস্ত এবিডিয়েন্স চু,রি করে ,সাথে তাকেও শেষ করে দেয়।এসব খুব ভেবে চিন্তে করা হয়।অপূর্ব চিন্তা, ভঙ্গিতে ভ্রু কুঁচকে বললো, সিসিটিভি ক্যামেরা গতকাল বন্ধ ছিল। তারমানে এগুলো আগে থেকেই কেউ পরিকল্পনা করে রেখেছিল। অপূর্ব ধিরে ধিরে জাকির এর লা,শটির কাছে এগোয়।তার ডান হাতের কাছে ছোট করে লেখা দ্যা

গোল্ড”অপূর্ব বিষিন্নত হয়।এটার মানে কি হতে পারে।এর দ্বারা কি বুঝবো।এসব ভাবতেই তৎক্ষণাৎ কিছু কনস্টেবল এসে লা,শ নিয়ে যায়। অপূর্ব হতাশায় পরে যায়। শ্রাবন খেয়াল করলো অপূর্বর চোখ মুখে চিন্তার ছাপ। শ্রাবন বলল, ভাই তুই বাড়ি ফিরে যা।আমি এদিক টা সামলে নিচ্ছি। অপূর্ব শ্রাবন এর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে।ল্যাবের নিচে

চলে আসে। অপূর্ব বললো,থানাতে কিছু কাজ আছে,পরে ফিরবো বাড়ি। এলিজা জয়ার জন্য গরম পানি করছে।কমড়ে সেক দিবে।জয়ার শরীর টা ধিরে ধিরে খারাপ হচ্ছে। বুকে ব্যাথা করে। ঔষধ খেয়েও কাজ হয়না।এলিজা গরম পানি নিয়ে উপরে যেতেই বাহির থেকে কাঠ কাটার আওয়াজ আসে।এলিজা দাড়িয়ে যায়।বাহিরের দিকে পরোক্ষ

করলেই দেখতে পায় বায়েজিদ কে। এলিজা ভ্রু কুঁচকে দেয়। মনস্থির করলো বায়েজিদ এর সাথে এখনি কথা বলবে। গরম পানি টা টেবিলের উপর রেখে বাহিরে বের হয়। আশেপাশে জাহাঙ্গীর কে পরোখ করে।সে কোথাও আছে কিনা।বাড়ির কাজের লোকদের সাথে কথা বলা জাহাঙ্গীর পছন্দ করে না।এলিজা বায়েজিদ এর দিকে এগোয়,

বায়েজিদ বসে বসে লাকরী কাটছে। এলিজা পেছনে দাঁড়িয়ে। বায়েজিদ এলিজার পদর্পন বুঝতে পারে। এলিজা বলল, বায়েজিদ। বায়েজিদ কাঠ কাটা রেখে, ধিরে ধিরে পেছন ঘুরে।এলিজার দিকে তাকিয়ে অমৃদু হাঁসি দেয়।বললো,আপা তুমি এখানে?এলিজা মৃদু হেসে বললো,তোর কিছু দরকার কিনা জানতে এসেছি। বায়েজিদ মৃদু

হাসে। এলিজা আগ্রহ ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো, তুই সেদিন রাতে ওরকম আচরণ করলি কেন? কিছু হয়েছিল? নির্ভয় বল। বায়েজিদ হঠাৎ মুখের রঙ বদলে ফেলে।এলিজা দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলো,বল কি হয়েছিল!

তৎকালীন সময় জাহাঙ্গীর পেছন থেকে গলায় কাশি দিয়ে,কর্কট মেজাজে বললো, এই সাত সকাল কাজের লোকের সাথে কি! তোমার

শ্বাশুড়ি ডাকছে। ভেতরে যাও। এলিজা জাহাঙ্গীর এর কথা মত চলে যায়।অপূর্ব বাড়ি ফিরে।কোন কিছুই তার ভালো লাগছে না। চারদিকে যা হচ্ছে।কোন পদক্ষেপ নিতে পারছে না। অপূর্ব বৈঠকখানায় কিছুক্ষণ বসে থাকে। কোনভাবেই ভাবনা থেকে বেরোতে পারছে না। অপূর্ব একা একা বিড়বিড় করে বললো,এলিজাকে দরকার,ওর

কণ্ঠস্বর পারবে আমার মস্তিষ্কের নিউরন কে সতেজ করে দিতে। হতাশা মুক্তির রাস্তা শুধু মাত্র আমার ম্যাডাম।অপূর্ব এলিজাকে এদিক সেদিক পরোক্ষ করে কোথাও দেখতে না পেয়ে ঘরে যায়। সেখানেও এলিজা নেই।কোথায় যাবে,পাখির ঘরে যায় সেখানেও নেই। তৎক্ষণাৎ ছাঁদে চলে যায়। এলিজা ছাঁদে। অপূর্ব অপলকে

দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।এলিজা উল্টো দিকে ঘুরে, ভেজা চুল ঝাপটাচ্ছে। এলিজার পরনে গোলাপি রঙের শাড়ি। অপূর্ব পেছন থেকে দেখছে। কমড় থেকে আঁচল টা কিছুটা নিচের দিকে রেখে দেয়া।দুপুর বেলার কড়া রোদ।কিছুটা শীতল হাওয়া বইছে। অপূর্ব এলিজার কাছে এগোয়। এলিজার কাছে গিয়ে কাছ থেকে এলিজার চুল মোছা দেখছে। এলিজা

চুল গুলো বা দিকে ঝাপটা দিতেই, অপূর্বর মুখে লাগে সমস্ত চুল। এলিজা পেছন ঘুরে। এলিজা সান্ত স্বরে বলল, আপনি এখানে? কখন এলেন?

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,সেই কখন। তোমার চুলের দর্পন দেখছিলাম। ভালোই লাগছিলো। শেষমেশ চুলের মার ও খেলাম। এলিজা সামনে ঘুরে মৃদু হাসে। অপূর্ব এলিজার পেছন

থেকে জড়িয়ে ধরে, এলিজা এই এই করে ওঠে।বললো, আপনি বাহির থেকে এসে গোসল না করেই আমায় জড়িয়ে ধরলেন।কত ধুলোবালি ।অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, আমার বউকে যখন খুশি জড়িয়ে ধরবো। আমার শরীরে বাহিরের ধুলোবালি তো কি হয়েছে।দরকার হলে দু'জনে আবার একসঙ্গে গোসল করবো।এলিজা অপূর্বর হাত সরিয়ে

দেয়। মৃদু হেসে বললো,ঘরে চলুন। কাজ আছে।মায়ের শরীর টা ভালো নেই। দুপুরে তার ঔষধ আছে দিতে হবে।এলিজা ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।অপূর্ব পেছন থেকে এলিজার চুলের দর্পন দেখে।এলিজা জয়ার ঘরে যায়। অপূর্ব গোসল করে সাদা পাঞ্জাবি,সাথে পাজামা পরে। ভেজা চুল। জোড় ভ্রু।ডান ভ্রুর উপরে কালো ছোট একটা তিল।আয়নার

সামনে দাঁড়িয়ে অপূর্ব নিজেকে দেখছে। এলিজা কে ডাকতে থাকে কোন সাড়া নেই। তৎক্ষণাৎ মনে পরে এলিজা জয়ার ঘরে। অপূর্ব ঘর থেকে বেড়িয়ে জয়ার ঘরের উদ্দ্যেশ্যে আসে। অপূর্ব জয়ার ঘরে আসে। জয়ার শরীর টা ভালো নেই। এলিজা হাত পা টিপে দিচ্ছে। অপূর্ব জয়ার গা ঘেঁষে বসে।জয়ার শরীরের অবস্থা কি অপূর্ব জিজ্ঞেস করে।জয়া আদুরে

গলায় উত্তর দেয়।অপূর্বর মাথায় হাত বুলিয়ে জয়া দোয়া করেন। অপূর্ব মৃদু হাসে। কিছুক্ষণ জয়ার সাথে কথা বলে।ফর্সা গায়ের রং, সাথে সাদা পাঞ্জাবি,জোড় ভ্রু , দেখতে অপূর্ব কে খুব মায়াবি লাগছে। এলিজা আর চোখে দেখছে। অপূর্ব জয়ার সাথে কথা শেষ করে স্থান ত্যাগ করে।জয়া উল্টো দিকে ঘুরে সোয়। এলিজা বললো,, আম্মা

চুল টা বেঁধে দেই। আপনি সুয়েই থাকুন। উঠতে হবে না। এলিজা জয়ার চুল টা আঁচড়াতে আঁচড়াতে চোখ পরে দরজায় দিকে অপূর্ব দরজার ওপাশ দাড়িয়ে আছে। অপূর্ব ইশারা করে ঘরে যাওয়ার জন্য। এলিজা অপূর্বর কান্ড দেখে মিটিমিটি হাসে। এলিজা না সূচক মাথা নাড়ে। জয়াকে রেখে যাবে না। অপূর্ব মুখ দিয়ে হিস হিস শব্দ করে আবার ও

ডাকে।এলিজা আর চোখে দেখে। তখন জয়া উল্টো দিকে ঘুরেই বললো, অপূর্ব ডাকছে তুই যা।আমি ঘুমাই কিছুক্ষণ।দেখ অপূর্বর কি দরকার। এলিজা হতভম্ব হয়ে যায়। আমতা আমতা করতে থাকে। এলিজা নিজের ঘরে চলে আসে। অপূর্ব এলিজাকে দেখে খাটের উপর কাদ হয়ে শুয়ে পরে। এলিজা ভ্রু কুঁচকে বললো, আপনি মায়ের ঘর

থেকে এভাবে ডাকলেন কে?মা কি মনে করলো! সবসময় আপনি আমাকে অন্যের সামনে লজ্জা দিতে পছন্দ করেন। অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,ম্যাডাম আপনাকে ছাড়া যে এক মুহুর্ত থাকতে পারি না। একাকিত্ব অনুভব হয়।কখনো আমাকে একা করে যেও না।সহ্য হবে না। সামান্য এইঘর থেকে তুমি ঐঘরে গেলেও আমার ততটুকু সময়

থাকতে কষ্ট হয়। এলিজা বললো,আপনাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা,আমি ভুলেও চিন্তা করি না। মৃত্যু ছাড়া আমি কোথাও যাচ্ছি না। অপুর্ব মৃদু হাসে।এলিজা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো,একটা কথা বলার ছিল!

অপূর্ব ভ্রু কুঁচকে বললো, কি কথা?

আমাকে এখান থেকে কিছুদিন এর জন্য চলে যেতে হবে।

কোথায়?

সেই শহরে।

মানে কি বলছো?

এলিজা হাত দিয়ে চুল গুলো খোঁপা করতে করতে বললো, এনজিওর জন্য কিছুদিন বাহিরে থাকতে হবে। বিক্রমপুর কিছু কিছু জায়গায় তারা , কিছু সদস্যদের নিয়ে মিটিং করবে। আমাকেও থাকতে হবে।অপূর্ব আপত্তি স্বরে বলল, তোমার চাকরী

টা করতেই হবে।আমি তোমার মামা মামির.... বলতেই এলিজা অপূর্বর কথা মাঝপথে থামিয়ে বললো, না। আমি থাকতে অন্য কারো সাহায্য কেন নেবো। মানুষ নানান কথা বলবে।

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, নানান মানুষ এর নানান, কথা, তাদের এই কথা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বন্ধ করতে পারবে না। এলিজা উপেক্ষা করে

বললো,দুদিন পর যাবো। আম্মার শরীর টা সুস্থ হোক। অপূর্ব কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, ম্যাডাম, গতকাল তুমি মায়ের কথা মত জাকির স্যার এর ফোনের কথাটা আমার কাছে বললে না।বললে হয়তো আমি তাকে বাঁচাতে পারতাম। এলিজা লেপ টা ভাঁজ করতে করতে বললো,আমি চেয়েছিলাম আম্মা বারন করে।

তৎক্ষণাৎ ঘরে উপস্থিত হয় মনোরা, বললো,ছোটদাদা বাবু,আপনাকে কেউ ফোন করেছি।সে লাইনেই আছে....অপূর্ব দ্রুত পায়ে হেঁটে নিচে নামে।ফোনটা তুললে,ওপাশ থেকে সূর্যর মা বললো, অপূর্ব তুমি আমার বাসাতে আসো। অপূর্ব জিজ্ঞেস করলো,কি হয়েছে? সূর্যর মা কাঁপা কণ্ঠে বললো, সূর্য গতকাল সকালে বেড়িয়েছে আর বাসায় ফিরেনি।

আমার ভিষন চিন্তা হচ্ছে।বলেই ফোনটা কেটে দেয়।ফোন কাটার সাথে সাথে দ্বিতীয় বার ফোন বাজে, অপূর্ব ফোন তুলে হ্যালো বললেই,ওপাশ থেকে শ্রাবন বলে উঠে,থানাতে ডিসি সাহেব তোকে ডেকে পাঠিয়েছে। অপূর্ব সূর্যর চিন্তা উপেক্ষা করে ,থানার উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পরে।এলিজা জয়ার ঘরে যায়।জয়া এলিজা কে দেখে উঠে

বসে। এলিজা মৃদু হেসে বললো, আম্মা শরীরের অবস্থা কি? জয়া পান বানাতে বানাতে বললো, তোর যত্নে যে কেউ সুস্থ হয়ে যাবে।এলিজা বললো,মা আপনার সাথে কথা আছে।বল।একটা কেন হাজার টা বল।

এলিজা জয়ার দিকে কিছুটা এগিয়ে বললো,মা এনজিওর কাজের জন্য দুদিন পর বিক্রমপুর যেতে হবে।

সেখানের গ্রামে ,কিছু কিছু সদস্যদের নিয়ে মিটিং হবে।জয়া পানের পিক ফেলে বললো, যাবি। বারন কে করছে। এলিজা জয়ার হাতে হাত রেখে বললো আম্মা আপনার শরীর টা ভালো না।তাই বললাম।জয়া যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়।এলিজা বললো দুদিন পর যাবো আপনার শরীর টা পুরোপুরি সুস্থ হোক।বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে

যায়।শীত কিছুটা বেড়েছে। আকাশে তারাদের আনাগোনা বেশি। অর্পা এটা ওটা আঁকছে।পাখি অর্পার কাছেই বসে আছে।অর্পার আকাঝোকা দেখে,পাখির হঠাৎ শ্রাবন এর আকা পেইন্টিং টার কথা মনে পরে।পাখি অর্পার ঘর ত্যাগ করে। নিজের ঘরে চলে আসে। শ্রাবনের আঁকা ছবি টা দেখে।পাখি শ্রাবনের আঁকা দেখে অবাক হয়।

পাখি ভেবেছিলো হয়তো ঠিক মত আঁকতে পারবে না। কিন্তু ছবি টা পুরোপুরি পাখির মত।পাখি সেভাবে শুয়ে ছিল ঠিক সেভাবে আঁকা।রঙ থেকে শুরু করে,ছবির ধরন সবকিছু ঠিকঠাক।পাখি ছবিটি ছুয়ে দেখলো। শ্রাবনের পাগলামীর কথা ভাবতেই ঠোঁটের এক কোনে হাঁসি চলে আসে। শ্রাবন সকালে বেড়িয়েছে। পূরো ঘর টা পাখি পরোখ করছে।

আলমারি খুলে শ্রাবনের একটা শার্ট বের করে।পাখি শার্টা টা হাতে নিয়ে খাটের এক কোনেতে বসে গন্ধ শুঁকে। আনমনে শ্রাবন কে নিয়ে ভাবতে থাকে ঠিক তখনই হাজির হয় শ্রাবন।পাখি চমকে উঠে।হাত থেকে দ্রুত শার্ট টা খাটের উপর রাখে। শ্রাবন ওয়াকিটকি টা হাত থেকে রাখতে রাখতে বলল, কি পিচ্চি মনে পরছিলো খুব তাইনা?

তাই আমার যায়গায় আমার শার্ট কে বসিয়ে দিয়েছো।পাখি আমতা আমতা করে বলল,কে বলেছে , আপনাকে মনে পরছিলো। আমি তো দেখছিলাম ধুতে হবে কিনা। শ্রাবন হাতে শার্ট টা নিয়ে বললো,এটা পরিষ্কার শার্ট।আমি একজন পুলিশ। আমাকে বোকা বানানো এত সহজ নয়।পাখি উল্টো দিকে ঘুরে যায়। শ্রাবন ইউনিফর্ম টা খুলে পাখিকে

পেছন জড়িয়ে ধরে।পাখি মৃদু কণ্ঠে বললো,এভাবে চেপে ধরলে একটা হাড় ও থাকবে না।শ্রাবন কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, ভেঙে যাক। আমার ভালোবাসা দিয়ে আবার জোড়া লাগিয়ে দিবো।পাখি শ্রাবনের হাত টা সরিয়ে দেয়। আলমারি থেকে নামানো শার্টটা ভাজ করতে করতে বললো,হাত মুখ ধুয়ে আসুন। আমি খেতে দেই। শ্রাবন স্নান ঘরে

যেতেই,পাখি বলে উঠলো, দুলাভাই কে রেখে আসলেন যে?
শ্রাবন হাতের ঘরিটা টেবিলের উপর রেখে বললো, থানাতে ওর কাজ আছে। আমাদের একজন ফরেন্সিক ডাঃ মা,রা গেছেন। সেই নিয়ে অপূর্ব ব্যাস্ত।আমি চলে এসেছি। আমার পিচ্চির জন্য। পিচ্চি যদি একা ঘরে কান্না করে।পাখি মৃদু হেসে ভ্রু কুঁচকে দেয়।রাত অনেক হয়।

এলিজা অপূর্বর জন্য অপেক্ষা করছে। অপূর্ব ফিরছে না। কিছুক্ষণ জয়ার ঘরে যায় তো কিছুক্ষণ অর্পার ঘরে। এলিজা খেয়াল করলো জাহাঙ্গীর ঘরে নেই।এই সুযোগে একবার বায়েজিদ এর সাথে কথা বলা যাবে।এলিজা সবার নজর এড়িয়ে বাহিরে বের হয়। বায়েজিদ বাহিরে থাকা একটা চৌকির উপর শুয়ে আছে।মনের খুশিতে গুন গুন

করে গান গাইছে।এলিজাকে বাহিরে বের হতে দেখে বায়েজিদ উঠে বসে। অমৃদু হাঁসি দেয়।এলিজা কাছে আসে, বায়েজিদ মৃদু হেসে বললো,আপা তুমি এইহানে, আমারে কিছু খাবার আইনা দাওনা।এলিজা বললো,তোর খিদে পেয়েছে।আগে বলবি তো।তুই অপেক্ষা কর আমি নিয়ে আসছি।এলিজা ভাবলো বায়েজিদ কে খাবার দিয়ে যদি তোর

মুখ থেকে সত্যিটা বের করা যায়। ওদিন কি বলতে চেয়েছিলো।এলিজা খাবারের জন্য রান্না ঘরে যায়।রাত ১১ টা অপূর্ব এখনো ফিরেনি।আজ সবাই তারাতাড়ি ঘুমিয়ে পরেছে। এলিজার ঘটকা লাগলো।এত দ্রুত সবাই ঘুমিয়ে পরলো,এমন মনে হয় ঘুমের ঔষধ খেয়ে ঘুমিয়েছে। এলিজা এসব ভাবনা উপেক্ষা করে। বায়েজিদ এর জন্য কিছু খাবার নিয়ে

বায়েজিদ এর কাছে আসে। বায়েজিদ খাবার দেখে অনেক আনন্দিত হয়। এলিজা বায়েজিদ কে সান্ত স্বরে বলল, ওদিন কি হয়েছিল? তুই ওরকম অদ্ভুত আচরন করছিলিস কেন? আবার দারোয়ান চাচা বললো তুই ওদিন বিকেলে গ্রামে গিয়েছিলিস তবে রাতে কে ছিলো? বায়েজিদ খাবার খাওয়া বন্ধ করে।ভাত মাখা ছেরে এলিজার

দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে। বায়েজিদ চোখ গুলো বড় বড় করে বললো ,শুনবা আপা তুমি।ওদিন কি হয়েছিল?এলিজা আগ্রহ নিয়ে হ্যা সুচক মাথা নাড়ে। বায়েজিদ বলতে শুরু করবে ঠিক তখনই এলিজার মাথায় কেউ আঘাত করে। এলিজা হতভম্ব হয়ে যায়। বায়েজিদ এর হাত থেকে ভাতের থালাটা পরে যায়। এলিজা পেছন ঘুরে দেখে

দু'জন কালো মুখোশ,ধারী।এরা সেই দুজন যারা এর আগেও আমাকে খু,ন করতে চেয়েছিল।। চারদিক নিস্তব্দ।বাড়িতে বাহিরের লোক ঠুকতে পারে না। চারদিকে উঁচু করে দেয়াল করা।বাড়িতে দারোয়ান আছে।সে কোথায়? তাদের চোখ এড়িয়ে এরা ঠুকলো কিভাবে? এলিজা মাথায় খুব একটা আঘাত পায়নি।এলিজা ক্রোধে,আক্রশে প্রশ্ন

করলো,তোরা কারা আর কে পাঠিয়েছে,সাহস থাকে তো বল। হঠাৎ দুজন মুখোশ,ধারীর একজন আরেকজনের সাথে ফিস ফিস করে কিছু বললো। একজন বাড়ির মধ্যে থেকে বেড়িয়ে যায়।অন্যজন হাতে, মাঝারি সাইজের রাম,দা নিয়ে এলিজার দিকে এগোতে থাকে। এলিজা ঘরের দিকে দৌড়াতে শুরু করলে অচেনা লোকটি ধরে ফেলে।

এলিজার মুখ চেপে রাম,দা দেখিয়ে বললো,ছটপট কম কর নয় একদম শেষ করে দেবো। এলিজা কণ্ঠ চিনলো না। এলিজা হুহু করতে থাকে।এলিজাকে বাহিরের দিকে নিতেই, এলিজা বুঝতে পারলো অচেনা লোকটি হঠাৎ এলিজাকে ছেড়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে , এলিজা হতভম্ব হয়ে যায়।পেছন ঘুরে দেখতেই দেখে, বায়েজিদ কাঠ

কাটার দা দিয়ে লোকটির গলায় কো,প দিয়েছে।লোকটি লুটিয়ে পড়ে যায়। বায়েজিদ সাপের মত ফোঁস ফোস করছে।ক্রোধের স্বরে বললো, আমার আপার গায়ে হাত দিছো। আমি থাকতে আমার আপার কিছু হইবো না। আমার সামনে আমার আপাকে মারবি।বায়েজিদ এর এমন রুপ দেখে এলিজা অবাক হয়। এলিজা এদিক সেদিক পরোক্ষ

করে।এলিজা লোকটির নার্ভ পর্যবেক্ষন করে দেখলো লোকটি মারা গেছে। এলিজা কিছুটা ভয় পায়।যদি কেউ দেখে ফেলে তবে বায়েজিদ কে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। কিন্তু এটা ছাড়া আর তো উপায় ও ছিলো না। এলিজা বায়েজিদ আচরনে খুশিও হয়, এবং অবাক হয়।,।রাত বেড়ে চলেছে। এলিজা বার বার এদিক সেদিক

দেখছে।লা,শ টা কি করবে বুঝতে পারছে না। বায়েজিদ হাত থেকে র,ক্ত মাখা দা টা ফেলে হাতের উল্টো দিক দিয়ে নাক মুছে। এলিজাকে বললো, আপা তুমি চিন্তা কইরো না।আমি লা,শ টা পুতে রাখছি।এমন ভাবে পুতে রাখবো কেউ কোনদিন খুঁজে পাইবো না। এলিজা অবাক হয়। বায়েজিদ এর কথা বলার ভঙ্গিমা একদম অদ্ভুত

রকমের ভয়ানক হয়ে ওঠেছে। এলিজা চোখ বড় করে দেখছে। বায়েজিদ অবাক ভঙ্গিতে এলিজাকে বললো,তুমি ঘরে যাও।আমি সব সামলে নিবো।তোমাকে কেউ দেখলে সমস্যা হইবো। এলিজা বায়েজিদ কে বললো,তুই পারবি সব সামলে নিতে? বায়েজিদ হ্যা সুচক মাথা নাড়ে।এলিজা ঘরে চলে যায়।এলিজা বৈঠকখানায় বসে ভাবছে।বাড়ির

মানুষ গুলো ভারি অদ্ভুত।এত কিছু হয়ে গেলো তারা সত্যি ই কিছু টের পায়নি।নাকি টের পেয়েও ঘাপটি মেরে বসে আছে। এলিজা ঘরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নেয়। এতক্ষণ যা কিছু হয়েছে,তার কোন চিন্হ যেন না থাকে।কারন অপূর্ব জানলে এলিজাকে নিয়ে ভিষন চিন্তা করবে। আর এটা এলিজা চায়না , অপূর্ব চিন্তায় থাকুক। রাত প্রাই ১টা।

অপূর্ব ফিরছে না এখনো।এলিজা জয়ার ঘরের পাশে যায়।সেখানের জানালা দিয়ে বাহির টা দেখা যায়। বায়েজিদ লা,শ টা সরিয়েছে কিনা,দেখতে আসে। কিন্তু এলিজা যা দেখে,তাতে অবাক হয়ে যায়। বায়েজিদ বসে বসে কাঠ কাটছে। নিচে কিছু হয়েছিল তার কোন ছিটেফোঁটাও চিন্হ নেই। বায়েজিদ কাঠ কাটা রেখে,পেছন দিকে ঘুরে

,এলিজা যে জানালায় সেদিকে তাকায়। এলিজা বায়েজিদ কে পরোখ করে।বেলা বাড়ছে।আজ কুয়াশা নেই। হঠাৎ করেই ভিষন গরম পরছে।আজকে হঠাৎ সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।এত বেলা অব্দি কেউ ঘুমোয়না। কিন্তু আজ হঠাৎ সবাই বেলা অব্দি ঘুমোচ্ছে। এলিজা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে সবার জন্য খাবার তৈরি করছে। আজকে

মনজুরাও আসছে। এলিজা বার বার সিড়ির দিকে দেখছে। অপূর্ব নিচে এলো বলে। গতকাল রাত করে, জাহাঙ্গীর অপূর্ব একসাথে ই বাড়ি ফিরে। এলিজা গতকাল রাতের ঘটনা কাউকে বলেনি। তৎক্ষণাৎ কমড়ে হাত দিয়ে নিচে নামলো জয়া।

জয়া বললো,গতকাল কড়া ঘুম হয়েছে। এরকম হঠাৎ করে ঘুম

হলো।আজ খুব রোদের তেজ। হঠাৎ খুব ঠান্ডা,গরমে অসুস্থতা বাড়ে। বৈঠকখানায় বসে মনোরাকে ডাকে। বললো আদা দিয়ে চা করে নিয়ে আয়। এলিজা তৎক্ষণাৎ সবার জন্য টেলিবে খাবার দিচ্ছে। মমতাজ, অর্পা নিচে আসে। মমতাজ জয়ার পাশে বসে।বললো, গতকাল ঘুমটা অন্যরকম ছিল।এত গভীর ঘুম।খুব ভালো লেগেছে।জয়া মৃদু হাসে।

মমতাজ রান্না ঘরের দিকে পরোখ করে বললো, রান্না ঘরে দেখছি এলিজা কাজ করছে। সারাদিন মেয়েটা কত কাজ করে।আর আমার বউ টাকে দেখো, সারাদিন মহারানির মত পায়ে পা তুলে থাকে।জয়া মৃদু হেসে বললো,তুই তোর ছেলের বউকে মহারানি করে রাখ দেখবি সেও তোকে রাজরানির মত সম্মান করবে।ছেলের বউকে বউমা নয়,

নিজের মেয়ের মত দেখতে হয়। এলিজা জয়ার কথায় খুশি হয়। এলিজা বায়েজিদ এর জন্য কিছু খাবার আলাদা করে রাখে।এক এক করে সবাই খাবার টেবিলে আসে। শ্রাবন পাখি দুজন একসাথে পাশাপাশি বসে।পাখি ইতস্তত বোধ করে।তার বোন কাজ করছে অথচ সে কিছু করছে না। এলিজা তাকে কাজ করতে দিবে না যে। অপূর্ব

খাবার খেতে খেতে বার বার এলিজার দিকে পরোখ করছে। মৃদু হেসে বললো, আমার বউ যেমনই দেখতে তেমনি তার রান্না। এলিজা মৃদু হাসে। শ্রাবন পাশ থেকে বলে উঠলো, পিচ্চি তোমার হাতে একদিন রান্না খেতে হবে।পাখি খাবার রেখে ভ্রু কুঁচকে বললো, ভাইয়া, আপনি আমাকে পিচ্চি ডাকবেন না। তৎক্ষণাৎ শ্রাবনের বিষন লাগে।

মমতাজ দ্রুত পানি দেয়। অপূর্ব মৃদু হাসে। অর্পা,ডালিয়া চাঁদনী,এলিজা আওয়াজ করে হেসে উঠে। শ্রাবন পানি খেয়ে নেয়। শ্রাবন পাখির দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো,ভাইয়া আমি?

পাখি হ্যা সুচক মাথা নাড়ে।শ্রাবন পাখির কাছে এগিয়ে বললো,আমি তোমার স্বামী! ভাইয়া কেন বলছো।

ভাইয়া টা লেগেছে।তাও সবার সামনে।
মমতাজ টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে বললো, এই মেয়েটা ঠিক মত আমার ছেলেকে খেতেও দেবে না। বাবা ওর কথায় কান দিসনা।তুই তারাতারি খেয়ে নে। জাহাঙ্গীর এখনো নিচে আসেনি।এলিজা বায়েজিদ এর জন্য খাবার নিয়ে যায়। বায়েজিদ চৌকিতে বসে

আছে।এলিজা কে দেখে মৃদু হাসে। এলিজা খাবার টা দিতে দিতে বললো, মুখো,শধারী লোকটির লা,শটি কোথায় পুতে রেখেছিস? বায়েজিদ ঠোঁট কুঁচকে হেসে ফিসফিস করে বলল,তা আমি রেখেছি।সেটা নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না।তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।এলিজা চলে যায়। অপূর্ব সিড়ি বেয়ে নিচে নামছে।থানার উদ্দেশ্যে বের হবে

বলে। তৎক্ষণাৎ জয়া অপূর্ব কে দাড় করিয়ে নরম গলায় বললো,খোকা আমার জন্য পান নিয়ে আসবি। আমার পান যে শেষ হয়ে গেছে। অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, এভাবে বলার কি আছে। তুমি বললে পানের দোকান টাই কিনে নিয়ে আসবো। বলেই,শ্রাবন অপূর্ব থানার উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পরে।পাখি রান্না ঘরে যায়। বাহানা ধরেছে আজ সে রান্না

করবেই। এলিজা রান্না ঘরে পাখিকে দেখে মৃদু হাসে।বললো, এখানে কেন এসেছিস! কোন কিছু করতে হবে না।হাত পুড়ে যাবে।পাখি বললো,আপু একদিনে কিছু হবে না। আচ্ছা কর তাহলে। কিন্তু সাবধানে। এলিজা রান্না ঘর থেকে যেতেই থমকে দাঁড়ায়,পেছন ঘুরে সন্দেহ গলায় মৃদু হেসেই পাখিকে প্রশ্ন করলো, গতকাল ঘুম কেমন

হয়েছিল?পাখি এলিজার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো, বিছানায় শোয়ার সাথে সাথে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম।ঘুম টা ভালো হয়েছিল। এলিজা মনোরাকে উদ্দেশ্য করে বললো, পাখির যা দরকার গুছিয়ে দাও।ওর যাতে কোন আঁচ না লাগে। আমি আম্মার ঘরে যাচ্ছি।এলিজা জয়ার ঘরে চলে যায়। এলিজা গিয়ে দেখে জয়া মেঝেতে সুয়ে কমড় ধরে

কাঁদছে। এলিজা অস্থির হয়ে যায়। এলিজা চোখ গুলো বড় বড় করে বললো,কি হয়েছে আম্মা। এরকম কমড় ধরে কাঁদছেন কেন?

জয়া কাপা কণ্ঠে বললো,মারে ভিষন কষ্ট হচ্ছে।কমড়ে বেথা টা বেড়েছে। তারসাথে বুকের ভেতর চিনচিন বেথা করছে। এলিজা কি করবে বুঝতে না পেরে জাহাঙ্গীর কে ডাকে। জাহাঙ্গীর স্টোর রুম থেকে

চলে আসে। জাহাঙ্গীর জয়াকে ধরে বসে।কাপা কন্ঠে বললো,কি হয়েছে খোকার মা? এরকম করছো কেন? জয়া নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। জাহাঙ্গীর এলিজা কে বললো, তুমি বসো জয়ার কাছে আমি এ্যাম্বুলেন্স কে ফোন দেই।রাত ৮ টা নাগাদ –

অপূর্ব কিছু ফাইল চেক করছে।পাশে বসে শ্রাবন চা খাচ্ছে। হঠাৎ অপূর্বর বুকের ভেতর চাপ চাপ বেথা হচ্ছে।

অপূর্বর বুকে হঠাৎ করেই জ্বালাপোড়া শুরু করে। অপূর্ব কাজে মন দিতে পারছে না। শ্রাবন অপূর্বর হাব ভাব দেখে বললো,কি হয়েছে? কিছু ভাবছিস?অপুর্ব কাপা কণ্ঠে বললো, মনটার ভেতর কুহ ডাকছে। হঠাৎ কেমন জানি মনে হচ্ছে চারদিক টা অন্ধকার ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। শ্রাবন বললো চল বাড়ি ফিরে যাই। আমার ও কিছু ভালো

লাগছে না। তৎক্ষণাৎ একজন কনস্টেবল অপূর্ব কে বললো, স্যার আপনার বাড়ি থেকে একজন মেয়ে ফোন করেছে ,বললো এখনি বাড়ি ফিরতে। অপূর্বর চোখ গুলো ছানাবরা হয়ে যায়। হঠাৎ কেমন জানি অদ্ভুত রকম অনুভুতি হচ্ছে। অপূর্ব দ্রুত পায়ে বেড়িয়ে যায়। শ্রাবন গাড়ি ড্রাইফ করছে। অপূর্ব অঝরে ঘামছে। চারদিক কেমন

জানি অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। অপূর্বর ভেতরে জ্বালাপো,ড়া টা কমছেই না। শ্রাবন কে বললো, তারাতাড়ি গাড়ি চালা। রাস্তা যেন শেষ ই হচ্ছে না। আকাশের তারা গুলো ঢেকে গেছে কালো মেঘে। অপূর্ব বার বার উঁকি দিয়ে দেখছে, রাস্তা শেষ হলো কিনা। কিছুক্ষণ এর মধ্যে পৌছায় বাড়িতে।অপূর্ব সম্পুর্ন ভাবে থমকে যায়।বুকের ভেতর ধুকবুকানি টা

হঠাৎ বেড়ে গেছে।কপাল থেকে অঝরে ঘাম বেয়ে পরছে।বাড়ির সামনে অনেক মানুষ জন।এত মানুষের ভির কেন।কি হয়েছে। অপূর্ব ভেতরে যায়। চারদিকে সবাই কাঁদছে।কান্নার আওয়াজ এ যেন বাড়ি, হইহুল্লুর হয়ে যাচ্ছে। অপূর্ব কে দেখেই,অর্পা দৌড়ে আসে। অপূর্ব কে জড়িয়ে ধরে। অপূর্ব থমকে যায়। এলিজা সিড়ির কোনে

বসে কাঁদছে।পাশে পাখি কাঁদছে। মমতাজ নিস্তেজ হয়ে পরে আছে। জাহাঙ্গীর নিস্তব্দ হয়ে বসে আছে। অপূর্ব অর্পার দুই স্বিনাতে হাত দিয়ে কাঁপা গলায় বললো,এই অর্পা কি হয়েছে? কি হয়েছে বল।অর্পা কথা বলার মত অবস্থায় নেই। অপূর্ব দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলে ,অর্পা হাতের ইশারায় উঠানের বা দিকে দেখিয়ে দেয়।অপূর্বর চোখ গুলো বড়

বড় হয়ে যায়। হৃদয়ের স্পন্দন টা বন্ধ হয়ে যায়। একটা খাটিয়া । উপরে সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। অপূর্ব ধিরে ধিরে এগোয়। অপূর্বর হাটার শক্তি যেন নিমিষেই ফুরিয়ে গেছে। অপূর্ব কাপা হাতে ধিরে ধিরে ,সাদা কাপড় টা তুলতেই দেখে জয়া সুয়ে আছে। তার নাকের মধ্যে তুলা দেয়া।রুহহীন হয়ে শুয়ে আছে। অপূর্ব মা বলে এক চিৎকার।

অপূর্বর চিৎকারে চারদিকে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। অপূর্ব কান্না জড়িত কণ্ঠে বলে উঠলো,মা ও মা মা, কি হয়েছে তোমার।তোমায় ওরা এভাবে বাহিরে সুইয়ে রাখছে কেন।ও মা মা, কথা বলো,চোখ খুলো,মা মা বলেই অপূর্ব বুক ফাটা কান্না শুরু করে।এই আমার মায়ের কি হয়েছে। আমার মা কেন খাটিয়ায় সুয়ে আছে।আমার মা আমায় সকালেও খোকা বলে

ডেকেছে। এখন কেন আমার মা চুপ হয়ে আছে।ও মা,মা চোখ খুলো। আশেপাশের সবাই অপূর্বর কান্না দেখে কান্না করছে। প্রতিবেশী মহিলারা মুখে কাপড় দিয়ে কাঁদছে। কেউ কেউ দোয়া করছে। অপূর্ব কে ধৈর্য্য ধারন করার ক্ষমতা দাও। অপূর্ব জয়ার লা,শের কাছে বসে অঝরে কাঁদছে।মা ওমা চোখ খুলো , তোমার খোকা তোমায় ডাকছে।

কথা বলোনা মা,এটা তুমি কি করলে।এটা তুমি কি করলে আমাকে একা রেখে ফেলে গেলে।আমাকে কে খোকা বলে ডাকবে কে,কে মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করবে! মা উঠোনা মা! শ্রাবন অপূর্বর পেছনে দাঁড়িয়ে ফোপাচ্ছে, অপূর্ব কে শান্ত না দেয়ার মত কোন শব্দ যে নেই। শ্রাবনের হাতে জয়ার জন্য আনা পান। অপূর্ব পান টা থাবা মেরে

নিজের হাতে নিয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো, ওমা তুমি না পান আনতে বলেছিলে।এইযে তোমার জন্য অনেক পান নিয়ে এসেছি।মারে একটা বার চোখ খুলো মা।মা একটা বার ওঠোনা মা।আমি আর পুলিশের চাকরি করবো না,মা।তুমি না বলতে এই কাজ তোমার পছন্দ নয়। তোমার সারাদিন আমায় নিয়ে চিন্তা হয়।আমি চাকরি টা ছেড়ে দেবো।

আর তোমায় চিন্তা করতে হবে না। সারাদিন তোমার সাথে সময় কাটাবো।হঠাৎ চারদিক নিস্তব্ধ। গাছের পাতা গুলো ও যেন মা হারানোর বেদনায় কাতর হয়ে যাচ্ছে। অপূর্বর বুক ফাটা কান্নায় , ভেঙে যাচ্ছে সবকিছু। অপূর্ব মাটিতে লুটিয়ে বসে পরে।মা মা বলে চিৎকার করে।ওমা সাড়া দাও।মারে একটা বার ওঠো না।

পাশে বসা ইমাম সাহেব, অপূর্বর কাদে হাত রেখে বলল, আর যে তোর মা সাড়া দিবে না।মা,যে চলে গেছে পরপারে।যার মা চলে গেছে,তার যে দুয়িয়ার সব থেকে দামি জিনিস টাই চলে যায়।ভেঙে পরিস না।

অপূর্ব খাটিয়ার সাথে কপাল লাগিয়ে কাদদে থাকে।মা মা বলে ডাকতে থাকে।মা উঠো না,ওমা,কে আমায়

খোকা বলে ডাকবে।কে আমার পথচেয়ে বসে থাকবে।ইমাম সাহেব অপূর্ব কে সরাতে চায় বলে চোখের পানি পড়রে,মৃত মানুষের ক্ষতি হয়। অপূর্ব কে খাটিয়া থেকে সরাতে পারছে না। অপূর্বর হাতে ,জয়ার জন্য আনা পানটা অপূর্ব শক্ত করে ধরে রেখেছে। অপূর্ব ধিরে ধিরে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে।

মমতাজ এলিজাকে শান্তনা দিচ্ছে, এলিজা অঝরে কাঁদছে,কাপা কণ্ঠে বলছে, কাকি আমার আম্মার কি হলো, আমার আম্মা না বলেই চলে গেলো।আমি আম্মা বলে কাকে ডাকবো,কার শরীর থেকে আমার মায়ের গন্ধ শুকবো,এলিজার বুকের ভেতরটা দুমরে মুচড়ে যাচ্ছে।.....বেলা বাড়ছে।আজ কুয়াশা নেই। হঠাৎ করেই ভিষন গরম

পরছে।আজকে হঠাৎ সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।এত বেলা অব্দি কেউ ঘুমোয়না। কিন্তু আজ হঠাৎ সবাই বেলা অব্দি ঘুমোচ্ছে। এলিজা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে সবার জন্য খাবার তৈরি করছে। আজকে মনজুরাও আসছে। এলিজা বার বার সিড়ির দিকে দেখছে। অপূর্ব নিচে এলো বলে। গতকাল রাত করে, জাহাঙ্গীর অপূর্ব একসাথে ই বাড়ি

ফিরে। এলিজা গতকাল রাতের ঘটনা কাউকে বলেনি। তৎক্ষণাৎ কমড়ে হাত দিয়ে নিচে নামলো জয়া।

জয়া বললো,গতকাল কড়া ঘুম হয়েছে। এরকম হঠাৎ করে ঘুম হলো।আজ খুব রোদের তেজ। হঠাৎ খুব ঠান্ডা,গরমে অসুস্থতা বাড়ে। বৈঠকখানায় বসে মনোরাকে ডাকে। বললো আদা দিয়ে চা করে নিয়ে

আয়। এলিজা তৎক্ষণাৎ সবার জন্য টেলিবে খাবার দিচ্ছে। মমতাজ, অর্পা নিচে আসে। মমতাজ জয়ার পাশে বসে।বললো, গতকাল ঘুমটা অন্যরকম ছিল।এত গভীর ঘুম।খুব ভালো লেগেছে।জয়া মৃদু হাসে। মমতাজ রান্না ঘরের দিকে পরোখ করে বললো, রান্না ঘরে দেখছি এলিজা কাজ করছে। সারাদিন মেয়েটা কত কাজ করে।আর আমার

বউ টাকে দেখো, সারাদিন মহারানির মত পায়ে পা তুলে থাকে।জয়া মৃদু হেসে বললো,তুই তোর ছেলের বউকে মহারানি করে রাখ দেখবি সেও তোকে রাজরানির মত সম্মান করবে।ছেলের বউকে বউমা নয়, নিজের মেয়ের মত দেখতে হয়। এলিজা জয়ার কথায় খুশি হয়। এলিজা বায়েজিদ এর জন্য কিছু খাবার আলাদা করে রাখে।এক এক

করে সবাই খাবার টেবিলে আসে। শ্রাবন পাখি দুজন একসাথে পাশাপাশি বসে।পাখি ইতস্তত বোধ করে।তার বোন কাজ করছে অথচ সে কিছু করছে না। এলিজা তাকে কাজ করতে দিবে না যে। অপূর্ব খাবার খেতে খেতে বার বার এলিজার দিকে পরোখ করছে। মৃদু হেসে বললো, আমার বউ যেমনই দেখতে তেমনি তার রান্না। এলিজা

মৃদু হাসে। শ্রাবন পাশ থেকে বলে উঠলো, পিচ্চি তোমার হাতে একদিন রান্না খেতে হবে।পাখি খাবার রেখে ভ্রু কুঁচকে বললো, ভাইয়া, আপনি আমাকে পিচ্চি ডাকবেন না। তৎক্ষণাৎ শ্রাবনের বিষন লাগে। মমতাজ দ্রুত পানি দেয়। অপূর্ব মৃদু হাসে। অর্পা,ডালিয়া চাঁদনী,এলিজা আওয়াজ করে হেসে উঠে। শ্রাবন পানি খেয়ে নেয়। শ্রাবন পাখির

দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো,ভাইয়া আমি?

পাখি হ্যা সুচক মাথা নাড়ে।শ্রাবন পাখির কাছে এগিয়ে বললো,আমি তোমার স্বামী! ভাইয়া কেন বলছো। ভাইয়া টা লেগেছে।তাও সবার সামনে।

মমতাজ টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে বললো, এই মেয়েটা ঠিক মত আমার ছেলেকে খেতেও দেবে না।

বাবা ওর কথায় কান দিসনা।তুই তারাতারি খেয়ে নে। জাহাঙ্গীর এখনো নিচে আসেনি।এলিজা বায়েজিদ এর জন্য খাবার নিয়ে যায়। বায়েজিদ চৌকিতে বসে আছে।এলিজা কে দেখে মৃদু হাসে। এলিজা খাবার টা দিতে দিতে বললো, মুখো,শধারী লোকটির লা,শটি কোথায় পুতে রেখেছিস?

বায়েজিদ ঠোঁট কুঁচকে হেসে ফিসফিস করে বলল,তা আমি রেখেছি।সেটা নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না।তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।এলিজা চলে যায়। অপূর্ব সিড়ি বেয়ে নিচে নামছে।থানার উদ্দেশ্যে বের হবে বলে। তৎক্ষণাৎ জয়া অপূর্ব কে দাড় করিয়ে নরম গলায় বললো,খোকা আমার জন্য পান নিয়ে আসবি। আমার পান যে শেষ হয়ে গেছে।

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, এভাবে বলার কি আছে। তুমি বললে পানের দোকান টাই কিনে নিয়ে আসবো। বলেই,শ্রাবন অপূর্ব থানার উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পরে।পাখি রান্না ঘরে যায়। বাহানা ধরেছে আজ সে রান্না করবেই। এলিজা রান্না ঘরে পাখিকে দেখে মৃদু হাসে।বললো, এখানে কেন এসেছিস! কোন কিছু করতে

হবে না।হাত পুড়ে যাবে।পাখি বললো,আপু একদিনে কিছু হবে না। আচ্ছা কর তাহলে। কিন্তু সাবধানে। এলিজা রান্না ঘর থেকে যেতেই থমকে দাঁড়ায়,পেছন ঘুরে সন্দেহ গলায় মৃদু হেসেই পাখিকে প্রশ্ন করলো, গতকাল ঘুম কেমন হয়েছিল?পাখি এলিজার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো, বিছানায় শোয়ার সাথে সাথে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম।ঘুম

টা ভালো হয়েছিল। এলিজা মনোরাকে উদ্দেশ্য করে বললো, পাখির যা দরকার গুছিয়ে দাও।ওর যাতে কোন আঁচ না লাগে। আমি আম্মার ঘরে যাচ্ছি।এলিজা জয়ার ঘরে চলে যায়। এলিজা গিয়ে দেখে জয়া মেঝেতে সুয়ে কমড় ধরে কাঁদছে। এলিজা অস্থির হয়ে যায়। এলিজা চোখ গুলো বড় বড় করে

বললো,কি হয়েছে আম্মা। এরকম কমড় ধরে কাঁদছেন কেন?
জয়া কাপা কন্ঠে বললো,মারে ভিষন কষ্ট হচ্ছে।কমড়ে বেথা টা বেড়েছে। তারসাথে বুকের ভেতর চিনচিন বেথা করছে। এলিজা কি করবে বুঝতে না পেরে জাহাঙ্গীর কে ডাকে। জাহাঙ্গীর স্টোর রুম থেকে চলে আসে। জাহাঙ্গীর জয়াকে ধরে বসে।কাপা কন্ঠে বললো,কি হয়েছে

খোকার মা? এরকম করছো কেন? জয়া নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। জাহাঙ্গীর এলিজা কে বললো, তুমি বসো জয়ার কাছে আমি এ্যাম্বুলেন্স কে ফোন দেই।রাত ৮ টা নাগাদ —

অপূর্ব কিছু ফাইল চেক করছে।পাশে বসে শ্রাবন চা খাচ্ছে। হঠাৎ অপূর্বর বুকের ভেতর চাপ চাপ বেথা হচ্ছে। অপূর্বর বুকে হঠাৎ করেই জ্বালাপোড়া শুরু করে। অপূর্ব কাজে

মন দিতে পারছে না। শ্রাবন অপূর্বর হাব ভাব দেখে বললো,কি হয়েছে? কিছু ভাবছিস?অপুর্ব কাপা কণ্ঠে বললো, মনটার ভেতর কুহ ডাকছে। হঠাৎ কেমন জানি মনে হচ্ছে চারদিক টা অন্ধকার ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। শ্রাবন বললো চল বাড়ি ফিরে যাই। আমার ও কিছু ভালো লাগছে না। তৎক্ষণাৎ একজন কনস্টেবল অপূর্ব কে বললো, স্যার

আপনার বাড়ি থেকে একজন মেয়ে ফোন করেছে ,বললো এখনি বাড়ি ফিরতে। অপূর্বর চোখ গুলো ছানাবরা হয়ে যায়। হঠাৎ কেমন জানি অদ্ভুত রকম অনুভুতি হচ্ছে। অপূর্ব দ্রুত পায়ে বেড়িয়ে যায়। শ্রাবন গাড়ি ড্রাইফ করছে। অপূর্ব অঝরে ঘামছে। চারদিক কেমন জানি অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। অপূর্বর ভেতরে জ্বালাপো,ড়া টা কমছেই না।

শ্রাবন কে বললো, তারাতাড়ি গাড়ি চালা। রাস্তা যেন শেষ ই হচ্ছে না। আকাশের তারা গুলো ঢেকে গেছে কালো মেঘে।অপূর্ব বার বার উঁকি দিয়ে দেখছে, রাস্তা শেষ হলো কিনা। কিছুক্ষণ এর মধ্যে পৌছায় বাড়িতে। অপূর্ব সম্পুর্ন ভাবে থমকে যায়।বুকের ভেতর ধুকবুকানি টা হঠাৎ বেড়ে গেছে।কপাল থেকে অঝরে ঘাম বেয়ে পরছে।বাড়ির

সামনে অনেক মানুষ জন।এত মানুষের ভির কেন।কি হয়েছে। অপূর্ব ভেতরে যায়। চারদিকে সবাই কাঁদছে।কান্নার আওয়াজ এ যেন বাড়ি, হইহুল্লুর হয়ে যাচ্ছে। অপূর্ব কে দেখেই,অর্পা দৌড়ে আসে। অপূর্ব কে জড়িয়ে ধরে। অপূর্ব থমকে যায়। এলিজা সিড়ির কোনে বসে কাঁদছে।পাশে পাখি কাঁদছে। মমতাজ নিস্তেজ হয়ে পরে আছে।

জাহাঙ্গীর নিস্তব্দ হয়ে বসে আছে। অপূর্ব অর্পার দুই স্বিনাতে হাত দিয়ে কাঁপা গলায় বললো,এই অর্পা কি হয়েছে? কি হয়েছে বল।অর্পা কথা বলার মত অবস্থায় নেই। অপূর্ব দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলে ,অর্পা হাতের ইশারায় উঠানের বা দিকে দেখিয়ে দেয়।অপূর্বর চোখ গুলো বড় বড় হয়ে যায়। হৃদয়ের স্পন্দন টা বন্ধ হয়ে যায়। একটা খাটিয়া ।

উপরে সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। অপূর্ব ধিরে ধিরে এগোয়। অপূর্বর হাটার শক্তি যেন নিমিষেই ফুরিয়ে গেছে। অপূর্ব কাপা হাতে ধিরে ধিরে ,সাদা কাপড় টা তুলতেই দেখে জয়া সুয়ে আছে। তার নাকের মধ্যে তুলা দেয়া।রুহহীন হয়ে শুয়ে আছে। অপূর্ব মা বলে এক চিৎকার। অপূর্বর চিৎকারে চারদিকে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। অপূর্ব কান্না জড়িত কন্ঠে

বলে উঠলো,মা ও মা মা, কি হয়েছে তোমার।তোমায় ওরা এভাবে বাহিরে সুইয়ে রাখছে কেন।ও মা মা, কথা বলো,চোখ খুলো,মা মা বলেই অপূর্ব বুক ফাটা কান্না শুরু করে।এই আমার মায়ের কি হয়েছে। আমার মা কেন খাটিয়ায় সুয়ে আছে।আমার মা আমায় সকালেও খোকা বলে ডেকেছে। এখন কেন আমার মা চুপ হয়ে আছে।ও মা,মা চোখ খুলো।

আশেপাশের সবাই অপূর্বর কান্না দেখে কান্না করছে। প্রতিবেশী মহিলারা মুখে কাপড় দিয়ে কাঁদছে। কেউ কেউ দোয়া করছে। অপূর্ব কে ধৈর্য্য ধারন করার ক্ষমতা দাও। অপূর্ব জয়ার লা,শের কাছে বসে অঝরে কাঁদছে।মা ওমা চোখ খুলো , তোমার খোকা তোমায় ডাকছে। কথা বলোনা মা,এটা তুমি কি করলে।এটা তুমি কি করলে আমাকে

একা রেখে ফেলে গেলে।আমাকে কে খোকা বলে ডাকবে কে,কে মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করবে! মা উঠোনা মা! শ্রাবন অপূর্বর পেছনে দাঁড়িয়ে ফোপাচ্ছে, অপূর্ব কে শান্ত না দেয়ার মত কোন শব্দ যে নেই। শ্রাবনের হাতে জয়ার জন্য আনা পান। অপূর্ব পান টা থাবা মেরে নিজের হাতে নিয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো, ওমা তুমি না পান

আনতে বলেছিলে।এইযে তোমার জন্য অনেক পান নিয়ে এসেছি।মারে একটা বার চোখ খুলো মা।মা একটা বার ওঠোনা মা।আমি আর পুলিশের চাকরি করবো না,মা।তুমি না বলতে এই কাজ তোমার পছন্দ নয়। তোমার সারাদিন আমায় নিয়ে চিন্তা হয়।আমি চাকরি টা ছেড়ে দেবো। আর তোমায় চিন্তা করতে হবে না। সারাদিন তোমার সাথে সময়

কাটাবো।হঠাৎ চারদিক নিস্তব্ধ। গাছের পাতা গুলো ও যেন মা হারানোর বেদনায় কাতর হয়ে যাচ্ছে। অপূর্বর বুক ফাটা কান্নায় , ভেঙে যাচ্ছে সবকিছু। অপূর্ব মাটিতে লুটিয়ে বসে পরে।মা মা বলে চিৎকার করে।ওমা সাড়া দাও।মারে একটা বার ওঠো না।

পাশে বসা ইমাম সাহেব, অপূর্বর কাদে হাত রেখে বলল, আর যে

তোর মা সাড়া দিবে না।মা,যে চলে গেছে পরপারে।যার মা চলে গেছে,তার যে দুয়িয়ার সব থেকে দামি জিনিস টাই চলে যায়।ভেঙে পরিস না।

অপূর্ব খাটিয়ার সাথে কপাল লাগিয়ে কাদদে থাকে।মা মা বলে ডাকতে থাকে।মা উঠো না,ওমা,কে আমায় খোকা বলে ডাকবে।কে আমার পথচেয়ে বসে থাকবে।ইমাম সাহেব

অপূর্ব কে সরাতে চায় বলে চোখের পানি পড়রে,মৃত মানুষের ক্ষতি হয়। অপূর্ব কে খাটিয়া থেকে সরাতে পারছে না। অপূর্বর হাতে ,জয়ার জন্য আনা পানটা অপূর্ব শক্ত করে ধরে রেখেছে। অপূর্ব ধিরে ধিরে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে।

মমতাজ এলিজাকে শান্তনা দিচ্ছে, এলিজা অঝরে কাঁদছে,কাপা কন্ঠে বলছে, কাকি আমার আম্মার কি

হলো, আমার আম্মা না বলেই চলে গেলো।আমি আম্মা বলে কাকে ডাকবো,কার শরীর থেকে আমার মায়ের গন্ধ শুকবো,এলিজার বুকের ভেতরটা দুমরে মুচড়ে যাচ্ছে।.....মা হারানো বেদনায়,কষ্টে নির্বিঘ্নে কেটে যায় ৭ টি দিন। শ্রাবন চলে যায় থানাতে। অপূর্ব যায়নি।একা একা ভালো লাগছে না।বড্ড একাকিত্ব অনুভব হচ্ছে।বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা

লাগছে। মনোরা বাড়ির সমস্ত কাজ করছে।পাখি রান্না ঘরে। মনোরা সবকিছু কেটে ধুয়ে দিয়ে এসেছে। বায়েজিদ ও বাড়িতে নেই,বলে মা অসুস্থ গ্রামে চলে গেছে।মমতাজ বসে বসে পান চিবোচ্ছে। মমতাজ সিদ্ধান্ত নিলো বিদেশে আর যাবে না।জয়া নেই,সবার দেখভাল কে করবে।সবাই বাচ্চা বাচ্চা।তাই সিদ্ধান্ত নেয় বিদেশ ফিরবে না আর।

জাহাঙ্গীর ঘর থেকে কম বের হয়। জয়া চলে যাওয়ার পর জাহাঙ্গীর নিঃস্ব হয়ে গেছে। অপূর্ব ছাঁদে বসে আছে। এলিজা বাড়িতে নেই আজ তিনদিন ধরে। এনজিওর জন্য যেতেই হয়েছে। অপূর্ব ছাঁদে বসে একা একা বিড়বিড় করছে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় তানভীর। গলায় কাশি দিয়ে তানভীর বললো, না বলেই চলে আসলাম। অপূর্ব ঘুরে

তাকায়। তানভীর অপূর্বর পাশে বসে। অপূর্বর ভালো মন্দ তানভীর জিজ্ঞেস করে। অপূর্ব মৃদু হেসে উত্তর দেয়। অপূর্বর হঠাৎ মনে পরে সূর্যর কথা। অপূর্ব ভ্রূ কুঁচকে বললো, সূর্যর কি খবর?মা মা,রা গেলো তখন ও আসলো না। তানভীর সামনের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো, অনেক দিন থেকেই ওর খবর নেই।জানি না, হঠাৎ হঠাৎ

কোথায় যায়। অপূর্বর চিন্তা হঠাৎ বেড়ে যায়।মাকে হারানোর বেদনায় সবকিছু ভুলে গিয়েছিলাম।সেদিন সূর্যর মা ফোন দিয়ে সূর্য বাড়িতে ফিরেনি বলেছিল। তারপর আর খোঁজ নেওয়া হয়নি। অপূর্ব মনস্থির করলো এখনই একবার সূর্য দের বাড়ি যাবে। অপূর্ব সূর্যর বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তানভীর নিজ বাসাতে চলে যায়। অপূর্ব সূর্যর বাড়ি

উপস্থিত হয়।বাড়ির গেট খোলা। ভেতরে আসে,ঘরের দরজাও খোলা অপূর্বর খটকা লাগলো। এদিক সেদিক পরোক্ষ করে কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে ছাঁদে চলে যায়। সূর্যর মা,আর বোন রোদ পোহাচ্ছে। অপূর্ব গলায় কাশি দিলো। সূর্যর মা তাকালো। অপূর্ব বললো, মাফ করবেন দরজা খোলা ছিলো, অনুমতি না নিয়েই চলে

এসেছি। সূর্যর মা অপূর্ব কে দেখে দু কদম সামনে আসে।কাপা কন্ঠে বললো, সূর্য কোথায়? অপূর্ব অবাক হয়। অপূর্ব ভ্রু কুঁচকে বললো, সূর্য কবে থেকে বাড়ি ফিরেনি?সূর্যর মা উল্টো দিকে ঘুরে বললো,আজ ৮ দিন ধরেই ওর খবর নেই। তোমাকে যেদিন ফোন দিয়েছে ,তার আগের দিন সূর্য কে শেষ বারের মত দেখেছি। জানি না ছেলেটার কি

হয়েছে। অপূর্বর খটকা লাগলো অপূর্ব কিছু না বলে দ্রুত স্থান করে। অপূর্ব থানাতে আসে।যে দুজন কনস্টেবল কে সিভিল পোশাকে সূর্যর উপর নজরদারি রাখার জন্য রেখেছে তাদের কাছে আসে। অপূর্ব তাদের দুজন কে নিয়ে আড়ালে আসে। আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো সূর্য কোথায়? ও আজ আটদিন ধরে নিখোঁজ।আর তোমরা আমাকে

জানাও নি-কনস্টেবল দু'জন চুপ করে আছে। কিছু বলছে না। অপূর্ব দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলে একজন বললো, দুঃখিত স্যার।ওদিন আমরা সূর্য কে অনুসরণ করেও তাকে ধরতে পারিনি। অপূর্ব আ'হত চোখে প্রশ্ন করলো, কোনদিন? কোথায় গিয়েছিলো? কি দেখেছো?কনস্টেবল বললো, বুড়িগঙ্গা নদীর তীর থেকে একটা কালো রঙের মাইক্রো তে সূর্য

উঠেছিল। মাইক্রো টার ভিতরে অন্য কেউ ছিল কিন্তু দেখতে পারিনি। আমরা অনুসরণ করি , কিন্তু চোখের পলকে হারিয়ে যায় । অপূর্ব চোখ বড় বড় করে ফেলে। অপূর্ব ভাবলো, তারমানে সবকিছুর পেছনে সূর্যর হাত আছে।আমি ওকে বিশ্বাস করে ঠিক করিনি। কিন্তু এর শেষ আমি দেখে নিবো। অপূর্ব তার আগে শেষ বারের মত সমস্ত বন্ধু বান্ধব এর

কাছে যায়।কারো সাথে সূর্যর অনেকদিন যোগাযোগ নেই। কিন্তু হিমেল আজ ১মাস ধরে নিখোঁজ। সবার ব্যাপারে খোজ নিতে নিতে বেলা ফুরিয়ে সন্ধ্যা হয়ে যায়। অপূর্ব বাড়ি ফিরেনি।ফিরেই বা কি করবে বাড়িতে মা নেই।এলিজাও নেই। অপূর্ব থানার বাহিরে আসে কিছুক্ষণ পায়চারি করে। অপূর্বর ভেতরে সূর্যর চিন্তা গ্রা,স করেছে। অপূর্ব

মনস্থির করলো আজ রাতেই একা রুশরাজ্যে যাবে।এখন পর্যন্ত সন্দেহ করা, সবাইকে রুশরাজ্যে ই দেখেছি কি আছে ওখানে।জানতেই হবে। অপূর্ব তিলকনগর-এর উদ্দেশ্যে বের হয়।হাতে পিস্তল আর ছোট টর্চ নেয়। অপূর্ব গাড়ি না নিয়ে রিকশা নিয়ে বের হয়। তিলকনগর রাস্তার সামনে এসে নামে।রাত ধিরে ধিরে বাড়ছে। চারদিক নিশ্চুপ। শীতল

হাওয়া বইছে। কোথাও থেকে কালো ধোঁয়া আসছে। গাছের পাতা গুলো নেতিয়ে পরছে। অপূর্ব এগোতে থাকে। আশেপাশে কোন মানুষ নেই। অপূর্ব ধিরে ধিরে এগোতে থাকে। অপূর্ব বার বার আশেপাশে দেখছে। কোথাও থেকে হুট করে কেউ এসে আঘাত না করে বসে। অপূর্ব হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় দিগন্ত নদীর তীরে। কোথাও কোন

জনব মানব নেই। অপূর্ব উল্টো ঘুরে রুশরাজ্যের দিকে হাটতে শুরু করে। আশেপাশে ভালো করে চোখ বুলায়।না, কোথাও তো কিছু নেই। তবে এখান থেকে সবাই কোথায় যায়। অপূর্ব ঘামছে।বা হাত দিয়ে ঘাম মুছে। চাঁদনী রাত। চারদিকে চাঁদনীর আলোয় আলোকিত। কিন্তু কোথা থেকে যেন কালো ধোঁয়া ধেয়ে আসছে। আশেপাশে মনে হচ্ছে,জন্তু

জানো,য়ার ঘাপটি মেরে বসে আছে। অপূর্ব হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে যায়। কোথাও কিছু নেই। দিগন্ত নদী- বা দিকে অনেক টা দূরে। অপূর্ব হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে যায়। অপূর্ব নিশানা দেখে বুঝলো।আমি সেই যায়গায় এসে পৌছেছি যেই,জায়গা পর্যন্ত আমরা ক্যাম্পিং এর সময় এসেছিলাম। এদিকে আর যাওয়া হয়নি কারন,

এখানে থেকে ডান দিকে শরু আকারে ছোট খাল বেয়ে ডান দিক, অর্থাৎ দক্ষিনে চলে গেছে। ওপাশ যাওয়ার মত কোন মাধ্যম নেই। ওপাশে বড় বড় মৃত গাছ।সাথে লতাপাতার আচ্ছন্ন। অপূর্ব ভেবে পাচ্ছে না।এখান থেকে তো কিছুই পেলো না। অপূর্ব ফিরে আসবে তখনই ভাবলো,এই ছোট খাল টা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে গিয়ে দেখা

যাক। অপূর্ব দক্ষিন দিকে হাটা শুরু করে। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে যায়। কোথাও কিছু নেই।গাছ, লতাপাতা সবকিছু মৃত।খুব ভয়ান,ক যায়গা। অপূর্ব মনস্থির করলো ফিরে যাবে এখানে কিছু নেই।হঠাৎ অপূর্ব থমকে দাঁড়ায়।ভাবলো অনেক দূর তো এসেছি,আর একটু সামনে এগোনো যাক। অপূর্ব কিছুদূর সামনে এগোতেই দেখে খালের

ভেতর ছোট একটা নৌকা। অপূর্ব অবাক হয়।চোখ গুলো ছানাবরা হয়ে যায়। ভেতরের কম্পন টা বেরে যায়। অপূর্ব সামনে এগোয়।টর্চের আলোতে দেখতে পায়।এটা কোন জে-সে নৌকা নয় বিদেশী ছোট নৌকা গুলো। এরকম নৌকা গুলো বিভিন্ন পার্কেও দেখা যায়। হুবহু এরকম নয়, তবে এরকম ই।খালের আয়োতন দৈর্ঘ্য বড় ,আয়োতনে

খুবই ছোট। অপূর্ব ধিরে ধিরে নিচে নামে। মনস্থির করলো, এই নৌকা দিয়ে খালের ওপার যেতে হবে। ওপারে হয়তো কিছু আছে।যেই চিন্তা সেই কাজ। অপূর্ব নৌকায় উঠে। ওপার চলে যায়। তৎক্ষণাৎ মনে হলো,হয়তো কেউ ওপার গিয়েছে,তাই নৌকাটা ওপার ছিলো। এখন এপার দেখলে সন্দেহ করবে। অপূর্ব নৌকাটা ঠেলে ওপার পাঠায়।

খাল নিরব নৌকা ভেসে অন্য দিকে যাবে না। অপূর্ব ওপার উঠে যায়। অপূর্ব অবাক হয়ে যায়।এটা কেমন জায়গা। এরকম জায়গা কাশ্মিনকালেও দেখেনি। অপূর্ব ঘামতে থাকে। অপূর্বর ভয় ও হচ্ছে। এমাজন জঙ্গল ও এত ভয়া,নক মনে হয়না।বড় বড় মৃত গাছ।তার সাথে বড় বড় মোটা লতা পেঁচিয়ে আছে। প্রচুর গাছে ঘন হয়ে আছে জঙ্গল

টা। স্থান টা এতোটাই নির্জন যে, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ও শোনা যাচ্ছে না।অপূর্ব এগোতে থাকে। কিছুদূর এগোতেই যা দেখে অপূর্ব সম্পূর্ণ ভাবে বিষিন্নত, হয়ে যায়। অপূর্বর শরীরের সমস্ত শক্তি নিমেষেই শেষ হয়ে যায়। বিভিন্ন বড় বড় মৃত গাছের আড়ালে,বড় একটা পরিত্যাক্ত বাড়ি। অপূর্ব ঢেক গিলতে থাকে।এই জঙ্গলে বাড়ি।তাও পরিত্যাক্ত।

কয়েকশো পূরানো বাড়ি। অপূর্ব সামনে এগোবে না পিছনে বুঝতে পারছে না। অপূর্ব মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে। আয়াতুল কুরসি পাঠ করে। এরপর সামনে এগোয়। ধিরে ধিরে বাড়িটির দিকে এগোয়। অপূর্ব সাহস করে পরিত্যাক্ত বাড়িটির দরজার সামনে আসে। অনেক বড় দরজা। অপূর্ব উপরের দিকে টর্চ মারতেই

দেখে,বড় করে লেখা ‘আমার পাপের সম্রাজ্য আপনাকে স্বাগতম। অপূর্ব থমকে যায়।লেখার ধরন ঠিক সেরকম,যেরকম টা সৈকতের লা,শের সাথে চিঠি দিয়েছিল। অপূর্ব দরজা টা খুলতে চায় কিন্তু খোলার কোন উপায় নেই।কারন দরজা টা অনেক বড় আর মজবুত।এত পূরানো বাড়ির দরজাও এত মজবুত থাকে। অপূর্ব বাড়ি টার অন্য দিকে

দেখছে।কোথাও থেকে ভেতরে প্রবেশের রাস্তা পায় কিনা। অপূর্ব দেখতে পায় ছোট একটা জানালা, কিন্তু কিভাবে খুলবে। অপূর্বর পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো।এটা দিয়ে শুট করলে শব্দ হবে না। অপূর্ব জানালায় শুট করে। জানালা টা খুলে যায়। অপূর্ব ভিতরে প্রবেশ করে। অপূর্ব বুঝতে পারলো একটা ঘরে মধ্যে প্রবেশ করেছে।ঘরটা

অন্ধকার। অপূর্ব টর্চ জালায়।দেখতে পায় একটা দরজা। অপূর্ব দরজটা খুললে যা দেখতে পায়, অপূর্ব সম্পূর্ণ ভাবে বিষিন্নত হয়ে যায়। অপূর্বর চোখ গুলো বড় বড় হয়ে যায়।ঘরের ভেতরের অংশ দিনের মত আলোকিত। বিভিন্ন লাইটিং করা। অনেক দামী দামী বাতি।বাহির থেকে বাড়িটি পরিত্যাক্ত মনে হলেও ভেতরে একদম সাধারণ বাড়ির

মতই। সাধারণ বললে ভুল হবে রাজবাড়ীর মত।অপূর্ব ধিরে ধিরে ভেতরে প্রবেশ করে। অদ্ভুত আর ভয়ানক। আশেপাশে দেয়ালে কিছু ভয়া,নক শব্দ লেখা। হাতের লেখা,ও লেখার ধরন খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। অপূর্ব সামনে এগোয়।পরপর কয়েকটি ঘর।দরজা-বিহীন ঘর,হয়তো ঘর গুলোতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। অপূর্ব পিস্তল টা সামনে

তাক করে,ঘরটার ভিতর উকি দেয়। অপূর্ব ভয়ে চাপসে যাচ্ছে। ঘরটার ভিতর,কিছু মেডিক্যালি জিনিস পত্র। অপূর্ব ঘর টি থেকে বের হয়।এদিক সেদিক পরোক্ষ করছে।কোথাও কেউ নেই।সামনে সরু একটা গলির মত।তার সামনে একটা ঘর।ডান দিকে উপর দিকে সিড়ি। অপূর্ব সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। বুকের ভেতর ধুবধুবানি পরিস্কার

শোনা যাচ্ছে। অপূর্ব মনে মনে কিছু দোয়া পাঠ করছে। অপুর্ব প্রথম সিড়ি পার হয়। দ্বিতীয় সিড়ির পর একটা ঘর। ঘরটার সামনে বড় করে লেখা S.Room তার সামনে ব্রাকেট দিয়ে লেখা Death । মানে কোন মৃত মানুষের ঘর।দরজা বন্ধ। অপূর্ব ভালো ভাবে পরোখ করে দেখলো,, দরজার পাশে ছোট একটা গ্লাসের জানালা। খুবই ছোট। অপূর্ব

ভেতরে উঁকি মারে। ভেতর টা ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করতেই দেখতে পায়,, অপূর্ব যা দেখতে পেলো, অপূর্বর চোখ গুলো বড় বড় হয়ে গেলো।বার বার ঢেক গিলতে শুরু করে। কাঁপুনি উঠে যাওয়ার উপক্রম। অপূর্ব দেখতে পায়, একটা ছেলের মৃত দেহ।সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা।তবে মুখমণ্ডল বের করা। লা,শটির নিচে কিছু ক্যামিকেল এর

বোতল,যেই ক্যামিকাল এর সাহায্যে মৃত দেহটি অক্ষয় আছে। অপূর্ব ভালো করে দেখার চেষ্টা করলে দেখতে,পায় লা,শটির পাশে, উল্টো দিকে ঘুরে একটা মেয়ে বসে আছে। চুলগুলো কোকরানো।মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছে না।সেই মেয়েটা এমন ভাব ভঙ্গিমা করছে যেন,তার পাশে সুয়ে থাকা লা,শটি জীবিত। উল্টো দিকে ঘুরে মেয়েটা মৃত লা,শটির

সাথে কথা বলছে। খাবার ও খাওয়াচ্ছে। অপূর্ব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে খাবার গুলো অনবরত পরে যাচ্ছে। অপূর্ব ধপাস করে দেয়াল টপকে পরে।হাতের উল্টো দিক দিয়ে ঘাম মুছে।দ্রুত গতিতে নিঃশ্বাস নিতে থাকে। এটা কাদের আস্তানা।এত ভ,য়ানক। অপূর্ব নিচে নামে। আশেপাশে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না।সামনে সরু গলিটার

সামনে একটা ঘর। অপূর্ব ধিরে ধিরে ঘরটির সামনে এগোলো ঘরটির উপরে লেখা ইংলিশে – H. Room তার সামনে ক্রোস চিন্হ মানে প্রবেশ নিষেধ।অপূর্ব ঘামছে। চারদিক এত নিস্তব্ধ।শরির শিউরে উঠছে। অপূর্ব ঘরটির ভেতরে প্রবেশ করবে কিন্তু দরজাটি মজবুত।খালি হাতে খোলা সম্ভব নয়। অপূর্ব লক বরাবর সুট করে।দরজাটি খুলে

যায়।ঘরটি অন্ধকার। ঘরটির ভেতর থেকে শিকল এর শব্দ আসছে।অপূর্ব টর্চ জালায়। অপূর্ব দেখতে পায় এক কোনে একজন রক্তা,ক্ত লোক ভয়ে চাপসে বসে আছে।চুল দাড়িতে একাকার। অপূর্ব লোকটির কাছে গেলে দেখতে পায়,ইনি সেই লোক যিনি,সেদিন আমাকে কয়েন দিয়েছিল।লোকটির অবস্থা করুন। অপূর্ব আতংক স্বরে বলল,কে -কে

আপনি! আপনি এখানে কিভাবে আসলেন! আপনার এরকম অবস্থা কেন! আপনার নাম কি!লোকটি কাপছে। অপূর্ব দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলো, বলুন না,কিছুতো বলুন।কিছু বলার চেষ্টা করুন,লোকটি কাঁপতে কাঁপতে বললো,হা-হা-হাশেম আমি। অপূর্ব চটকে বসে পরে। অপূর্বর সমস্ত পৃথিবী ঘুরছে।কি বলছে, উনি।এই কি সেই হাশেম যিনি ৫

বছর ধরে নিখোঁজ। অপূর্বর শরীর থেকে অঝরে ঘাম ঝরতে থাকে। কে করেছে এমন! এই পরিত্যাক্ত বাড়িটাকে মৃত্যু ঘর কারা বানিয়ে রেখেছে।

হঠাৎ অপূর্ব দুজন লোকের গলার আওয়াজ পায়। অপূর্ব দরজার বাহিরে উঁকি মারে,দেখতে পায় চীপস ডুপিয়ালি আর হিমেল। অপূর্ব মেঝেতে বসে পড়ে।নিজের চোখকে

বিশ্বাস করাতে পারছে না।রাত বেরে চলেছে। রাত প্রাই ১২ টা নাগাদ। অপূর্ব মেঝেতে লুটিয়ে বসে আছে। অপূর্ব কারো উপস্থিতি অনুভব করছে।কেউ আসছে এই ঘরের দিকে। অপূর্ব টর্চ টা বন্ধ করে দরজার পাশে দাঁড়ায়।ঘরটি বেশ বড় আর অন্ধকার। একজন হাশেমের ঘরের দরজার কাছে এসে দাড়ায়। লোকটি একা একা বললো এই

ঘরটি কে খুলেছে! এদের টাকা দিয়ে কাজে রেখেছে কিসের জন্য।বলেই লোকটি দরজা টি বাহির থেকে বন্ধ করে দেয়। অপূর্ব বুঝতে পেরেছে লোকটি মাতা,ল।হাশেম কাঁপছে বোঝা যাচ্ছে।শিকল এর শব্দ আসছে। অপূর্ব হাশেমের অবস্থা দেখে কাঁদছে।কতটা নিষ্ঠুর।কতটা হায়,না ওরা।কতটা পাষান হলে এরকম করতে পারে। আমার ঘৃনা

হচ্ছে। আমার বন্ধুদের উপর ওরা এতটা নিষ্ঠুর। অপূর্ব এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বুকের মধ্যে বেথা শুরু হয়। অপূর্ব বুকের উপর হাত রেখে প্রার্থনা করতে থাকে।যাতে বুকের বেথা টা কমে যায়।এখানে পানি নেই কিছু না। অপূর্ব টর্চটা জ্বালায়। উঠে গিয়ে হাশেমের কাছে বসে। হাশেম কিছু বলতে পারছে না।বলার জন্য চেষ্টা করছে। অপূর্ব পাশে বসে

আছে।বুকের বা পাশে হাত দিয়ে। হঠাৎ হাশেম অতিকষ্টে ডান দিকে দেখিয়ে দেয়। অপূর্ব ডান দিকে টর্চের আলো দিলে দেখতে পায়,মাটির কলস।হয়তো ওটাতে পানি আছে । অপূর্ব ভেবেছিল এখানে পানি নেই। অপূর্ব কলস থেকে পানি ঠেলে খেয়ে নেয়। অপূর্ব হাশেম এর কাছে এসে বসলো। জোড়ে জোড়ে শ্বাস নিচ্ছে অপূর্ব।

পিস্তল টা মেঝেতে রেখে দেয়। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকে। হাশেমের বয়স খুব একটা নয়। আমাদের মতই। কিন্তু তার যা অবস্থা ওরা করে রেখেছে। দাড়ি চুল গুলো অনেক বড় বড়।মনে মনে ভাবতেই অপূর্ব বলল,হাশেম ভাই,ওদিন যে কয়েনটা দিয়েছিলেন,সেই নকশার জায়গাটা কি এটাই?

হাশেমে কিছু বলছে না। কথা বলার মত শক্তি হাশেমের নেই। অপূর্ব হাশেমের কাদে হাত দিয়ে কাপা কণ্ঠে বললো, হাশেম ভাই, কথা না বলতে পারলেও ,হ্যাঁ বা না সূচক মাথা নাড়েন।কয়েন টা এই জায়গার ই ছিল, হাশেম না সুচক মাথা নাড়ে। অপূর্ব ছিটকে ১ হাত দূরে সরে যায়।কি বলছে হাশেম এসব। তারমানে এট সেই জায়গা নয়।তবে

এটা কাদের আস্তানা। অপূর্বর চিন্তা আরো দ্বিগুন বেড়ে গেল। অপূর্ব ঘামছে। তারমানে আমি এখন পর্যন্ত সঠিক রাস্তায় আসেনি।তবে এটা কাদের আস্তানা। এখানে হিমেল চীপস ডুপিয়ালি ই বা- কি করছে। অপূর্ব অন্ধকার ঘরে বন্দি হয়ে আছে। এখান থেকে তো বের হতে হবে। কিন্তু ভেতরে হায়,না গুলো আছে। অপূর্ব অপেক্ষা করছে কখন

তারা বাহিরে যাবে। অপূর্বর অপেক্ষার প্রহর কাটছে না।এক প্রহর দুই প্রহর কেটে যাচ্ছে অনেক প্রহর।রাত যেন আজ শেষ হচ্ছে না।কেউ বাহিরে বের হচ্ছে না। অপূর্ব মনস্থির করলো দরজা পিস্তল দিয়ে খুলবে। এরপর বের হবে।কি আছে এই যায়গায় দেখতে হবে। অপূর্ব দরজার লক বরাবর সুট করে। দরজা খুলে যায়। আশেপাশে

কেউ নেই অপূর্ব পিস্তল সামনে তাক করে বের হয়। অপূর্ব উপরে উঠতে থাকে।তখন চীপস , হিমেল উপরে গিয়েছিল। অপূর্ব ধিরে ধিরে উপরে উঠে।প্রতিটা ঘর বন্ধ।ঘর গুলোর কোন জানালা নেই।দুই তলা অতিক্রম করে তিনতলায় উঠে। চারদিক নিস্তব্দ।গলির মত পথ। দুইপাশে হাসপাতালের মত ঘর, অপূর্ব উকি মেরে দেখছে, প্রতিটা

ঘরের সামনে থাই- গ্লাসের দরজা ভিতরে সব দেখা যাচ্ছে।কিন্তু কেউ নেই। চিকিৎসার জন্য যা কিছু দরকার সেসব কিছুই এখানে আছে। এখানে হয়তো জেনারেটর ব্যবহার করা হয়।অপূর্ব অবাক হয়।বার বার ঢেক গিলতে থাকে। অপূর্ব আশপাশ ভালো করে দেখতে থাকে। কিন্তু কোথাও কোন সুত্র পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এখানে কোন কিছু তো

হচ্ছে। কিন্তু কি। তৎক্ষণাৎ অপূর্বর পেছন কেউ এসে হঠাৎ করে অপূর্বর মাথায় আঘাত করে। অপূর্ব পেছন দিকে ঘুরে দেখতে পারেনি। পিস্তল টা হাত থেকে পরে যায়।উপর হয়ে অপূর্ব পরে যায়। তৎক্ষণাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। রাত বেড়ে চলেছে। কিন্তু এই রাত কোন এক অভিশপ্ত রাত।রাত শেষ ই হচ্ছে না।ঠিক ১ ঘন্টা পরে অপূর্বর জ্ঞান ফিরে।অপূর্ব

টিপ টিপ করে চোখ মেলছে। চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা দেখছে।চোখ পরিষ্কার করার চেষ্টা করলো। তখনি অপূর্ব বুঝতে পারলো তার হাত পা বাঁধা। অপূর্ব কে চেয়ারের উপর বসিয়ে বেঁধে রেখেছে। অপূর্ব নিজেকে বাধা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলো কিন্তু ব্যার্থ হলো। অপূর্বর মাথার উপর ছোট একটা বাল্ব জ্বলছে।বাল্ব এর আলো

শুধু অপূর্ব বরাবর পরছে। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। অপূর্ব বারবার হাতের দড়ি খোলার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। তৎক্ষণাৎ কারো হাঁটার আওয়াজ পায়।কেউ আসছে। অপূর্ব কান খাড়া করে শুনতে পেলো। একাধিক লোকের পায়ের চপর চপর আওয়াজ আসছে। হঠাৎ অপূর্ব কে আটকে রাখার ঘরের বাইরে থেকে দু'জন অচেনা মানুষের

কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। তাদের মধ্যে একজন বলছে, একে নিয়ে কি করা যায়! শেষ করে দেই!তার সাথে অন্যজন বলছে, না তবে এ খুব সাহসী।হুট করে কিছু করা যাবে না। আগে স্যার কে আসতে দে।স্যার যা করবেন তাই হবে।এই বলে অচেনা লোক দুটো স্থান ত্যাগ করে। অপূর্ব বুঝতে পেরেছে।এদের উপরেও কেউ আছে।ওরা তার চালা।ওদের

স্যারের অনুমতি ছাড়া এরা কেউ কিছু করবে না। কিন্তু ওদের স্যার টা কে।সেটা যে আমাকে জানতে হবে। অপূর্ব বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, শুনতে পেলো কেউ আসছে।এবারো ঠিক একাধিক পায়ের আওয়াজ । তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল,স্যার,ছেলেটাকে আমরা বেধে রেখেছি। অপূর্ব ভাবলো হয়তো ওদের স্যার চলে এসেছে।

দরজা খুলে দিচ্ছে। অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে দেখছে। কিন্তু ঘরটা অন্ধকার দেখবো কিভাবে। দরজা খুলে ভেতরে এসে, একজন একটা বাল্ব জ্বালায়।পূরো ঘরটা আলোকিত হয়ে ওঠে।অপূর্ব চোখ গুলো বড় বড় করে দেখলেই যা দেখতে পায়, অপূর্ব সম্পূর্ণ ভাবে হতভম্ব হয়ে যায়।ভ্রু কুঁচকে দেয়, আতংক স্বরে বলল,তুই? অপূর্বর সামনে দাঁড়িয়ে

থাকা সূর্য আতংক স্বরে বলল,তুই এখানে? সূর্যর চালারা হতভম্ব হয়ে যায়।এরা দুজন,দুজন কে চিনে। এখন এ যদি বলে দেয়,আমরা একে আঘাত করেছি। সূর্য তৎক্ষণাৎ একজন চালার কলার টা ধরে মেজাজ দেখিয়ে বললো, একে মেরেছিস? একে আঘাত করেছিস? বেধে রেখেছিস কেন? দ্রুত খুলে দে।চালা দুজন কাপা হাতে অপূর্বর

হাত পা কে খুলে দেয়। অপূর্ব আড় চোখে সূর্য কে দেখছে।কি বলবে বুঝতে পারছে না। সুর্য হঠাৎ করেই অস্থির হয়ে যায়।চালা দুটোকে বললো,তোরা দুজন বাহিরে অপেক্ষা কর।চালা দুজন বাহিরে চলে যায়। অপূর্ব থম মেরে চেয়ারে বসে আছে। সূর্য অপূর্বর সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে। অপূর্ব র'ক্ত মাখা চোখে সূর্যর দিকে তাকিয়ে আছে। সূর্য

অস্থির। চোখে মুখে বিষন্নতা। অপূর্ব কাপা কন্ঠে বললো,কি করছিস এখানে?আমাকে বোকা বানিয়েছিস! সবকিছুর পেছনে তোর হাত। সূর্য ঠোঁট কুঁচকে হাসি দেয়। অপূর্ব ঘৃনা জড়িত কন্ঠে বললো তোকে বন্ধু বলতে ঘৃনা হচ্ছে আমার।ছিহ:সূর্য খিল খিল করে হেসে উঠে। কিছু বলছে না। অপূর্ব চুপ হয়ে আছে। অপূর্ব রাগান্বিত হয়ে আবার বলে

উঠলো, জবাব দে,এই নোংরা খেলা খেলছিস কেন? সূর্য বলল,তুই খুব বুদ্ধিমান। সেই ঘুরে ফিরে, খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলেই আসলি। কিন্তু তুই যা ভাবছিস তা কিছুই নয়।

অপূর্ব ঠোঁট কুঁচকে হেসে বললো, এখনো মিথ্যা বলবি! কি লাব মিথ্যা বলে! মিথ্যার পর্দা তো উঠতেই হবে।তাই না!

সূর্য হেসে বললো , তুই পরিত্যাক্ত বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে দেখেছিস । কিছু পেয়েছিস? অপূর্ব মুখ ঘুরিয়ে নেয়। অপূর্ব সূর্যের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো,হাশেম কে কেন ৫ বছর ধরে আটকে রেখেছিস?

সূর্য ঠোঁট কুঁচকে বললো, পথের কাটা ছিল।অনেক বার-বেরেছিলো।৫ বছর আগে। একদিন আমি আর

চীপস দুজনে রঞ্জনার কবরের কাছে ছিলাম।তখন দেখা হয় হাশেমের সাথে। হাশেমের সাথে কথা হয়। জিজ্ঞেস করছিল, এখানে কি করছি, আমরা সত্যিটা বলি।হাশেম চলে যায়। কিন্তু বুদ্ধিমান হাশেম আমাদের পিছু নেয়।

সেখান থেকে আমি আর চীপস দুজনে , আমাদের আস্তানায় চলে আসি। সেদিন আমি আর চীপস

দুজনে মিলে, মুন্না হত্যা,র পরিকল্পনা করি।কারন,মুন্না আমার ব্যাপারে সবকিছু জেনে গিয়েছিলো।মুন্না কিছুদিন পর পর,মোটা অংকের টাকা চাইতো দিতাম। কিন্তু হঠাৎ ওর মাথায় ভুত চাপে। একসাথে ১ কোটি টাকা চেয়েছিল।আমি বলেছিলাম কিছুদিন অপেক্ষা কর। কিন্তু ও অধৈর্য হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি আর চীপস দুজনে মিলে ওকে

হত্যা করার পরিকল্পনা করি।আর এসব কিছু হাশেম আমাদের অনুসরণ করে, আমাদের আস্তানায় পৌঁছে শুনে নেয়। আমার লোকেরা হাশেম কে দেখতে পায়। হাশেমের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে।হাশেম পালিয়ে যায়।হাশেম নিজ বাড়িতে না গিয়ে ঢাকা তে চলে যায়।আমি বিষয়টা রেখাকে বলি।রেখা হাশেম কে চিনতে পারে।রেখাকে হাশেম

একসময় পছন্দ করতো।এরপর নিরাকে বিয়ে করে।বিয়ের কিছুদিন পরই হাশেমের সাথে এমনটি হয়। হাশেম যখন পালিয়ে ঢাকা যায় তখন আমরা ভিষন চিন্তায় পড়ে যাই। যদি গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয় ।তখন রেখা বললো, আমি সামলে নেবো।রেখা হাশেমের সাথে যোগাযোগ করে, এবং রেখা হাশেমের সাথে এমন আচরন করে,

হাশেম রেখাকে ভরসা করে।রেখা হাশেম কে বলে, তুমি আর আমি দু'জনে মিলে পুলিশের কাছে যাবো। ওদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিবো। হাশেম রাজি হয়।রেখা হাশেম কে নিজ বাসাতে থাকতে দেয়।সেই রাতে, রেখা হাশেম কে আমার কথা মত, হাশেমের শরীরে এক প্রকার কেমিক্যাল ইনজেক্ট করে। হাশেম নিস্তেজ হয়ে যায়।

এরপর আমরা মিলে আমাদের আস্তানায় ওকে নিয়ে আসি। হাশেম তখন ছিল সদ্য বিবাহিত। আর আমি ভালোবাসা কে সম্মান করতাম।চীপস চেয়েছিলো হাশেম কে মেরে দিতে কিন্তু আমি মারতে দেইনি।সেই থেকে হাশেম বন্ধি। এরপর ভয় ঢুকে হাশেমের পরিবার কে নিয়ে।তারা যদি কিডন্যাপিং কেস ফাইল করে, তবে পুলিশ

তদন্ত করবে।তাই রেখা পরিকল্পনা করে নিরাকে হাশেম সেজে চিঠি পাঠায়।আর এটা সবাই বিশ্বাস ও করে। কিন্তু একটা ভুলের জন্য আবার সব এলোমেলো হয়ে যায়। সবকিছু ঠিকঠাক ই ছিল। কিন্তু সবকিছু তোর চোখের সামনে বারবার পরছিলো।তুই যখন,এলিজাদের বাড়ি যাস। তার দুদিন পর আমিও উপস্থিত হই।

তারপর দিন রাতে, তুই চীপস কে দেখে-ছিলিস হিমেল এর সাথে।তুই ও পিছুনিস। আর চীপস বেখেয়ালির জন্য ওর আইডি কার্ড ফেলে রেখে আসে।তুই ওটা নিয়ে নিস।তখন আমাদের চিন্তা আরো বেড়ে গেলো। কি করবো ভেবে না পেয়ে, আমি অন্তিম বাজার থেকে ফোন করে রেখাকে বলি আর ,রেখা সব সামলায়। তবে সত্যটা সামনে এনে।

তারপর দিন রেখা উপস্থিত হয় আলি বাড়ি।আর হাশেমের বিষয় টা বলে।এসব তুই জানিস।রেখার উদ্দ্যেশ্য ছিল চীপস এর আইডি কার্ড।অপূর্ব জিজ্ঞেস করলো, নিরা কে কারা মেরেছে। সূর্য বললো, তা আমরা জানি না।

দোতলায়,S room d,eath এটার মানে কি? আর ঐখানে মেয়েটাই বা কে আর মৃত লাশ,টি কার?

সূর্য বললো, দূর্জয় দের বন্ধুর মধ্যে মৃত ব্যক্তি একজন।আর তার সাথে ওর স্ত্রী চন্দ্রিকা। ওকে মেরে ফেলার পর লা,শটি এখানে রাখা হয়। ভালোবাসার মানুষ হারানো অতি কষ্টের,তাই আমি চন্দ্রিকার সাথে দেখা করি, চন্দ্রিকা ভেবেছিলো,ওর স্বামী নিখোঁজ।আমি বললাম,সে আমাদের কাছে।চন্দ্রিকা ওর স্বামিকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে যায়।আমি

চন্দ্রিকাকে নিয়ে আসি। চন্দ্রিকা ওর লা,শ দেখে অজ্ঞান হয়ে যায়।চীপস ওর চিকিৎসা করে,পরে জানতে পারি,তার ব্রেনে অতিরিক্ত চাপে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। তখন থেকেই ওর স্বামিকে ও জীবিত মনে করে।আর আমরা লা,শটি অক্ষয় রাখার জন্য বিভিন্ন কেমিক্যাল ব্যবহার করি।মৃত ব্যক্তির নাম সাগর'। মেয়েটি উপরে আছে

চাইলে দেখতে পারিস।আর এটা পরিত্যাক্ত বাড়ি নয়,এটা হাসপাতাল ছিলো। এটাকেই আস্তানা বানিয়ে রেখেছি।

অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, উপরে হাসপাতাল এর মত ঘর গুলো তো পরিত্যাক্ত মনে হচ্ছে না।

সূর্য বললো,পরিত্যাক্ত ছিল আমরা নতুন করে নেই।

অপূর্ব ভ্রু কুঁচকে বললো চীপস ডুপিয়ালি কে কিভাবে পেয়েছিস?

সূর্য বললো,চীপস একজন ডক্টর তার উপর অভিজ্ঞ একজন খু,নি।

অপূর্বর ঘৃনা হচ্ছে ওর বন্ধুদের উপর একটা খু,নের জন্য হাজার টা খু,ন করতে হচ্ছে।একটা মিথ্যা ঢাকার জন্য, হাজার টা মিথ্যা বলতে হচ্ছে। অপূর্ব সূর্যর দিকে পরোখ করছে,কত সান্ত ভাবে কথা গুলো বললো।কোন

অনুশোচনা নেই। সূর্য একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে শুরু করে। রাত বাড়ছে। অপূর্বর শরীর দূর্বল হচ্ছে।মাথায় আঘাত টা লেগেছে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, ২৭ বছরের ছেলেদের হত্যা,র পেছনে কে আছে??সূর্য বসা থেকে উঠে দাড়ায়। সিগারেট এর ধোয়া উপরের দিকে দিয়ে বললো, আমার অজানা। তুই এখানে এমন কিছু পেয়েছিস!

যেটা থেকে আমাকে সন্দেহ হচ্ছে!বা আমি এই নোংরা হত্যা'কান্ডের পেছনে আছি?

অপূর্ব সূর্যর দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। অপূর্বর সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। অপূর্ব মনে মনে ভাবলো,সূর্য কে বিশ্বাস আর করা যাবে না।এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে একবার হাশেম এর কাছে যেতে হবে।ওনার কাছে দ্বিতীয় কোন কয়েন আছে

কিনা,যেটা থেকে আমি জানতে পারবো,যে আসলে সেই , কয়েনে কোন জায়গার নকশা আছে। সূর্য কিছুক্ষন থম মেরে থাকে। সিগারেট এর অর্ধেক টা ফেলে দেয়। অপূর্বর সামনে এসে বসে। অপূর্ব হাত দুটো,হাটুর উপর রেখে বসে আছে। সূর্য বলল, ওরা মাথায় আঘাত করেছে! লেগেছিল খুব? অপূর্ব ঠোঁট কুঁচকে হেসে বললো,তোর মিষ্টি

অভিনয় বন্ধ কর।যে নিরীহ মানুষদের হ'ত্যা করতে পারে,সে অন্য কে ভালোবাসতে পারে না। সূর্য কিছু বললো না। অপূর্ব উঠে দাঁড়ায়। সূর্য বললো, কোথায় যাচ্ছিস? অপূর্ব কর্কট মেজাজে বললো, ভালো করে এই পাপি মহল টা একবার দেখতে। দেখতে না খুঁজতে?

যেটা মনে করিস। বলেই অপূর্ব সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে।

সূর্য ওর চালাদের ডাকলো,বললো, অপূর্ব যা দেখতে চায়, যেভাবে এই জায়গাটা পর্যবেক্ষন করতে চায়,করুক।ওকে যেন কেউ বাধা না দেয়।তোরা ওর সাথে যা।চালা দুটো অপূর্বর সাথে যায়। অপূর্ব প্রথম ঘরটাতে যায়। S. ROOM D,EATH... । অপূর্ব দেখলো সেই মেয়েটা মৃত লা'শ,টির পাশে বসে বসে গল্পের বই পরছে।একা একা

হাসছে। তার পাশেই সাগরের লা,শ। অপূর্ব বিষিন্নত হয়। অপূর্ব মেয়েটির মুখ দেখতে চাইলো। কিন্তু মেয়েটি উল্টো দিকে ঘুরে আছে। অপূর্ব চালাদের দিকে, দৃষ্টি স্থাপন করলে, ওরা বুঝতে পারে। অপূর্ব কি বলতে চেয়েছে। একজন চালা, অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাতে তালি দেয়। মেয়েটা ঘুরে তাকায়। অপূর্ব দেখলো মেয়েটিকে।চুল গুলো উষ্কখুস্ক।

চোখের নিচে কালো দাগ।মেয়েটি অপূর্বর দিকে ঘুরেই,হুসসসসস, আঙুলের ইশারায় চুপ করতে বলে। মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, আমার স্বামি ঘুমোচ্ছে।এখন এখান থেকে যাও। অপূর্বর ভেতরে কম্পন শুরু হয়। কি অদ্ভুত।একটা মৃত লা,শের সাথে দিন কাটাচ্ছে। অপূর্ব অন্যঘর গুলো দেখতে চায়। সবগুলো ঘর সাধারণ ঘরের মতই সাজানো।

তেমন কিছু নেই।একটা ঘরের সামনে চীপস ডুপিয়ালির নাম লেখা। দরজা খোলা। অপূর্ব দ্রুত পায়ে ভেতরে ঠুকে দেখতে পায় , হিমেল,চীপস ডুপিয়ালি কিছু নিয়ে আলোচনা করছে। অপূর্ব কে দেখে দুজন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। চীপস অপূর্বর দিকে তেরে আসতে চাইলেই, হিমেল হাত বাড়িয়ে চীপস কে বাধা দেয়। অপূর্ব দাতে দাঁত

শক্ত করে চেপে ,ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়। অপূর্ব সমস্ত বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখে। কিন্তু কোথাও কিছু পায়নি। অপূর্ব চিন্তায় পড়ে যায়। অপূর্ব কিছুক্ষণ পায়চারি করে নিচে নেমে যায়। সূর্য সেই ঘরের ভেতরে চেয়ারটাতে বসে আছে। অপূর্ব ওর সামনে গিয়ে বসে পরে। মনস্থির করলো হাশেমের সাথে কথা বলে ,কয়েনের ব্যাপারে জানতে হবে।

তৎক্ষণাৎ একটা চালা দ্রুত পায়ে উপস্থিত হয়। সূর্য কে উদ্দেশ্য করে বললো,স্যার ,ঐ পাগল টা মনে হয় বেঁচে নেই। অপূর্ব,চট করে দাঁড়িয়ে যায়। সূর্য দ্রুত পায়ে হাশেমের ঘরে যায়।সাথে অপূর্ব । হাশেম মেজেতে লুটিয়ে পড়ে আছে। অপূর্ব কাঁপা হাতে হাশেম কে জড়িয়ে ধরে বললো,হাশেম ভাই,হাশেম ভাই,চোখ খুলেন, হাশেম ভাই,। অপূর্ব পাল্স

পর্যবেক্ষন করে দেখলো হাশেম আর নেই। অপূর্ব ধপাস করে বসে পরে। বুকের ভেতর ধুকবুকানি পরিস্কার শোনা যাচ্ছে। এবার আমি কি করে, এই মৃত্যু খেলার শিকড় পর্যন্ত যাবো।ভাবতেই অপূর্ব চট করে দাড়িয়ে যায়। ঘৃনার চোখে সূর্য কে বললো,তুই একটা খু,নি। বলেই সূর্য কে ধাক্কা দেয়। সূর্য দেয়ালের সাথে ধাক্কা খায়। অপূর্ব সূর্যর দিকে তেরে

যায়। সূর্যর কলার চেপে ধরে, রাগান্বিত কণ্ঠে বললো,তুই নিরীহ মানুষের প্রান নিয়েছিস, কিভাবে করতে পারলি। সূর্য রাগান্বিত চোখে অপূর্ব কে বললো,কলার ছেড়ে দে। অপূর্ব বললো,কি করবি তুই? সূর্য রেগে যায়।দুজনার মধ্যে লরিঝাপটা শুরু হয়। তখন হিমেল আর চীপস ডুপিয়ালি উপস্থিত হয়।, অপূর্ব আর সূর্য কে আলাদা করে । অপূর্ব

সাপে'র মত, ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। হিমেল অপূর্ব কে ধরে বললো, পাগল হয়ে গেছিস! এরকম করছিস কেন! নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করছিস! শান্ত হ।অপূর্ব ঘরটার বাহিরে বের হয়।রাত শেষ হওয়ার পর্যায়। অপূর্বর হঠাৎ করে, চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।পূরো বাড়িটা ঘুরছে। অপূর্বর সমস্ত শরীর নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে।

অপূর্ব সামনে এগোতে শুরু করবে,ঠিক তখনই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে।দ্রুত পায়ে দৌড়ে আসে, সূর্য, হিমেল,সহ চালারা। সূর্য অপূর্ব কে এরকম অবস্থায় দেখে বিষিন্নত হয়ে যায়। অপূর্ব কে জড়িয়ে ধরে বললো,এই ভাই ,কি হয়েছে,চোখ খোল অপূর্ব।, সূর্য অস্থির হয়ে যায়। সূর্য, হিমেল দু'জনে ধরে নিয়ে অপূর্ব কে একটা ঘরে সুইয়ে দেয়।অপূর্ব

চীপস কে রক্ত মাখা চোখ নিয়ে বললো,দাড়িয়ে আছিস কেন! দেখ ওর কি হয়েছে! আমার বন্ধুর যাতে কিছু না হয়। হিমেল সূর্য কে শান্ত হতে বললো।বললো, এরকম করছিস কেন!ও দূর্বল হয়ে আছে। সারারাত জেগে আছে এইজন্য। হিমেল চীপস কে,তার ভাষাতে বুঝিয়ে বললো। চীপস, অপূর্বর চেকাপ করে। অপূর্ব কে ইনজেকশন

দেয়।তার ভাষাতে বললো,সে দুর্বল, অতিরিক্ত চিন্তায় এমন হয়ে গেছে। ঠিক হয়ে যাবে। হিমেল চীপস চলে যায়। সূর্য অপূর্বর পাশে বসে আছে। অপূর্ব ঘুমোচ্ছে। সূর্য অপূর্বর খাটের সাথে ঝুঁকে মাথা দিয়ে বসে আছে। সূর্য মনের অজান্তেই ঘুমিয়ে পরে। সূর্যর আলোয় চারদিক আলোকিত হয়ে যায়। পাখিদের কিচিরমিচির আওয়াজ আসছে। কিছুদূর থেকে

নদীর ঢেউয়ের আওয়াজ আসছে। অপূর্বর ঘুম ভেঙে যায়। এদিক সেদিক পরোক্ষ করতেই দেখে সূর্য,বসে বসেই ঘুমোচ্ছে। অপূর্ব অভাক হয়। হিমেল থাকলো না অপূর্বর পাশে। কিন্তু সূর্য সমস্ত রাত অপূর্বর পাশে এভাবেই ছিল। অপূর্ব দৃষ্টি সরিনে নেয়।মনের এক কোনেতে সূর্যর জন্য ঘৃনা জমেছে। সূর্য সজাগ হয়। চোখ পরিষ্কার করে

দেখে, অপূর্ব বসে আছে। সূর্য মৃদু হাসি দিয়ে বলল,কি অবস্থা এখন? অপূর্ব কিছু বলছে না।খাট থেকে নেমে জানালার পাশে গিয়ে দাড়ায়। বাহির টা দেখে।কতটা শুনশান জায়গা। নিস্তব্ধ পরিবেশ। অপূর্বর ধম বন্ধ হয়ে আসছে। এরা এখানে কিভাবে থাকে।অপূর্ব শান্ত হয়ে দাড়িয়ে আছে। সূর্য নিচে চলে যায়। তৎক্ষণাৎ দুজন চালা অপূর্বর কাছে

আসে। টেবিলের উপর কিছু খাবার রাখে। অপূর্ব কর্কট মেজাজে বললো, এগুলো নিয়ে যাও। আমার খিদে নেই।একজন বললো, স্যার দিতে বলেছে। অপূর্ব খাটের এক কোণে বসে পরে।ভাবছে এখান থেকে চলে যাবে। এখানে কিছুই পেলো না।আর হাশেম ও পরপারে চলে গেলো। কিভাবে এর শিকড়ে যাবো। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় সূর্য।একটা

চেয়ার টেনে বসে।বললো, এখানে আর কাজ নেই।চল ফিরে যাই।ভয় ছিল হাশেম কে নিয়ে।সে ভয় এখন আর নেই। অপূর্ব কিছু বললো না।

ঢাকা —-অপূর্ব ক্লান্ত শরীরে বাড়িতে ফিরে।ভয় হচ্ছে জাহাঙ্গীর এর। গতকাল বাড়ি ফিরেনি। না জানি কত টা রাগ করে আছেন। মনোরা রান্না ঘরে কাজ করছে।সাথে পাখি। অপূর্ব পাখিকে ডাকে।পাখি দ্রুত

পায়ে এসে বললো, ভাইয়া আপনি! গতকাল কোথায় ছিলেন!বড় চাচা ভিষন চিন্তায় ছিলেন।আপু গতকাল সারারাত জেগে জেগে কেঁদেছে। সকাল থেকে গম্ভীর মুখে বসে আছে। অপূর্ব ভ্রু কুঁচকে বললো,কিহ এলিজা ফিরেছে।পাখি হ্যা বলে। অপূর্ব অমৃদু হাঁসি দেয়। এলিজা এসেছে শুনে অপূর্ব খুশিতে আপ্লুত হয়ে যায়। দৌড়ে ঘরে চলে যায়।

এলিজা জানালার দিকে উল্টো দিকে ঘুরে দাড়িয়ে আছে। অপূর্ব নরম গলায় বললো,ম্যাডাম!এলিজা পেছন ঘুরে অপূর্ব কে দেখেই জড়িয়ে ধরে হুহু করে কান্না শুরু করে। এলিজার স্পর্শে অপূর্বর সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, আমার জন্য কাদছো ভালো ই লাগছে। এলিজা কাপা কন্ঠে বললো,আমাকে কষ্ট দিতে আপনার

ভালো লাগে। কোথায় ছিলেন কাল থেকে আপনার কোন খবর নেই। কত চিন্তা হচ্ছিল জানেন।যদি আপনার কিছু হয়ে যেত। অপূর্ব এলিজার দুই স্বিনাতে হাত দিয়ে বললো, আমার কিছু হয়ে গেলে কি হতো! শুনি। এলিজা জ্বল জ্বল চোখে বললো! আপনিহীন আমি নিঃস্ব। তৃপ্তিময় দুনিয়ায়,আপনাকে ছাড়া যে , সবকিছু তৃপ্তিহীন মনে হয়। অপূর্ব

এলিজাকে বুকে জড়িয়ে নেয়।এত ভালো বাসো আমাকে! এলিজা অপূর্ব কে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। অপূর্ব বলল, কখনো ছেড়ে যাবেন নাতো ম্যাডাম!এলিজা শক্ত গলায় বললো,আমার শরীরে যতদিন রুহ'আছে ততদিন আমি আপনার হয়েই থাকতে চাই। অপূর্ব আবেগ প্রবন হয়,কাপা কন্ঠে বললো,আমাকে

ছুঁয়ে কথা দাও। কোনদিন ছেড়ে যাবে না!

‘আপনাকে ছুয়ে কথা দিলাম।যদি আমার মন কখনো আপনাকে ভুল করেও ভুলে যেতে চায়, কিংবা কখনও আমার মনে আপনাকে ছেড়ে যাওয়ার ভাবনা আসে,তবে সেই ভাবনা পূরন হওয়ার আগেই’ নিজের জীবন টাই কো’রবান করে দেবো। এলিজা কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে

বললো, কোথায় ছিলেন আপনি? অপূর্ব ভাবলো, গতকাল কোথায় ছিলাম এসব এলিজাকে বলা যাবে না। চিন্তা করবে। অপূর্ব শান্ত স্বরে বললো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কেস চলে আসে। তারজন্য দূরে যেতে হয়। এলিজা অপূর্বর জুতো খুলে দিতে দিতে বললো, গোসল করে নিন।আমি আপনার জন্য কিছু খাবার তৈরি করি।এলিজা রান্না ঘরে আসে।

পাখিকে বললো তুই দেখ আমি কিভাবে রান্না করি।তোর করতে হবে না।পাখি বুঝতে পারলো, এলিজা চায়না সে থাকতে- পাখি কোন কাজ করুক।পাখি পাশে সরে দাড়ায়। এলিজা মৃদু হেসে বললো, শ্রাবন কখন বেড়িয়েছে।পাখি বললো, দুলাভাই না থাকায় তাকে আজ সকালে যেতে হয়েছে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় মমতাজ।হামি

দিতে দিতে রান্না ঘরে আসলো।পাখি বললো, আম্মা আপনার কিছু দরকার? মমতাজ বললো, কড়া করে চা বানিয়ে দাও।পাখি চা করে মমতাজ কে দেয়।পাখি পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মমতাজ বলল,পাশে বোস। মমতাজ চা'য়ে এক চুমুক দিয়ে বললো,তোর সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি। ছোট করে কত কথা বলেছি। পারলে আমাকে ক্ষমা

করে দিস।পাখি মমতাজ এর কাছে এগিয়ে বললো, আম্মা আপনি এগুলো কি বলছেন! আপনি যে আমার মায়ের মতন। আপনি আমায় বকবেন,যা খুশি বলবেন,আমি আপনার কথায় কখনো রাগ করি না। এলিজা রান্নাঘর থেকে মমতাজ আর পাখির কথোপকথন শুনতে পায়। এলিজা মৃদু হাসে। মনোরা এলিজার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে

বললো, মিটিমিটি হাসছো যে!এলিজা হাতের কাজ করতে করতে বললো, আমার বোনের মুখে হাসি দেখলে,আমি আনন্দিত হই।ওর খুশি ই যে আমার সুখ।মনোরা মৃদু হাসে। অপূর্ব গোসল করে খাটের এক কোণে ঝিম মেরে বসে আছে। সূর্য আর ওর কর্মকাণ্ড অপূর্ব কে বার বার ভাবাচ্ছে।প্রানের বদলে প্রান নেয়াটাই কি সমাধান!কি করে

পারলো সূর্য এমন করতে। আমার বন্ধু সে কিনা একজন...

অপূর্ব এসব ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বেড়িয়ে নিচে চলে আসে। জাহাঙ্গীর বৈঠকখানায় বসে বসে নিউজ পেপার পড়ছে। অপূর্ব কে দেখে নিজের কাছে বসতে বলে। অপূর্ব বসে। জাহাঙ্গীর মৃদু হেসে বললো, আজকাল দেখছি ঘরেই বেশি থাকা হয়! কিছু হয়েছে?

অপূর্ব না সূচক মাথা নাড়ে। জাহাঙ্গীর এর কথা বলার ভঙ্গিমা, আচরণ আগের মতন নেই।জয়া চলে যাওয়ার পর থেকে জাহাঙ্গীর নিশ্চুপ হয়ে গেছে।বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যায়। শীতল হাওয়া বইছে।শীত এখন অনেক টাই কম। মমতাজ পান চিপোচ্ছে। একজন প্রতিবেশী এসেছে তার সাথে বিভিন্ন কথায় মশগুল। অর্পা পাখি ছাঁদে বসে চাঁদ

দেখছে। এলিজা নিজ ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে।বাড়ির পেছন দিকের ঝোপঝাড় টা দেখা যাচ্ছে ।ধমকা হাওয়া তে গাছের পাতা গুলো এদিক সেদিক নড়ছে। এলিজা অপূর্বর অপেক্ষায়। বিকেলে বের হয়েছে বললো, সূর্যর সাথে দরকার আছে। অপূর্ব কে ছাড়া এলিজা একাকিত্ব অনুভব করে। এলিজা আকাশের দিকে তাকিয়ে

আছে। আকাশের তারা গুলো দেখছে। কপালের কাছে ছোট চুল গুলো একদিকে উড়ছে।সন্ধ্যার তারা গুলো ঘর পাল্টাচ্ছে। এলিজা অপলকে দেখছে।একা একা বির বির করে বলছে,হাজারো তারাদের মধ্যে একটা আমার বাবা,একটা মা,একটা আমার ভাই। আমাদের একা করে দিয়ে এভাবে চলে গেলে। খুব মনে পরে তোমাদের।এলিজার

চোখ গড়িয়ে পানি পড়ছে,, তৎক্ষণাৎ পেছন থেকে এসে অপূর্ব জড়িয়ে ধরে। এলিজা হকচকিয়ে উঠে।দ্রুত হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখের পানি মুছে। অপূর্ব খেয়াল করলো এলিজা কাঁদছে। অপূর্ব ভ্রু কুঁচকে বললো,কি হয়েছে কাঁদছো কেন! কিছু হয়েছে! এলিজা মৃদু হেসে বললো, কোথায় কাঁদছি।চোখে কিছু পরেছে। অপূর্ব বললো, আমার সাথে

মিথ্যা বলে কি হবে!বলো কি হয়েছে! আমি তোমার মন ভালো করার চেষ্টা করবো! আর সেটাও না পারলে, তোমার মন খারাপের সঙ্গীই হলাম। এলিজা জ্বল জ্বল চোখে বললো,মা বাবার কথা খুব মনে পরছিলো। অপূর্ব এলিজা-কে শক্ত করে ধরে বললো, কখনো তোমার মা বাবার কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি।কিভাবে মারা যান তারা? এলিজা ভারি

একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেলে বললো, স্বার্থপর ছিলো আমার বাবা মা! অপূর্ব অবাক হয়। এলিজা কে ছেড়ে দিয়ে এলিজার পাশে দাড়ায়। এলিজার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো,কি করেছে তারা। এলিজা অপূর্বর ঘা ঘেষে হাতের উপর মাথা রেখে বললো, আমাকে ছেড়ে তারা অতি তাড়াতাড়ি চলে গেছে। অপূর্ব সান্ত স্বরে বলল, দুনিয়াতে যার

যতদিন আয়ু থাকবে সে'তো ততদিন ই বাঁচবে।তাই বলে এভাবে বলতে হয়। তাদের জন্য দোয়া করবে। এলিজা কিছু বললো না।রাত ১০ টা নাগাদ

পাখি বৈঠকখানায় বসে আছে। শ্রাবন কখন ফিরবে।পাখির শরীর ভালো নয়। অনুভব করলো,শরীর খুব ক্লান্ত লাগছে। হঠাৎ হঠাৎ চোঁখের সামনে সব ঝাঁপসা হয়ে যাচ্ছে। কানের

ভেতর এক প্রকার শব্দ হচ্ছে।পাখি রান্না ঘরে গিয়ে পানি খায়।শরীর ঝিমঝিম করছে। শান্ত হয়ে কিছুক্ষণ বসে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় শ্রাবন। শ্রাবন পাখির কাছে এসেই পাখিকে জড়িয়ে ধরে। মৃদু হাসি দিয়ে বললো, পিচ্চি বেয়ান, আমার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে বুঝি।পাখি বলল,আর কার জন্য অপেক্ষা করবো! পাখি শ্রাবন কে বললো,হাত

মুখ ধুয়ে আসুন।আমি আপনাকে খাবার দিচ্ছি। শ্রাবন পাখির শরীর ঘেঁষে বসে বললো,আজকে তুমি আমাকে খাইয়ে দিবে।পাখি মৃদু হাসে। শ্রাবন সিড়ি বেয়ে উঠতেই,থম মেরে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে বললো , তোমাকে আমি বিশেষ একটা জিনিস দেখাবো।পাখি ভ্রু কুঁচকে দেয়।

শ্রাবন খেতে বসলে খাবার না খেয়ে বসে আছে।পাখি ভেজা কণ্ঠে বললো, খাচ্ছেন না কেন? শ্রাবন বললো,খাইয়ে না দিলে খাচ্ছি না। পাখি আওয়াজ করে হেসে বললো, আপনি না সত্যি ই পাগল।

তোমার মায়াতে পাগল”বললো শ্রাবন।

শ্রাবন খেতে খেতে বললো,বাকিরা কোথায়?

যে যার ঘরে।

তারা খেয়েছে?

হুম।

খাওয়া শেষে শ্রাবন বললো,এবার চলো।

কোথায়?

চলোই না! তার আগে চোখ বন্ধ করো!

পাখি ইতস্তত বোধ করে। শ্রাবন পাখির চোখ ধরে বাহিরে নিয়ে যায়।

কিছুটা দূরে নিয়ে যায়।পাখি বললো, কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?শ্রাবন হাত সরিয়ে দেয়।পাখি দেখলো চারদিক অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই। বাড়ির ভেতর ছোট বাগানের গাছ গুলো। আশেপাশে গাছ ,ছাড়া আর কিছুই নেই।পাখি অন্ধকার দেখে শ্রাবন কে আঝাপটা দিয়ে জড়িয়ে ধরে। শ্রাবন খিল খিল করে হেসে বললো, তোমার চোখে ভুতের ভয়

দেখলে আমার বেশ ভালো ই লাগে। পাখি রাগান্বিত হয়ে বললো, আপনি সবসময় আমার সাথে মজা করেন। শ্রাবন হেসে বললো,পিচ্চি বেয়ান এর সাথেই তো মজা করতে হয়। আর কার সাথে করবো!পাখি শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে। শ্রাবন পরোখ করে দেখলো পাখি চোখ বুঝে আছে। শ্রাবন শান্ত গলায় বললো,চোখ খুলো আমি আছিতো।

পাখি নরম গলায় বললো, ভুত আছে, অন্ধকার দেখলেই আমার ভয় হয়। শ্রাবন পাখিকে রাগানোর জন্য বললো, আমার তো আমার পিচ্চি বেয়ান কে দেখলেই ভয় লাগে।পাখি এটা শুনে শ্রাবন কে আদুরে আচে,মার শুরু করে। শ্রাবন পাখিকে রেখে ঘরের দিক দৌড় দিয়ে বললো,পারলে ছোঁয় আমাকে।পাখি শ্রাবনের পেছনে ছুটতে থাকে।

শ্রাবন সিড়ি বেয়ে উপরে যেতেই,পাখি ধপাস করে মেঝেতে লুটিয়ে পরে। শ্রাবন হতভম্ব হয়ে যায়।মুখের রং নিমিষেই পরিবর্তন হয়ে কালো হয়ে যায়। শ্রাবন কাঁপা হাতে পাখিকে জড়িয়ে ধরে বললো,এই পাখি ,পাখি, হঠাৎ কি হলো।পাখি ,মজা করছো আমার সাথে।আমি কিন্তু বুঝতে পারছি।এই পাখি চোখ খুলো। শ্রাবন ভাবলো

পাখি মজা করছে। শ্রাবন মৃদু হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বললো,ঐ যে ভুতের সব রাজারা দল বেঁধে আসছে। চললাম আমি তোমায় রেখে।শ্রাবন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। ভাবলো পাখি হয়তো পেছন থেকে এসে হয়তো জড়িয়ে ধরবে। শ্রাবন থমকে দাঁড়ায়।পাখি কিছু বলছে না। শ্রাবন পেছন ঘুরে পাখির দিকে দেখে পাখি বলে এক চিৎকার।

শ্রাবন মেঝেতে লুটিয়ে পরে। শ্রাবন দেখলো পাখির কান থেকে রক্ত বের হচ্ছে। শ্রাবন এর চিৎকার এর আওয়াজ শুনে বাড়ির সকলে বেড়িয়ে আসে। শ্রাবন পাখিকে জড়িয়ে ধরে অঝরে কান্না শুরু করে।ভাঙ্গা গলায় বললো,এই পাখি চোখ খুলো পাখি।আর ভয় দেখাবো না।কান ধরেছি।আর ভয় দেখাবো না উঠো। দ্রুত পায়ে সবাই ঘর

থেকে থেকে চলে আসে। এলিজা লুটিয়ে পরে।সবাই আতংকিত হয়ে পরে। অপূর্ব পাল্স পর্যবেক্ষন করে বললো,দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। শ্রাবন পাখিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে। অপূর্ব কে বললো, জলদি এ্যাম্বুলেন্স কে ফোন কর।

পাখি ধিরে ধিরে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। শ্রাবনের চোখের পানিতে

পাখির কপাল ভিজে যাচ্ছে......ঢাকা পিজি হাসপাতালে সবাই উপস্থিত হয়। এলিজা বসে বসে ফোপাচ্ছে। অপূর্ব দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। মমতাজ অর্পা সিটে বসে আছে। শ্রাবন সিটের পাশে মেঝেতে লুটিয়ে বসে আছে। শ্রাবন ভেঙে পরেছে। ভেতরটা ভেঙে চুরে যাচ্ছে। নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। মস্তিষ্কের নিউরন গুলো ছিরে যাচ্ছে। চোখ গুলো রক্ত মাখা

লাল হয়ে গেছে। অপূর্ব শ্রাবনের দিকে পরোখ করছে। শ্রাবনের কাছে যায়। শ্রাবনের কাঁদে শান্তনা মূলক হাত দিয়ে বললো,ডাক্তার দেখছে তো! এভাবে ভেঙে পরছিস কেন। সব ঠিক হয়ে যাবে।শ্রাবন কিছু বলছে না। শুধু চোখ দিয়ে অনবরত পানি পরছে। মমতাজ কাঁদছে,পাখির জন্য। দ্বিতীয়ত তার ছেলের জন্য। মমতাজ দেখছে শ্রাবন কতটা ভেঙে

পরেছে।চোখ মুখ নিমিষেই বিষিন্নত হয়ে গেছে। নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে শ্রাবন।যদি পাখির কিছু হয়ে যায় তবে, শ্রাবন যে...মমতাজ মনে মনে প্রার্থনা করতে থাকে যাতে পাখি সুস্থ হয়ে যায়। অপূর্ব এলিজার কাছে বসে। অপূর্ব এলিজার মাথা পাঁজরের উপর রাখে। অপূর্ব বলল, এভাবে ভেঙে পরলে কি করে হবে।পাখির কিছু হবে না। প্রার্থনা করো সব ঠিক

হয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ পাখির চেকাপ করে ডাক্তার বের হয়। শ্রাবন হকচকিয়ে উঠে দাড়ায়।ডাক্তার কে জিজ্ঞেস করলো,কি হয়েছে পাখির? ডাক্তার দৃষ্টি সংযত করে বললো, এখন পর্যন্ত ঠিক আছে। প্রার্থনা করুন যাতে ঠিক হয়ে যায়। ইনজেকশন দিয়ে দিয়েছি জ্ঞান ফিরলে দেখা করতে পারবেন।এই বলে ডাক্তার চলে যায়। শ্রাবন এক

কদম -দু কদম করে,ধমকে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পরে। সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।গোটা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।কালো ধোঁয়া আমাকে গ্রা,স করার জন্য ধেয়ে আসছে।আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আমার জীবনের শেষ হাঁসি আমি আজকেই হেঁসে নিয়েছি।বুকের ভেতর কেন জানি কুহ ডাকছে। শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে।

এমন অনুভূতি কেন হচ্ছে। শ্রাবন এসব ভাবতে ভাবতে নিজের চুল গুলো নিজেই টানছে। অপূর্ব হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখ মুছে।পাখিকে নিজের ছোট বোনের মত স্নেহ করতো। মমতাজ দূরে সরে যায়। শ্রাবনের এরকম নিস্তেজ হওয়া সে সহ্য করতে পারছে না।রাত বেড়ে চলেছে। হাসপাতালের মানুষজন চারদিকে ছোটাছুটি করছে।কেউ

নতুন মানুষের আগমন নিয়ে ব্যাস্ত,কেউ নিজের মানুষ হারানোর বেঁদনায় কাতর।কেউ কেউ তার কাছের মানুষ হারানোর ভয়ে চাপসে যাচ্ছে।

শ্রাবন হতাশায় এক কোনে বসে আছে।ভাবছে, কিছুক্ষণ আগেও তো পাখি কত সুন্দর হাসছিল, কথা বলছিলো,আমাকে জড়িয়ে ধরে ছিলো,খাইয়ে দিয়েছিলো। হঠাৎ করে

কি হলো পাখির। শ্রাবন প্রার্থনা করতে থাকে সৃষ্টিকর্তার কাছে,বিরবির করে বলছে,পাখির অসুস্থতা আমাকে দিয়ে দাও। আমার আয়ু পাখিকে দিয়ে দাও।পাখিকে সুস্থ করে দাও।

রাত বাড়ছে। অপূর্ব ভাবলো এভাবে সবাই হতভম্ব হয়ে বসে থাকলে সবাই নিস্তেজ হয়ে যাবে।বাড়িতে বাবা একা।তাই অপূর্ব মমতাজ,

এলিজা-কে বললো বাড়ি ফিরে যেতে। এলিজা রাজি হলো না। অপূর্ব জোর করলো। এলিজা যেতে রাজি নয়। অপূর্ব কিছুক্ষণ বোঝানোর পর এলিজা যেতে রাজি হয়। অপূর্ব মমতাজ এলিজা-কে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।রাত ১১ টা নাগাদ।

শ্রাবন সিটের উপর বসে আছে।দু হাতের উপর মুখের ভর দিয়ে

অঝরে কাঁদছে। শব্দহীন কান্না।নিরব কান্না'শ্রাবনের বুকের ভেতর টা দুমরে মুচড়ে যাচ্ছে।চোখ গুলো রক্ত মাখা হয়ে আছে। অপূর্ব পাশে বসে শ্রাবন কে পরোখ করছে। শ্রাবন উঠে দাড়ায়।আইসিইউর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গ্লাস দিয়ে দেখছে। পাখি নিস্তেজ হয়ে সুয়ে আছে। ফিসফিস করে বলছে,পাখিহহ..তৎক্ষণাৎ নার্স

বেরিয়ে আসে। শ্রাবন হাতের উল্টো দিক চোখের পানি মুছে।নার্সকে দেখে অপূর্ব কাছে আসে।নার্স বললো,আপনারা দেখা করতে পারেন।তবে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। শ্রাবন নার্স এর কথা শেষ হওয়ার আগেই ভেতরে চলে যায়। পাখি ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে আছে। শ্রাবন ধির পায়ে এগোয়।পাখির সামনে যায়।পাখি শ্রাবনের দিকে

দৃষ্টি স্থাপন করে। শ্রাবন টুলের উপর বসে।পাখি জ্বল জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে। শ্রাবন পাখির হাত আলতো করে ধরে,ভাঙা গলায় বললো, এভাবে কেন আমায় কষ্ট দিচ্ছ!কেন আমার ভেতরটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছ! বেঁচে থাকতেও যে মরে যাচ্ছি।পাখি চোখে পানি নিয়ে মৃদু হেসে ধীরে ধীরে বললো,আমি মরে যাবো সেই

ভেবে আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না,যতটা কষ্ট আপনার চোখে পানি দেখে হচ্ছে ”শ্রাবন পাখির হাতের উল্টো দিকে চুমু খায়।পাখি বললো, আপনি এভাবে ভেঙে পরবেন না। আমি যতটুকু সুস্থ হবো’আপনার এরকম অবস্থা দেখে আরো নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছি। শ্রাবন পাখির মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ভরসা স্বরে বলল,তুমি ঠিক হয়ে যাবে। কিছু

হবে না তোমার। অপূর্ব দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে। অপূর্ব চোখের পানি মুছে। পাখির যদি কিছু হয়ে যায় তবে যে শ্রাবন.. না ওর যাতে কিছু না হয়। অপূর্ব এসব ভাবতেই,নার্স হাজির হয়। শ্রাবন কে বললো। দয়াকরে এখন চলে যান। শ্রাবন পাখির কপালে চুমু খায়। হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখের পানি মুছে চলে যায়।রাত গভীর

থেকে গভীরতর হচ্ছে। হাসপাতাল নিরব হয়ে যাচ্ছে।

”’’এলিজা ঘরের এক কোনেতে বসে আছে । পাখিই একমাত্র তার রক্তের বন্ধন।পাখির যদি কিছু হয়ে যায় তবে,এই দুনিয়াতে আর রক্তের বলতে কেউ থাকবে না। আমার বোন, আমার ছোট্ট পাখি,কি করে থাকবো আমার বোনকে ছাড়া। এলিজা ফোপাতে থাকে।অর্পা

এলিজার ঘরে আসে।অর্পা ঘুমোয়নি। অর্পা এলিজার কাছে আসে।জ্বল জ্বল চোখে বললো,বউমনি আমার ও পাখির জন্য ভিষন কষ্ট হচ্ছে।আমি নামাজ পরে দোয়া করেছি।দেখবে পাখি ঠিক হয়ে যাবে।এলিজা উঠে এসে বারান্দায় দাড়ায়।শাড়ির আঁচল টা ধমকা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।অর্পা পেছনে এসে দাড়ায়। এলিজা

জ্বলজ্বল চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো,এই স্বার্থপর দুনিয়াতে কেন পাঠালে।যেখানে প্রিয় মানুষ গুলো মায়াজাল থেকে ছেড়ে চলে যায়।কতটা যে কষ্ট তাদের হারানো।

অর্পা অপলকে দেখছে।ভাবছে, এলিজার কথা বলার ভঙ্গিমায় বোঝা যাচ্ছে সৃষ্টিকর্তার সাথে অভিমানে

কথা বলছে।অর্পা কিছু বললো না।”পিজি হাসপাতাল”
”’অপূর্ব শ্রাবন কে শান্তনা দেয়। শ্রাবন কোন কথা বলছে না। অপূর্ব উঠে যায়।এদিক সেদিক হাঁটছে।ঘুরে ঘুরে দেখছে চারপাশে কত মানুষ নিস্তেজ হয়ে পরে আছে। হাসপাতালে না আসলে বোঝা যায়না সুস্থতা সৃষ্টিকর্তার কত বড় উপহার। অপূর্ব এক গলি থেকে আরেক

গলিতে যাচ্ছে।কোন কিছু ভালো লাগছে না।পাখি অসুস্থ। শ্রাবন হতাশ।তার সাথে পূরো পরিবার হতাশ। এত এত চিন্তার মধ্যে ও সূর্যর চিন্তা গ্রা,স করে। অপূর্ব পায়চারি করতে থাকে। হঠাৎ অপূর্ব ডান দিকে পরোখ করে, অপূর্ব চোখ গুলো বড় বড় করে ফেলে, অপূর্ব দেখলো রেখা একজন নার্সের সাথে কথা বলছে।এই রেখা এখানে কি

করছে। হাসপাতালে আসছে তবুও কাপড় পরিধান ঠিক নয়। অসহ্য’অপূর্ব দূর থেকে খেয়াল করলো,রেখা আঙুল দেখিয়ে কথা বলছে তার সামনে থাকা নার্সের সাথে। অপূর্বর খটকা লাগলো কি বলছে। অপূর্ব সামনে এগোতে থাকে। অপূর্ব ধির পায়ে এগোতে থাকলে রেখা ততক্ষনে কথা শেষ করে অনেক দূর চলে যায়। অপূর্ব

চেষ্টা করলো না রেখাকে ধরার। অপূর্ব আইসিইউর সামনে চলে আসে।এসে সিটে বসে কিন্তু আশেপাশে শ্রাবন নেই। অপূর্ব এদিক ওদিক পরোখ করে দেখলো। ভাবলো হয়তো আশেপাশে আছে। অপূর্ব বেশ কিছুক্ষণ বসে আছে। শ্রাবন আসছে না। অপূর্ব দ্রুত পায়ে উঠে দাড়ায়। আশেপাশে খুঁজতে থাকে কোথাও নেই শ্রাবন। অপূর্ব

চিন্তায় পড়ে যায়,পাখিকে এখানে রেখে কোথায় যাবে। অপূর্ব দেখলো একটা আইসিইউ থেকে একজন নার্স বের হচ্ছে।তাকে জিজ্ঞেস করলো, সিস্টার! এখানে একজন লোক ছিলো দেখতে, লম্বাটে,ফর্সা,কালো জ্যাকেট পরিধান করা সে কোথায়?নার্স টি মনে করে বললো,ওনাকে একজন লোকের

সাথে কথা বলতে বলতে বাহিরে যেতে দেখেছি।

অপূর্ব চোখ বড় করে ফেলে।ভ্রু কুঁচকে আতংক স্বরে বলল,লোকটি দেখতে কেমন ছিলো?

সিস্টার বললো, ইমাম-দের মত।

অপূর্ব বিষিন্নত হয়ে যায়।কার সাথে কোথায় গেলো।পাখিকে এভাবে রেখে কোথায় যাবে! অপূর্ব দ্রুত পায়ে বাহিরে বের হয়।অর্পা ঘুমিয়ে

পরে।সাথে মমতাজ। জাহাঙ্গীর আজকাল ঘর থেকে কম বের হয়। জয়া চলে যাওয়ার পর জাহাঙ্গীরের তেজ ও চলে যায়।কারো সাথে রাগ দেখান না। উচ্চ স্বরে কথাও বলে না।রাত অনেক জাহাঙ্গীর ঘুমোয়নি। ঘরের ভেতর পায়চারি করছে। পায়চারি করতে করতে লম্বা টে ভারী দেহ নিয়ে বসে পরে চেয়ারে। পরনে রাতের পোশাক।একটা

সিগার ধরায়। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় মনোরা।হাতে চা নিয়ে।এত রাতে চা খাওয়া টা মনোরার অন্য রকম লাগলো। আজকাল জাহাঙ্গীর নিশ্চুপ থাকলেও,তার মনের ভেতর হাজারো ভাবনা ঘুরে।এসব ভাবনা ভেবেই উপেক্ষা করে মনোরা বললো,বড় দাদা আপনার চা। জাহাঙ্গীর হাত ইশারা করে মনোরা কে চলে যেতে বলে।মনোরা চলে

যায় ।মনোরা গিয়ে সুয়ে পরে।
এলিজা বিছানায় সুয়ে এপাশ ওপাশ
করছে।পাখির চিন্তায় ঘুম আসছে
না। অপূর্ব যে বালিশে সোয়,সেই
বালিশ টা বুকের মধ্যে জড়িয়ে
রেখেছে। অপূর্বর শরীরের গন্ধ
আসছে বালিশ থেকে,তা শুঁকছে।
এলিজা একপ্রকার শান্তি অনুভব
করলো। অপূর্বর কথা ভাবতেই
মনের অজান্তেই ঠোঁটের এক কোনে

হাঁসি চলে আসে। এলিজা চোখ বুঝবে ঠিক তখনই শুনতে পায়,কারো পায়ের আওয়াজ। অচেনা কারো উপস্থিতি।রাত এখন গভীর। এলিজা কান খাড়া করে শুনতে পায় কেউ হেটে আসছে। এলিজা উঠে বসে।তার পায়ের আওয়াজ,এলিজার ঘরের সামনে এসেই থেমে যায়।এত রাতে কে আসবে। এলিজা চিন্তিত হয়।ঘরের ভেতরে রা,ম দা খুঁজতে

থাকে। কিন্তু কোথাও রা,মদা পেলো না।কারন অপূর্ব সব ঘর থেকে সরিয়ে স্টোর ঘরে রাখে। এলিজা দরজার সামনে আসে।মনে হচ্ছে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটি। এলিজা দরজা খোলার মনস্থির করলো।তার আগে এলিজা কর্কট স্বরে বলল,কে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে? কি চাই?ওমনি পায়ের আওয়াজ দূরে চলে যায়।

অর্থাৎ,দরজার সামনে থেকে সরে গিয়েছে লোকটি।এলিজা অবাক হয় কে ছিলো। এলিজা দরজা খুলে দেয়।বাহিরে বের হয়। এদিক সেদিক পরোক্ষ করে। কোথায় কেউ নেই। এলিজা সামনে এগোয়। কোথাও কেউ নেই তবে কি মনের ভুল। এলিজা ঘরের উদ্দেশ্যে আসতেই , হঠাৎ করে কালো রঙের মুখোশ পরা একজন লোক এলিজার

সামনে দাড়ায়। এলিজা থমকে যায়। মুখোশধারী লোকটির হাতে রামদা। এলিজা কর্কট মেজাজে বললো,কে তুই? আর আমার পেছনে কেন পরে আছিস?কে পাঠিয়েছে তোকে? লোকটি অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘার এদিক সেদিক করে।কোন কথার উত্তর দিলো না।লোকটি ধিরে ধিরে এলিজার দিকে এগোয়। এলিজা পেছনে সরে যায়। এলিজা দেয়াল

ঘেঁষে যেতেই হাতের কাছে পায়, ফুলদানি। এলিজা ফুলদানি টা হাতে নিয়ে অচেনা লোকটির গায়ে ছুড়ে মারে।লোকটি দৃষ্টি অন্য দিকে দর্পন হয়। এলিজা দৌড়ে ঘরের দিকে আসতেই কারো সাথে ধাক্কা খেয়ে পরে যায়। এলিজা পেছন ঘুরে পরোখ করতেই দেখে,কেউ দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা টে শরীর।ভারী দেহ,খানি নিয়ে কড়া চোখে তাকিয়ে

আছে।সে আর কেউ নয় জাহাঙ্গীর। এলিজা ভ্রু কুঁচকে দেয়। এলিজা ভাঙা গলায় বললো, তারমানে আপনি বাবা..। এলিজা ধিরে ধিরে উঠে দাড়ায়। জাহাঙ্গীর কিছু বলছে না।এলিজা রক্ত মাখা চোখে বললো , আপনি আমাকে মারতে চান? জাহাঙ্গীর সাপের মত ফোঁস ফোস করছে।মুখোশধারী লোকটি সামনে এগোয়, এলিজা কে ধরার জন্য,

তৎক্ষণাৎ জাহাঙ্গীর মুখোশধারী লোকটির উপর রা,মদা দিয়ে আঘাত করে।লোকটির হাতের উপর আঘাত লাগে। জাহাঙ্গীর কর্কট মেজাজে বললো, আমার মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছিস! এত বড় সাহস! শেষ করে দেবো আজ তোকে! মুখোশধারী লোকটি উল্টো দিকে দৌড়ে চলে যায়। এলিজা জাহাঙ্গীর এর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়।

পিজি হাসপাতাল—অপূর্ব বাহিরে বের হয়। হাসপাতালের সামনের দিক থেকে,আনাচে কানাচে সব জায়গায় খুজে দেখে। কোথাও শ্রাবন নেই। অপূর্ব ক্লান্ত হয়ে যায়।ভাবলো যেখানেই আছে,হয়তো ফিরে আসবে।পাখিকে এভাবে রেখে কোথায় যাবে। অপূর্ব ভেতরে আসতেই চোখ পরে, হাসপাতালের পাশে ছোট মসজিদ এর সামনে

জুতো রাখার দিকে।তাও দু জোড়া জুতো। অপূর্ব পরিষ্কার করে দেখার চেষ্টা করলে দেখে একজোড়া শ্রাবণের জুতো। অপূর্ব মসজিদ এর কাছে এগোয়।এত রাতে কেউ তো মসজিদে থাকবে না। এখন গভীর রাত। অপূর্ব ভেতরে উঁকি মেরে দেখতেই দেখে শ্রাবণ নামাজ পরছে। শ্রাবনের সাথে একজন ইমাম সাহেব।অপূর্ব বুঝতে পেরেছে

হয়তো এনার সাথেই শ্রাবন বাহিরে আসে। অপূর্ব মসজিদ এর মেঝেতে লুটিয়ে বসে। ক্লান্ত হয়ে আছে অপূর্ব। অপূর্ব শান্তির একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলে।ভাবলো, শ্রাবন পাখিকে রেখে কোথাও চলে যাবে এটা কখনো হতে পারে না। শ্রাবন পাখির জন্য ই এত রাতে নামাজ পরছে ।শ্রাবন নামাজ পরছে।তার সাথে কাঁদছে।পাশে থাকা ইমাম

সাহেব বুঝতে পারছে। ইমাম সাহেব,বির বির করে বলছে, এরকম স্বামীর ভালবাসা থেকে তার স্ত্রী কে দূরে সরিয়ে নিও না। শ্রাবন নামাজ শেষ করে বাহিরে আসে। দরজার সামনে দেখতে পায়,অপূর্ব বসে আছে। শ্রাবন বললো,ভাই তুই এখানে? অপূর্ব উঠে দাড়ায়। বললো,তোকে না পেয়ে আমি চিন্তায় পড়ে যাই। কোথায় না কোথায় চলে

গেছিস। চারদিকে যা হচ্ছে ।শ্রাবন মৃদু হেসে বললো, ভালো লাগছিল না কিছু।তখন এখানের ইমাম কে ভেতরে দেখি।ওনার মেয়েও অসুস্থ বললো,উনি তাহাজ্জুদ পরতেই আসছিলেন।তাই আমিও চলে আসলাম।পাখির জন্য দোয়া করলাম। অপূর্ব শ্রাবনের কাঁদে হাত দিয়ে বললো,তোর মত স্বামি পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।যে কিনা তার স্ত্রীর

অসুস্থতায়,নামাজে বসে কাঁদে।নতুন ভোরের সূর্যর কিরন নিয়ে আলোকিত হয় পূর্ন সকাল। এলিজা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে রান্না ঘরে চলে যায়।পাখির জন্য কিছু খাবার রান্না করে নিয়ে যাবে হাসপাতালে। মনজুরা এসেছে। মনজুরা মনোরা,দু'জন এলিজাকে কাজে সাহায্য করছে। মমতাজ রান্না ঘরে আসে এলিজাকে বললো, তুমি

হাসপাতালে যাওয়ার জন্য তৈরি হও।আমি এদিক টা সামলাচ্ছি। এলিজা মৃদু হাসি দিয়ে উপরে চলে যায়।কালো রঙের শাড়ি পরে।তার সাথে চুল গুলো বেনুনি।

কিছুক্ষণ এর মধ্যে ই বেড়িয়ে পরে হাসপাতের উদ্যেশ্যে।শ্রাবন শুকনো মুখে বসে আছে সিটের উপর ।বার বার উকি মেরে দেখছে পাখিকে। অপূর্ব সান্ত স্বরে বলল,আমি বাহির

থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসি। এভাবে না খেয়ে থাকলে যে অসুস্থ হয়ে পরবি। শ্রাবন আহত কণ্ঠে বললো, আমার পাখি নিস্তেজ হয়ে সুয়ে আছে আর আমি খাবার খাবো। গলা দিয়ে নামবে । অপূর্ব কিছুটা রেগে বললো, তবে কি তুই চাস তোর এই শুকনো মুখ দেখে পাখি আরো ভেঙে পরুক, অসুস্থ হোক! শ্রাবন কিছু বললো না। তৎক্ষণাৎ

উপস্থিত হয় ডাক্তার। অপূর্ব শ্রাবন উঠে দাড়ায়। শ্রাবন আহত কন্ঠে বললো, পাখির কি অবস্থা! ও কি সুস্থ হয়ে যাবে!আমরা কি পাখিকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো!ডাক্তার বললো,পাখির যা শারীরিক অবস্থা,তাতে বাড়ি রাখা সম্ভব নয়। হাসপাতালেই রাখতে হবে।যদি হাসপাতালে থাকে তবে আমাদের আয়ত্তে থাকবে।পাখির জন্য ভালো

হবে। এখন আপনাদের ইচ্ছা।বলেই ডাক্তার চলে যাম। শ্রাবন থমকে যায়।ক্লান্ত শরীর নিয়ে বসে পরে । মুখের রঙ নিমিষেই বদলে যায়। শ্রাবন কাপা কণ্ঠে বললো, পাখি আর কোনদিন তার স্বামীর ঘরে ফিরবে না ‘এটা কি করে হতে পারে।কেন আমার সাথেই এমন টা হলো। অপূর্ব কি বলবে বুঝতে পারছে না।

শান্তনা দেয়ার মত কোন শব্দ নেই। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় এলিজা। এলিজা পাখির কাছে কাছে আসে। নার্স বললো আপনারা বেশিক্ষণ রোগীর কাছে থাকবেন না।পাখি ধিরে ধিরে উঠে বসে। শ্রাবন বেডের কাছে দাঁড়িয়ে। এলিজা খাবার খাওয়া তে চাইলো পাখিকে।পাখি খেতে চাইলো না। এলিজা মুখের ভাষাতে বুঝে গেছে কি বলতে চায়।

এলিজা মৃদু হেসে বললো,তুই আগে খেয়ে নে তারপর শ্রাবন খেয়ে নিবে। শ্রাবন এলিজার হাত থেকে খাবারের বাটি টা নেয়।বললো আমি খাইয়ে দিচ্ছি,এবার তো খেয়ে নাও।তুমি খেয়ে নেয়ার পর আমরা খাবো।পাখি শ্রাবনের হাতে খেয়ে নেয়।এলিজা অপূর্বর দিকে পরোক্ষ করে। এলিজা দেখলো অপূর্বর চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে।এলিজা বাহিরে সিটে বসে।

অপূর্ব কে খাবার দিয়ে বললো খেয়েনিন। অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, আমার জন্য চিন্তা হচ্ছিল বুঝি।

এলিজা দৃষ্টি সংযত করে বললো,হওয়ার ই তো কথা। আপনার এখানে থাকতে হবে না বাড়ি চলুন। এখানে আমি আর শ্রাবন থাকবো।আর তা না হলে আমরা পাখিকে বাড়ি নিয়ে যাবো।

অপূর্ব বললো,পাখিকে আর বাড়ি় নেয়া যাবে না।ডাক্তার বলেছেন এখন থেকে এখানেই রাখতে হবে। এলিজা কাঁপা গলায় বললো,কি বলছেন আপনি?

অপূর্ব হ্যা সুচক মাথা নাড়ে।

দেখতে দেখতে কেটে যায় ৩টি দিন! শ্রাবন আর থানাতে যাবে না বলে দিয়েছে ।কারন পাখিকে রেখে এক মুহুর্ত ও দূরে থাকা শ্রাবনের জন্য

কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে।কখন কি হয় না হয় ,এই ভেবে কাজ থেকে লম্বা একটা ছুটি নিয়েছে। এখন বলছে আর চাকরি ই করবে না।

অপূর্ব থানাতে বসে নতুন কিছু ফাইল দেখছে। তখন উপস্থিত হয়,ডিসি সাহেব বললো, অপূর্ব আমরা কি সেই সাই,কো কি,লার কে খুঁজে পেতে ব্যার্থ হলাম। অপূর্ব চা খেতে খেতে বললো,এর শেষ তো

হতেই হবে।হয়তো দুদিন আগে নয়তো পরে। আপনি এ নিয়ে চিন্তা করবেন না।ডিসি সাহেব চলে যায়। অপূর্ব নতুন করে সেই চিন্তায় ডুবে যায়। অপূর্ব চেয়ারে টান হয়ে বসে পরে। বিকেল ৩টা নাগাদ।এলিজা গতকাল তিলকনগর গেছে।মামা মামির কাছে।বাড়িতে জাহাঙ্গীর, মমতাজ অর্পা, এবং কাজের লোক ছাড়া আর কেউ নেই। শ্রাবন

হাসপাতাল পাখির কাছে।বাড়িটা সম্পুর্ন নিস্তব্দ। অপূর্ব বসে বসে এসব ভাবতেই থানাতে উপস্থিত হয় সূর্যর মা। অপূর্ব হকচকিয়ে উঠে। অপূর্ব বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো,আরে আন্টি আপনি এখানে? সূর্যের মা কাপা কন্ঠে বলল, সূর্য দুদিন ধরে বাড়ি ফেরেনি ।ওর বাবার শরীর টা হঠাৎ করেই খারাপ হয়।জানি না এই অবস্থায় ছেলেটা

কোথায় গেছে।তাই তোমার কাছে আসলাম। অপূর্ব মেঝেতে দৃষ্টি স্থাপন করলো। অপূর্ব বুঝতে পেরেছে সূর্য কোথায় আছে। অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, আপনি চিন্তা করবেন না আমি সূর্য কে পাঠিয়ে দিবো।সূর্যর মা চলে যায়। অপূর্ব ভাবলো সূর্য সেই পরিত্যাক্ত বাড়িতে আছে। অপূর্ব সেই বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। অপূর্ব তিলকনগর

পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে যায়।গাড়ি তিলকনগর বাজারে রেখে হাঁটতে শুরু করে। কিছুক্ষণ এর মধ্যে রুশরাজ্যে পৌছায়। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে পৌছায় পরিত্যাক্ত বাড়িতে। সূর্যদের আস্তানায়।দিনেও এই জায়গাটা এতটা শুনশান যে,কোন পাখিও এখানে থাকে না। অপূর্ব বাড়িটার চারদিক দেখছে।ভেতরে

কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। দরজা বন্ধ। অপূর্ব সেদিন যে জানালা থেকে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেছিলো সেখান থেকে ভেতরে প্রবেশ করে। অপূর্ব ধিরে ধিরে উপরে উঠে। কিন্তু কোথাও নেই। অপূর্ব প্রতিটা ঘর খুঁজে। ।কোথাও কেউ নেই। অপূর্ব থম মেরে বসে পরে। কোথায় এরা। অপূর্বর হঠাৎ মনে পরলো সাগরের লাশের কথা।

সাগরের লাশের সাথে সাগরের বউ ছিলো সেই ঘরটা দেখা হয়নি। অপূর্ব দ্রুত পায়ে হেঁটে সেই ঘরে আসে। অপূর্ব যা দেখে অপূর্ব সম্পূর্ণ ভাবে বিষিন্নত হয়ে যায়।সেই ঘর সম্পুর্ন ফাঁকা।কোথাও কিছু নেই।মৃত দেহ অক্ষয় রাখার ক্যামিকেল গুলো ও নেই। অপূর্ব ঘামতে শুরু করে। কোথায় যাবে এরা। তারমানে এদের অন্য কোন আস্তানা আছে।আর আমি

সবকিছু জেনে যাওয়া তে ওরা এখান থেকে চলে যায়। অপূর্ব রেগে দেয়ালে এক ঘুষি মেরে বললো, তুই আমায় দ্বিতীয় বার বোকা বানিয়ে আমার চোখে ধুলো দিলি। সূর্য আমার হাত থেকে তুই রক্ষা পাবি না।অপূর্ব ভাবলো কিভাবে ওদের আস্তানা অব্দি পৌছাবো। কিভাবে হাশেমের দেয়া নকশার সে-ই স্থানে পৌছাবো। অপূর্ব সিড়ির উপর বসে

পরে। মস্তিষ্ক ঘাটালো,ভাবলো অপরাধী নিজেকে যতই চালাক ভাবুক না কেন,সে নির্বোধ হয়। অপরাধের মাঝে সে কোন না কোন ক্লু ফেলেই যায়। সূর্যর সমস্ত কিছু, সূর্যর বলা প্রতিটি অক্ষর মনে করতে থাকে। অপূর্ব এসব চিন্তা করতে করতে মাথা বেথা শুরু হয়। কোথায় ওদের আস্তানা কোথায়। অপূর্ব সূর্যর বলা প্রতিটি অক্ষর মনে

করতেই মনে পরে ”বাবর রাজ্যের’কথা। অপূর্বর বাবর রাজ্যের কথা মনে পরতেই , উঠে দাড়ায়। অপূর্ব মনস্থির করলো সেই পূরানো বাবর রাজ্যে যাবে।কি আছে সেই বাবর রাজ্যে।আসল সত্যিটা কি তা আমাকে জানতেই হবে। কিন্তু বাবর রাজ্য কোথায়।তার পথ কিভাবে আমি পাবো।বাবর রাজ্য এখন পরিত্যাক্ত হলেও একসময় সবাই তা

চিনতো।কেউ তো কিছু বলতে পারবে। অপূর্ব রুশরাজ্যে থেকে বের হয়।বেলা ফুরিয়ে যাচ্ছে।আশেপাশে কেউ নেই।কাকে জিজ্ঞেস করবে। অপূর্ব এদিক সেদিক পরোক্ষ করছে।দক্ষিন দিক থেকে দুজন লোক আসছে।বয়স মধ্যেম অপূর্ব মনস্থির করলো, তাদের জিজ্ঞেস করবে।লোক দুটো কাছে আসতেই দাড় করায়।লোক দুটো ভ্রু কুঁচকে

দেয়। অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো,চাচা বাবর রাজ্য টা কোথায়? বলতে পারেন!বাবর রাজ্যর নাম শুনতেই লোক দুটো চোখ বড় করে দুজন দুজনার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে,দুটো দ্রুত পায়ে অপূর্ব কে উপেক্ষা করে চলে যায়। অপূর্ব হতভম্ব হয় যায়।লোক দুটোর চাওয়ার পানে দেখে।ভাবলো ,কি

অদ্ভুত লোক। অপূর্ব চিন্তিত হয় কাকে জিজ্ঞেস করবে। অপূর্ব বাজারের উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকে, তৎক্ষণাৎ সামনে পরে রাশেদ। রাশেদ অপূর্ব কে দেখেই, অমৃদু হাঁসি দিয়ে বলল,স্যার আপনি! কেমন আছেন! অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা রাশেদ বাবর রাজ্য টা কোথায় বলতে পারবে! রাশেদ বাবর রাজ্যর কথা শুনেই মুখ

ফ্যাকাশে করে ফেলে,বললো না স্যার আমি তো জানি না। অপূর্ব বুঝতে পারলো রাশেদ জানে । রাশেদের মুখের ভাষাই তা বলে দিয়েছে। অপূর্ব পকেট থেকে মানিব্যাগ টা বের কিছু টাকা রাশেদ কে ধরিয়ে দেয় বললো,এই টাকা রাখ আর সত্যিটা বল! দরকার পরলে আরো দেবো! কোথায় সে রাজ্য! রাশেদ টাকা হাতে পেয়ে

বললো,স্যার অনেক দূর আর ঐ জায়গা টা অনেক ভয়ানক।কেউ যায়না।ওটা পরিত্যাক্ত । অপূর্ব বললো সে যাইহোক,আমি দেখে নিবো।তুই আমায় নিয়ে চল। রাশেদ মুখ ভার করে বললো,না স্যার আমি যামু না।আমি এত তাড়াতাড়ি মরতে চাই না । আপনি যান। অপূর্ব নিজের মাথায় হাত দিয়ে অসহ্য হয়ে বললো,তোর যেতে হবে না তুই দূর

থেকে দেখিয়ে চলে আসবি। রাশেদ রাজি হয়। অপূর্ব বললো, গাড়ি দরকার?

রাশেদ বললো, কিছুদূর গাড়িতে যাওয়া যাইবো।বেড়িয়ে পরে বাবররাজ্যের উদ্দেশ্যে। গাড়ি চলে তিলকনগর থেকে উত্তর দিকে।৩ ঘন্টা গাড়ি চলে। রাশেদ বললো এখানে থামেন। অপূর্ব বললো, চলে এসেছি? রাশেদ বললো না। সামনে

নদি।নদী টা অনেক বড়।এই নদীর পর আরো একটা নদী পাবেন।সেই টা পার হলেই বাবর রাজ্যর সীমানা। অপূর্ব বললো,তো চল যাওয়া যাক। রাশেদ কাপা কন্ঠে বললো স্যার আপনি যান আমারে আর টাইনেন না।মাফ করেন স্যার। অপূর্ব বললো, আচ্ছা যা তুই।আমি একাই যাবো। রাত ৮ টা নাগাদ রাশেদ ফিরে আসে। অপূর্ব সামনে এগোতে দেখে

অনেক গুলো মাঝি।মাঝি-জ্বেলেরা জ্বাল বাইছে। অপূর্ব কে দেখে মাঝিরা বসা থেকে উঠে দাড়ায়। সবাই অবাক হয়।এদিকে তো জেলে ছাড়া আর কেউ আসে না তবে ইনি কে।ভালো করে পরোখ করতে দেখে পুলিশ অফিসার। একজন মাঝি বললো,স্যার আমরা কোন চোরা জ্বাল দিয়ে মাছ ধরি না। অপূর্ব বললো,আমি এখানে আপনাদের

জন্য আসেনি।আমাকে বাবর রাজ্য দিয়ে আসেন।সবাই হকচকিয়ে উঠে। হতভম্ব হয়ে যায়। অপূর্ব বুঝলো এনারা কেউ যেতে রাজি নয়।তাই অপূর্ব বললো,যে নিয়ে যাবে তাকে ৫০০ টাকা দেবো। তৎক্ষণাৎ মাঝিদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক শুরু হয়।এ বললো,আমি নিয়ে যাবো ও বললো আমি নিয়ে যাবো। তাদের কথা না থামতেই অপূর্ব একটা

নৌকায় উঠে।যার নৌকায় উঠে উনি খুব খুশি হয়।নৌকা চললো বাবর রাজ্যের উদ্যেশ্যে। আকাশের তারা রা জ্বল জ্বল করছে। চাঁদনীর আলো নদীর ঢেউয়ে দর্পন হচ্ছে। শীতল হাওয়া বইছে।মাঝি অপূর্বর দিক পরোখ করে বললো, স্যার আপনি বাবর রাজ্য যাবেন কেন?ওটাতো পরিত্যাক্ত!অপূর্ব বলল, কিছু আসামি ঘাপটি মেরে বসে আছে

বাবররাজ্যে। তাই ওদের ধরার জন্য যাচ্ছি।মাঝি বললো,তা আপনি একা! ভয় করছে না! ওখানে যাওয়া তো ঝুঁকিপূর্ণ।অপূর্ব বললো,আমি একাই যথেষ্ট ।বেশ অনেকক্ষন ধরে নৌকা চলছে। অপূর্ব খেয়াল করলো,নৌকা সোজা না গিয়ে বাকা দিকে যাচ্ছে। অপূর্ব জিজ্ঞেস করলো,ওপার যাচ্ছেন না কেন?ওদিক থেকেও নাকি নদী পার হতে হবে! মাঝি বললো,আমি

আপনারে একেবারে বাবর-রাজ্যের নদীর তীরে নামাই দিয়া আসমু।নদী পথে কেটে যাচ্ছে অনেক সময়। যেতে যেতে পৌছে যায় বাবররাজ্য। অপূর্ব ভাবলো গাড়ি করে ওপার অব্দি আসাতে হয়তো তারাতাড়ি পৌঁছেছি। চারদিক অন্ধকার।বড় বড় ঝোপঝাড়।কোথাও কোন জনব মানব নেই।এ এক নির্জন প্রহর। মাঝি বললো,সার রাত শেষ অংশে

আমরা পৌঁছেছি।আপনে আমার টাকা টা দিয়ে চলে জান। অপূর্ব টাকা দেয়। অপূর্ব ওপার উঠতেই মাঝি বললো, এটা সাথে নিয়ে যান দরকার পরবো। অপূর্ব দেখলো একটা টর্চ। অপূর্ব ধন্যবাদ জানায়। মাঝি ফিরে যায়। অপূর্ব সামনে এগোতে থাকে।দুপাশে ঝোপঝাড় মাঝখান থেকে একটা সরু পথ চলে গেছে। অপূর্ব সামনে এগোতে

থাকে। দু'পাশে পূরানো কিছু উঁচু উঁচু বিল্ডিং।যেগুলো দেখতে সাধারণ কোন বিল্ডিং নয়। পুরানো পিরামিড এর মত দেখতে।হয়তো বাবর রাজ্য রাজাদের ন্যায় ছিলো।চাঁদনী রাত চারদিক আলোকিত।এমন মনে হচ্ছে আশেপাশে কোন জন্তু জানোয়া,র ও নেই। অপূর্ব যতই সামনের দিকে এগোচ্ছে ততই বুকের ভেতর ধুবধুবানি টা বেড়ে

চলেছে। অপূর্ব যতই চারদিক দেখছে অপূর্বর মনে হচ্ছে এই বাবররাজ্য আমি অনেক বার এসেছি। সবকিছু পরিচিত মনে হচ্ছে। অপূর্ব চারদিক দেখছে। অপূর্ব ঘামছে। আশেপাশে বড় বড় ভাঙা বিল্ডিং। অপূর্ব কাপা হাতে ছুয়ে দেখছে। অপূর্বর অনুভূতি অন্যরকম মনে হচ্ছে। অপূর্বর মনে হচ্ছে এ দেয়াল আমি আরো ছুয়েছি।এইসব

কিছুর সাথে আমার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। অপূর্ব কিছুক্ষণ থম মেরে দাড়ায়।একা একা বির বির করে বলছে, আমার এরকম অনুভুতি হচ্ছে কেন। সবকিছু আমার পরিচিত মনে হচ্ছে কেন। অপূর্ব মাথা চেপে ধরে চোখের সামনে অনেক কিছু ভেসে আসছে। কিন্তু পরিষ্কার নয়। অপূর্ব সামনে এগোতে ই দেখে বিশাল বড় এক রাজপ্রাসাদ এর মত

বাড়ি। অপূর্ব ভাবলো এটাই হয়তো বাবর সিকদার এর বাড়ি।বাড়ির চারদিকে বড় করে দেয়াল ফেরাঁনো। অপূর্ব ধির পায়ে এগোয়।বাড়িটির বা-দিকে বড় একটা খামার।একদম পরিত্যাক্ত। অপূর্ব ভালো করে পরোখ করে দেখলো,মৃত গরু মহিষের অনেক কঙ্কাল পরে আছে। কি এমন হয়েছিল এই বাবররাজ্য যারজন্য সবকিছু আজ এত

এলোমেলো। অপূর্ব বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে।বড় গেট তবে তালাবিহীন অপূর্ব খুব সহজে প্রবেশ করতে পারলো। অপূর্ব বাড়ির ভেতর পা রাখতেই সমস্ত শরীর কেঁপে উঠে। অপূর্ব হতভম্ব হয়ে যায়।এমন কেন অস্থির অনুভব হচ্ছে। অপূর্ব বাড়িটি পরোখ করছে। অনেক বড় বাড়িটি। আশেপাশে অনেক কাঁটা দেয়া। আশেপাশের

সবকিছু এলোমেলো হয়ে পরে আছে।এই বাড়িতে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না। অপূর্ব বাড়ির আশেপাশে ঘুরতে থাকে।বাড়িটি এতই বড় যে,গোলাকার ভাবে ঘুরলেও কয়েক প্রহর কেটে যাবে। অপূর্ব চারদিক পরোখ করতে থাকে। মানুষের মত মুর্তি ভেঙে পরে আছে। অপূর্ব ঘুরতে ঘুরতে চোখে পরে একটা ছোট দরজার

দিকে। অপূর্ব মনস্থির করলো,এই দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে। অপূর্ব দরজায় হাত দিয়ে খোলার চেষ্টা করলে অতি সহজেই খুলে যায়। অপূর্ব হতভম্ব হয়। অপূর্ব নিশ্চিত হয় এখানে কেউ নেই। কিন্তু একবার এর ভেতর টা দেখতে হবে। অপূর্ব দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলে, সবকিছু অন্ধকার। অপূর্ব টর্চ জ্বালিয়ে আশপাশ দেখতে

থাকে। সবকিছু নতুন বাড়িটার বাহির থেকে সবকিছু পরিত্যাক্ত মনে হলেও ভেতরে সব নতুন। দেয়ালে অনেক ছবি পেইন্টিং করা।অপূর্ব স্পর্শ করলে অনুভব করে,এ সবকিছু আমার পরিচিত। এখানে আমি আগেও এসেছি। অপূর্ব চোখ বড় বড় করে পরোখ চারপাশ দেখতে থাকে।এটা একটা ছোট বৈঠকখানা। অনেক জিনিস পত্র।

অপূর্বর চোখ পরে ,পুরোনো রুপার তৈরি একটা আলমারির দিকে। অপূর্ব আলমারি টা ছুয়ে দেখে। একদম নতুনের মত চকচক করছে। অপূর্ব আলমারি টি খোলার চেষ্টা করলে খুলতে পারে। অপূর্ব অবাক হয় তালাবিহীন কি করে সম্ভব। অপুর্ব ভেতরে দেখতে চাইলে দেখলো, অনেক শাড়ি , লেহেঙ্গা, নৃত্য পোশাক।সোনা,রুপার বিভিন্ন

ধরনের অলংকার।এত মুল্যবান জিনিস এভাবে পরে আছে।কেউ নিচ্ছে না।নাকি পূরোনো বাড়ি বলে ভয় পায় সবাই। অপূর্ব ভাবনা উপেক্ষা করে। বৈঠকখানাটা পরোখ করছে, বৈঠকখানার ধরন সেকেলের রাজাদের বৈঠকখানার মত।হয়তো বাবর সিকদার এসব পছন্দ করতেন। অপূর্ব বৈঠকখানা থেকে সামনে আসে।একটা ঘর।ঘরটা

আয়তনে অনেক বড়।অপূর্ব ঘরটাতে আসতেই অন্যরকম অনুভূতি হয়। অপূর্ব ভালো ভাবে দেখে বুঝলো,এটা মেহমানদের ঘর। অপূর্ব সম্পূর্ণ ভাবে হতভম্ব হয়ে যাচ্ছে। চারপাশ দেখে খুব চেনা চেনা লাগছে।বার বার এটা কেন মনে হচ্ছে।দেয়ালে বিভিন্ন পশু,দের ছবি খুব সুন্দর ভাবে আঁকা।পূরোনো বাড়ি কিন্তু সেটা ঘরের ভেতর অংশে

মনেই হচ্ছে না। অপূর্ব দেখলো বা- দিকে দরজা। তবে তালাবদ্ধ। অপূর্ব খোলার চেষ্টা করলো। অপূর্বর কৌতুহল হলো এটা তালাবদ্ধ কেন। হয়তো এটার পরের ঘরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে। অপূর্ব তালা বরাবর সুট করে দরজাটি খুলে যায়। অপূর্ব যা দেখলো তাতে সম্পুর্ন ভাবে হতভম্ব হয়ে যায়।চোখ গুলো বড় বড় হয়ে যায়।ঢেক গিলতে থাকে।এটা বাড়ির

মধ্যখান, চারদিক সোনালী রঙে চিকচিক করছে। চারদিক রাজকীয় আকারে সাজানো।নিচে বড় বড় চেয়ার ময়ূরপঙ্খীর মত।এত বিশাল বাড়ি।এটা পূরানো হলে, সবকিছু এত নতুন কি করে হতে পারে। অপুর্ব প্রথম তলায়। চারদিকে কেউ নেই।কোন মানুষের ছিটেফোঁটাও নেই। অপূর্ব ধির পায়ে এগোয়। সবকিছু পরিচিত মনে হচ্ছে। অপূর্ব

নিশ্চিত ,যে সে আগেও এসেছে। কিন্তু কবে কখন, কিছু মনে পরছে না। শুধু মনে হচ্ছে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। অপূর্ব এদিক ওদিক পরোখ করতে দেখে দেয়ালে অনেক বড় পেইন্টিং করা একজন লোকের ছবি। লম্বা,চাপ দাড়ি, মনোভাব সম্পন্ন লোক। সূর্যর বর্ননার সাথে মিলে গেছে।ইনিই হয়তো বাবর সিকদার।অপূর্ব অপলকে দৃষ্টিতে

তাকিয়ে আছে। অপূর্ব ছবিটার উপর হাত দিয়ে বললো,ভিষন পরিচিত মনে হচ্ছে।কে ইনি,এমন কেন অনুভূতি হচ্ছে। অপূর্ব সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে। অনেক গুলো ঘর। একটা ঘরের সামনে একটা নৃত্যশিল্পীর ছবি আঁকা । অপূর্ব ছবিটিকে ভালো করে দেখছে। খুবই সুদর্শন একজন নারী।যার চুল গিয়ে পরেছে হাটুর নিচ পর্যন্ত।এটাই

হয়তো রঞ্জনা। অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে ঘরটাতে প্রবেশ করে।পূরোনো বাড়ি অথচ বাল্ব জ্বলছে।ঘরটির ভেতরে সবকিছু সোনার মত চক চক করছে।বাবর সিকদার একজন প্রতাবশালী ব্যাক্তি ছিলেন । সূর্যর তথ্য ভুল ছিল না।ঘর গুলো সাজানো গোছানো।চোখ পরে একটা আলমারির দিকে, তবে এটায় সোনার প্রলেপ দেয়া। অপূর্ব

আলমারি টি খোলার চেষ্টা করলে খুলতে পারে।ভেতরে নৃত্য পোশাক। সাথে বই। অপূর্ব দেখার চেষ্টা করলো না। অপূর্ব ঘরটা পরোক্ষ করে ।মনে মনে ভাবছে, সবকিছু পরিচিত মনে হচ্ছে।আমি এই বাড়িটাতে আগেও এসেছি।কিন্তু কেন এসেছি।কোন কিছু মনে পরছে না। অপূর্ব ঘরটা থেকে বের হয়। ঘরটার বাহির থেকে একটা সরু পথ চলে

গেছে। অপূর্ব সরু পথে যেতে থাকে। সামনে এগোতেই উপরে ক্রোস চিন্হ দেয়া।মানে এখানে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু এখানে কি আছে। চারদিক কতটা শুনশান। কিন্তু সবকিছু স্বর্নের মত চকচক করছে। অপূর্ব সামনে এগোতে থাকলে,যত এগোয়,তত আলো কমতে থাকে।সামনের পথগুলো অন্ধকার। অপূর্ব সামনে এগোলেই

দেখতে পায়,একটা ঘরের সামনে দু জোড়া জুতা। অপূর্ব হকচকিয়ে উঠে। ভ্রু কুঁচকে দেয়। এখানে জুতো আসবে কোথা থেকে। অপূর্ব ঘরটির জানালার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করলেই দেখে,ডাঃ ইব্রাহিম।তার সামনে কেউ বসে আছে।কোন অল্প বয়সি লোক। মুখ দেখা যাচ্ছে না। অপূর্ব থমকে যায়।শরির শিউরে উঠলো।ডাঃ ইব্রাহিম এর খোজ নেই আজ অনেক

দিন।তারমানে উনি এখানে। অপূর্ব নিজের চোখ কে বিশ্বাস করাতে পারছে না। অপূর্ব অবাক হয়। অপূর্ব নিশ্চিত হলো,এই বাড়িতেই কিছু আছে।এটাই ওদের আস্তানা। কিন্তু এখানে তো কিছু পেলাম না। অপূর্ব দেখলো ডাঃ ইব্রাহিম বের হচ্ছে। অপূর্ব ঘরের পেছন দিকে লুকিয়ে পরে। আজকে আর সেদিনের মত ভুল করলে চলবে না। অপূর্ব ডাঃ

ইব্রাহিম এর পিছু নিতে চায়। দূরুত্ব রাখলো অনেক।যাতে ইব্রাহিম ধরে না ফেলতে পারে। অপূর্ব দেখলো ইব্রাহিম নিচের দিকে নামছে। অপূর্ব দোতলা থেকে, বারান্দায় যায়। বাহিরে বের হয়ে এরা কোন দিকে যায় এটা দেখতে হবে। অপূর্ব বারান্দায় এসে দাড়িয়ে আছে।কয়েক প্রহর দাড়িয়ে থাকে। ইব্রাহিম তো বের হচ্ছে না। অপূর্ব ভেতরে আসে।

অপূর্ব অবাক হয়,কোথাও ডাঃ ইব্রাহিম নেই।এত কম সময় কোথায় যাবে। অপূর্ব দ্রুত পায়ে হেঁটে নিচে আসে।এসে দেখে প্রবেশ দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অপূর্ব হকচকিয়ে উঠে। আশে পাশে দেখতে থাকে। কোথায় যাবে এত কম সময়ে। অপূর্ব এদিক সেদিক পরোক্ষ করতে থাকে।চোখ পরলো বাবরের বড় পেইন্টিং- টার দিকে অপূর্ব ভালো

ভাবে খেয়াল করলে দেখলো, ছবিটা বাঁকা হয়ে আছে।একটু আগে তো বাকা ছিলো না ।অপূর্ব ছবিটির কাছে এগোয়।ছবিটি নাড়ানোর চেষ্টা করলে দেখে, ছবিটি এদিক সেদিক নড়ছে। অপূর্ব অবাক হয়।এতবড় ছবিটা পিন দিয়ে না আটকিয়ে এভাবে রেখে দিয়েছে। চট করে অপূর্বর মস্তিষ্কের নিউরন সতেজ হয়।অপূর্ব পেইন্টিং টার উপরে হাত

দিয়ে পর্যবেক্ষন করে দেখলো,এটা পেছনে দেয়াল নেই। খোলস-এর মত শব্দ হচ্ছে। অপূর্ব পেইন্টিং টা সরিয়ে ফেলে। অপূর্ব যা দেখলো, অপূর্বর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। পেছন দিক টা অন্ধকার। অপূর্ব টর্চ মেরে দেখলো, নিচের দিকে সিড়ি বেয়ে গেছে।তার সামনে বন্ধ দরজা। অপূর্বর বুঝতে আর বাকি রইলো না।এটা গুপ্তঘর।ডাঃ ইব্রাহিম এই

পথেই গেছে। অপূর্ব সিড়ি বেয়ে নিচে নামলো,দরজার উপর লেখা ”হ্রদয়হীন অন্ধকার জগৎ” অপূর্ব চোখ গুলো বড় বড় করে ফেলে। অপূর্ব হাতের উল্টো দিক হয়ে ঘাম মুছে।ভাবলো,আমি শেষ পর্যন্ত সঠিক আস্থানায় চলে এসেছি। এত বড় বাড়ি থাকতেও,মাটির নিচে অন্ধকার ঘরের রহস্য কি।ভেতরে কি আছে? অপূর্ব গুপ্তঘরের দরজাটি খোলার

চেষ্টা করলো।দরজাটি তালাবদ্ধ। অপূর্ব অঝরে ঘামছে।বুকের ভেতর চিন চিন করছে। অপূর্বর পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো। অপূর্ব তালা বরাবর সুট করে।দরজাটি খুলে যায়। অপূর্ব দেখলো পরবর্তী আর একটি সিড়ি।সিড়িটি অনেক টা পাতালে গিয়ে পৌঁছেছে। অপূর্বর ভয় ও হচ্ছে।জীবনে এমন একটি পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে, না

পারছে পেছনে যেতে না পারছে সামনে এগোতে।সামনে যাওয়ার পথ যে,কঠিন-ও থেকে কঠিন। অপূর্ব সাহস করে নিচে নামে। অন্ধকার সরুপথ। অপূর্ব হাতে টর্চ নিয়ে নিচে নামতে থাকে।বুক ধরফর করতে থাকে।হাটার শক্তি নিমিষেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। অপূর্ব হাঁটতে হাঁটতে নিচে নেমে দেখলো আরকেটি দরজা। দরজাটির সামনে লেখা' আমার মৃত্যু

খেলা ”’অপূর্ব ঢেক গিলতে থাকে। অপূর্ব সুট করে তালা বরাবর। দরজাটি খুলে যায়।অপূর্ব পা রাখে – অন্ধকার জগতে। অপূর্বর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠছে।অপূর্ব দেখলো, চারদিকে বিভিন্ন ধরনের বাল্ব জ্বলছে। গোলাকার ৫ টি ঘর। চারদিক উপরের ঘরের মতই চিকচিক করছে।এটা পাতাল ঘর মনেই হচ্ছে না।মনে হচ্ছে এটাও

একটা বাবররাজ্য।৫ ঘরের সামনে কিছু না কিছু লেখা।১নং ঘরের সামনে লেখা ‘রক্ত খেলা’তার উপরে লেখা ২৭ বছর বয়স’। অপূর্ব হতভম্ব হয়ে যায়। ২নং ঘরের সামনে লেখা” কন্যাধর্ষন”। ৩নং মাঝ বরাবর ঘর সেটা একদম ভিন্ন। অনেক বড় আকারের সাদা রঙের দরজা-অর্থাৎ রুপার তৈরি দরজা। তার উপরে লেখা’ হিং,স্র ‘ শব্দটির

নিচে লেখা' মালাইকা সিকদারিনী। অপূর্ব শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কালো ধোঁয়া ধেয়ে আসছে।কি হচ্ছে এসব।৪নং ঘরের উপর লেখা'সূর্য' অর্থাৎ এটায় হয়তো সূর্য থাকে।৫নং ঘরের উপর লেখা ' হিসাব-পাচার। অপূর্বর সব কিছু গুলিয়ে ফেলছে। এসবের মানে কি। কেন করছে এসব।কিসের জন্য এই পাপের

খেলা হচ্ছে।এসব ভাবতেই,অপূর্ব প্রথম ঘরটার দরজায় সুট করে। দরজা খুলে যায়। অপূর্ব যা দেখলো, সম্পুর্ন ভাবে কেঁপে উঠে। ভেতরে অনেক গুলো ছেলেদের কে বেডের উপর সুইয়ে রেখেছে।ঘরটা আয়তনে অনেক বড়।মেডিক্যালি সবকিছু এখানে আছে। অপূর্ব কাছে এগোয়। সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা। মুখমণ্ডল দেখা যাচ্ছে। অপূর্ব একটা

ছেলের শরীরের উপর থেকে কাপড় টা সরিয়ে ফেলে। অপূর্ব দেখলো,এদের শরীরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই। তারমানে এদের অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে। অপূর্ব ভাবলো এদের যদি বাঁচাতে পারতাম। কিন্তু কিভাবে। অপূর্ব ঘরটা থেকে বের হয়।২নং ঘরের ভেতর প্রবেশ করে। এখানেও ঠিক একই ভাবে মেয়েদের সুইয়ে

রেখেছে।৫ টা মেয়ে তবে এদের প্রত্যেকের পরনে লাল বেনারশী। এদের কেও অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে। অপূর্ব ঘর টা থেকে বের হয়। অপূর্বর পিস্তলে মাত্র একটা বুলেট আছে। এখন ও তিনটে ঘর বাকি। অপূর্ব ভাবতে থাকে কোন ঘরটায় যাবে। অপূর্ব ভাবলো , সূর্য যে ঘরটায় এটায় যাওয়া যাক। হয়তো ওকে এখানেই পেয়ে যাবো।

অপূর্ব সূর্যর ঘরের দরজার লক বরাবর সুট করে দরজা খুলে যায়। অপূর্ব চোখ বড় বড় করে করে দেখছে। অনেক বড় ঘর। সবকিছু সোনার-মত চিকচিক করছে। সোনালী রঙের দেয়াল। চারদিকে নৃত্য শিল্পীর ছবি।অন্যকোন নৃত্য শিল্পী নয়। সমস্ত ছবি রঞ্জনার। সূর্য আর ডাঃ ইব্রাহিম মুখোমুখি বসে কথা বলছে। আশেপাশে ৬জন

চালা।তবে তারা কেউ দেশী নাগরিক নয়। বিদেশি। শরীরের রঙ সাদা ধবধবে। চুলগুলো লাল। অপূর্ব কে দেখা মাত্রই চালা গুলো ঝাঁপিয়ে পরবে,ঠিক তখনি সূর্য বাঁধা দেয়।ডাঃ ইব্রাহিম হকচকিয়ে উঠে।চশমাটা ঠিক মত পরে।টিসু দিয়ে ঘাম মুছে পানি খায়।সূর্য চালাদের দূরে সরিয়ে দেয়। অপূর্ব সূর্য কে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়।রাগে আক্রসে,ঘৃনার

ভঙ্গিতে বললো, মিথ্যাবাদী খু, নি। বেইমান,হিং,স্র শেষ করে দেবো তোকে আজ। সূর্য কে অপূর্ব এলোপাথাড়ি ভাবে মারতে থাকে। একটা ঘুষি লাগে সূর্যর ঠোঁটে। সূর্যর ঠোট বেয়ে রক্ত পরছে।ডাঃ ইব্রাহিম এক কোনে চাপসে বসে আছে। অপূর্ব ক্রোধের স্বরে বললো,কেন করছিস এসব?নিরীহ মানুষদের প্রান নিয়ে খেলছিস কেন?কি দোষ

করেছে ওরা?মেয়েরা মায়ের জাত ওদের ও ছারলি না।কি করেছে ওরা? জবাব দে। সূর্য অপূর্বর হাত সরিয়ে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে বললো, সবকিছুর জন্য তুই দায়ী। তুই দায়ী,তোর গোটা পরিবার দায়ী। অপূর্ব পেছনে টপকে দিয়ে দেয়ালের সাথে ধাক্কা খায়।কি বলছে সূর্য এসব,আমি দায়ী মানে,কি বলছে এসব, আমার পরিবার কি করেছে,।

অপূর্ব নিস্তব্দ হয়ে যাচ্ছে সূর্যর কথা শুনে। আমি সবকিছুর জন্য দায়ী!কি বলছে সূর্য!সূর্য ঠোঁট কুঁচকে হেসে দেয়। সূর্য এদিক ওদিক ঘার ঘুরিয়ে নেয়। কতটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে সূর্য কে।কানে দুল,গলায় চেন,ভ্রূ কাটা। অদ্ভুত রুপের সাথে ভয়ং,কর আচরণ অপূর্ব কে নিশ্চুপ করিয়ে দিচ্ছে।ডাঃ ইব্রাহিম অপূর্ব কে দেখার পর থেকে বার বার পানি খাচ্ছে।

আর টিসু দিয়ে ঘাম মুছছে। সূর্য হাতের উল্টো দিক ঠোটের রক্ত মুছে।পা দিয়ে একটা টুল অপূর্বর দিকে এগিয়ে দেয়।বললো,বোস। অপূর্ব থম মেরে বসে পরে। সূর্যর নকের আচে, অপূর্বর কপাল আচরে যায়। সূর্য কিছুক্ষন নিশ্চুপ থেকে বললো,তোর থেকে যা কিছু লুকিয়েছে সবটা জানার আজ সময় হয়ে গেছে।

তুই আমাকে মিথ্যা বাদি বলেছিস,প্রতারক বলেছিস, বেইমান বলেছিস। এগুলো আমি তোদের বলতে পারি।তোর গোটা পরিবার নিকৃষ্ট।তোর গোটা পরিবার বেইমান ছিল,স্বার্থপর ছিলো। অপূর্ব সূর্য কে জ্বলজ্বল চোখে দেখছে।যে বন্ধু চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতো না,যদি কোন কথায় কষ্ট পাই এই ভেবে।আর আজ সে আঙুল দেখিয়ে

কথা বলছে, আমি খারাপ,আমরা নিকৃষ্ট।কি বলছে এসব!সূর্য নিঃশ্বাস ফেলে। অপূর্ব সূর্যর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ।

সূর্য কিছুক্ষন চুপ থেকে বললো,তোর বাবার জন্য আজ সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। সূর্য ঘৃনা জড়িত কন্ঠে বললো,পাষান তোর বাবা, নিকৃষ্ট তোর পরিবার,লোভি।

অপূর্ব কিছু বলতে পারছে না।বলার মত শক্তি অপূর্বর নেই। অপূর্ব ভাঙা গলায় বললো,কি করেছেন আমার বাবা!কি করেছে আমার পরিবার? আমাকে কেন তুই দায়ী বলছিস?সূর্য কর্কট স্বরে বলল, তোদের বেইমনীর জন্য,লোভের জন্য,আজ এই পূরো বাবর রাজ্য টা শ্মশানে পরিণত হয়েছে।সুখ শান্তি তে আলোরনে ভরপুর ছিল এই রাজ্য,আজ সব

মাটি হয়ে গেছে। অপূর্ব সূর্যর দিকে দেখে, সূর্যর কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছে। চারদিক ভারী হয়ে যাচ্ছে। আকাশ টা ভেঙ্গে পরেছে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়, একজন নার্স। সূর্য কে উদ্দ্যেশ্য করে বললো, ছেলেদের দ্বিতীয় ডোস দিয়ে দিয়েছি। সূর্য ডাঃ ইব্রাহিম কে ইশারা করলো।ডাঃ ইব্রাহিম বসা থেকে উঠে যেতেই , সূর্য বললো, তার অনুমতি নিয়ে

তবেই কাজ শুরু করবেন। সাথে চীপস ডুপিয়ালি কে নিবেন। অপূর্ব নার্স টিকে দেখার চেষ্টা করলে দেখতে পায়,এই সেই মেয়েটি যে হাসপাতালে আমাকে বোকা বানিয়েছে। অপূর্বর ইচ্ছা করছে এখানেই শেষ করে দেই। কিন্তু কিছু বললো না। অপূর্ব সূর্যের একটা কথা শুনে হতভম্ব হয়, সূর্য একটু আগে বললো, যে,সে যদি অনুমতি দেয়

তবেই কাজ শুরু হবে। তারমানে এদের সবার উপর অন্য কেউ আছে।

সূর্য অপূর্বর দিকে পরোক্ষ করে বললো,কি অবাক হচ্ছিস নার্স কে দেখে। সূর্য চোখ দুটো বড় করে ,ভয়ান,ক স্বরে বলল, সে নার্স নয় , একজন খু,নি।অপূর্ব অধির আগ্রহে বসে আছে, সূর্য কি বলতে চাইছে।

সূর্য বলতে শুরু করলো,

বাবর সিকদার যে ছিলেন একজন গন্যমান্য ব্যক্তি।যিনি ছিলেন একজন প্রতাবশালী।ছিলোনা তার কোন কিছুর কমতি।সে ছিল একজন সৎ সাহসী ব্যাক্তি।তার প্রান প্রিয় একমাত্র বন্ধু,তিনিও ছিলেন একজন প্রতাবশালী।তার ও ছিলো তার নগরে নাম-ডাক।তিনি ছিলেন তিলকনগর এর ভরসার স্থল।তার নাম জাহাঙ্গীর চৌধুরী।

বাবর সিকদার এবং জাহাঙ্গীর চৌধুরী তাদের বন্ধুত্ব ছিল অটুট। তাদের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলো শক্তি,ভরসা,রক্ষা,একে অপরের প্রতি মায়া টান সব কিছু। সময়ের সাথে সাথে বাবর সিকদার তার নিজ কর্মে নিযুক্ত হতে থাকে। সময়ের সাথে সাথে জাহাঙ্গীর চৌধুরী তার নিজ কর্মে নিযুক্ত হতে থাকে। বাবরের ঘর আলোকিত করে জন্ম নেয়

অন্তিম। জাহাঙ্গীর চৌধুরী তার বন্ধুর ছেলের জন্য কয়েকশ'ভরী স্বর্ন দিয়ে তৈরি করে সোনার দোলনা উপহার দেয়

বাবরের ছেলে অন্তিমকে।দুই বন্ধু নেচে গেয়ে আনন্দ করতে থাকে। নতুন মেহমানের আগমনে খুশি হয় বাবররাজ্য।

তখন জাহাঙ্গীর চৌধুরীর কোন সন্তান ছিল না।তার স্ত্রী জয়ার

সমস্যা থাকায় জাহাঙ্গীর দ্বির্ঘ একটা সময় বাবা ডাক না শুনেই ছিল। তবুও তার স্ত্রীর প্রতি ছিল না কোন আক্ষেপ।এভাবে ই চলে যায় কয়েকটি বছর। জাহাঙ্গীর চৌধুরী ও বাবর সিকদার এর বন্ধুত্ব অন্যরা দেখে হিংসা করতো।

ঠিক তার কিছুদিন পরই খবর আসে জাহাঙ্গীর চৌধুরী বাবা হতে চলেছে। সমস্ত তিলকনগর খুশিতে আপ্লুত

হয়ে ওঠে। আনন্দিত হয় বাবররাজ্য।বাবর সেদিন জাহাঙ্গীর কে বলেছিল।তোর যদি মেয়ে হয় তবে আমার ছেলের বউ করবো। তখন জাহাঙ্গীর বলছিলো আর যদি ছেলে হয়। তখন বাবর বলেছিলো এখন আমার কন্যা সন্তান নেই। কিন্তু যদি সৃষ্টিকর্তা দেন। তাহলে তোর ছেলেকে আমার জামাই করবো।

জাহাঙ্গীর চৌধুরীর ঘর আলোকিত করে জন্ম নেয় তার একমাত্র সন্তান অপূর্ব।যে এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে বসে আছে। অপূর্ব হকচকিয়ে উঠে। অপূর্ব সূর্যর কথা গুলো ধ্যান দিয়ে শুনছে।সূর্য বলতে শুরু করে, জাহাঙ্গীর চৌধুরী খুশিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে। সমস্ত তিলকনগর খুশিতে আপ্লুত হয়।খুশি হয় বাবররাজ্য। বাবর ছুটে আসে তিলকনগর।তার

বন্ধু সদ্য বাবা হয়েছে। বাবর সিকদার নিজেই তার বন্ধুর ছেলের নাম ঠিক করেছিলো।সেই নামেই নাম রাখা জাহাঙ্গীর চৌধুরীর একমাত্র ছেলে অপূর্ব চৌধুরী।কারন অপূর্ব ছিল সু-দর্শন।

এভাবে আনন্দে ভরপুর ছিল বাবররাজ্য। আনন্দে ভরপুর ছিল তিলকনগর।কেটে যায় দির্ঘ একটি সময়। কিছুদিন পর জন্ম নেয়

বাবরের দুই রাজকন্যা।সেদিন একসাথে জমজ জন্ম নিয়েছিল রঞ্জনা ও মালাইকা।

অপূর্ব ভাঙা গলায় বললো, তুই এত কিছু আমার থেকে বন্ধু হয়েও লুকিয়েছিস? কত মিথ্যে বললি। সূর্য বললো,তোকে আমি অনেক কিছু ই মিথ্যা বলেছি ।তবে বাধ্য হয়ে।তবে আজ সত্যিটা জানার সময় হয়ে গেছে।

অপূর্ব জ্বলজ্বল চোখে জিজ্ঞাসা করলো, তারপর কি হয়েছিল?সূর্য বললো, রঞ্জনা মালাইকা দুইজন ই হয়েছিল ভুবনমোহিনী সুন্দরী। জাহাঙ্গীর ছুটে আসে বাবররাজ্য। জাহাঙ্গীর চৌধুরী খুশিতে আপ্লুত হয়ে, প্রথমেই তার কোলে নিয়েছিল,মালাইকা কে। এবং তখন বলেছিল, মালাইকাই হবে আমার ছেলের বউ।বাবর খুশি হয়।সে রাজি

হয়।ধিরে ধিরে বড় হতে লাগে মালাইকা অপূর্ব।
অপূর্ব কে নিয়ে জাহাঙ্গীর বেড়াতে আসতো এই বাবররাজ্য। মালাইকা অপূর্ব সারাদিন বাবররাজ্য ঘোরাফেরা করতো,খেলা করতো। ওরা তখন খুবই ছোট। ওরা যত বড় হয় বাবর আর জাহাঙ্গীর এর মধ্যে তত দূরুত্ব হয়।বাবর সবসময় দয়াময় মানুষ ছিলেন। জাহাঙ্গীর ও

কম ছিল না। বাবরের সমস্ত জমিতে গরিব অসহায় মানুষ চাষাবাদ করে খেতো। বাবররাজ্য যত মানুষ ছিলো,তার থেকে তিলকনগর কম ছিলো।একবার বাবররাজ্য কিছু কৃষক ভূমিহীন হয়ে যায়। বাবররাজ্য যত জমি ছিলো তাতে সবাই কর্মরত ছিলো। নতুন করে যারা জমি চায় তাদের আর বাবর জমি দিতে পারলো না।বাবর চিন্তায় পরে যায়।

কি করবে তখন বাবর তিলকনগর জাহাঙ্গীর এর কাছে আসে। তিলকনগর লোক সংখ্যা কম। বাবর আর জাহাঙ্গীর এর মধ্যে কথোপকথন হয়, বাবররাজ্য ও তিলকনগর দুই গ্রামের মধ্যখান সীমানায় বসে। বাবর বললো তোর জমি থেকে আমাদের কিছু জমি দে। আমার আসহায় কৃষকরা চাষাবাদ করে খাক। জাহাঙ্গীর এটা শুনে মুখ

কালো করে ফেলে। জাহাঙ্গীর কোন মতেই রাজি হলো না। এভাবে বাবর অনেকক্ষন বলার পর ও জাহাঙ্গীর রাজি হয়না। তখন বাবর বললো ,তুই আমার কিসের বন্ধু যে আমার প্রয়জনেই তোকে পেলাম না। জাহাঙ্গীর ও কর্কট মেজাজে বললো, আমার কোন বন্ধুর দরকার নেই। বাবর রাগ করে জাহাঙ্গীর এর কলারে হাত দেয়। জাহাঙ্গীর ধাক্কা

মেরে বাবর কে ফেলে দেয়।এই দেখে বাবরের সাথে থাকা লোক জাহাঙ্গীর কে পেটাতে শুরু করে। সেদিন জাহাঙ্গীর একাই ছিলো।বাবর বাধা দিলেও তার লোকেরা জাহাঙ্গীর কে আঘাত করে।এক পর্যায় বাবর আটকাতে পারলো। জাহাঙ্গীর সেদিন ক্রোধের সরে বলেছিলো ,তোর আর আমার বন্ধুত্ব এখানেই শেষ। কিন্তু তোকে আমি দেখে নিবো।

সেদিন থেকে বাবর আর জাহাঙ্গীর এর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। জাহাঙ্গীর এক পর্যায় সিদ্ধান্ত নেয়, তিলকনগর ছেড়ে ঢাকাতে চলে যাবে। জাহাঙ্গীর তাই করলো নিজের জমি জমা সব বিক্রি করে ঢাকাতে চলে যায়। তিলকনগর গ্রামের মানুষ অসহায় হয়ে পরে।হায়হায় করতে থাকে। কোথায় যাবে কি করবে।তখন বাবর

সিকদার তিলকনগরে শাসনকার্য চালায়।
বড় হতে লাগে রঞ্জনা,মালাইকা। অন্তিম সবার বড় ছিলো।তোর থেকেও বড় ছিলো।তবে রঞ্জনা আর মালাইকা এক ভ্রুনে জন্ম নিলেও তাদের আচার আচরণ, সবকিছু ভিন্ন ছিলো। কিন্তু দেখতে এক রকম ছিলো। রঞ্জনা ছিলো সাহসী।

মালাইকা ছলো ভিতূ।তোর বাবা তোকে ঢাকা স্কুলে পড়া শুনা করায়। তখন জাহাঙ্গীর এর ঘর আলোকিত করে আসে অর্পা।বাবরের ঘর আলোকিত করে আসে প্রিয়া।

বাবরের জিবন আনন্দেই কাটছিলো। কিন্তু জাহাঙ্গীর এর রাগ ,ক্রোধ ধিরে ধিরে বাড়তে থাকে। তিলকনগর ও বাবররাজ্যর সীমানায় বসে যে, জাহাঙ্গীর এর গায়ে হাত তোলা হয় ,

জাহাঙ্গীর সেই অপমান সহ্য করতে পারলো না। জাহাঙ্গীর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো উনি এর প্রতিশোধ নিবেন।

স্বাবলম্বী হয় বাবরের দুই কন্যা। রঞ্জনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সুযোগ পায়।

সূর্য কথা থামিয়ে দেয়। অপূর্ব ঘার সোজা করে। সূর্য থম মেরে অপূর্বর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো ,এই

পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা অন্যের মুখ থেকে শুনেছি।

অপূর্ব আহত কণ্ঠে বললো,কার কাছ থেকে শুনেছিস?সূর্য চোখের ইশারায় অপূর্বর পেছন দিক থেকে দেখিয়ে দেয়। অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে পেছনে ঘার ঘুরিয়ে দেখে,এক বয়স্ক বৃদ্ধা মহিলা।পরনে সাদা কাপর।গায়ের রং ফর্সা।চুল গুলো একদম ধবধবে সাদা।হাতে লাঠি।একা একা হাঁটতে

কষ্ট হয় , বলে দুজন দাসী দুপাশ থেকে ধরে রেখেছে। অপূর্ব হকচকিয়ে উঠে। সূর্য বৃদ্ধা মহিলাকে ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে এসে, সূর্যর খাটের উপর বসিয়ে দেয়। বৃদ্ধা মহিলাটি সূর্যর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সূর্য চেয়ারে বসে পরে। অপূর্ব একবার ঢেক গিললো। আগ্রহ স্বরে বললো, ইনি কে?

সূর্য ঠোঁট কুঁচকে হেসে বলল,ইনি জয়গুন বিবি। রঞ্জনার দাদি।

অপূর্ব বললো,তুই তো বলেছিলি ইনি মারা গেছেন।

সূর্য বললো, মিথ্যা বলেছিলাম।এই পর্যন্ত তুই যা শুনেছিস তা আমি সব কিছু দাদুর কাছ থেকেই শুনেছি।

অপূর্ব দৃষ্টি সরিয়ে নেয়।সূর্য বললো,তার পরে যে ঘটনা গুলো ঘটেছে, এবং সমস্ত মৃ,ত্যু খেলায়

আমিও ছিলাম।তাই আমি ই পরবর্তী সত্যি গুলো তোকে বলছি।যা আমার সামনে ই ঘটেছে।

সূর্য বলতে শুরু করলো,

রঞ্জনার সাথে আমার প্রথম দেখা কিভাবে হয় তা সবকিছু তুই জানিস। আমাদের প্রেম কাহিনী ভালো ই চলতে ছিলো। কিন্তু হঠাৎ নেমে আসে কালো ধোঁয়া। রঞ্জনা আমাকে বিয়ে করার কথা বলে আমি

রাজি হয়। কিন্তু তা রঞ্জনার পরিবার জানতো না। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ওর পরিবার কে জানাবো। ঠিক তাই করলাম ।আমি একদিন রঞ্জনা কে না জানিয়ে বাবররাজ্য আসি।বাবর এবং অন্তিম এর সাথে দেখা করতে। আমার সেদিন ভয় ও হচ্ছিল।ভয়কে উপেক্ষা করে, বাবর সিকদার এর সাথে আমার আর রঞ্জনার সম্পর্কের কথা বলি। এবং

আমি এটাও বলি যে, রঞ্জনা আমাকে একা বিয়ে করতে চায়। কিন্তু আমি তা চাই না।আমি চাই সবাইকে জানিয়ে সবকিছু হোক।

তাই আমি রঞ্জনা কে না জানিয়ে আপনাদের সাথে দেখা করতে আসি।চাইলে আমি একাই ওকে বিয়ে করতে পারতাম কিন্তু আমি চাইনা আপনাদের অমতে কিছু হোক।সেদিন আমার কথায় বাবর

সিকদার খুশি হন। উনি বলেছিলেন যে,চাইলেই তুমি আমার মেয়েকে একা বিয়ে করতে পারতে কিন্তু তুমি তা করোনি। নিশ্চয়ই তোমার পরিবার তোমায় ভালো শিক্ষা দিয়েছে।আমি সেদিন খুব খুশি হই। আমি রঞ্জনার বিয়ের ইচ্ছা নিয়ে বাবর কে বলি,যে রঞ্জনা চায় ওর বিয়ে সমুদ্রের তীরে হোক।বাবর বললো,আমরা সবাই মিলে যমুনা

নদীর তীরে রঞ্জনার বিয়ের আয়োজন করবো। কিন্তু রঞ্জনা এসব যেন না জানে।আমরা সবাই সেখানে উপস্থিত থাকবো। রঞ্জনা কে চমকে দেয়ার জন্য। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু করা হয়। কিন্তু হায়,না গুলো রঞ্জনা কে বাঁচতে দিলো না।বাবর রঞ্জনার মৃত্যু মেনে নিতে পারেনি।অন্তিম রঞ্জনার মৃ,ত দেহ থেকে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে

গিয়েছিল।ঢাকা পুলিশ স্টেশনে আমরা সবাই গিয়েছিলাম কেস ফাইল করতে। সেখানে উপস্থিত ছিলো, সৈকতের বাবা। আমাদের ডিসি সাহেব।উনি কেস ফাইল করেন।

সকলে ফিরে আসে বাবররাজ্য।আর রঞ্জনার লা,শ দাফন করা হয় তিলকনগর।কারন বাবর সিকদার এর মত সাহসী,সৎ একজন মানুষ

এর কন্যাকে ,কেউ ধর্ষ,ন করে হ,ত্যা করেছে এটা গ্রামবাসীরা মেনে নিতে পারতো না।সবাই বাবরের দিকে আঙুল তুলবে বলে।সবাই হতাশ ছিল।দু-দিন পরে পুলিশ উপস্থিত হয় বাবররাজ্য। এবং ওনারা যা জানান তার জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না।ডিসি সাহেব জানায়, রঞ্জনার একাধিক পুরুষের সাথে সম্পর্ক ছিল, এবং রঞ্জনা

নিজেই একাধিক পুরুষের সাথে পাপাচারে লিপ্ত হয়। এবং রঞ্জনার মৃত্যু,র জন্য রঞ্জনা নিজেই দায়ী। ডিসি সাহেব সমস্ত বাবররাজ্য সবাইকে বলে দিয়েছিলো যে, বাবর সিকদার এর মেয়ে রঞ্জনা একজন দুশ্চরিত্রা। সেদিন বাবরের কান কাটা যায়। আমি জানতাম রঞ্জনা কখনো ই এমন নয়। রঞ্জনা কোন দুশ্চরিত্রা ছিল না।এর পেছনে লুকিয়ে আছে

গভীর রহস্য। আমি খোঁজ নেই। এবং জানতে পারি এসবের পেছনে কারা ছিলো। দূর্জয় ও তার বন্ধুরা। এবং ডিসি সাহেব এর ছেলে সৈকত। ডিসি এসব জানতে পেরে কেসটা ধামাচাপা দিয়ে দেয়। এবং রঞ্জনার দিকে মিথ্যা বদনাম ছেড়ে দেয়।

ঠিক তখনি হঠাৎ করে অসুস্থ হয় অন্তিম।বাবর তার ছেলের অসুস্থতায়

ভেঙে পরে। অন্তিম কে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা পিজি হাসপাতালে।সেই সময় একই সাথে অসুস্থ ছিলিস তুই।তুই ও তখন বিদেশ থেকে ফিরে এসেছিলিস। কিন্তু তোর অসুস্থতার কথা আমি জানতাম না। অন্তিম কে ভর্তি করানো হয় ঢাকা পিজি হাসপাতাল। এবং তোকেও ভর্তি করানো ঢাকা পিজি হাসপাতাল।

ডাঃ ইব্রাহিম তোর চিকিৎসা করে জানায় তোর হার্টে ছোট করে ৪ টা ছিদ্র হয়ে গেছে। আগামী ৭২ ঘন্টার ভেতর যদি তোর হার্ট পরিবর্তন না করা হয় তবে তোকে বাঁচানো সম্ভব নয়।তৎকালীন তোর বাবার চোখ পরে বাবরের দিকে। বাবর এই হাসপাতালে কি করছে। জাহাঙ্গীর দেখলো ডাঃ ইব্রাহিম এর সাথে বাবর কথা বলছে। জাহাঙ্গীর আগ্রহ

নিয়ে ডাঃ ইব্রাহিম কে জিজ্ঞেস করে,উনি এখানে কেন এসেছে।ডাঃ ইব্রাহিম বললো,তেমন কিছু না অতিরিক্ত চিন্তার চাপে ওনার ছেলের হার্ট দুর্বল হয়।এখন সুস্থ আছে। তখনই তোর বাবা এক জঘন্য পরিকল্পনা আটে। তোর বাবা সেদিন বললো, বাবরের ছেলের হার্ট অপা,রেশন করে আমার ছেলের শরীরে স্থাপন করো।যত টাকা লাগে

আমি দেবো।ডাঃ ইব্রাহিম আপত্তি জানায় এরকম অন্যায় কাজ সে করবে না। তাছাড়া অপূর্বর জন্য হার্ট কোন হাসপাতালে পাওয়া যায়নি। জাহাঙ্গীর ডাঃ ইব্রাহিম কে বললো, আপনাকে আমি ৫ কোটি টাকা দেবো।এর পরিবর্তে এটা করতে হবে। ডাঃ ইব্রাহিম লোভে পরে রাজি হয়। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে জাহাঙ্গীর ও তার ছোট ভাই অর্থাৎ

তোর ছোট চাচা আরো একটি পরিকল্পনা আটে। জাহাঙ্গীর ভাবলো এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাবরের সমস্ত সম্পত্তি আমাদের আয়ত্তে করে নেবো।তৎক্ষণাৎ জাহাঙ্গীর ইব্রাহিম কে বললো, তোমাকে আরো একটি কাজ করতে হবে।ডাঃ ইব্রাহিম জানতে চায় কি কাজ ।তখন জাহাঙ্গীর বললো, তুমি বাবর কে বলবে আপনার ছেলের হার্ট

পরিবর্তন করতে হবে। এবং তারজন্য মোটা অংকের টাকা দরকার। এবং এই হার্ট বিদেশ থেকে আনতে হবে।ডাঃ ইব্রাহিম জাহাঙ্গীর এর পরিকল্পনা মত কাজ করে।অন্তিম কে অজ্ঞান করার ইনজেকশন দেয়। এবং বাবর কে জানায়, আপনার ছেলের হার্ট ব্লক হয়ে গেছে জরুরি পরিবর্তন করতে হবে। এবং তারজন্য ডাঃ ইব্রাহিম

মোটা অংকের টাকা চায়।যে পরিমানে টাকা চেয়েছিল তার পরিমাণ ছিল,সমস্ত বাবররাজ্যের জমি ও বাবরের বাড়ির ন্যায়। যে টাকা দরকার তারজন্য বাবররাজ্যের জমি বিক্রি করতে হবে।তোর বাবাই ডাঃ ইব্রাহিম কে টাকার পরিমান বলে দেয়।

সেদিন বাবর সিকদার বেঁচে থেকে ই মৃ,ত্যুর স্বাদ পায়। মেয়ে হারায়

এখন ছেলের এই অবস্থা তার উপর এত টাকা।কল্যানি বললো, গ্রামের সমস্ত জমি জমা বিক্রি করে দাও এবং আমাদের ছেলেকে বাঁচাও। বাবর তাই করে বাবররাজ্যের সমস্ত জমি ও বাড়ি বিক্রি করে দেয়। সেদিন বাবররাজ্য সমস্ত মানুষ হায়হায় করেছিল।কারন সবার আশ্রয় স্থল ছিলো বাবররাজ্য।আজ সেই সবকিছু বিক্রি করে দেয়।

গ্রামের অনেক মানুষ বাবরের বাড়ির সামনে এসে নিজের শরীরে আগু,ন দেয়।কারন তাদের বেঁচে থাকার আর কোন আশাভরসা নেই। রোজগার এর মাধ্যমে যে আর নেই। বাবর সেদিন সম্পুর্ন ভাবে ভেঙে পরে। বাবর সবকিছু বিক্রি করে সেই টাকা ডাঃ ইব্রাহিম এর হাতে দেয়। ডাঃ ইব্রাহিম সেই টাকা তোর বাবা অর্থাৎ জাহাঙ্গীর কে দেয়।

জাহাঙ্গীর আর তার ভাই অর্থাৎ শ্রাবনের বাবা এই টাকা ভাগাভাগি করে নেয়। শ্রাবনের বাবা বিদেশ এই টাকা দিয়ে ব্যাবসা শুরু করেন। আর তোর বাবা ঢাকার সহর ১৮ টি বাড়ি কিনে। যে বাড়ির কথা তুই ও জানিস না।সেই সমস্ত বাড়ি তোর নামে করা।

ডাঃ ইব্রাহিম অন্তিম এর অপারেশন করে। ডাঃ ইব্রাহিম বাবরকে জানায়

অপারেশন করতে দেরি হয়ে গেছে। আপনার টাকা নিয়ে আসতে দেরি হয়ে যাওয়াতে অন্তিম মারা যায়। তখন অন্তিম এর বয়স ছিল ২৭।ডাঃ ইব্রাহিম অন্তিম এর হার্ট তোর শরীরে স্থাপন করে।যদিও তোর বয়স অন্তিম এর থেকে কম ছিলো। এবং তুই কিছুদিন এর মধ্যে ই সুস্থ হয়ে যাস।কিন্তু অন্ধকার হয়ে যায় বাবররাজ্য। নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল

বাবর।তার সম্রাজ্য চলে গেলো।তার সাথে মেয়ে তার সাথে তার ছেলে। গ্রামের সবাই বাবরকে লাথি উষ্ঠা মারতো।

বাবর যাদের কাছে বাড়ি বিক্রি করে তারা বাবরকে ১২ ঘন্টা সময় দিয়েছিল তার বাড়ি ছাড়ার জন্য। তখন জয়গুন অর্থাৎ আমাদের দাদি সে ছিলো তার বাবা বাড়ি। বাবর সবকিছু হারানোর বেদনা সহ্য

করতে পারলো না। গ্রামের সবাই রঞ্জনা কে তুলে বে’’শ্যা উপাদি দিতো।বাবর এসব সহ্য করতে না পেরে কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়।যেদিন বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দেয় সেদিন রাতে বাবর ও তার স্ত্রী আ,ত্মহত্যা,করার সিদ্ধান্ত নেয়। আত্মহ,ত্যা করার আগে বাবর মালাইকাকে বলে তুই আর প্রিয়া এখান থেকে পালিয়ে যা।মালাইকা

ভয়ে চাপসে ছিলো। সমস্ত শরীরে ছিলো তার কাঁপুনি।বাবর বললো,তোর ছোট বোন প্রিয়াকে নিয়ে তুই এই গ্রাম ছেড়ে চলে যা। আর হ্যা কখনো কোথাও আমার পরিচয় দিবি না তোরা।মালাইকা যেতে রাজি হলো না।বাবর জোড় করলো।বাবর মালাইকা আর প্রিয়াকে ঘর থেকে বের করে দরজা বন্ধ করে দেয়।মালাইকা প্রিয়াকে

কোলে জড়িয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে যা দেখলো,মালাইকা পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে যায়।পূরো শরীর মালাইকার কাঁপুনি উঠে গিয়েছিল সেদিন।বাবর তার স্ত্রীকে বি,ষ পান করায় এবং একই সাথে নিজেও বি,ষ পান করে।মালাইকার চোখের সামনে তার মা বাবা মৃত্যু বরন করে।শেষ হয়ে গিয়েছিল বাবররাজ্য। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল

বাবররাজ্য। ধ্বং,স হয়ে গিয়েছিল বাবররাজ্য।

এদিকে জাহাঙ্গীর ও তার পরিবার ছিল আনন্দে। তাদের হয় সুখের রাজ্যে, কিন্তু পাপকে ধামাচাপা দিয়ে সুখ কিনে ছিলো জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গির তার শরীরের আঘাতের প্রতিশোধ নেয়।একই সাথে বাবরের ছেলের জীবনের পরিবর্তে নিজের ছেলের

জীবন বাচায়।কিন্তু সবকিছু এখানেই শেষ হয়নি।

অপূর্ব ভাঙা গলায় বললো, আমার বাবা কি এসবের সাথে জড়িত??

সূর্য ঠোঁট কুঁচকে হেসে বললো, নিকৃষ্ট মানুষটার জঘন্য কাজটা হাসপাতালেই শেষ হয়ে যায়। এসবের পেছনে ওনার হাত নেই কিন্তু ওনার নিকৃষ্ট কাজের জন্য ই আজকে এই মৃত্যু খেলা শুরু হয়।

সূর্য কিছুক্ষন থম মেরে থেকে বললো, এবং তোর পুলিশ অফিসারের চাকরিটাও তোর বাবার টাকার জোরেই হয়েছিল।কারন পুলিশ অফিসার হতে হলে নিখুঁত থাকতে হয়।

যেখানে জাহাঙ্গীর এর বেইমানির খেলা যেখানে শেষ হয়।সেখান থেকে শুরু হয় মালাইকা সিকদারিনীর মৃ'ত্যু খেলা। অপূর্ব

অবাক হয়। ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞেস করলো, কোথায় সে?সে এসব করে কি পাবে? জানি আমার বাবা খারাপ করেছে আমি নিজ হাতে তাকে শাস্তি দেবো।আইন সবার জন্য সমান। এবং এই হিং,স্র মালাইকাকেও। আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া অন্যায়। একজন পুলিশ অফিসার অন্যায় করেছে। কিন্তু সবাই তো আর এক নয়।মালাইকা চাইলেই

এর জন্য আইনি ব্যবস্থা নিতে পারতো। এবং পাপীদের শাস্তি দিতে পারতো। কিন্তু তারজন্য একাধিক প্রান নেয়াটা কাম্য নয়।

সূর্য বললো, তুই পারবি মালাইকা কে ,তার জঘন্য পাপের শাস্তি দিতে?

অপূর্ব রক্ত মাখা চোখে বললো, যেখানে আমি আমার বাবাকে শাস্তি দিতে পারবো, সেখানে মালাইকাকে কঠিন ও থেকে কঠিনতম শাস্তি

দিতে পারবো। অপূর্বর কথা বলার ভঙ্গিমায় ছিলো,রাগ,ঘৃনা। অপূর্বর তার বাবার প্রতি ঘৃনা জমে গেছে। অপূর্ব জিজ্ঞেস, করলো কোথায় মালাইকা সিকদারিনী!সে কত বড় সাহসী নারী তা আমি দেখতে চাই। সূর্য কিছু বলতে শুরু করবে ঠিক তখনি একজন চালা উপস্থিত হয়, সূর্য কে বললো,স্যার ১নং ঘরে আপনাকে জরুরি ডাকছে। সূর্য

অপূর্ব কে বললো, তুই বোস আমি আসছি। অপূর্ব এদিক সেদিক পরোক্ষ করে ভারি একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেললো। রঞ্জনার দাদির দিকে দৃষ্টি স্থাপন করলো। বসে বসে বির বির করে কিছু বলছে। অপূর্ব উপেক্ষা করলো। অপূর্ব বসা থেকে উঠে দাঁড়ায়। আগ্রহ নিয়ে বাহিরে বের হয়।১নং ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।যাওয়া যাবে না। অপূর্বর হঠাৎ

চোখ পরে মধ্যখান দরজার দিকে। অপূর্ব দেখলো দরজা টা খোলা।মনে মনে ভাবলো হয়তো দাদী এই ঘরেই ছিলো।দরজাটা খোলা ।এই মালাইকা হয়তো এখানেই আছে। অপূর্ব ঘরটির ভেতর ধিরে ধিরে প্রবেশ করে। চারদিক দিনের মত আলোকিত। সোনালী রঙের দেয়াল। সবকিছু সোনালী রঙে চিকচিক করছে। অপূর্বর বুকের ভেতর

ধুকবুকানি টা বেড়ে চলেছে। শরীর থেকে ঘাম ঝরছে। অপূর্ব সামনে এগোয়। কিছু দাসীরা উল্টো ঘুরে বিভিন্ন কাজ করছে।তবে এরা কেউ দেশী নাগরিক নয়।সবার সাদা শরীর।পরনে স্কার্ট, সাথে ছোট পাথরের আবরনের ব্লাউজ।এদের মধ্যে কি কেউ কি মালাইকা। অপূর্ব সামনে এগোতে থাকে।ঘরটা দেখে মনে হচ্ছে এটা আরাম আয়েশ

করার ঘর। ময়ূরপঙ্খী খাট।স্বর্নের প্রলেপ দেয়া।ঘরটির মাঝ বরাবর একটি দরজা।অপূর্ব অবাক হয় এই ঘরেও একটা দরজা। অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে দরজাটির কাছে এগোয়। অপূর্ব বারবার ঢেক গিলছে।বুকের ভেতর ধরফর করছে। হঠাৎ এরকম কেন অনুভূতি হচ্ছে।মনের মধ্যে এত কুহ ডাকছে কেন। অপূর্ব দরজাটি খুললো।দরজাটি খোলাই ছিল। অপূর্ব

দেখলো আলোকিত এটি সিড়ি বেয়ে গেছে নিচের দিকে। সামনের স্থান টা আয়োতনে বড়। কিন্তু এই দেয়াল গুলো ঈটের মত রঙ,হয়তো এগুলো শুধু ঈট দিয়েই বাধাই করা। অপূর্ব কিছুটা নিচে নামতেই দেখলো,একটি ছোট পুকুর।তবে সাধারণ কোন পুকুর নয়। পুকুরের ঘাট রুপা দিতে বাধাই করা।পানি গুলো নিলাকার। অপূর্ব দেখলো একটি মেয়ে পুকুরের

ভেতর গোসল করছে।যার চুল অনেক বড়, সমস্ত শরীর ধবধবে ফর্সা,পরনে কালো রঙের স্কার্ট, সাদা পাথরের আবরনের ব্লাউজ।কমরে স্বর্নের বিছা।মাথায় একটা ছোট মুকুট। তার দু পাশে ৬জন দাসী। পুকুরের পানি কমর অব্দি।পানিতে হাজারো বেলিফুল। অপূর্ব ভাবলো,এটাই হয়তো মালাইকা।

একজন দাসী, উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকা,মালাইকার লম্বা চুল ধুয়ে দিচ্ছে। একজন মাথায় দুধ ঢেলে দিচ্ছে। অপূর্ব মালাইকাকে দেখতে চাইলো। অপূর্ব সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলো। অপূর্বর বুকের ভেতর ধরফর করছে। অপূর্ব নিচে নেমে হাতের বা দিকে যাচ্ছে।পুকুরটি গোলাকার। অপূর্ব ঘুরে গিয়ে সামনে থেকে মালাইকার মুখটি দেখবে।

অপূর্ব ধির পায়ে এগোচ্ছে। অপূর্ব যত বা দিকে যাচ্ছে।মালাইকা তত ডান দিকে ঘুরছে। অপূর্ব পুকুরের মাঝ বরাবর। মালাইকা মুখ ঘুরিয়ে সামনের দিকে রেখেছে। অপূর্ব দেখতে পারলো না।মালাইকা ভেজা চুল গুলো এপাশ ওপাশ করছে। মালাইকা পা ভাজ করে পানির ভেতর ডুব দেয়। অপূর্ব অপেক্ষা করছে কখন উঠবে। অপূর্ব মনে

মনে বলছে,এদিকে ঘুরেই যেন ডুব থেকে উঠে। মালাইকা ডুব থেকে ধিরে ধিরে উঠলো।মালাইকা চোখ বোঝা অবস্থায় পানির ভেতর থেকে উঠলো। অপূর্বর হঠাৎ করেই চোখ গুলো ছানাবরা হয়ে যায়।পূরো পৃথিবী এলোমেলো হয়ে যায়। অপূর্ব চট করে গিয়ে দেয়ালে ধপাস করে ঘেষে পরে। সামনে থাকা সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসছে। অপূর্বর মাথা

ঘুরে যায়। অপূর্ব কাপা ঠোঁটে একবার বললো,এলিজাহহহ।এলিজা চোখ বন্ধ অবস্থায় উল্টো ঘুরে যায়। পুকুর থেকে উঠে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়। অপূর্ব কে দেখেনি। অপূর্বর নিমিষেই শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে যায়। অপূর্ব দেয়াল ঘেঁষে বসে পরে। অপূর্ব কাকে দেখেছে,এ কোন এলিজা,কি তার অঙ্গ ভঙ্গি।পরনে তার কি পোশাক।

তৎক্ষণাৎ সূর্য আসে। সূর্য বুঝতে পেরে যায়। অজানা হিং,স্রী নারী তার চোখের সামনে,সে যে আর কেউ নয়,তার প্রিয়তমা স্ত্রী। অপূর্ব আরো একবার কাপা ঠোঁটে বিড়বিড় করে বললো,এলিজাহহ। অপূর্বর কথা বলার মত শক্তি নেই। সূর্য অপূর্বর মুখের কাছে গিয়ে,এক অদ্ভুত স্বরে বললো,সে এলিজা নয়,সে মালাইকা সিকদারিনী।

বাবররাজ্যের রাজকুমারী।তাকে সবাই রাজকুমারী বলে। সূর্য খিল খিল করে হেসে উঠে। অপূর্ব নিস্তেজ, নিঃস্ব, অপূর্বর দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতর দুমরে মুচড়ে যাচ্ছে। সুর্য অপূর্বর পাশে এক পা টান করে দেয়াল ঘেঁষে বসে। অপূর্বর এক পা ভাঁজ করা।অন্য পা টান করে বসে আছে।

অপূর্ব নিস্তব্দ।ভেতরে ভেতরে মরে যাচ্ছে।চোখ দিয়ে পানি পরছে। অথচ কান্নার শব্দ নেই। অপূর্ব কাপা ঠোঁটে বললো, সব সত্যিটা বল।সূর্য বলতে শুরু করলো,

তোর বাবার সেই জঘন্য কাজের জন্য ধ্বংস হয় সুন্দর একটি পরিবার।

সেদিন মালাইকা ওর ছোট বোনকে নিয়ে পালিয়ে আসে।তখন প্রিয়ার বয়স ৬।

মালাইকা ছিল ভিতু। সবকিছুতেই ভয় পেয়ে যেত।একটা মেয়ে মানুষ কোথায় যাবে,কার কাছে যাবে,সবাই যে অচেনা।মালাইকা সেদিন রাতে প্রিয়াকে নিয়ে আলি বাড়ি ওঠে। আলির রান্না ঘরে মালাইকা প্রিয়া রাত কাটানোর জন্য স্থান নেয়।

প্রিয়া কেঁদে উঠে।মা বাবার জন্য। তখন জয়তুন কারো কান্নার আওয়াজ শুনে রান্না ঘরে যায়। জয়তুন দেখলো দুটো মেয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তখন ছিল শীতের দিন।মালাইকা শীতের থেকে ও বেশি ভয়ে কাপছিলো। জয়তুন এর মায়া হয়। জয়তুন, রমজান সবকিছু জিজ্ঞেস করে।মালাইকা সবকিছু খুলে বলে। জয়তুন রমজান

এর সন্তান না থাকায়, ওদের সন্তানের জায়গাটা দিয়েছিলো।কিন্তু অপরাধী নিজেকে যত বড় চালাক ই মনে করুক না কেন সে কোন না কোন ভুল করেই থাকে।যেদিন হাসপাতালে তোর বাবা আর ডাঃ ইব্রাহিম অন্তিম কে মেরে ফেলার,ও তার সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়ার চুক্তি করে সেদিন নার্স রিয়া সব শুনে ফেলে। নার্স রিয়া বলেছিলো পুলিশ

কে জানিয়ে দিবে।তখন ডাঃ ইব্রাহিম রিয়াকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। এবং চেষ্টা ও করে কিন্তু পারেনি। সেদিন থেকে রিয়া গায়েব হয়। তোর বাবা রিয়াকে খু,ন করার জন্য কিছু গুন্ডাদের টাকা দেয়।রিয়া বুঝতে পেরে গেছিলো যে ওর আয়ু আর বেশিদিন নেই।আর পুলিশ কে যদি রিয়া জানিয়ে দেয় তবে ওর পরিবার কেও শেষ করে দিতো।সেই

ভয়ে আর রিয়া পুলিশ কে জানালো না।রিয়া খোজ করলো বাবররাজ্যর। জানতে পারে বাবর ও তার স্ত্রী মারা গেছে। বেঁচে আছে তার দুই মেয়ে কিন্তু তারা কোথায় তা জানা নেই। রিয়া অনেক কষ্টে খুজে পায় মালাইকাকে , সেদিন মালাইকাকে সব কিছু বলে দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে রিয়া কে জাহাঙ্গীরের লোকেরা মেরে ফেলে।সেদিন সব

সত্যি মালাইকা জেনে যাওয়ার পর, ভীতি মালাইকা হয়ে ওঠে হিং,স্রী মালাইকা। নিজের পরিচয় বদলে ফেলে। নিজের নাম দেয় রত্না এবং প্রিয়ার নাম দেয় পাখি। এভাবে কিছুদিন কেটে যায়। জয়তুন ছিলো আল্লাহ ভীরু, জয়তুন বললো রত্না নামটা ভালো না।আজ থেকে তোর নাম এলিজা।এলিজা ভেতরে ভেতরে ফন্দি আটতে থাকে। সাধারণ,থেকে

হয়ে ওঠে অসাধারণ।এই অসাধারণত্ত-ছিলো হিংস্র-তা। এলিজার পরিকল্পনা জয়তুন বা রমজান এবং পাখি এরা কেউ ই জানতো না। আমি জানতে পারি মালাইকা কোথায় ।আমি দেখা করতে যাই।তখন মালাইকা আমায় সবকিছু খুলে বলে। এবং আমিও খুলে বলি,যে রঞ্জনা কে কারা মেরেছে।

সেদিন থেকেই শুরু হয় মৃত্যু খেলা। আমরা দুটো জায়গায় আস্থানা তৈরি করি।একটি বাবররাজ্য এবং রুশরাজ্যে। এই বাড়িটা যারা কিনেছিলো তারা আর আসেনি। কারন বাবর ও তার স্ত্রী আত্মহ,ত্যা করেছে বলে। আমরা একে একে অনেক নিরীহ মানুষের প্রান নেই। দূর্জয় সহ অনেক কে শেষ করি। শুরু হয় ২৭ বছরের ছেলেদের

কিডন্যা,পিক।আমি টাকা দিয়ে হিমেল এবং চীপস কে কিনে নেই। চীপস জানায় তার আরো একজন ডাক্তার লাগবে।তখন ডাঃ ইব্রাহিম কে আমাদের মৃত্যু খেলায় নিয়ে আসি।কারন,ডাঃ ইব্রাহিম ভয় পেয়ে গিয়েছিল যদি সবকিছু পুলিশ কে বলে দেই। সেদিন থেকে ইব্রাহিম ও জড়িত হয়। এলিজা জানতো না যে,রিয়া যে জাহাঙ্গীর এর কথা

বলেছে আমি তার পরিচিত।আমি তোকে চিনী তা এলিজা-জানতো না। এবং আমিও বলিনি। কারন আমি তোর মৃত্যু চাইনি।এলিজার মূল উদ্দেশ্য ছিল তোকে হ,ত্যা করা। চাইলে এলিজা জাহাঙ্গীর কে অনেক বার মেরে ফেলতে পারতো কিন্তু ওর নিসানা ছিলিস তুই। কিন্তু আমি এলিজা কে বলতাম তার ছেলে বিদেশ। মিথ্যা বলতাম যাতে ও

তোর খোঁজ, এবং তোকে খু,ন না করতে পারে।তোকে না পেয়ে এলিজা একে একে হাজারো নিরীহ ২৭ বছরের ছেলেদের খু,ন করতে থাকে। এবং ওদের হার্ট গুলো বিদেশ পাচার করে দিতো। এবং সেই টাকা অসহায়দের মধ্যে বিলিয়ে দিতো। সেই সাথে কিড,ন্যাপ করা হত সদ্য বিয়ে ঠিক হওয়া কনেদের। এটা করতো রঞ্জনার জন্য।এভাবেই

মৃত্যু খেলায় কেটে যায় দির্ঘ একটি সময়।

একদিন এলিজা আমাকে খোজ পাঠায় যে,আমরা যাকে খুঁজছি সে আমাদের নাগালে।আমি সেদিন আদমরা হয়ে গিয়েছিলাম।কি বলছে এসব।আমি জিজ্ঞেস করি মানে কি,তখন ও বললো, জাহাঙ্গীর চৌধুরীর ছেলে অপূর্ব রুশরাজ্যে এসেছে।আমি কি করবো বুঝতে

পারছিলাম না।আমি তখন তোর খোঁজে তোর বাড়ি যাই। এবং জানতে পারি তুই সত্যি ই বিক্রমপুরের রুশরাজ্যে ক্যাম্পিং এ গিয়েছিস।আমি কি করবো বুঝতে পারছিলাম না ।এলিজা আমাদের দলের সবাইকে নিয়ে রুশরাজ্যে উপস্থিত হয়। কিন্তু ওরা দেখলো তোদের টিমে অনেকজন। এলিজা এভাবে অনেক দিন তোর জন্য

রুশরাজ্যে যায়। দিনেও অনেকবার ছদ্মবেশে গিয়েছে তোকে দেখার জন্য।ওর ভাইয়ের হৃদয় কার শরীরে তা দেখার জন্য। কিন্তু তোকে দেখার পর থেকে এলিজার হাবভাব অন্য রকম হতে থাকে। দলের অন্যরা তা পরোখ করতো।এভাবে এলিজা তোকে দূর থেকে অনেকবার পরোখ করে। একদিন রাতে এলিজা তোকে দেখার জন্য একাই রুশরাজ্যে যায়।

সেদিন ছিলো তোদের ক্যাম্পিং এর বয়স ১৩ দিন। এলিজা তোকে দেখে। অন্ধকার রাতে চাদনীর আলোয় তোর সুন্দর্য এলিজা কে আকর্ষন করে। এলিজা তোকে দূর থেকে পরোখ করতো।তখনি তুই এলিজার উপস্থিতি বুঝতে পারিস। এবং এলিজা কে ধরে ফেলিস। এলিজা নতুন ফন্দি আঁটে।যে,তোকে প্রেমের ফাঁদে ফালাবে।আর এলিজা-

এও জানতো ওর রুপের ঝলকে যে কেউ প্রেমে পরবে। সেদিন তুই এলিজাকে দেখিস এবং ওর প্রেমে পরিস।কিছুটা সময়ের ব্যাবধানে তুই ওকে বিয়ে করার জন্য অস্থির হয়ে যাস। এলিজা ও রাজি হয়।এলিজা শুধু ওর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তোকে বিয়ে করে।তখন তোর বাবা জানতো না কে এই এলিজা।একটা সময় জানত পারে এলিজাই বাবর

সিকদার এর মেয়ে। এটা জানার পর তোর বাবা এলিজাকে মারার জন্য দুজন গুন্ডা ঠিক করে ১০ লাখ টাকা দিয়ে।সেদিন রাতে তোর থানাতে কাজ ও থাকে অনেক। জাহাঙ্গীর সেই সুযোগ কাজে লাগায়। জাহাঙ্গীর সেদিন খাবারের পানিতে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে রাখে। সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু এলিজা সেদিন রাতে খাবার ই

খায়নি।কারন এলিজা জানতো জাহাঙ্গীর কেমন নিকৃষ্ট মানুষ।সেদিন রাতে এলিজা কে আক্রমন করলে এলিজা কোনরকম বেঁচে যায়। পরবর্তীতে আবার আক্রমন করলে এলিজা কে বায়েজিদ বাঁচিয়ে নেয়। এবং তৃতীয় বার খু,ন করতে চাইলে জাহাঙ্গীর নিজেই বাচায় এলিজা-কে। কারন তোর মা চলে যাওয়ার পর উনি নিস্তেজ হয়।

গুনজন এবং মৌলবী দুজনেই জেনে গিয়েছিল আমাদের পাপের সম্রাজ্যের কথা। তোদের বিয়ের পরেরদিন তুই আর সাদিক যখন , গুনজন কে দেখিস,সেদিন গুনজন তোকে সব বলার জন্য ই গিয়েছিল। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি। এরপর এলিজা-মৌলবী আর গুঞ্জন কে মেরে ফেলতে বলে। অপূর্ব থম মেরে কাপা ঠোঁটে বললো, যেদিন মৌলবী মারা যায়, সেদিন

তো এলিজা-আমার কাছেই ছিলো। যখন গুনজন মারা যায় তখন ও এলিজা-আমার কাছে ছিলো তবে কারা মেরেছে?

সূর্য ঠোঁট কুঁচকে হেসে বললো, আমিও মারিনি এলিজা ও না। মৌলবী কে মেরেছিল হিমেল,চীপস, এবং শ্যামলী। অপূর্ব অবাক হয়।ভ্রু কুঁচকে ভাঙ্গা গলায় বললো,শ্যামলী?? সূর্য বললো,হ্যা শ্যামলী ।যে বয়সে

আমাদের থেকে বড় । সে ছিল অন্তিম প্রেমিকা।অন্তিম এবং শ্যামলী দুজন দুজনকে অসম্ভব ভালোবাসতো। কিছুদিন পরই ওদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওরাও নিয়তির কাছে হেরে যায়।

সূর্য ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, এলিজা-তোকে ভালোবাসে। অপূর্ব মেরুদন্ড সোজা করে বসে। অপূর্ব বললো বিশ্বাস করি না । সূর্য

বললো, এলিজা ধিরে ধিরে তোর মায়াজালে ফেসে যায়। এক পর্যায় তোর উপর এবং তোর বাবার উপর থেকে সব রাগ তুলে নেয়। শুধু মাত্র তোকে ভেবে। কিন্তু তারপরেও এলিজা-এই পাপের, জঘন্য মৃ'ত্যু খেলা খেলতে বাধ্য হচ্ছে। অপূর্ব বললো, যে অন্যের নিরীহ জীবন কেরে নিতে পারে সে কখনো অন্যকে ভালোবাসতে পারে না।

অপূর্ব ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাঙা গলায় বললো, তারপর কি হয়েছিল?

সূর্য বললো, মৌলভী কে মেরে ফেলার পর।তার লা,শ কে রাস্তার পাশে ফেলে দেই।

রুশরাজ্যে যে লা,শ টি দেখেছিলাম। সাথে যে মেয়েটি সে কে?সূর্য বললো, সেদিন ও তোর চোখে ধুলো দিয়েছিলাম। ওটা সাগরের লা,শ

নয়। সেটি ছিল অন্তিম এর লা,শ। এবং মেয়েটি ছিলো শ্যামলী। যখন আমার চালারা আমায় বললো, একটা ছেলে ঠুকে পরেছে আমাদের আস্তানায় তখন আমি , ওদের কাছে বর্ণনা জিজ্ঞেস করলে তোর সাথে মিলে যায়। এবং আমি নিশ্চিত ছিলাম ওটা তুই।তাই শ্যামলী কে সরিয়ে ওর জায়গায় একটা দাসী কে বসিয়ে দেই।অপূর্ব কাপা কণ্ঠে

বললো, নিরার কথা বললি না,তাকে কে মেরেছে?

সূর্য বললো, নিরাকে তো এলিজা ওর বিয়ের আগে মেরে'ছিলো। কিন্তু এলিজা নিরাকে ভাবী হিসেবে খুব ভালো বাসতো। একদিন রাতে এলিজা আর শ্যামলী রুশরাজ্যে আসতে ছিলো তখন নিরা পিছু নেয়। নিরা ভাবী সবকিছু জেনে যাওয়াতে আমরা মিলে সেদিন তাকেও শেষ

করে দেই।অপূর্ব নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে।বুকের ভেতর ধুকবুকানি টা বেরে চলেছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।চোখে রক্ত উঠে কার্নিস লাল হয়ে গেছে।কথা বলার মত শক্তি নেই।

সূর্য চুপ করে বসে আছে।একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে টানতে শুরু করে।

অপূর্ব ভাঙা গলায় বললো, আর কিছু অজানা আছে?সূর্য ঠোঁট কুঁচকে হেসে বললো, এবার আসি ডাঃ জাকির এর কাছে।যখন আমি তোর কাছে বাবররাজ্যের নকশার কয়েন দেখি,তখন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। তুই ওটা নিয়ে ফরেন্সিক ল্যাবে যাস।তখন আমি কয়েনের ব্যাপার টা এলিজাকে বলি। এবং তোকে কয়েনের কথা ভুলিয়ে রাখার জন্য

সেদিন তোর বাড়িতে গিয়েছিলাম। এবং সেই রাতে ডাঃ জাকির,ল্যান্ডলাইনে তোকে ফোন দেয়। সৌভাগ্য বসত ফোন টা এলিজা রিসিভ করে।তখন জাকির বলেছিলো যে কয়েনটা চুরি করেছে তার খোজ পেয়েছি। মৃত রিয়ার এ্যাপ্রন পরে শ্যামলি ই তোকে বোকা বানিয়েছিলো। শ্যামলি কন্ঠস্বর পরিবর্তন করতে পারে। এবং

জাকির কে শ্যামলি এবং চীপস,হিমেল মিলে হ,ত্যা করেছিলো।
এবং জাকির যে ইংলিশে লিখে গিয়েছিলো'The Gold ,এটার মানে ছিলো এই বাবররাজ্য।কারন বাবররাজ্যের অপর নাম,সোনার-নগর।জানি না এমন নাম কেন। হয়তো,বাবর এবং তার পিতৃপুরুষের কোন ঐতিহ্য থেকে নামটি দেয়া।

অপূর্ব ভাঙা গলায় বললো, তারমানে তুই আর শ্যামলী আগে থেকেই দুজন দুজনকে চিন্তিস তবে,না চেনার অভিনয় কেন করেছিস?খুব সোজা।কারন আমি চাইনি তোর সামনে কোন ভাবে সন্দেহ জনক কিছু হোক।

অপূর্ব বললো, ঘরের ভেতর যে,ছবি টাঙানো,সে কে?

সূর্য বললো, রঞ্জনার ফুপি।যিনি অনেক বড় একজন নৃত্য শিল্পী ছিলো।আমরা দেখিনি তাকে।কম বয়সেই মারা যায়। আমি যে ঘরটাতে থাকি সেখানেও তার ই ছবি।

আর কিছু অজানা আছে?

সূর্য সিগারেট এর ধোঁয়া উপরের দিকে ছেড়ে বললো,এবার আসি এনজিওর ব্যাপারে।এলিজা কোন

এনজিও তে কাজ করতো না।ওর মাঝে মধ্যে হা'র্ট পাচা'র করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে হতো।সেখানে এলিজা কে দরকার পরতো।তোর যাতে সন্দেহ না হয় সেইজন্য এই এনজিওর নাটক।

কাঠের পুতুল এর রহস্য কি ছিলো? একবার পাখি আলি বাড়িতে বসে কাঠের পুতুল দেখে ভয়।যে ভয়ের প্রভাব ছিলো দীর্ঘদিন। এলিজার

তোর বাবার প্রতি সেদিন রাগ হয়। জাহাঙ্গীর এর জন্য ই আজকে এতকিছু।এলিজা পাখিকে ভিষন ভালো বাসে।তাই অর্পা কে ভয় দেখানোর জন্য এরকম টি করেছিলো। চেয়েছিল জাহাঙ্গীর অর্পার চোখে ভয় দেখুক।

চীপস ছদ্মবেশে শ্রাবনের বিয়েতে কেন এসেছিল?

তখন একটা ডিল হওয়ার কথা ছিলো।সেই খবর ই চীপস দিতে এসেছিলো।

কোলাহল এর ভিতর এলিজার সাথে বলে চীপস। এবং সেই কথা সেদিন বায়েজিদ শুনে ফেলে। বায়েজিদ সেদিন অবাক হয়।ভিষন ভয় ও পায়। তারপর দিন বায়েজিদ রাত বসে কাঠ কাটছিলো। বায়েজিদ কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এরপর

এলিজা বাঁয়েজিদ কে জিজ্ঞেস করে। সেদিন বায়েজিদ কিছু বলার আগেই তুই এলিজার কাছে যাস।তারপর দিন বায়েজিদ কে জিজ্ঞেস করলে, বায়েজিদ কিছু বলার আগেই তোর বাবার লোক এলিজা কে আক্রমন করে। এবং বায়েজিদ বাচায়।

বায়েজিদ কোথায়?

সূর্য চোখের ইশারায় সামনের দিকে দেখিয়ে দেয়।

অপূর্ব আহত দৃষ্টিতে তাকায়। অপূর্ব দেখলো বায়েজিদ,পানির মধ্যে থেকে বেলিফুল গুলো কিছু একটার সাহায্য উঠাচ্ছে। অপূর্ব অবাক হয়ে যায়। অপূর্ব কথা বলার সমস্ত হারিয়ে ফেলেছে।চোখের পানি শুকিয়ে গালের সাথে লেগে আছে।

কাপা ঠোঁটে বললো, বায়েজিদ এসবের সাথে জড়িত কেন?

সূর্য বললো, এলিজা কোন কাঁচা খেলোয়াড় নয়।সে তার অন্ধকার জগতে সবাইকে নিয়ে এসেছে। বায়েজিদ সেদিন রাতে তোর বাবার,পাঠানো একজন গুন্ডাকে হ,ত্যা করে। এবং নিজেই সেই লা,শ পুতে ফেলে। সেটা এলিজার ভালো লেগেছিল।তাই টাকার লোভ দেখিয়ে বায়েজিদ কেও কিনে নিয়েছে।অপূর্ব

কাঁপা ঠোঁটে বললো,আর আমাকে কেন বাঁচিয়ে রেখেছে?

সূর্য বললো,কারন ও তোকে ভালোবাসে।আমরা ভেবেছিলাম,যে তোকে হয়তো কোন না কোন ভাবে মে'রে ফেলবে কিন্তু না,ও বলেছে আমার আর তার প্রতি কোন অভিযোগ নেই।কারন ভালোবাসার মানুষটার প্রতি কোন অভিযোগ থাকতে পারে না।তোর কোন সমস্যা

হলে,এলিজা পাগলের মত হয়ে যেত। তোর থানা থেকে ফিরতে দেরি হলে,এলিজা তোর চিন্তায় বেকুল হয়ে যেত। এবং তোর জন্য হাজার টা খু,ন করার জন্য প্রস্তুত হত।

যদি তোর কোন ক্ষতি কেউ করতে চায়। তবে তাকে শেষ করে দেয়ার চিন্তা গ্রা,স করতো।তিলকনগর সেদিন যখন হাশেম কয়েনটি দেয়,

এবং তোর মাথায় যে আঘাত করে,সে ছিল আমাদের দলের ই একজন।সেও ছিল বিদেশিয়ান। তোর শরীরে আঘাত করাতে,এলিজা ওকে শেষ করে দিয়েছিল।অপূর্ব ঠোঁট কুঁচকে হেসে বললো, সব মিথ্যা।ছলনা করেছে আমার সাথে। যদি আমাকে ভালোবাসতো তবে, আমার সাথে একটার পর একটা মিথ্যা বলতে পারতো না। এই

নোংরা মৃত্যু খেলা খেলতে পারতো না।সূর্য কিছু বললো না। অপূর্ব উপর দিক তাকিয়ে ভারি একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাড়ায়। সূর্য বললো, কোথায় যাচ্ছিস।

অপূর্ব শক্ত গলায় বললো, শেষ বারের মত একবার, মালাইকা সিকদারিনীর সাথে কথা বলতে যাচ্ছি। সূর্য হকচকিয়ে উঠে। অপূর্ব সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে। দরজা খুলে

ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে।দেখলো ঘর খালি।ঘরটির ডান-দিকে একটি ঘর। অপূর্ব ঘরটিতে প্রবেশ করে দেখলো, এলিজা-আয়নার সামনে বসে আছে।দাসীরা কয়লার তাপ দিয়ে চুল শুকিয়ে দিচ্ছে।কেউ গলা থেকে অলংকার খুলছে। পরনে লেহেঙ্গা নেই। লেহেঙ্গা বদলে,শাড়ি পরেছে।সাজ দেখে মনে হচ্ছে,বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা করবে। অপূর্ব

এলিজাকে দেখা মাত্রই দূর্বল হয়ে যায়। ভাঙ্গা গলায় বললো,মালাইকা সিকদারিনী!এলিজা মেঝের দিকে দৃষ্টি ছিল। হঠাৎ করেই এলিজা- হকচকিয়ে উঠে।চোখ গুলো বড় বড় হয়ে যায়। ভেতরের ধুকবুকানি টা বেরে যায়। এলিজা আয়নার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করলে দেখতে পায়, উল্টো দিকে অপূর্ব দাড়িয়ে আছে । এলিজা হতভস্ব হয়ে যায়। শরীরের

শক্তি ধিরে ধিরে শেষ হয়ে যায়।
এলিজা কথা বলার বাক্য হারিয়ে ফেলে।
অপূর্ব কাপা ঠোঁটে বললো, খু,ন করতে চেয়েছিলে আমায়?
এলিজা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে,উল্টো দিকে ঘুরে কানের দুল খুলতে খুলতে সাধারণ ভঙ্গিতে জবাব দিলো,
চেয়েছিলাম।

করলে না কেন?

আটকে গিয়েছিলাম!

কিসে?

আপনার ভালোবাসার মায়াজালে। অপূর্ব ঠোঁট কুঁচকে হেসে দেয়। এলিজা দাসীদের হাতের ইশারা করে তারা চলে যায়। এলিজা উল্টো দিকে ঘুরে আছে। অপূর্বর চোখে চোখ রাখার মত শক্তি নিমিষেই শেষ। অপূর্ব এই এক – কদম দু-

কদম পেছনে যেতে যেতে কাঁপা গলায় বলল, শেষ করে দিতে সেদিন।নিশি রাতের আড়ালে আমার বুকটা ছুরির আঘাতে ছিন্নভিন্ন করে দিতে।

তোমাকে বলেছিলাম*তোমার এই রুপ যেন কোনদিন পাল্টে না যায়। সৎ রুপের আড়ালে-লুকিয়ে থাকা অসৎ রুপের ঝলক' আমাকে আগুনের মত ঝলসে দিচ্ছে '

প্রথম দেখাতেই বুক ছিরে হৃদয় টাকে নিয়ে নিতে'
মৃত্যুর চেয়েও বিষা'ক্ত 'প্রিয় মানুষের ছলনার রুপ।সৎ অঙ্গের আড়ালে ' লুকিয়ে থাকা অসৎ অঙ্গর ঝলক 'আমাকে আগুনের মতন পুড়িয়ে দিচ্ছে"।

অপূর্ব থেমে যায়। এলিজা মাথা নত করে উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দিয়ে পানি পরছে।

হিং,স্ত্রী মালাইকা,ধিরে ধিরে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। অপূর্ব এলিজার চুপ করে থাকা সহ্য করতে পারছে না। অপূর্ব এলিজার ডান হাতের কব্জি ধরে, নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেয়। কব্জিতে থাকা অলংকার অপূর্বর হাতের স্পর্শে মাংসের ভেতর ঠুকে যাচ্ছে।এলিজা জ্বলজ্বল চোখে অপূর্বর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে। অপূর্ব ঘৃনা জড়িত কন্ঠে বললো,কেন

করলে এমন!কেন আমার সাথে মিথ্যা ভালোবাসার নাটক করলে! কেন আমাকে তোমার মিথ্যে মায়ায় ফাসালে!কি দোষ করেছিলাম আমি! এলিজা নিশ্চুপ। অপূর্ব এলিজার ঘা ঘেষে মেঝেতে হাঁটুঘেরে বসে পরে। এলিজা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্ব বেদনা সহ্য না করতে পেরে এলিজার পা জড়িয়ে ধরে।অঝরে কান্না শুরু করে বললো, তুমি তো

আমাকে কথা দিয়েছিলে, তোমার এই রুপ কোনদিন পাল্টাবে না'সারাজিবন সাধারণ এলিজা হয়ে থাকতে'তোমার এই ভয়ং,কর রুপ আমি সহ্য করতে পারছি না। এলিজা কিছু বলছে না।থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে।ডান হাতের ভেতর স্বর্নের বাজু ঠুকে পরাতে রক্ত বের হচ্ছে। রক্ত বেয়ে পরছে অথচ সেদিক এলিজার কোন খেয়াল নেই।

হঠাৎ অপূর্ব দ্রুত উঠে দাড়ায়। নিজেকে শক্ত করে ঘৃনার ভঙ্গিতে বললো, তুই একটা ছলনাময়ী, কালনাগিনী, মিথ্যাবাদী। অপূর্ব এলিজার দুই স্বিনাতে হাত দিয়ে বললো, আর কোনদিন আমার চোখের সামনে আসবে না।আজ থেকে আমি কোন এলিজা–কে চিনি না।আর খুব শীঘ্রই তোর এই, ধ্বংস,সলীলা আমি শেষ করবো।

সমস্ত পুলিশ টিম এখানে পাঠাবো। এবং নিরীহদের উদ্ধার করবো। অপূর্ব ক্রোধের সরে কথা শেষ করে,এলিজাকে চটকে ছেড়ে দেয়। এলিজা মেঝেতে উপর হয়ে পরে যায়।চুল গুলো এলোমেলো হয়ে যায়।শাড়ির আচল টা অনেক বড়। অপূর্ব ঘৃনার দৃষ্টিতে এলিজার দিকে পরোখ করে ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়। অপূর্ব হাতের উল্টো দিক দিয়ে

চোখের পানি মুছে যেতে থাকে। সূর্য দরজার বাহির থেকে হাত দুটো পাঁজা-বেধে দাড়িয়ে আছে। অপূর্ব যেতেই অপূর্ব কে উদ্দেশ্য করে বললো, প্রিয়তমা স্ত্রীর হাতে হাত কড়া পরাতে পারবি? অপূর্ব থম মেরে দাঁড়িয়ে বললো, আমার স্ত্রী এলিজা মরে গেছে।যখনি তার ঐ ভয়ংকর রুপ দেখেছি তখনই সে আমার কাছে মৃত হয়ে গেছে।সূর্য

ঠোঁট কুঁচকে হেসে বললো,চোখে পানি কেন? অপূর্ব সূর্যর দিকে আর চোখে একবার তাকিয়ে চলে যায়। এলিজার ঘরে আসে শ্যামলী, শ্যামলি অস্থির ভঙ্গিতে বললো, অপূর্ব কে আটকা!ওকে যেতে দিস না।বাধা দে,ওর পা ধরে মাফ চা।সে যে তোর স্বামী,। বিচ্ছেদের যন্ত্রণা আমি বুঝি। যা,যা ।বল যে তুই ভুল করেছিস।এলিজা হতভম্ব হয়ে যায়।

নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে।পূরো পৃথিবী টা ঘুরছে।এলিজা উঠে দৌড়ে চলে যায়। অপূর্ব পাতাল ঘর থেকে বেড়িয়ে হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে যেতে থাকে। এলিজা পেছন পেছন দৌড়াতে থাকে। অপূর্ব একবার পেছন ঘুরেও দেখছে না।এলিজা দৌড়াচ্ছে,চুল গুলো দর্পন করছে। শাড়ির আঁচল টা উড়ে যাচ্ছে। অপূর্ব

উপর তলা থেকে নিচ তলায় চলে আসে। এলিজা দৌড়ে আসতেই অপূর্ব বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। এলিজা হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়।ঘোর ঘুরিয়ে অপূর্ব কে পরোখ করে। ততক্ষনে অপূর্ব বাবররাজ্যের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। এলিজা উঠে বাড়ির সামনে আসলে দেখলোহ অপূর্ব চলে যাচ্ছে।রাত শেষ হয়ে ভোরের দর্পন হচ্ছে। অপূর্ব চলে

যাচ্ছে। এলিজা থমকে দাঁড়িয়ে অপূর্বর যাওয়ার পানে দেখে।ভোরের আলো ফুটলেও এই ভোর অভিশপ্ত এক ভোর। চারদিক অভিশপ্ত আলোতে আলোকিত হচ্ছে। চারদিক নিশ্চুপ। প্রকৃতি আজ অন্য কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে। এলিজা নিস্তেজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পেছন থেকে দাসীরা দেখছে।সবাই এলিজাকে দেখছে। এই কি সেই হিং,স্রী মালাইকা!যে

আজ নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে।অপূর্ব বাড়িতে ফিরেই উত্তেজিত মেজাজে জাহাঙ্গীর কে ডাকতে থাকে। বাবা বাবা বলে চেঁচাতে থাকে।মনোরা রান্না ঘর থেকে বললো, নিজের ঘরে আছে। অপুর্ব দ্রুত পায়ে হেঁটে উপরে উঠে। মমতাজ পরোখ করে। অপূর্বর হাবভাব স্বাভাবিক নয়। জাহাঙ্গীর চেয়ারে হেলানে বসে আছে । অপূর্ব কর্কট মেজাজে বললো,

কথা আছে উঠে এসো। জাহাঙ্গীর চোখ বুজে আছে।চোখ বোজারত অবস্থায় কাপা কণ্ঠে বললো, আমি জানি। তুই কি বলতে চাস।সব কিছু জেনে গেছিস ।আমি অন্যর জীবনের বিনিময় তোর জীবন বাঁচিয়েছি তাইতো। জাহাঙ্গীর উঠে দাড়ায়। অপূর্ব রাগে বিষিন্নত হয়ে যাচ্ছে। জাহাঙ্গীর পায়চারি করতে করতে বললো,জানিস খোকা! নিজের

জীবনের থেকেও বেশি ভালোবাসতাম বাবর কে। বন্ধু নয় ভাই ভেবেছি।ও যেদিন আমার কাছে জমির জন্য আসে, সেদিন আমি জমি দেইনি।আমি সেদিন ভুল করেছি। কিন্তু তাই বলে আমার গায়ে হাত তুলবে!সেদিন আমি একা ছিলাম বলে, ওর লোকেরা আমায় পেটায়। ওর লোকেদের সামনে বেইজ্জত করে। আমার সেদিন ওর প্রতি ঘৃনা

জমে। কিন্তু আমি এভাবে প্রতিশোধ নিতে চাইনি। তুই যখন অসুস্থ ছিলিস, তখন কোথাও হা,র্ট খুজে পাচ্ছিলাম না।ছেলে হারানোর ভয়ে আমি সেদিন নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিলাম। নিজের ছেলের জীবন বাঁচাতে আমাকে,অন্যের জীবন কেড়ে নিতে হয়েছে।একটা পাপের জন্য হাজারটা পাপ করতে হয়েছে।অপূর্ব ঘৃনা জড়িত কন্ঠে বললো,যেতাম

আমি মরে।কি এমন হতো,আমি সেদিন মারা গেলে?সেদিন যদি আমি মারা যেতাম,তবে এই মৃত্যু খেলা শুরু হতো না।একটা প্রানের বিনিময়ে হাজার টা প্রান যেতো না। জাহাঙ্গীর নরম কণ্ঠে বললো, এর শাস্তি আমি পাচ্ছি।এই পাপ আমায় কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। অপূর্ব হাটুঘেরে ধপাস করে বসে পরে। জাহাঙ্গীর কিছু

বললো না। অপূর্ব ভাঙা গলায় কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো,মরে যেতাম সেদিন আমি।কেন বাঁচালে আমাকে। আজকে বেচে থাকাটাই আমার জন্য মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাহাঙ্গীর অপূর্বর এই বুক ফাটা কান্না সহ্য করতে পারছে না।...বেলা অনেক। অপূর্ব গোসল করে ,ভেজা চুল,সাথে তাওয়াল নিয়ে বসে আছে খাটের এক কোনে।

অপূর্বর একদিকে ঘৃনার তোলপাড়। অন্যদিকে মায়ার আড়ন্নতি। কাঁদদে চাচ্ছে অথচ চোখ দিয়ে পানি বের হচ্ছে না।

তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়, মমতাজ। মমতাজ বললো, অপূর্ব এলিজা কোথায়?

অপূর্ব কিছুটা হকচকিয়ে উঠে। আমতা আমতা করে বলল, এলিজা মামা মামীকে দেখতে গিয়েছে।সেটা

জেনেও কেন জিজ্ঞেস করছো। মমতাজ কিছু বললো না।

পিজি হাসপাতাল–পাখির শরীরের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো। শ্রাবন পাখির কাছ থেকে এক মুহুর্তের জন্য কোথায় যাচ্ছে না।পাখি ঘুমোচ্ছে। শ্রাবন পাখির বেডের কাছে মাথা ঝুকে সুয়ে আছে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় ডাক্তার। শ্রাবন উপস্থিতি বুঝতে পেরে উঠে দাড়ায়।ডাক্তার চেকআপ

করে বললো,আগের থেকে শরীরের অবস্থা ভালো। শ্রাবন ডাক্তারের কথায় খুশি হয়। শ্রাবন মৃদু হেসে বললো,আমি সারাক্ষন প্রার্থনা করি,যাতে আমার পাখি সুস্থ হয়ে যায়।ডাক্তার শ্রাবনের কাঁদে হাত দিয়ে বললো, আপনার মত স্বামী পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। খেয়াল রাখবেন।বলেই ডাক্তার চলে যায়। মমতাজ বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে

আসে হাসপাতালে। শ্রাবন নিজ হাতে পাখিকে খাইয়ে দেয়।পাখি শ্রাবনের দিকে পরোক্ষ করলো,শ্রাবনের চোখ মুখ শুকিয়ে একাকার।চুল দাড়ি় তে ভরে গেছে। পাখি ভাঙা গলায় বললো, আপনাকে আমি এভাবে এলোমেলো দেখতে পারছি না। নিজের যত্ন নিন। শ্রাবন মৃদু হেসে বললো, তোমার চোখের মায়াবি দৃষ্টি আমার যত্ন' তোমার

কাছে যতক্ষন থাকি ততক্ষন স্বর্গের সুখ পাই। মমতাজ খেয়াল করলো, তার ছেলের মুখের দিকে। শ্রাবনের চোখে পাখিকে হারানোর ভয়। মমতাজ মনে মনে, প্রার্থনা করলো, পাখিকে সুস্থ করো।প্রয়োজনে আমাকে নিয়ে নাও,তবুও পাখিকে রেখে যেও।কারন,পাখির কিছু হলে যে, আমার ছেলেটা বাচবে না। মমতাজ বাড়ি ফিরে যায়।

রাত বাড়ছে। মমতাজ জাহাঙ্গীর,অর্পা কে ডেকে খেতে দেয়। জাহাঙ্গীর খেতে পারলো না। খাবার সামনে নিয়ে বসে আছে।অর্পা পরোখ করছে। অপূর্ব কে খেতে ডাকলে,ঘরের দরজাই খুলেনি।কোন সাড়া শব্দ নেই। অপূর্ব ঘরের ভেতর পায়চারি করছে। এলিজা কে যে অবস্থায় দেখেছে,সেই চিত্র বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। অপূর্ব

অস্থির হয়ে যাচ্ছে।বুকের ভেতর দুমরে মুচড়ে যাচ্ছে।এলিজার কথা মনে পরতেই বুকের ভেতর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে।অপূর্বর শরির খারাপ হতে থাকে। নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। বিরবির করে বলছে, আমার স্ত্রী অপরাধী'কিন্তু যেই হাত দিয়ে,তার কোমল শরীর স্পর্শ করেছি 'সেই হাত দিয়ে 'তার হাতে হাত কড়া পরানো কোনদিন সম্ভব নয়'!।

অপূর্বর চোখ দিয়ে পানি বেয়ে পরছে। একবার ফিসফিস করে বলল, তুমি আমায় কেন ভালোবাসলে না ‘।

অপূর্ব নিস্তেজ শরীরে সুয়ে পরে। রাত ১১ টা। অপূর্বর শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। শরীরের উপর চাদর নেই।চাদর টেনে দেয়ার মত শক্তি অপূর্বর নেই। অপূর্ব নিস্তেজ হয়ে সুয়ে আছে। তৎক্ষণাৎ অপূর্ব অনুভব

করলো তার শরীরে কেউ চাদর দিয়ে দিচ্ছে। অপূর্ব চোখ টিপ টিপ করে দেখলো,এলিজা। মিষ্টি রঙের শাড়ি পরনে।চুল বেনুনি।ভি_কার থুতনি।ফর্সা গায়ের রং।কি তার চাহনি। অপূর্ব ভাবলো,এ কি এলিজা!নাকি আমি স্বপ্ন দেখছি। অপূর্ব অনুভব করলো,কেউ তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। অপূর্ব ঝাপসা চোখে দেখলো, এলিজা

মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।জ্বরে কাতর শরীর। এলিজার উপস্থিতি,তার স্পর্শে, অপূর্ব শান্তি অনুভব করছে । সে সত্যিই এলিজা না, হ্যালোসোলেশন হচ্ছে। অপূর্ব নিস্তেজ।কথা বলার মত শক্তি নেই। শুধু ভাবছে কে এ,এলিজা না আমি স্বপ্ন দেখছি।অপূর্ব কাতর কণ্ঠে একবার বললো,ম্যাডাম! এলিজা মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললো,

আপনি না চাইলেও আমি আপনার সামনে আসবো’ এহকাল-পরকালেও আপনি না চাইলেও আমি আপনার সামনে আসবো’। আপনি আমাকে আপনার থেকে দূরে করতে পারবেন না! একমাত্র মৃত্যু পারবে আমাকে আপনার থেকে দূরে করতে।

অপূর্ব চোখ বোজারত অবস্থায় ফিসফিস করে বলল, তুমি পাপি——
অপূর্ব বিরবির করছে।কিছু বলছে

তবে বাক্য গুলো স্পষ্ট নয়। অপূর্ব অনুভব করলো তার কপালে ঠান্ডা পানির মত কিছু একটা আছে। অপূর্বর চোখে ঘুম আসছে না। কিন্তু ক্লান্তির জন্য সে নিস্তেজ।প্রিয় মানুষটির কঠিন রুপ তাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। অপূর্ব চোখ মেলে দেখছে।সব ঝাঁপসা।তবে বুঝতে পারছে ,তার সামনে থাকা মানুষটা তার প্রিয়তমা স্ত্রী। অপূর্বর মাথায়

জ্বলপট্টি দিয়ে দিচ্ছে। অপূর্বর হাতে পায়ে তেল ম্যাসাজ করে দিচ্ছে। অপূর্ব অনুভব করছে।

রাত বেড়ে চলেছে।রাত ২টো নাগাদ।

পিজি হাসপাতাল-পাখির হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়।এপাশ ওপাশ করছে। পাখির কোন কিছু ভালো লাগছে না। হঠাৎ এরকম অনুভুতি পাখিকে ভাবাচ্ছে।পাখি খেয়াল করলো, শ্রাবন

টুলে বসে পাখির হাতের উপর হাত রেখে মাথা গুঁজে সুয়ে আছে। পাখি শ্রাবন কে দেখছে। মনের অজান্তেই চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পরছে। পাখি-হীন শ্রাবন যে নিঃস্ব। পাখি ভাবছে,আমি মরে যাবো,সেই ভেবে আমার একটু ও কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু এই মানুষটির কি হবে,সেই ভেবে আমি মৃত্যুর আগেও মৃত্যুর স্বাদ পাচ্ছি।

ভোর হয়ে যায়। ফজরের আজান শুনে অপূর্ব সজাগ হয়ে যায়। অপূর্ব ভাবলো,কাল রাতে সব স্বপ্ন ছিল।নয় এলিজা আসবে কি করে।সে তো পাষান।এসব ভাবতে ভাবতে,অপূর্ব ঘুম থেকে উঠবে ঠিক তখনি বুঝলো,তার বুকের উপর কিছু একটা।ঘর অন্ধকার। অপূর্ব হাত দিলো,দেখলো চুল। অপূর্ব ভালো ভাবে পরোখ করতেই দেখে

এলিজা। অপূর্ব হকচকিয়ে উঠে। অপূর্ব শান্তি অনুভব করলো। অপূর্বর বুক পাজরে মাথা রেখে এলিজা ঘুমোচ্ছে। অপূর্ব এলিজা কে ডাকলো না। অপূর্ব এলিজার মাথায় হাত বুলাতে যাবে,ঠিক তখনই, অপূর্ব চোখের সামনে সেসব চিত্র ভেসে উঠে।যা দেখার জন্য অপূর্ব কোনদিন প্রস্তুত ছিল না। অপূর্ব হাত টা এলিজার মাথায় দিতে যেও না,হাত

মুঠি করে সরিয়ে নেয়। এলিজার নিঃশ্বাস অপূর্বর বুকে লাগছে। অপূর্ব কোন এক অজানা কারণে এলিজার নিঃশ্বাস ভারী মনে হচ্ছে। এলিজা অনুভব করলো অপূর্ব জেগে গেছে। এলিজা ধিরে উঠে যায়। ভোরের কিছুটা আলো পরেছে। অপূর্ব সোয়া থেকে উঠে,খাটে পা ঝুলিয়ে বসে। কাট গলায় বললো, এসেছো কেন? বারন করেছি না, আমার চোখের

সামনে আসতে! ।সহ্য হয়না তোমাকে ।অপূর্বর ঘৃনিত আচরণ এলিজাকে ভেতর থেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। এলিজা কাপা কণ্ঠে বললো, আপনার বুক পাঁজর ছাড়া,যে আমার ঘুম হয়না। অপূর্ব আওয়াজ করে হাসলো ।যেই হাসিতে লুকিয়ে আছে ঘৃনা,। এলিজা অপূর্বর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করলো। এলিজা অপূর্বর কাছে এগোবে, তখন

ই অপূর্ব দ্রুত পায়ে মনোভাব নিয়ে বেড়িয়ে যায়। এলিজা অপূর্বর পেছন পেছন গিয়ে পথ আটকিয়ে দেয়। অপূর্ব থমকে দাঁড়ায়। এলিজা হাত জোড় করে বললো,একটা বার আমার কথা শুনোন, এরকম আচরণ করবেন না, আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই, অপূর্ব শক্ত করে এলিজার স্বিনা ধরে বললো, তোমার যা বলার, এবং যা করার,তা করে

নিয়েছো। এখন কি নতুন কোন ফন্দি আটছো,নাকি ভয় পেয়ে গেছো,যখন বলেছি আইনের আওতায় এনে দিবো।ভয় পেয়ে গেছো তাই না। অপূর্ব এলিজা কে চটকে ছেড়ে দেয়।শক্ত গলায় বললো, ভয় নেই। তোমাকে পুলিশে দেবো না। আমার সামনে এসো না। বলেই অপূর্ব সিড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায়।অপূর্বর কথা বলার বাক্যে

ছিলে,ঘৃনা,ছিলো তেজ, কিন্তু তার মধ্যে ও লুকিয়ে ছিল ভালোবাসা। এলিজা বুঝতে পারলেও, অপূর্বর এরকম আচরণ এলিজাকে ভেতর থেকে শেষ করে দিচ্ছে।

বেলা বারছে।এলিজা রান্নাঘরে। পাখির জন্য খাবার নিয়ে যাবে। অনেকদিন পাখির থেকে দূরে।পাখির জন্য মন পূড়ছে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়,নূরনেসা বেগম এবং চাঁদনী।জয়া

মারা যাওয়ার পর,নূরনেসার মন ভালো যাচ্ছে না। নূরনেসা জয়ার ছোট বোন।অপূর্ব,অর্পা ওদের জন্য মন খারাপ হওয়াতে চলে আসে দেখতে। মমতাজ, এলিজা, তাদের দেখে খুশি পোষন করে আলিঙ্গন করে। মমতাজ,অর্পা , চাঁদনী সবাই একসাথে বৈঠকখানায় বসে গল্প করছে। এলিজা সবার জন্য খাবার তৈরি করছে। বারবার দরজার দিকে

পরোক্ষ করছে।এই বুঝি অপূর্ব আসলো।সকালে না খেয়ে বেড়িয়ে গেছে।এখনো ফিরছে না। মনোরা এলিজার দিকে পরোখ করে বললো, বউমনি দাদাবাবুর সাথে মনে হম মনোমালিন্য হয়েছে?তাই না? দাদাবাবু কাল থেকে কিছু খায়নি। এবং ঘরের দরজাও খোলেনি।

মনোরার মুখ থেকে কথা গুলো শোনা মাত্রই এলিজা-হকচকিয়ে

ওঠে।মনের অজান্তেই চোখ দিয়ে দু ফোঁটা পানি গড়িয়ে পরে। এলিজা হাসপাতাল যাবে না, অপূর্বর জন্য অপেক্ষা করবে বুঝতে পারলো না। এলিজা মনস্থির করলো , হাসপাতালে যাবে না। মমতাজ কে বললে সে খাবার নিয়ে যায়। এলিজা অপেক্ষা করছে কখন আসবে। সবাইকে খাইয়ে এলিজা নিজের ঘরে

চলে আসে।ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে,কখন আসবে।

অপেক্ষা করতে করতে রাত হয়ে যায়।এলিজা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। শীতল হাওয়া তে চাদরটা উরছে। তৎক্ষণাৎ চোখ পরে বাড়ির গেটের দিকে। অপূর্ব আসছে তবে একা নয়,সাথে দুজন লোক।কারা তা বোঝা যাচ্ছে না। এলিজা চোখ বড় করে পরোখ করে। অপূর্ব বেশ

কিছুক্ষণ কথা বলার পর ঘরের দিকে ফিরে। সাথে থাকা লোক দুটো উল্টো দিকে চলে যায়।এলিজার খটকা লাগলো।কি বললো,আর তারা কে। এলিজা ভাবনা উপেক্ষা করে। অপূর্ব ঘরে আসে। হাতে দুটো বই। এলিজা খাটের এক কোণে বসে আছে। এলিজা-কে উপেক্ষা করলো। তার আশেপাশে কোন ব্যাক্তি আছে,তা অপূর্বর মনেই হচ্ছে না।

অপূর্ব পরনের কাপড় পাল্টে নিচ্ছে। পরনে ছিল সাদা প্যান্ট, এবং শার্ট। উল্টো দিকে ঘুরে শার্ট খুললো। এলিজা আর চোখে পরোখ করলো। অপূর্ব শুধু সু-দর্শন নয়,তার সিক্স প্যাক পেট এবং মাসেল।এলিজা আজ তা প্রথম দেখলো। অপূর্ব গুনগুন করে গান গাইছে, আলমারি থেকে সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা বের করলো। অপূর্বর হাবভাব

স্বাভাবিক মনে হলো না।এলিজা উপেক্ষা করে বললো, আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসবো?অপূর্ব বাথরুমে ভেতর যেতেই, এলিজা প্রশ্ন টা করে। অপূর্ব থম মেরে দাঁড়িয়ে বললো,বাহির থেকে খেয়ে এসেছি। তাছাড়া আমি ,কারো জন্য না খেয়ে থাকবো ,এটা ভাবা ভুল।

এলিজা ভ্রু কুঁচকে বললো,তবে গতকাল সারাদিন,রাত না খেয়ে

ছিলেন কেন? অপূর্ব কিছু বললো না।
কিছুক্ষণ পর অপূর্ব বাথরুম থেকে বের হয়। এলিজা খাটের উপর বসে আছে। অপূর্ব আসার সময় দুটো বই কিনে নিয়ে আসে।একটি বই হাতে নিয়ে পায়চারি করতে করতে পরতে থাকলো। হঠাৎ করেই অপূর্বর এরকম,নরম হয়ে যাওয়া এলিজাকে ভাবায়।রাত বেড়ে চলেছে। এলিজা

বেহায়ার মত শান্ত স্বরে বললো,আমি খাইনি। আপনি খাননি ভেবে আমিও খায়নি। অপূর্ব দাড়িয়ে যায়।আর চোখে এলিজা-কে দেখে বললো, খেয়ে নিলেই তো হয়। আমার জন্য অপেক্ষা করা, খারাপ লাগা,এসব অভিনয় বন্ধ করো।এলিজা দৃষ্টি সরিয়ে নেয়।এই কথার জবাব যে দিতে চেয়েও দিতে পারছে না।

অপূর্ব বইটা রেখে সুতে আসে।সুয়ে চাদরটা গায়ে দেয়। এলিজা কে উদ্দেশ্যে করে অহং’কারী স্বরে বললো,অন্য ঘরে গিয়ে সোয়। তুমি পাশে থাকলে আমার ভয় হয়।যদি মেরে ফেলো। এলিজা হাতের উল্টো দিক চোখ মুছে কাপা কণ্ঠে বললো, আপনার বুক পাঁজর ছাড়া যে ঘুম হবে না। অপূর্ব বললো, না হলে জেগে থাকো।

এলিজা অপূর্বর দিকে কয়েকবার দৃষ্টি স্থাপন করে। অপূর্বর কথা মত খাট থেকে নেমে ফ্লোরে সোয় ।অন্য ঘরে যে,যেতে পারলো না ।কোন বালিস,চাদর ছাড়াই এলিজা-ফ্লোরে , সোয়। শীত অনেক ।বাহিরে শীতল হাওয়া বইছে। এলিজা শীতের জন্য চার হাত পা এক করে গুটিসুটি দিয়ে সুয়ে আছে ।রাত ধিরে ধিরে বারছে। অপূর্ব পেছনে ঘুরে তাকায়।

দেখলো এলিজা-ফ্লোরে সুয়ে আছে। শীতে কাঁপছে।এটা দেখে অপূর্বর বুকের ভেতর চাপ সৃষ্টি হয়। জ্বলজ্বল চোখে এলিজার মায়াবী মুখ দেখছে। অপূর্ব বিরবির করে বলছে, কত নত-যত হয়ে নিস্পাপ,রুপ নিয়ে ঘুমিয়ে আছো' ।পারতে না,আমাকে ভালবেসে সারাজীবন সাধারন এলিজা হয়ে থাকতে। কেন, দ্বিতীয় বার মালাইকা হতে গেলে।

অপূর্ব দৃষ্টি সরিয়ে বললো, সব মিথ্যা অভিনয় ছিলো। অপুর্ব বিছানা থেকে উঠে এলিজার কাছে আসে।ভাবছে এলিজা ঘুমিয়ে গেছে। অপূর্ব এলিজাকে ফ্লোর থেকে পাজা কোলে করে খাটে সুইয়ে দেয়।এলিজার দিকে পরোখ করে,ভাঙা গলায় বললো, আমার ভালোবাসা তোমার মত মিথ্যা ছিল না ' তুমি কি করে ভাবলে,তোমাকে রেখে আমি বাহির

থেকে খেয়ে আসবো। আমি পানাহার। অপূর্ব অন্যপাশে শুয়ে পরে। এলিজা চোখ মেলে তাকায়। এলিজা সজাগ ঘুমোয়নি। অপূর্বর সমস্ত কথাই শুনে নেয়। ভাবছে,হাজারো ঘৃনার মাঝে লুকিয়ে আছে ভালোবাসা।তবুও কেন আমার দিক থেকে মুখ সরিয়ে নেয়।এসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পরে দুজনেই।সকাল ৮ টা।এলিজা ঘুম

থেকে উঠে রান্না ঘরে যেতেই চোখে পরে, অপূর্বর গতকাল নিয়ে আসা বই দুটোর দিকে।এলিজা আগ্রহ নিয়ে দেখলো।বইটি ইংলিশ ভাষার। এলিজা আহত চোখে দেখলো বইটির নাম, The Murd,er ।

এলিজা অবাক হয় এই বই দিয়ে সে কি করছে। এলিজা উপেক্ষা করে রান্না ঘরে চলে যায়।

চাঁদনী এইঘর ও ঘর ঘুরছে। হঠাৎ চোখ পরে পেছনের ঝোপঝাড় এর দিকে ।দেখছে অপূর্ব ঝোপঝাড়ে বসে কিছু করছে।এত সকাল সকাল অপূর্ব ওখানে কেন। চাঁদনী আগ্রহ নিয়ে দেখতে যায়। চাঁদনী পেছন থেকে দেখলো, একটা মাঝারি আকারের রাম,দা ধার দিচ্ছে।

চাঁদনী নরম কন্ঠে বললো,এটা দিয়ে কি হবে?

অপূর্ব উল্টো দিকে ঘুরেই জবাব দিলো, জঙ্গল পরিষ্কার করবোএলিজা রান্না করছে। কিন্তু তার মনে গহীন চিন্তা আবরন করেছে। অপূর্ব হঠাৎ করে তার আচরণ বদলে নেয়াতে এলিজা চাপসে যাচ্ছে। অপূর্বর চোখের ঘৃনিত চাহনি।কর্কট মেজাজ , এলিজা-কে পুরিয়ে দিচ্ছে। এলিজা ভাবছে,সে কি আর আমার সাথে কথা বলবে না,আর কি আমাকে

ম্যাডাম ডাকবে না, আমার না বলা কথা গুলো কখন ও কি তাকে বলতে পারবো! ।এসব ভাবতে ভাবতে মনোরা এলিজার ভাবনা ভাঙিয়ে দেয়। মৃদু হেসে বললো, তোমার করাই এখন ই জ্বলে উঠতো। এলিজা কিছু বললো না। সকলের জন্য খাবার তৈরি করলো,। চাঁদনী অপূর্ব কে পেছন থেকে পরোখ করছে। অপূর্বর পরনে সাদা

পাঞ্জাবি, পাজামা,কালো জুতো।বা হাতে ঘরি।ভারী দেহখানি নিয়ে উল্টো দিকে ঘুরে আছে। চাঁদনী দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলো,কি করবি এটা দিয়ে? অপূর্ব রা,মদা তে ধার দেয়া বন্ধ করে বললো,এই জঙ্গল পরিষ্কার করবো।লতাপাতায় ভরে আছে। চাঁদনী বললো, পরিষ্কার করার জন্য বাড়িতে অন্য লোক আছে।অপূর্ব নরম গলায়

বলল,নিজের কাজ নিজেকে করতে হয়।
এলিজা অপূর্বর খোঁজে ঘরে আসে। ঘরে নেই। এলিজা এদিক সেদিক পরোক্ষ করতে উপস্থিত হয় অপূর্ব। এলিজা কিছু বললো না।, অপূর্ব দেখেও না দেখার ভান ধরলো। এলিজা কাপা কণ্ঠে বললো,খাবেন না?
খিদে নেই।

আমার উপর রাগ,ঘৃনা চেপে রেখে নিজেকে কষ্ট দিবেন না।

অপূর্ব ঠোঁট কুঁচকে হেসে বললো, আমার সামনে এসো না।

এলিজা অপূর্বর সামনে গিয়ে দাড়িয়ে বললো, কি করবেন আসলে! অপূর্ব দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়।

এলিজা ভেজা গলায় বললো, এরকম করবেন না। আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিবেন না। কষ্ট হয় যে।

অপূর্ব কর্কট স্বরে বললো, তোমার মনে অন্য কারো জন্য মায়া থাকতেই পারে না।আমি জানি না,তুমি আবার ফিরে কেন এসেছো।অপূর্ব উল্টো দিকে ঘুরে ভেজা কণ্ঠে বললো,যদি তুমি আমাকে ভালোবাসতে তবে তোমার অতীত ,সমস্ত কিছু আমাকে বলতে। জানি আমার বাবা সবকিছুর জন্য দায়ী। কিন্তু তুমি চাইলে,আমরা

দুজন মিলে অপরাধিদের শাস্তি দিতাম।ন্যায় বিচার হত।

তবে এই মৃত্যু খেলা আর হতো না।

এলিজা জ্বল জ্বল চোখে বললো, আমি আপনাকে হারানোর ভয়ে বলিনি।

অপূর্ব এলিজার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো, এখন কি নতুন করে, আমার আবেগ বাড়িয়ে তবেই আমাকে শেষ করবে!এই ভেবেছো?

এলিজার এই কথার জবাব দেয়ার মত শব্দ নেই। অপূর্ব এলিজাকে উপেক্ষা করে যেতেই,খাটের সাথে পা লেগে হোঁচট খেয়ে পরে যেতেই, এলিজা অপূর্ব কে ধরে ফেলে। অপূর্ব এলিজার দৃষ্টি স্থাপন করলো। এলিজা কাট গলায় বললো,আমি আপনাকে শেষ করতে নয়, আপনার বিপদে ঢাল হয়ে থাকতে চাই। নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও

আপনাকে রক্ষা করবো। অপূর্ব এলিজার হাত সরিয়ে চলে যায়। অপূর্বর ঘৃনিত আচরণ এলিজা কে দুমরে মুচড়ে দিচ্ছে।কোন ভাবেই বোঝাতে পারছে না,যে অপূর্ব কে সত্যিই ভালোবাসে।এলিজা অপূর্বর যাওয়ার পানে চেয়ে থাকে।

মমতাজ পাখি এবং শ্রাবনের জন্য রান্না করছে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় এলিজা।নরম গলায় বললো,কাকি

আমি আজকে হাসপাতাল যাবো। পাখিকে অনেক দিন দেখা হয়নি। জানি না ও কেমন আছে। মমতাজ যেতে বললো।

এলিজা খাবার নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়।এলিজা একা যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ মমতাজ বললো, একা যাবে?এলিজা বললো,এখন থেকে একাই পথ চলতে শিখতে হবে।

ঘরের ভেতর প্রবেশ করতেই,কথাটি অপূর্ব শুনে নেয়।

এলিজা বাহিরে বের হয়। এলিজা অপূর্বর জন্য অপেক্ষা করছে, ভাবছে আমি একা যাচ্ছি জেনেও উনি আসলো না।এলিজা পেছনের দিকে তাকিয়ে অপূর্বর পথ চেয়ে থাকে। অপূর্ব আসলো না।এলিজা গাড়িতে বসে। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করবে,ঠিক তখনি অপূর্ব আসে।

এলিজা অপূর্ব কে দেখে মৃদু হাসে। অপূর্ব ড্রাইভার কে কাট গলায় বললো,তুমি বাড়িতে থাকো।ড্রাইভার বললো,দাদাবাবু আপনি গাড়ি চালাবেন! আপনি বউমনির সাথে পেছনে বসেন। অপূর্ব গাড়ির দরজা খুলে বললো, নামো।ড্রাইভার নেমে যায়। অপূর্ব গাড়ি ড্রাইভ করে। এলিজা পেছনে বসে পরোখ করছে। এলিজার ঠোঁটের কোনে অজান্তেই

হাঁসি চলে আসে। কিন্তু অপূর্বর চোখের ঘৃনার দর্পন দেখা মাত্রই বুকের ভেতর দুমরে মুচড়ে ওঠে। অপূর্ব গাড়ির মধ্যখান লুকিং গ্লাস দিয়ে পেছনে এলিজার দিকে পরোখ করে বললো, ভেবো না আমি তোমার জন্য যাচ্ছি। শ্রাবন এর সাথে কথা আছে তাই যাচ্ছি। এলিজা কিছু বললো না।

পৌঁছে যায় হাসপাতালে।এলিজা কে দেখা মাত্রই পাখি হকচকিয়ে উঠে। এলিজা কে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কান্না শুরু করে।এলিজা পাখিকে বুকে জড়িয়ে নেয়।এলিজা কাপা কণ্ঠে বললো, আমার পাখির কিছু হবে না।পাখি ভাঙা গলায় বললো, এতদিন কোথায় ছিলে তুমি।আমায় দেখতে আসলে না।এলিজা বললো, মামির শরীর টা ভালো না তাই

সেখানে ছিলাম। অপূর্ব পেছনে দাঁড়িয়ে,মনে মনে বললো, এত নিখুঁত অভিনয় কিভাবে করে। ছলনাময়ী।সবার সাথে ছলনা করে। এলিজা পাখির জন্য আনা খাবার খাইয়ে দেয়। অপূর্ব শ্রাবন কে নিয়ে বাহিরে বের হয়।

এলিজা কে পেয়ে পাখি সস্তি অনুভব করলো।দুই বোন মিলে ছোট বেলার এটা ওটা ব্লা ব্লা অনেক কথা বলছে।

আর হাসছে।পাখির মুখের হাঁসি দেখে এলিজা শান্তি অনুভব করলো। অপলকে পাখিকে দেখলো। জ্বলজ্বল চোখে ভাবলো,সেদিন যদি আমাদের পরিবার টা এভাবে ধ্বংস না হয়ে যেত তবে, আজ পাখির এমন অবস্থা দেখতে হতো না।পাখির এরকম অবস্থা দেখতে ভালো লাগছে না। তার মাঝে আমার প্রানময় স্বামির ঘৃনিত চাহনি যে,-বি,ষের চেয়েও

বিষাক্ত।বাবা মায়ের আদর স্নেহ থেকে অতি কম বয়সে বঞ্চিত হলাম। বঞ্চিত হলাম সুখময় জিবন থেকে।আর নিয়তির নির্মম খেলায় আজ নিজের স্বামির চোখে ভালোবাসার বদলে ঘৃনা দেখতে হচ্ছে।এলিজার চোখ থেকে দু ফোটা পানি গড়িয়ে পরে। পাখি পরোখ করে বললো, কাঁদছো কেন?এলিজা

চোখের পানি মুছে বললো ,তোর মুখে হাঁসি দেখে।
অপূর্ব শ্রাবন কে নিয়ে গ্লাসকোব ফরেন্সিক ল্যাবে যায়।সেখান থেকে কিছু কেমিক্যা,ল এবং ইনজেকশন নেয়। শ্রাবন ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করলো,এসব নিয়ে কি হবে?অপূর্ব মৃদু হেসে বললো আমাদের ফ্যাক্টরিতে দরকার।দুজন একসাথে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

অপূর্ব থম মেরে দাঁড়িয়ে বললো, তুই অপেক্ষা কর আমি আসছি। অপূর্ব ফরেন্সিক ল্যাবে যায়। ফরেন্সিক ডাঃ নুহার সাথে কিছু কথা বলে।

কথা বলা শেষে দুইভাই মিলে রওনা হয় হাসপাতাল এর উদ্দেশ্যে। অপূর্ব শ্রাবন কে বাহির থেকে জোর করে কিছু খাওয়ায়। শ্রাবন পানাহার থাকায়,চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে। অপূর্ব তা পরোখ করলো।

হাসপাতালে ফিরে পাখির সাথে কিছু কথা বলে, অপূর্ব ।শরীরের কি অবস্থা হান তান।পাখি মৃদু হেসে উত্তর দেয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত পাখি শ্রাবন, এলিজা অপূর্ব একসাথে আড্ডা দেয়।পাখি সকলকে দেখে কিছুটা শান্তি অনুভব করে।সবার কথার মাঝে পাখি খেয়াল করলো, এলিজা আর অপূর্বর মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।যেটার অপূর্ব আর

এলিজার মুখের ভাষাই বলে দিচ্ছে। পাখি এলিজাকে এই নিয়ে কোন প্রশ্ন করলো না। অপূর্ব এলিজা হাসপাতাল থেকে বের হয়।গাড়ি রাস্তার ওপার রাখা।রাস্তায় অনেক জ্যাম।এলিজা অপূর্বর পাশে।এলিজা মনে মনে ভাবলো,এত জ্যামের ভিতর কিভাবে রাস্তা পার হবো। একটা বার আমার দিকে ঘুরেও দেখছে না।এতটা দূরে ঠেলে

দিলেন।এলিজা এসব ভাবতে না ভাবতেই, অপূর্ব এলিজার ডান হাত টা শক্ত করে ধরে।এলিজা হকচকিয়ে উঠে। অপূর্ব এলিজাকে নিজের বা দিকে রেখে রাস্তা পার হয়।এলিজা অপূর্বর দিকে পরোখ করলো। গাড়িতে অপূর্ব এলিজাকে বসিয়ে দেয়।সহর থেকে গাড়ি নিয়ে বের হতে থাকে। অপূর্ব লুকিং গ্লাস দিয়ে পরোখ করলো,এলিজা আগ্রহ

নিয়ে বা দিকের রাস্তার পাশে তাকিয়ে আছে। অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে,তাকায়। অপূর্ব দেখতে পায় এক-লোক বেলিফুলের মালা বিক্রি করছে।সেদিকেই এলিজা দেখছে। অপূর্ব উপেক্ষা করে চলে যায়।

রাত ১০ টা নাগাদ —বৈঠকখানায় সবাই বসে আড্ডা দিচ্ছে।নূরনেসা বেগম, তাদের অতিতের কথায় মশগুল।জয়ার সাথে শৈশব কাল

কেমন ছিলো ব্লা ব্লা। জাহাঙ্গীর এক কোনে ঘাপটি মেরে বসে আছে। পাপের অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে। তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কিন্তু প্রকাশ করতে পারছে না। এলিজা সবাইকে চা দিচ্ছে। অপূর্ব চায়ের কাপ টা হাতে নেয়। কিন্তু চা-টা খেলো না।এলিজা পরোখ করলো। রাত বেড়ে চলেছে।পাখি আগের থেকে বেশ কিছু টা সুস্থ। শ্রাবন

পাখিকে নিয়ে রাস্তায় হাটতে বের হয়। চাঁদনী রাতে ভরা জ্যামের পাশে শান্ত গলিতে দুজন পাশাপাশি হাঁটছে। শ্রাবন পাখির দিকে মায়ার দৃষ্টিতে তাকিয়ে, মৃদু হেসে বললো, মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত, পাশাপাশি ,তোমার সাথে এভাবেই হাঁটতে চাই।পাখি শ্রাবনের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে।পাখি কিছু বললো না। শুধু চেয়ে চেয়ে শ্রাবন কে দেখছে।

উষ্কখুস্ক কোকরা চুল,ক্লান্তি মুখ,দাড়ি কিছু টা বড় হয়েছে,তার সাথে ফর্সা মুখ। শ্রাবন পরোখ করে বললো,এভাবে কি দেখছো! একদম এলোমেলো হয়ে গেছি!সুন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে! আমার তো এখন ভয় হচ্ছে! আশেপাশে কত স্মার্ট ছেলেরা। না জানি আমার বউয়ের দৃষ্টি তাদের দিকে চলে যায়।পাখি কাট গলায় বললো, আপনি ছাড়া

অন্য কোন পর পূরুষের দিকে দৃষ্টি পরলে,সেই চোখ আমি নিজেই উপরে ফেলবো।

শ্রাবন নরম গলায় বলল, আমি দুনিয়ার সেই হতভাগা যে তার প্রিয় মানুষ টিকে কাছে পেয়েও হারিয়ে ফেলছি। প্রতিদিন তাকে হারানোর ভয়ে হয়। আমার মত আর কি কেউ আছে,যে তার প্রিয় মানুষ টিকে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত হারানোর ভয়

করে।পাখি পরোখ করলো, শ্রাবণ কাঁদছে।রাতে সবাই খেয়ে সুয়ে পরে। এলিজা অপেক্ষা করছে কখন অপূর্ব ফিরবে।রাতের খাবার না খেয়েই বেড়িয়ে যায়। হঠাৎ কোথায় যায়,কি করছে কিছু বুঝতে পারছে না। অপূর্বর এরকম আচরণ এলিজা কে ভাবাচ্ছে। এলিজা এসব ভাবনা থেকে বেড়িয়ে,নূরনেসার ঘরে যায়। নূরনেসা ,রাত অনেক পর্যন্ত জেগে

থাকে এটা তার অভ্যাস। এলিজা একাকিত্ব অনুভব করাতে, গল্প করতে আসে।কোন ভাবেই এলিজার মনে শান্তি আসছে না।মনটার ভেতর কুহ ডাকছে। শুধু মনে হচ্ছে কিছু একটা ধেয়ে আসছে।নূরনেসা ,সাদা রঙের শাড়ি পরা,চুল গুলো কোকরা। সবসময় মাথায় কাপড় রাখে। নুর নেসা,এলিজাকে দেখে মৃদু হাসে। নুরনেসা এটা,ওটা বলছে। কিন্তু

এলিজা তা খেয়াল ই করছে না। এলিজার মনটা ছটফট করছে। এলিজা নূরনেসার সাথে কথা শেষ করে তার ঘর থেকে বেরোয়।নক খুঁটতে খুঁটতে হাঁটছে। এলিজার তৎক্ষণাৎ চোখ পরলো তিনতলায় আলো জ্বলছে। কিন্তু যে ঘরে আলো,জ্বলছে,ঐ ঘরে তো,কেউ কখনো যায় না। এলিজা আগ্রহ নিয়ে উপরে যায়। চারদিক নিশ্চুপ।কালো

ধোঁয়া ধেয়ে আসছে। নিস্তব্ধ পরিবেশ। এলিজা যেতে যেতে দেখলো, তিনতলার বন্ধ স্টোর রুমটা খোলা। এলিজার খটকা লাগলো। এলিজা এদিক সেদিক পরোক্ষ করে ঘরটার দিকে এগোয়। এলিজা যা দেখলো,তাতে সম্পুর্ন ভাবে হতভম্ব হয়ে যায়। অপূর্ব বন্ধ স্টোর ঘরটার ভেতর কিছু করছে। এলিজা জানালা দিয়ে দেখছে।কি

অদ্ভুত অপূর্বর আচরণ। তার হাবভাব স্বাভাবিক নয়। এভাবে কিছুক্ষণ এলিজা দেখলো। অপূর্ব কাজ শেষ করে বের হতেই এলিজা লুকিয়ে পরে। অপূর্ব হাতের উল্টো দিক দিয়ে ঘাম মুছে চলে যায়। এলিজা মনস্থির করলো কি আছে এই ঘরে তা দেখতে হবে।এলিজা ঘরের ভেতর প্রবেশ করে। চারদিকে পূরানো জিনিস এলোমেলো করে

রাখা।সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা। এলিজা একটু দূরে খেয়াল করলে,দেখতে পায় একটা ওয়ারড্রপ। এলিজা আগ্রহ নিয়ে ভেতরে কি আছে দেখে। ভেতরে যা ছিলো তা,দেখে এলিজা বিষন্নত হয়ে যায়। ড্রয়ারে রাখা, ফ্লোরিক্সা ডাইন-যেটা এক ধরনের কেমিক্যাল।এই কেমিক্যাল শরীরে পুশ করলে,তার বুক থেকে হা,র্ট বের করে নেয়ার

পরেও সে ১৫ মিনিট বেঁচে থাকে, শুধু এই কেমি'ক্যাল এর সাহায্যে। এলিজা ভালো করে চিন্তে পেরেছে। কারন,এই কেমিক্যাল তারা ২৭ বছরের ছেলেদের হা,র্ট পাচার করাতে ব্যাবহার করতো। এলিজা ভ্রু কুঁচকে বিরবির করে বললো, এগুলো দিয়ে উনি কি করছেন। এগুলো তার কাছে কিভাবে আসলো।এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কেন

করছে।এসব ভাবতে ভাবতে এলিজা ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়।একা একা বির বির করছে আর হাঁটছে।এলিজা ঘরে গিয়ে দেখলো অপূর্ব সেখানে নেই।এইতো ফিরলো আবার কোথায় যাবে। এলিজা ঘরের এদিক সেদিক পরোক্ষ করতেই দেখে,খাটের উপর বেলিফুল রাখা।এলিজা অবাক হয়। এলিজা ফুল গুলো হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকে।বুকের মধ্যে জড়িয়ে,বললো

আপনি সামনের দিকে ঘুরেও,ব্যাস্ত শহরের মাঝেও আমার চাহনি কে খেয়াল করেছেন’পথের বাঁকে থাকা বেলিফুল আমার নজরে এলো’সেই নজর যে ,নিশানা করেছে আপনাকে। আপনার মত স্বামী পেয়ে আমি গর্বিত। কিন্তু তবুও কোথায় একটা শূন্যতা পরে আছে।এলিজা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে মনের অজান্তেই কাদছে।

চোখ থেকে অঝরে পানি পরছে। সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এক অজানা বেথা গ্রা,স করেছে। ঠান্ডা হাওয়া বইছে, আকাশের দূরদূরে তারাদের আগমন। চারদিক নিশ্চুপ। চাঁদনির আলোয় চারদিক আলোকিত।হঠাৎ এলিজার চোখ পরলো ঝোপঝাড় এর দিকে। ঝোপঝাড় এ কেউ একটা আছে। এলিজা চোখ বড় বড় করে দেখার

চেষ্টা করলে দেখে অপূর্ব—এলিজা অপূর্ব কে দেখে হকচকিয়ে উঠে। এত রাতে ঝোপঝাড় এ অপূর্ব কি করছে।সে কি করতে চাইছে।এলিজা নিচে চলে আসে।এলিজা নিচে এসে দেখলো,দরজা আগে থেকেই খোলা। এলিজা অপেক্ষা করছে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় অপূর্ব।এলিজাকে উপেক্ষা করে যেতেই,এলিজা ভাঙা গলায় বললো , ঝোপঝাড় এ কি

করছিলেন? অপূর্ব আর চোখে এলিজা কে দেখে ঘরে চলে যায়। এলিজা পেছন পেছন গেলো। অপূর্ব হাত মুখ ধুতে বাথরুমে প্রবেশ করে।এলিজা অপেক্ষা করছে। অপূর্বর অদ্ভুত আচরন এলিজাকে শেষ করে দিচ্ছে।এলিজা ঘরের ভেতর পায়চারি করতে থাকে। অপূর্ব বের হয়।এলিজা শান্ত হলো,সান্ত স্বরে বলল,কি করছিলেন

ঝোপঝাড়ে?তিনতলার , পূরোনো স্টোর ঘরে কি করছিলেন? অপূর্ব এলিজার বা হাতের কব্জি শক্ত করে ধরে বললো,সেই কৈফিয়ত আমি তোমাকে দেবো না। আমার আশেপাশে সারাদিন ঘুরঘুর করছো কেন! আমার চোখের সামনে এসো না!অপূর্বর জোড় ভ্রুর,রক্ত মাখা চোখে মায়ার স্থান ছিলো। কিন্তু আজ সেখানে ঘৃনা দেখতে পাচ্ছে। অপূর্ব

এলিজা কে ছিটকে দূরে সরিয়ে দেয়। অপূর্ব বিছানায় শুয়ে পরে। ভেজা তোয়ালে টা বিছানার উপর রাখা।এলিজা ভেজা তোয়ালে টা বারান্দার দড়িতে রাখে। অপূর্ব উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে সুয়ে আছে।এলিজা ভাঙা গলায় বললো , রাতে খাবেন না? অপূর্ব বললো,খিদে নেই।

এলিজা ভাবছে,

আপনাকে এরকম অবস্থায় দেখতে আমার ভালো লাগছে না।ভেতরটা দুমরে মুচড়ে যাচ্ছে। নিজের যত্ন নিতেও ভুলে যাচ্ছেন আপনি।কি করে বোঝাবো ,আপনিহীন আমি যে নিঃস্ব।

হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখের পানি মুছে এলিজা। অপূর্বর পাশে সুয়ে পরে। অপূর্বর বা দিকের, উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে সোয়।

অপূর্বর ঘৃণিত চাহনি,কর্কট মেজাজ , অদ্ভুত কাজ কর্ম এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে এলিজার মাথা বেথা শুরু হয়। রাত বেড়ে চলেছে।এলিজার শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।শরীরের যন্ত্রণায় ঘুম নেই চোখে।

অপূর্ব ঘুমাচ্ছে না।ঘার ঘুরিয়ে এলিজাকে একবার পরোখ করলো। এলিজা কাঁপছে। অপূর্ব উঠে বসে। এলিজার মাথায় হাত দিয়ে তাপমাত্রা

পর্যবেক্ষন করলে দেখে,এলিজার শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। অপূর্ব হকচকিয়ে উঠে।কি করবে বুঝতে পারলো না।এলিজার ক্লান্তি মুখ,দেখে অপূর্বর ভেতরে জ্বলছে। অপূর্ব ঘুম থেকে উঠে নিচে যায়।একটা বাটিতে পানি নেয়।এলিজার ডান পাশে বসে,এলিজার মাথায় জ্বলপট্টি দিয়ে দেয়। এলিজা ঘুমোয়নি, অপূর্বর কার্যক্রম অনুভব করছে।এলিজা

শান্তি অনুভব করলো।মনে মনে ভাবলো,ঘৃনা জন্মেছে ঠিক’তবে ভালোবাসা টা কমে যায়নি।তবে কেন, আমার না বলা কথা গুলো শুনছে না। অপূর্ব জলপট্টি দেয়া শেষ করে।এলিজার গাঁয়ে চাঁদর দিয়ে দেয়। অপূর্ব বেশ কিছুক্ষণ এলিজা কে পরোখ করে উঠে দাড়ায়। টেবিলে রাখা ‘দ্যা মার্ডা,র’ বইটি হাতে নেয়।মনে মনে বইটি পরতে

থাকে। এলিজা পরোখ করলো।কি আছে ঐ বইতে,কি করবে ঐ বই দিয়ে,কি করতে চাইছে সে,এসব ভাবতে ভাবতে এলিজা ঘুমিয়ে পরে। সকাল ৮ টা নাগাদ।শ্রাবন পাখির কাছে বসে আছে।পাখি ঘুমোচ্ছে। শ্রাবনের বুকের ভেতর কুহ ডাকছে। চারদিক নিশ্চুপ হয়ে আসছে। কোথাও কিছু একটা হবে। আশঙ্কা পাওয়া যাচ্ছে। সবকিছু অন্য রকম

হয়ে যাচ্ছে । এরকম অনুভুতি হওয়াতে শ্রাবন বসা থেকে উঠে দাড়ায়।পাখির দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বাহিরে বের হয়।ভরা জ্যাম,কাকের আনাগোনা,গরমের কিছুটা আহভাস হয়েছে।শ্রাবনের দৃষ্টি অস্থির। এরকম অনুভুতির ব্যাখ্যা শ্রাবন পাচ্ছে না। শ্রাবন আশেপাশে পরোখ করলে চোখ পরে রাস্তার উল্টো পাশে। শ্রাবন ভ্রু

কুঁচকে দেয়। শ্রাবন দেখলো সূর্য কে। একজন পুলিশ অফিসার এর সাথে কথা বলছে।তবে পুলিশ অফিসার টা উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে আছে।কে সে বোঝা যাচ্ছে না ।কি বলছে সূর্য! শ্রাবন রাস্তার ওপার যাওয়ার মনস্থির করলো। কিন্তু ভরা জানজটের আশরে যেতে পারলো না। শ্রাবন দেখলো, সূর্য এবং অফিসার টা কথা বলতে বলতে

দক্ষিন দিকে চলে যায়।শ্রাবন বেশ অনেকক্ষন পরোখ করলো।শ্রাবনের খটকা লাগলো। শ্রাবন ভাবনা উপেক্ষা করে, হাসপাতালের ভেতরে চলে আসে। শ্রাবন হাঁটতে হাঁটতে এদিক সেদিক পরোক্ষ করলো। ডাঃ ইব্রাহিম কে দেখতে পায়,তার চেম্বারে বসে আছে।তবে সে গভির চিন্তায় আহরন করছে। শ্রাবন বুঝতে পারলো ,তার মনের ভেতর

অস্থিরতা। শ্রাবন পাখির কাছে চলে আসে।পাখি ঘুম থেকে উঠে বসে আছে।পাশে বসা নার্স। শ্রাবন কে দেখে নার্স চলে যায়। শ্রাবন পাখির চোখ মুখ পরিষ্কার করে দেয়।পাখি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।পাখি ভাঙা গলায় বললো,একটা কথা বলবো! শ্রাবন মৃদু হেসে বললো,একটা কেন হাজার টা বলো। আমায় কিছু বলার জন্য অনুমতি

নিতে হবে না।পাখি ভেজা কণ্ঠে বললো,আমি ৬ মাস বেঁচে থাকবো এটা জেনেও কেন আমায় বিয়ে করলেন!

শ্রাবন কাট গলায় বললো, ভালোবাসা সময়কেও হার মানায়' মিথ্যা ভালোবাসার অভিনয়ে সারাজীবন না পুড়ে'সত্যিকারের ভালোবাসার ৬ মাস'পরবর্তী জিবন টাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

পাখি অপলকে শ্রাবন কে দেখছে। শ্রাবন ভাবছে,আমি হয়তো, তুমিহীনা বেঁচে থাকতে পারবো না ।এলিজা ঘুম থেকে উঠে। শরীর খুব একটা ভালো নয়। আশেপাশে অপূর্ব নেই। এলিজা আগ্রহ নিয়ে বইটি দেখে। বইটি হাতে নিয়ে পরোখ করতে থাকে। এলিজা দেখলো , এগুলো সেই বই যা,বড় বড় কি,লারদের দরকার পরে।এই বই চিপস

ডুপিয়ালির কাছে দেখেছে।এই বই দিয়ে উনি কি করছেন।এলিজা ভাবনা উপেক্ষা করে।হাত মুখ ধুয়ে নেয়।রান্না ঘরে চলে আসে। তৎক্ষণাৎ মনজুরা বললো,বউমনি আপনাকে বড়দাদা বাবু চা নিয়ে যেতে বলেছেন। এলিজা মৃদু হেসে হ্যা সুচক মাথা নাড়ে।চা নিয়ে যায় জাহাঙ্গীর এর ঘরে। জাহাঙ্গীর বারান্দায় উল্টো ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে।

জাহাঙ্গীর এর চোখ মুখে অনুশোচনা।এলিজা নরম গলায় বললো, আপনার চা। জাহাঙ্গীর এলিজার দিকে হালকা ঘার ঘুরালো। এলিজা ঘর থেকে চলে আসতেই , জাহাঙ্গীর নরম গলায় বললো, মালাইকা!এলিজা থমকে দাড়ায়। গম্ভীর মুখে জাহাঙ্গীর এর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে। জাহাঙ্গীর অনুশোচনা মূলক কণ্ঠে বললো,আমি জানি আমি

যা পাপ করেছি এর কোন ক্ষমা নেই।আমি একটা পরিবার কে ধ্বংস করে দিয়েছি। নিজের বন্ধুকে ঠকিয়েছি। জাহাঙ্গীর এর চোখে পানি। এলিজা থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাঙ্গীর ভেজা কন্ঠে বললো,পারলে আমায় ক্ষমা কর। না,হয় তোর অভিশাপ থেকে আমাকে মুক্ত দে।আমি যে, পাপের দগ্ধে পূরে যাচ্ছি।আমি জানি তোর

অভিশাপে,আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি।মন থেকে হয় ক্ষমা কর,না হয় আইনের হাতে আমাকে তুলে দে।তারা আমায় যা খুশি শাস্তি দিক।আমি তোর কাছেই, আমার মৃত্যু চাইতাম, কিন্তু যে হাত দিয়ে তোর অবুঝ দেহখানী বুকে জড়িয়েছি,সেই বুকে তোর আঘাত লাগলে যে, মৃত্যুর যন্ত্রনার থেকেও বেশি কষ্ট হবে।এলিজা কাঁপা কন্ঠে বললো,আমি আপনাকে

সেদিন ই ক্ষমা করে দিয়েছি,যেদিন থেকে আপনার ছেলেকে ভালবেসে ফেলেছি। আমার আপনার উপর কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আজ আপনার ভুলের জন্য,আমি যে মৃত্যু খেলা বেঁচে নিয়েছি,তা হয়তো কখনো বন্ধ হবে না। জাহাঙ্গীর এলিজার কথায় ঘৃনা দেখতে পেলো। ক্ষমা করেছি,এটা শুধু শব্দ মাত্র।

কিন্তু মন থেকে এলিজা ক্ষমা করতে পারেনি।

এলিজা জাহাঙ্গীর এর ঘর থেকে বের হয়ে আসে।মনোরা বললো,বউমনি মেহমানদের খাবার তৈরি করবেন না?

এলিজা মৃদু হেসে বললো,এখনি করবো। আপনি সব কেটে,ধুয়ে গুছিয়ে দেন।এলিজার হঠাৎ মনে পরলো অপূর্বর কথা। এলিজা চিন্তিত

ভঙ্গিতে মনোরাকে উদ্দ্যেশ্য করে বললো, তোমার ছোট দাদাবাবু কোথায় গেছে! দেখেছো!বা বলেছিলো কিছু!মনোরা শাক কাটতে কাটতে বললো, সকালে থানা থেকে ফোন আসে। তারপর ই বেড়িয়ে যান।তবে তার চোখ মুখে চিন্তার ছাপ ছিল।

মনোরার মুখে এই কথা শুনে এলিজা চিন্তায় পরে যায়।

সমস্ত ডিপার্টমেন্ট থেকে অফিসার-রা এসেছে।ঢাকা হাইকোর্ট এ মিটিং হবে। সেখানে থাকবে কমিশনার,সহ সমস্ত অফিসার। উপস্থিত থাকবে সি আইডি টিম।প্রধান অতিথি থাকবে, আইনমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ। অপূর্ব কিছুটা অবাক হয়,এত জরুরি কিসের মিটিং।সবাইকে ডাকা হয়েছে।কোন গুরুত্বপূর্ণ কেস নয়তো।

সবাই মিটিং এ উপস্থিত হয়। অপূর্ব ডিসি সাহেব কে বললো,স্যার মিটিং টা ঠিক কি নিয়ে হচ্ছে?ডিসি সাহেব বললো,আমরাও ঠিক জানি না। আইনমন্ত্রী তোফায়েল শুনেছি কিছু বলবেন,কোন কেস নিয়ে। তৎক্ষণাৎ আইনজীবী তোফায়েল আহমেদ হাতে মাইক্রোফোন -ট নেয়।বেশ কিছুক্ষণ বিভিন্ন কেস নিয়ে কথা বলে, এবং কিভাবে কোন কেস

সমাধান করেছে,কতটা সময় লেগেছে সে সব কিছু বলছে। তৎক্ষণাৎ তোফায়েল আহমেদ বলে উঠলো, বর্তমানে একটা কেসে আমরা পিছিয়ে আছি।তা হলো, যুবক ছেলেদের কিড,ন্যাপ করে ওদের হ,ত্যা করা।আমরা এখন পর্যন্ত এই কি,লার কে ধরতে পারছি না।তবে,এই কিলা,র কে যে,বা যারা ধরতে পারবে তাকে,৫ কোটি টাকা

দেয়া হবে। অপূর্ব এই কথা শুনে, হকচকিয়ে উঠে। মেরুদন্ড সোজা করে বসে। তৎক্ষণাৎ আবার শান্ত হয়ে মনে মনে বললো, আপনা,র চৌদ্দ গুষ্টি খুঁজলেও পাবে না।কারন সে যে, মালাইকা সিকদারিনী ।মিটিং শেষে সবাই বেড়িয়ে পরে। ডিসি সাহেব বললো, অপূর্ব তুমি ইদানীং এই কেসটাকে কোন গুরুত্ব দিচ্ছ না কেন! তুমি কি হাল ছেড়ে দিয়েছো!

অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, যাকে এত বছরেও পাওয়া যায়নি তাকে এখন ও পাওয়া যাবে না। আমার তো মনে হয়,যে এসব করছে সে কোন বাংলাদেশী নাগরিক নয়।

এবং অনেক দিন থেকেই দেখছি,এই মৃত্যু খেলা কম হচ্ছে। আশাকরি আর হয়তো করবেও না।ডিসি সাহেব কৌতুহল নিয়ে বললো,এত নিশ্চিত কি করে হচ্ছো,যে আর হবে

না? অপূর্ব অন্যদিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো, আমার ধারনা কখনো ভুল হয়না স্যার। আজকের আইনমন্ত্রীর ভাষন ,কিলা,দের মধ্যে কেউ না কেউ তো শুনেছে।এটা শোনার পর হয়তো নিজেকে গুটিয়ে নিবে।।ডিসি সাহেব অপূর্বর কথায় সহমত জানায়। অপূর্ব মনে মনে বললো, যার কোমল হাতের ছোঁয়া, আমার প্রতিদিনের অভ্যাস' তার

হাতে হাতকড়া কখনো ই পরাতে পারবো না।তবে এই মৃত্যু খেলা আমি বন্ধ করবো।

রাত প্রাই ৯ টা- অপূর্ব বাসায় ফিরতে না ফিরতেই ফোন আসে, কনস্টেবল এর। অপূর্ব ফোনটা ধরতেই ওপাশ থেকে কনস্টেবল বলে উঠলো,স্যার ডিসি সাহেব কে, আজকে কেউ বাহারতলা গলি থেকে জোর পূর্বক গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে

গেছে।গাড়ির রং টা কালো ছিল। অপূর্ব সম্পূর্ণ ভাবে হতভম্ব হয়ে যায়। অপূর্ব তৎক্ষণাৎ সন্দেহ করলো এলিজাকে।দ্রুত পায়ে এলিজার কাছে যায়। অপূর্ব দেখলো এলিজা ঘরে বসে অর্পার সাথে কথা বলছে। অপূর্ব আহত দৃষ্টিতে তাকায় এলিজাকে পরোখ করে বললো,বাহিরে এসো কথা আছে। এলিজা হকচকিয়ে উঠে। এলিজা

বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো,কি হয়েছে আপনার চোখ মুখে চিন্তার ছাপ কেন? অপূর্ব অর্পাকে উপেক্ষা করে বললো,ডিসি সাহেব কোথায়? এলিজা ভ্রু কুঁচকে বললো,কোন ডিসি সাহেব? অপূর্ব রক্ত মাখা চোখে বললো,আবরাম হোসেন, সৈকতের বাবা। আমাদের ডিসি সাহেব! কোথায় উনি?এলিজা অবাক ভঙ্গিতে বললো,আমি কি করে জানবো?সে

কোথায় আমি জানি না। অপূর্ব কর্কট মেজাজে বললো,সত্যি বল!

এলিজা কিছুটা কর্কট স্বরে বলল, সত্যিই আমি কিছু জানি না।

অপূর্ব তৎক্ষণাৎ উচ্চ স্বরে ঘৃনিত কণ্ঠে বলল, মিথ্যা বাদি, ছলনাময়ী,আর কত মিথ্যে বলবি! বলেই ঠাস করে এক থাপ্পর দিয়ে এলিজাকে মেঝেতে ফেলে দেয়। এলিজার চিকচিক করা ফর্সা গাল

নিমিষেই লাল হয়ে যায়। এলিজা উপর হয়ে পরে যায়। চুলের বেনুনিটা ,মুখের সামনে চলে আসে। পরনে লাল শাড়ির সাথে, চিকচিক করা গাল নিমিষেই লাল হয়ে যায়। অপূর্ব পুলিশ পোষাক পরিধান অবস্থায় ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়। অর্পা হতভম্ব হয়ে যায়।ভয়ে চাপসে গেছে অর্পা।এলিজা গালে হাত দিয়ে অঝরে কাঁদছে।নিয়তি আজ কোথা

থেকে কোথায় নিয়ে এসেছে, কেউ আমার শরীরে আঘাত করলে , তাকে এফোঁড়ওফোঁড় করে দিতে যার বাদ্ধ না।সে কি না ,আজ আমাকে ভুল বুঝে আমাকে মারলো। অর্পা এলিজার কাছে যায়। এলিজার ফর্সা গালে রক্ত উঠে যায়।অর্পা তার ভাইয়ের এরকম রুপ দেখে অবাক হয়ে যায়।

অপূর্ব গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পরে সূর্যর উদ্দেশ্যে। অপূর্ব নিশ্চিত যে সূর্য ই ডিসি সাহেব কে কিড,ন্যাপ করেছে। অপূর্ব দ্রত গতিতে গাড়ি চালায়।গাড়ি থামে সূর্যেদের বাড়ির সামনে। অপূর্ব দ্রুত পায়ে ভেতরে প্রবেশ করে। অপূর্ব এদিক সেদিক পরোক্ষ করে দেখলো কোথাও কেউ নেই। তৎক্ষণাৎ আওয়াজ আসে, উপরের ঘর থেকে, অপূর্ব দ্রুত পায়ে উপরে

উঠে। অপূর্ব দেখলো , সূর্যের ঘরের সামনে একাধিক জুতো ।ঘরের দরজা খোলা, অপূর্ব ভেতরে প্রবেশ করে দেখলো, সূর্য, হিমেল, এবং সূর্যের বাসার সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছে ।ডিসি সাহেব কে, লুকিং রেখে এখানে বসে ফুর্তি করা হচ্ছে,কর্কট মেজাজে এসব ভাবতেই, অপূর্ব সূর্যের কলার চেপে ধরে। সবাই হঠাৎ অপূর্বর উপস্থিতিতে

হকচকিয়ে উঠে।সবাই বসা থেকে দাড়িয়ে যায়। সূর্য আর চোখে বললো,কি করছিস তুই? কি হয়েছে বলবি তো!অপূর্ব রক্ত মাখা চোখে বললো,ডিসি সাহেব কোথায়? সূর্য ভ্রু কুঁচকে বললো, মানে? সে কোথায় আমি জানবো কিভাবে!
অপূর্ব মেজাজের স্বরে বলল,ডিসি সাহেব কে,কেউ অপহরণ করেছে,আর আমি নিশ্চিত এটা তুই

অথবা তোরা ছাড়া কেউ করেনি। মানছি সে, একসময় অপরাধ করেছে।তাই বলে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারিস না। আর,এই নির্মম খেলা খেলিস না। সূর্য অপূর্বর হাত চটকে সরিয়ে বললো,কখন থেকে উল্টো পাল্টা বকছিস।আমরা তাকে অপহরণ করিনি।তোর বিশ্বাস না হলে,এইতো মা আছে,মাকে জিজ্ঞেস কর।আজ

সারাদিন আমরা ঘরেই ছিলাম। অপূর্ব বিষিন্নত হয়ে যায়। বুকের ভেতর ধুকবুকানি বেড়ে যায়। সূর্য অপূর্বর কানের কাছে এসে বললো,, বিশ্বাস না হলে আমাদের দুটো আস্তানার দুই জায়গায় খুঁজে দেখতে পারিস। অপূর্ব সূর্যের কথা বিশ্বাস করলো।কারন, সূর্য সারাদিন বাসায় না থাকলে, এখন ওর মা বলে দিতো।অপূর্ব স্থান ত্যাগ করে।

বাড়িতে চলে আসে। অপূর্ব সমস্ত ভাবনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়। ইউনিফর্ম পরেই,বসে পরে বৈঠকখানায়।শার্টের বোতাম খুলে, মাথা পেছনে সোফার সাথে হেলান দিয়ে বসে আছে। রাত ১১:৩০। অপূর্ব অনুভব করলো এলিজা আসছে। অপূর্ব চোখ বড় করে তাকায়। এলিজা অপূর্ব কে উপেক্ষা করে রান্না ঘরে চলে যায়।জগে করে

পানি নেয়। অপূর্ব এলিজার দিকে পরোখ করছে।লাল শাড়ি,চুল গুলো বেনুনি, লম্বা টে শরীর,ভি-কার ধুতনি,মায়াবী চোখ মিলিয়ে বড্ড সুন্দরী দেখাচ্ছে। এলিজা পানির জগ টা হাতে নিয়ে অপূর্বর কাছে আসে,কাপা ঠোঁটে বললো,আমি টেবিলে খাবার দিয়ে দিয়েছি।খেয়ে নিবেন।এলিজার দৃষ্টি সংযত। অপূর্ব একবার এলিজার দিকে পরোক্ষ

করলো।এলিজার বা গাল লাল হয়ে আছে। অপূর্ব দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। এলিজা উপরে চলে যায়। এলিজা ভেতরে ভেতরে মরে যাচ্ছে। অপূর্বর দেয়া শরীরের আঘাতের চেয়ে,ঘৃনিত চোখের চাহনির দর্পন দ্বিগুণ বেদনাদায়ক। এলিজা ভাবলো, একবার জিজ্ঞেস ও করলো না আমি আমার লেগেছিল কিনা। এলিজা নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে।পানির জগ টা

টেবিলে রেখে।খাটের এক কোণে বসে কাঁদছে।অপূর্ব ঘরে আসে। এলিজা কে উপেক্ষা করে আলমারি থেকে পাঞ্জাবি, পাজামা বের করে। বাথরুমে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ পর গোসল করে বের হয়। কাঁদে তাওয়াল টা বিছানার উপরে ফেলে দেয়।আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা চুল গুলো হাত দিয়ে উপরে দর্পন করছে।পরনে সাদা পাঞ্জাবি,সাদা

পাজামা, জোর ভ্রু,ফর্সা দেহ খানি। এলিজা আর চোখে অপূর্ব কে দেখছে। অপূর্ব ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়। এলিজা অপূর্বর যাওয়ার পানে দেখে। এলিজা মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে।অঝরে কাঁদতে শুরু করে। এলিজা ভাঙা গলায় বললো,কি করে বোঝাবো আমার ভেতরের অনুভূতি গুলো।কি করে বোঝাবো,যে আমি তাকে সত্যিই ভালোবাসি। এলিজা

চোখ মুছে উঠে দাড়ায়।মনস্থির করলো, অপূর্বর সঙ্গে আজ কথা বলবেই,সে কি চায় তা আজ তাকে বলতেই হবে। এলিজা ঘর থেকে বের হয়। নিচে আসে কিন্তু ,অপূর্ব নিচে নেই।এলিজা এদিক সেদিক পরোক্ষ করে, কোথাও নেই। এলিজা দেখলো, ঘরের দরজা খোলা । এলিজা বাহিরে বের হয়। চারদিক নিশ্চুপ ।দূরে দু একটা ঝিঁঝিঁ

পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। হালকা শীতল হাওয়া বইছে। চাঁদনির আলোয় উদ্ভাসিত চারদিক । আশেপাশে এলিজা পরোক্ষ করলো, কোথাও অপূর্ব নেই । এলিজা বাড়ির গেট অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। কোথাও নেই । হঠাৎ এলিজার চোখ পরে জয়ার কবরের দিকে । এলিজা দেখলো অপূর্ব জয়ার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।, এলিজা ধির পায়ে

অপূর্বর কাছে এগোয় । অপূর্ব উল্টো ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে । এলিজা খেয়াল করলো, অপূর্বর ডান হাত থেকে রক্ত পরছে । ধবধবে সাদা হাত,র'ক্তে লাল হয়ে আছে। এলিজা বুঝতে পেরেছে এলিজা কে আঘাত করে অপূর্ব নিজেই এলিজার থেকে বেশি আঘাত পেয়েছে । এলিজা নরম গলায় বললো,আমায় আঘাত করে নিজেকেই নিজে কষ্ট দিয়েছেন

! অপূর্ব চুপ করে আছে। অপূর্বর চুপ করে থাকা এলিজার সহ্য হচ্ছে না। এলিজা জ্বলজ্বল চোখে কাঁপা কণ্ঠে আওয়াজ করে বলল, কি চাইছেন আপনি?কেন এরকম করছেন!! আমার সাথে যা হয়েছে তা যদি আপনার সাথে হতো, তবে আপনি কি করতেন?কেন আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন? আমার বুকের ভেতর টা দুমরে মুচড়ে যাচ্ছে!

আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ! আমি ভুল করেছি! আমি অন্যায় করেছি! একটা প্রানের বিনিময়ে হাজার টা প্রান নিয়েছি! এলিজা অঝরে কাঁদছে।এলিজার কান্নায় চারদিক থমকে যাচ্ছে। প্রকৃতি ও হা,হাকার করছে। কোথাও থেকে কালো ধোঁয়া ধেয়ে আসছে । এলিজা কাঁপা গলায় বলল,” আমার দিক থেকে থেকে মুখ ঘুরিয়ে না থেকে ‘

আপনি নিজের হাতে আমাকে শেষ করে দিন’। আপনি বললে,ছু,রি দিয়ে আমি আমার হ্রদয় টাকে নিজের হাতে,আপনাকে দিয়ে দিতে পারবো। সেই কষ্ট ও আমার সহ্য হবে ‘কিন্তু আপনার কর্কট মেজাজ, অবহেলা আমাকে শেষ করে দিচ্ছে। আমি পাপি,আমি অপরাধী। আপনি নিজের হাতে আমায় শেষ করে দিন।যদি আমার বুকে ছু,রি চালাতে আপনার

কষ্ট হয়।তবে আপনি একবার বলুন,আমি নিজেকে আইনের হাতে তুলে দিচ্ছি।তারা আমাকে শাস্তি দিক।

কথা গুলো শেষ করতে না করতেই, অপূর্ব দ্রুত পায়েএলিজার দিকে ঘুরে এলিজাকে আঝাপটা দিয়ে জড়িয়ে ধরে। এলিজার হৃদয় কেঁপে উঠে। অপূর্ব ভাঙা গলায় কান্না জড়িত কন্ঠে বললো,আমি তোমাকে আঘাত করে

নিজেই মরে গেছি।যেই হাত দিয়ে তোমায় আঘাত করেছি সেই হাত পুড়ে যাক”! আমি তোমাকে ভালোবাসি। নিজের জীবনের থেকেও বেশি ভালোবাসি।তোমাকে ছাড়া আমার থাকতে বড্ড কষ্ট হয়। আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারছি না। আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো ও না। অপূর্ব শক্ত করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো

এলিজাকে ।এলিজা শান্তি অনুভব করলো। অপূর্বর বুকে কতদিন পরে,তার মোহময়,শান্তিময় স্থানে মাথা রাখতে পেরেছে । এলিজা শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। অপূর্ব কাঁপা ঠোঁটে বললো, তুমি অপরাধী ‘তুমি পাপি’তুমি পাপের রানি’হৃদয়হরন -কারি’তুমি যত বড়ই পাপী হওনা কেন’আমার যে তোমাকেই লাগবে। অপূর্ব এলিজাকে জড়িয়ে ধরে

অঝরে কাঁদছে ।এলিজার বুকের ভেতর ধুকবুকানি বেড়ে গেছে। অপূর্বর কান্নায়, চারদিক নিশ্চুপ হয়ে গেছে।আকাশটা কালো মেঘে ঢেকে গেছে।অপূর্ব এলিজার দুই গাল আলতো করে ধরলো।,এলিজা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অপূর্ব কাঁপা ঠোঁটে এলিজার গালে চুমু খেয়ে বললো,আমি এই পাপিটাকে নিয়েই সারাজীবন থাকতে চাই। অপূর্ব

হাটুঘেরে বসে এলিজার পা জড়িয়ে ধরে বুক ফাটা কান্না স্বর নিয়ে বললো,হেরে গেছি আমি, আজকে আমার আইনের কাছে হেরে গেছে,আমি পারলাম না তোমার হাতে হাতকড়া পরাতে! আমার দায়িত্ব আজকে হেরে গেছে। আমার আইন ,হেরে গেছে, ভালোবাসার আদালতের কাছে।অপূর্ব দ্রুত উঠে দাড়ায়।দু হাত দিয়ে চোখ মুছে

অস্থির কণ্ঠে বললো, তুমি তোমার এই পাপের খেলা , মৃত্যু খেলা,পাপের সম্রাজ্য, সবকিছু ছেড়ে দাও।আমরা অনেক দূরে চলে যাবো।যেখানে থাকবে না কোন পাপ,যেখানে থাকবে না কোন মৃত্যু খেলা,যেখানে আমাদের কেউ পাবে না। তুমি আমায় কথা দাও, অপূর্ব এলিজার হাত নিজের মাথার উপর রেখে, কাঁপা গলায় বলল, এই

আমাকে ছুয়ে কথা দাও, তুমি সবকিছু ছেড়ে দিবে। নিজকে আমার জন্য গুটিয়ে নেবে, কথা দাও কোনদিন আমাকে ছেড়ে যাবে না,কথা দাও। এলিজা অপূর্ব কে জড়িয়ে ধরে বললো,আমি কথা দিচ্ছি আমি আজ থেকে পাপের খেলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলাম। আমি আর মৃত্যু খেলা খেলবো না। আমি আপনাকে ভালোবাসি, কোনদিন

আপনাকে ছেড়ে যাবো না।যতদিন পর্যন্ত আমার দেহে প্রান আছে, ততদিন পর্যন্ত আপনার বুকে মাথা রেখে থাকতে চাই। আপনার সাথে চাঁদনী রাতে পাশাপাশি সারাজীবন হাঁটতে চাই।দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে। এলিজা আজ খুব শান্তি পাচ্ছে। কতদিন পর,তার প্রান প্রিয় স্বামির শরীরের স্নিগ্ধ, শোভন, তৃপ্তিময় গন্ধ পাচ্ছে।

রাত ১২ টা নাগাদ –

অপূর্ব এলিজা কে শান্ত স্বরে বললো,ক্ষমা করে দাও, অনেক টা অবহেলা করেছি। কিন্তু তোমাকে অবহেলা করে,নিজেই নিজের সুখের কাছে অবহেলিত হয়েগেছি।

এলিজা শান্তিময় হাসি দিয়ে বলল, আপনার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী । আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। অনেক অন্যায় অবিচার করেছি।

অপূর্ব এলিজার কপালে চুমু খায়। মৃদু হেসে বললো, চাঁদনীর আলোয় চারদিক আলোকিত।এই ঝলকে,আমরা পাশাপাশি হাটবো। চলো –

এলিজা চোখ মুছে বললো, কোথায়? অপূর্ব বললো অজানা পথে।এলিজার গাল অপূর্বর হাতের রক্ত লেগে লাল হয়ে আছে। অপূর্ব গাল মুছে দিয়ে বললো,তোমাকে আঘাত করার পর,

তোমার রক্ত মাখা গাল দেখে,দেয়ালের সাথে ঘুষি মেরে নিজের হাতে ,নিজেই আঘাত করেছি। নিজের হাত নিজেই রক্তা,ক্ত করেছি।এলিজা কাঁপা ঠোঁটে অপূর্বর হাতে চুমু খায়।এলিজা অপূর্ব দুজনে মিলে অজানা পথে হাঁটছে। দুজন দুজনার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে । দু'জনে মিলে উপভোগ করেছে চাঁদনী রাত।

অপূর্ব এলিজার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে,মনে মনে ভাবলো, তুমি কি সত্যিই আমায় ভালোবাসো! তুমি কি সত্যিই তোমার পাপের সম্রাজ্য ছেড়ে দিতে পারবে। আমার যে ভয় হয়,যদি না তুমি পাল্টে যাও।এই ভালোবাসা কি সত্যি নাকি ক্ষনিকের অভিনয়। অপূর্ব এসব ভাবতে ভাবতে এলিজাকে শক্ত করে ধরে।

অপূর্ব মনে মনে বললো, তোমাকে হারানোর ভয় হয় যে...

শ্রাবন বসে আছে পাখির কাছে। পাখি ঘুমোচ্ছে। শ্রাবন পাখির কাছে বসে বসে ফোপাচ্ছে,পাখিকে হারানোর ভয় প্রতিদিন উৎফুলিত হয়।

শ্রাবন বিরবির করে বললো, তোমাকে হারানোর ভয় হয় যে।সূর্য রঞ্জনার কবরের কাছে বসে আছে।

বিরবির করে বলছে,কেন ছেড়ে গেলে আমায়,কেন এভাবে পোড়ালে,আজ বেঁচে থেকেও মরে যাচ্ছি। আমি যে ব্যার্থ,তোমাকে পেয়েও পায়নি।

মিরা বসে আছে সায়ানের কবরের কাছে।সায়ানের ছবিটি নিয়ে। এলোমেলো চুল।মাটি মাখা দেহ। ভাঙা গলায় ফিসফিস করে বলল,কেন ভালোবাসলে না আমায়।

আমায় ভালোবাসলে কি হতো!নিয়তি আজ কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এসেছে।কেউ পেয়েও হারানোর ভয় করছে।কেউ না পাওয়ার বেদনায় ছটফট করছে।কারো, পূর্নতার কাছ থেকেও বিচ্ছেদ হয়েছে।কেউ তার কর্মের জন্য তার প্রিয় মানুষ টিকে হারাচ্ছে।

নিয়তি আবার এক করেছে।

কিন্তু এখানেই কি সবকিছু শেষ! নাকি অপেক্ষা করছে নির্মম পরিহাস,নাকি অপেক্ষা করছে সুখের উৎচাস।

কি হবে এর শেষ পরিনতি.....সূর্যর কিরনে নতুন একটি দিনের আগমন নিয়ে আসলো । চারদিকে মানুষের কোলাহল ।ভরা জ্যামের নির্বিস গাড়ির শব্দ। উৎফুল্ল কাকের আনাগোনা। চৈত্র মাসের আগমন।

এলিজার ঘুম ভেঙ্গে যায় । এলিজা দেখলো অপূর্বর বুকের উপর শুয়ে আছে। অপূর্ব গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এলিজা অপূর্ব কে মায়ার দৃষ্টিতে পরোক্ষ করে।জোড়া ভ্রুর উপরে কালো তিল,গোলাপি ঠোঁট। অনেক নিষ্পাপ দেখাচ্ছে মানুষ টাকে। এলিজা ধিরে ধিরে উঠে বসে। ভাবছে, কতদিন পর,তার বুকে মাথা রেখে ঘুমাতে পারলাম। এলিজা

শান্তি অনুভব করলো । মনের অজান্তেই ঠোঁটের এক কোনে হাঁসি চলে আসে। এলিজা এলোমেলো চুল গুলো হাত দিয়ে খোপা করছে। ক্লান্তি গলায় হঠাৎ করে অপূর্ব বললো,ম্যাডাম। আমাকে রেখেই উঠে খেলেন। এলিজা উৎফুল্ল হয়ে পেছনে তাকায়। অপূর্ব চোখ বুজে আছে। এলিজা মৃদু হেসে বললো, আপনি সজাগ থেকে ও ঘুমের ভান

ধরে আছেন! অপূর্ব অমৃদু হাঁসি দিয়ে বলল, কখনো তোমার মিষ্টি হাসি দেখার জন্য ভান তো করতেই হয়। এলিজা মৃদু হেসে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। এলিজা অকারনেই লজ্জা পেলো। অপূর্ব এলিজাকে চট করে টেনে বুকের উপর সুইয়ে নেয়। অপূর্ব চোখ মেলে তাকিয়ে বললো,এত লজ্জা পাচ্ছ যে! এলিজা ভ্রু কুঁচকে বললো, লজ্জা পেয়েছি তাও চোখ

বুজে ই দেখেছেন!অপূর্ব মৃদু হেসে শক্ত গলায় বললো, পুলিশের চোখ থাকে দুটো।একটা আসামিদের জন্য ,আরেকটা নিজের বউয়ের জন্য। এলিজা আওয়াজ করে হেসে উঠলো। অপূর্ব মায়ার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, তোমার মুখের হাঁসি দেখার জন্য আমি ,আইনের আদালতে হাজার বার হারতে রাজি।

এলিজা রান্না ঘরে চলে আসে। নুরনেসা বেগম,পান চিবোতে চিবোতে রান্না ঘরে উপস্থিত হয় । এলিজা দেখে মৃদু হেসে বললো,ছোট আম্মা কিছু লাগবে,!বলেন, আমি দিচ্ছি।নূরনেসা বললো,কড়া করে এককাপ চা দাও দেখি।নূরনেসা খেয়াল করলো, এলিজা নতুন শাড়ি পরা। একদম পরিপাটি ।নূরনেসা জিজ্ঞেস করলো, কোথাও যাচ্ছ?

এলিজা মৃদু হেসে বললো, পাখির জন্য কিছু রান্না করে নিয়ে যাবো। নূরনেসা বৈঠকখানায় বসে। জাহাঙ্গীর হাতে ভারবহন লাঠি নিয়ে নিচে আসে। এলিজা জাহাঙ্গীর এর দিকে পরোক্ষ করলো, এলিজা ভাবলো,মানুষ টা কতটা নিস্তেজ হয়ে গেছে।তেজি মানুষটা আজ নিস্তেজ। সময় মানুষ কে উত্তম থেকে উত্তাপ করে দেয়।তার প্রমান আমার সামনে

থাকা মানুষটি। এলিজা, জাহাঙ্গীর নূরনেসা দুজনের জন্য চা নিয়ে আসে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় অপূর্ব। অপূর্ব পুলিশ ইউনিফর্ম পরা। এলিজা পরোখ করলো। এলিজা রান্না ঘরে চলে যায়। অপূর্ব জাহাঙ্গীর কে উপেক্ষা করে,রান্না ঘরে চলে যায়। এলিজা উল্টো ঘুরে পাখির জন্য রান্না করছে। অপূর্ব পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে। এলিজা নরম

গলায় বললো, সুযোগ পেলেই জড়িয়ে ধরেন। অপূর্ব এলিজার কাদের উপর ধুতনি টা রেখে মৃদু হেসে বললো,এই সুযোগ আমার সারাজীবন থাকুক। এলিজা বললো, আপনি থানাতে যাচ্ছেন? অপূর্ব বললো,যেতে হচ্ছে ডিসি সাহেব নি,খোজ কিনা,এই নিয়ে তদন্ত করতে হবে ।এলিজা বলল, টেবিলে গিয়ে বসুন আমি নাস্তা দিচ্ছি। অপূর্ব

এলিজার কথা মত খেতে বসে। অপূর্ব এলিজার দিকে পরোখ করে বিরবির করে বলছে, আমার নিষ্পাপ স্বর্গিয়পরী। এলিজা মনোরার সাথে হেসে হেসে কথা বলছে,আর খাবার বাড়ছে। অপূর্ব হাতের উপর গালের ভর দিয়ে অপলকে দেখছে। তৎক্ষণাৎ মনে পরে,ডিসি সাহেব এর কথা। কোথায় যাবেন উনি। কারা ওনাকে অপ,হরন করলো।

যেভাবে কনস্টেবল বর্ননা দিলো,তাতে তো সূর্যর সাথে মিলে যায়। অপূর্ব তৎক্ষণাৎ এলিজা কে বললো,আমি ড্রাইভার কে বলে যাচ্ছি,উনি তোমায় হাসপাতাল ছেড়ে দিবে। আমার তারা আছে,এখনি যেতে হবে বলেই,এলিজার কপালে চুমু খায়। এলিজা মৃদু হেসে সাবধানে যেতে বললো।

সকাল ৯ টা নাগাদ।শ্রাবন পাখি কে সকালের খাবার খাইয়ে ঔষধ খাইয়ে দেয়। শ্রাবন এদিক ওদিক কিছু খুঁজলো।পাখি বললো,কি খুজছেন? শ্রাবন ভাবনা নিয়ে বললো, চিরুনি কোথায়!! পাখি দেখিয়ে দেয়। শ্রাবন চিরুনি হাতে পাখির চুল গুলো আচরিয়ে দেয়।পাখি কাপা কণ্ঠে বললো,আমি আর আপনাকে এভাবে এলোমেলো দেখতে পারছি না।

আপনি দয়াকরে নিজেকে একটু গুছিয়ে নিন। শ্রাবন পাখির চুল বেঁধে দেয়। শক্ত গলায় বললো, তুমি যখন বলছো,তবে তাই হোক।বউমনি আসুক।তাকে তোমার কাছে রেখে চুল ,দাড়ি কেটে একদম সেজে গুজে আসবো।পাখি সম্মতি জানায়।

অপূর্ব বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নেয়। কোথাও ডিসি সাহেব এর হদিস মিললো না। অপূর্ব নতুন করে

চিন্তায় পড়ে যায়। হঠাৎ মাথায় আসলো এলিজা হাসপাতালে।ভাবনা উপেক্ষা করে হাসপাতালে চলে আসে।পাখি, শ্রাবন,সবার সাথে বিভিন্ন কথা বলার মাঝে,এলিজা পরোখ করলো অপূর্বর চোখ মুখে চিন্তার ছাপ। তৎক্ষণাৎ শ্রাবন অপূর্ব কে বললো,কি ভাবছিস ?কি হয়েছে? অপূর্ব শ্বাস ফেলে বললো,ডিসি সাহেব কে পাওয়া যাচ্ছে না। শ্রাবন

কিছু একটা ভেবে বললো,ওনাকে আমি সূর্যর সাথে গতকাল কথা বলতে দেখেছি। অপূর্ব হকচকিয়ে উঠে বললো, কোথায়? শ্রাবন বললো, হাসপাতালের সামনে,যদিও আমি ডিসি সাহেব এর মুখ দেখিনি উল্টো ঘুরে থাকায় তবে উনিই হবে হয়তো । অপূর্ব দ্রুত পায়ে হাসপাতাল থেকে বেড়িয়ে যায়। অপূর্ব সূর্য দের বাড়ি উপস্থিত হয়।

সূর্যর মা ঘরে। অপূর্ব আহত গলায় জিজ্ঞেস করলো, সূর্য কোথায়? সূর্যের মা বললো, রায়হান এর বাসায় গিয়েছে। অপূর্ব অবাক হয়। সম্পূর্ণ ভাবে হতভম্ব হয়ে যায়। মৃত ব্যক্তির বাসায় কি করছে। অপূর্ব স্থান ত্যাগ করে। বেড়িয়ে পরে রায়হান এর বাড়ির উদ্দেশ্যে। অপূর্ব রাগে গভীর হয়ে আছে । রক্ত মাখা চোখে বিরবির করে বললো, সূর্য

যদি আজ কোন উল্টো পাল্টা করে,তবে এর শেষ দেখে ছারবো। অপূর্ব উপস্থিত হয় রায়হানদের বাড়ি।বাড়িটা একদম নিঝুম হয়ে গেছে। রায়হানের মৃত্যুর পর, রায়হানের বাবাও মারা যায়। বেঁচে আছেন শুধু রায়হানের মা। অপূর্ব ভেতরে প্রবেশ করে,দরজা খোলাই ছিল।অপূর্ব এদিক ওদিক পরোখ করে। হঠাৎ একজন মহিলা বাহির

থেকে অপূর্ব কে উদ্দ্যেশ্যে করে বললো,খালি বাড়িতে কি করছেন? রায়হান এর আম্মা গ্রামে গেছেন। অপূর্ব অবাক হয়ে যায়। সম্পূর্ন ভাবে বিষিন্নত হয়ে যায়। অপূর্ব ভাবলো তবে এখানে সূর্য কি করছে, অপূর্ব পিস্তল টা বের করে।সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে, চারদিক অন্ধকার,দূর থেকে দেখতে পায়,রায়হান এর ঘরে আলো

জ্বলছে। অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে ঘরটির দিকে এগোতেই যা দেখলো, অপূর্বর চোখ গুলো ছানাবড়া হয়ে যায়। শরীর থেকে অঝরে ঘাম ঝরতে থাকে। অপূর্ব দেখলো, ডিসি সাহেব কে ,একটা চেয়ারের সাথে বেধে রেখেছে।মুখে টেপ লাগানো। তৎক্ষণাৎ বাথরুম থেকে বের হয় সূর্য। সূর্য অপূর্ব কে দেখেই ডিসি সাহেব এর পেছনে দাড়ায়। অপূর্ব

পিস্তল টা তাক করে রেখেছে সূর্যর দিকে, ।অপূর্ব কর্কট মেজাজে বললো,ছিঃ , আমার ঘৃনা হচ্ছে। এতটা নিষ্ঠুর মানুষ কি করে হতে পারে। বলেছিলাম, হাজার বার বুঝিয়েছি,আইন নিজের হাতে তুলে নিস না। মানছি তোদের সাথে খারাপ হয়েছে তাই বলে,আইন নিজের হাতে তুলে নিবি?তুই আসলেই একটা পাপি। তৎক্ষণাৎ

সূর্য পেছন থেকে মাঝারি সাইজের রাম,দা বের করে ডিসি সাহেব এর গলায় ধরলো। সূর্য শান্ত স্বরে বললো,আমাকে বাধা দিস না।এই পাষান লোকটিই আমার শেষ নিশানা। অপুর্ব শক্ত গলায় বললো,ছেড়ে দে বলছি।নয় কিন্তু....
সূর্য বললো,নয় কি করবি?
অপূর্ব পিস্তল টা লোড করে শেষ বারের মত বললো,ছেড়ে দে!

সূর্য বললো সম্ভব না।
অপূর্ব কর্কট মেজাজে বললো,তোকে আর এই মৃত্যু খেলা খেলতে দেবো না বলেই, সূর্যের বুকটা গুলিতে ছারখার করে দেয়। সূর্য নেতিয়ে পরে যায়।রাম,দা টা দূরে পরে যায়। ডিসি সাহেব কিছু বলার চেষ্টা করছে। অপূর্ব কে দেখা মাত্রই ছটফট শুরু করেছে। অপূর্ব ডিসি সাহেব এর মুখের টেপ টা খুলে

দিলো।ডিসি সাহেব অঝরে কান্না শুরু করে। অপূর্ব সূর্যর রক্তা'ক্ত দেহের কাছে হাঁটু ঘেরে বসে পরে। ঘৃনা হচ্ছিল কিন্তু প্রানপ্রিয় বন্ধুর মৃ'ত দেহখানি দেখে অপূর্বর বুকের ভেতর তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পরছে।কাপা কণ্ঠে বললো,কেন মৃত্যু খেলায় নিজেকে জড়িয়ে নিলি। বন্ধু হিসেবে যদি এতটুকু আমায়

ভালোবাসতি,তবে আমার একটা কথা রাখতিস!তবে আজ আর বন্ধুর হাতে মৃত্যু বরন হতো না।ডিসি সাহেব অঝরে কাঁদদে কাদদে বললেন, সূর্য তোমার হাতেই মরতে চেয়েছিলো। অপূর্ব হকচকিয়ে উঠে । ডিসি সাহেব কে,অস্থির কণ্ঠে বললো,কি বলছেন আপনি! আমার হাতে মরতে চেয়েছিলো মানে!

ডিসি সাহেব,কাপা হাতে ,টেবিলের উপর দেখিয়ে দেয়। অপূর্ব দ্রুত পায়ে টেবিলের কাছে গিয়ে দেখলো,একটা ডায়েরি! অপূর্ব দেখতে পেলো এটা সূর্যর ডায়েরি। অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে ডায়েরিটা খুললো, অপূর্ব দেখলো প্রথম পাতায় অপূর্ব কে নিয়ে একটা চিঠি লেখা । অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে পরতে শুরু করে।প্রিয়

অপূর্ব। আমাদের পথচলা সেই ছোটবেলা থেকে। একসাথে বড় হওয়া, একসাথে পথচলা, একসাথে স্কুলে যাওয়া,রোজ বিকেলে একসাথে খেলতে যাওয়া,সুখ দুঃখ ভাগ করে নেয়া,কি করে ভুলে যাবো সেই পূরানো স্মৃতি । বন্ধুত্বের বন্ধনে যখন আবধ্য হই,তখন একে অপরকে কথা দিয়েছি,জিবনের চলা প্রতিটা পথের একে অপরের সঙ্গি হবো।কি

করে ভুলে যাবো সেই স্মৃতি গুলো। কি করে বেইমানি করবো বন্ধুত্বের বাঁধনের সাথে।এতটাই কি স্বার্থপর ছিলাম!

আমি এতটাও নিষ্ঠুর ছিলাম না। যেদিন রঞ্জনার ধ,র্ষন ও হ,ত্যা হয়, সেদিন রায়হানের কোন দোষ ছিল না। রায়হান এর বাবাকে দূর্জয় ওরা অপহ,রণ করে। এরপর রায়হান কে ওদের কাজে সাহায্যর জন্য বাধ্য

করা হয়। রায়হান সেদিন রঞ্জনা কে বাঁচাতে চেয়েও বাঁচাতে পারেনি । রায়হান আমাকে সত্যিটা অনেক বার বলতে চেয়েও বলতে পারেনি। রায়হান কখনো বেইমানি করতে পারে না,এটা আমার বিশ্বাস ছিল। তাই দুদিন আগে ওর বাড়িতে আসলে ওর ঘর থেকে ওর রেখে যাওয়া চিঠি থেকে সব জানতে পারি।তখন নিজেকে খুব অপরাধী

মনে হয়েছিল।প্রানের চেয়েও প্রিয় বন্ধু কে নিজের হাতে মেরে ফেলেছি। অনুশোচনার আগুনে পুড়ে ছারখার হচ্ছিলাম। নিজেকে কখনো পাপি মনে হয়নি। হাজার টা নিরীহ মানুষের প্রান নেয়ার পরেও নিজেকে পাপি মনে হয়নি। কিন্তু যেদিন জেনেছি নির্দোষ বন্ধু কে মেরে ফেলেছি সেদিন থেকে নিজেকে পাপি মনে হয়েছে ।পাপের আগুনে

পুড়ে যাচ্ছিলাম। মনস্থির করি এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে হবে।সেদিন ডিসি সাহেব কে আমিই অপহরণ করি। এবং সবকিছু খুলে বলি।এটাও বলেছি,যে আমি তোর হাতে মরতে চাই।কারন আমি পাপি তুই পবিত্র’তোর হাতে মৃত্যু হবে আমার জন্য শ্রেষ্ঠ ‘মৃত্য । ডিসি সাহেব কে অপহ,রণ করা,সবকিছু একটা সাজানো নাটক ছিল। কিন্তু

উনি আপত্তি জানায়।তাই বেধে রাখতে বাধ্য হয়েছি।ডিসি সাহেব এর গলায় যে রাম,দাটা ধরেছি, সেটা ছিল ধারবিহীন রাম,দা। আজকে আমি মরেও শান্তি পাব। ভালোবাসি বন্ধুত্ব কে ,ভালোবাসি তোকে। অনেক মিথ্যার মাঝেও ছিল বন্ধুর জন্য মায়া।যা রয়ে গেলো অপ্রাকাশিত। ভালো থাকিস, নিজের যত্ন নিতে ভুলবি না।পারলে আমাকে

ক্ষমা করে দিস ।আর হ্যা এলিজা তোকে সত্যিই ভালোবাসে। এলিজাকে একটা বার সুযোগ দিস ।

ইতি

তোর পাপি সূর্য ।

অপূর্ব রাম,দা টা হাতে নিয়ে দেখলো এটা ধারবিহীন। অপূর্ব ছিটকে দূরে পরে যায় ।অপূর্ব অঝরে কাদদে শুরু করে। সূর্যর মৃত টা দেহটা অপূর্ব বুকে জড়িয়ে নেয়। শুরু করে

বুকফাটা কান্না। অপূর্বর কান্নায়, প্রকৃতি থমকে যায়। চারদিক নিশ্চুপ হয়ে যায়। অপূর্বর কাপা ঠোঁটে বললো,এটা আমি কি করলাম, নিজের হাতে নিজের বন্ধুকে হ,ত্যা করলাম।এই সূর্য চোখ খোল,কথা বলনা আমার সাথে। সূর্যর সমস্ত শরীর রক্তে লাল হয়ে আছে। অপূর্ব নিস্তেজ হয়ে বসে পরে।ডিসি সাহেব কাপা কন্ঠে বললো,আমাকে সূর্য

সেদিন সব বলেছে। আমি চাইনি। কিন্তু আমাকে জোড় করে আটকে রেখে, নিজের মৃত্যু নিজেই কামনা করলো।আমি তোমাদের বন্ধুত্ব সম্মান করি।পরে আছে সূর্যের নিঃস্ব দেহখানি। অপূর্ব মেঝেতে লেপ্টে বসে আছে।ডিসি সাহেব বাহিরে বের হয়।একটা দোকানের ল্যান্ডলাইন থেকে কনস্টেবল দের ফোন।তারা এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসে। সূর্যর মৃত

দেহ নিয়ে যায়। অপূর্ব রক্ত মাখা চোখে সূর্যের মৃত দেহকে পরোখ করে। হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখের পানি মুছে।নিয়ে চলে যায় সূর্য কে।ডিসি সাহেব অপূর্বর কাদে শান্তনা মূলক হাত রাখে। অপূর্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।ডিসি সাহেব একটা রিকশা ডাকে, অপূর্ব কে বললো, বাসায় যাবে না থানায়?

অপূর্ব ভাঙা গলায় বললো, পিজি হাসপাতালে যাবো। সেখান থেকে সূর্যের জানাজায়। অপূর্ব রিকশায় উঠে যায়।ব্যাস্ত সহর আজ নিরব মনে হচ্ছে। চারদিক এর কোলাহল এর দগ্ধ, নিমিষেই নিশ্চুপ হয়ে গেছে। একে একে সবাই কে হারালাম, সাদিক, রায়হান, সৈকত, অবশেষে সূর্য_ কেও।অপূর্ব হাতের উল্টো দিক চোখের পানি মুছে।

নিজের চোখ মুখের রঙ স্বচ্ছল করে।এলিজা যাতে কিছু বুঝতে না পারে। অপূর্ব কিছুক্ষণ এর মধ্যে পৌঁছে যায় হাসপাতালে। এলিজা পাখি বিভিন্ন কথায় মশগুল। শ্রাবন টুলে বসে আছে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় অপূর্ব। এলিজার চোখে চোখ পরতেই অপূর্ব মৃদু হাসে। বেশকিছু_ক্ষন অপূর্ব পাখি,এলিজার সাথে কথা বলে। তৎক্ষণাৎ এলিজা অপূর্ব কে

হতাশা কণ্ঠে বললো, আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে। অপূর্ব বাহিরে আসে।বাহিরের সিটে বসে। এলিজা ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে, অপূর্ব কে বললো, আমায় একবার বাবররাজ্য যেতে হবে। অপূর্ব এলিজার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে,ভ্রু কুঁচকে বললো, কিসের জন্য!তুমি তো সবকিছু ছেড়ে দিয়েছো।এলিজা নরম গলায় বললো, আমাদের দলের

সবাই তো আর এটা জানে না,চীপস ডুপিয়ালি এবং ডাঃ ইব্রাহিম এবং অন্যান্য অনেক এ আছেন!তাই তাদের সবার সাথে শেষ বারের মত, কথা বলা দরকার।আমি শেষ বারের মত বাবর রাজ্যে যেতে চাই। অপূর্বর দৃষ্টিতে আপত্তির ছাপ। অপূর্ব ভাবনা নিয়ে বললো, তোমার ইচ্ছে। এলিজা মৃদু হাসলো। অপূর্ব এলিজার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো, কবে

যেতে চাও? এলিজা বললো, আপনার আপত্তি না, থাকলে আজকেই যেতে চাই। অপূর্ব বললো,আমি আসবো তোমার সাথে? এলিজা আপত্তি স্বরে বলল, আপনাকে আমি দ্বিতীয় বার আমার পাপের সম্রাজ্য নিতে চাই না।

এলিজা চলে যায় , বাবর রাজ্যের উদ্দেশ্যে। অপূর্ব মনস্থির করলো, সূর্যর জানাজায় যাবে। অপূর্ব শ্রাবন

পাখির কাছ থেকে বিদায় নেয়। পাখির মুখের ছাপ চিন্তিত। শ্রাবন জিজ্ঞেস করলো,কি ভাবছো? কিছু হয়েছে?

পাখি নরম কন্ঠে বললো, আমার কিছু ভালো লাগছে না। শুধু মনের ভেতর কুহু ডাকছে। কোথাও থেকে কালো ধোঁয়া ধেয়ে আসছে। খারাপ কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে । শ্রাবন পাখির হাত দুটো ধরে বললো, এগুলো

তোমার ভাবনা_ মাত্র । খারাপ কিছু হবে না ।যা হবে ভালো ই হবে।
পাখি মৃদু হাসলো।
রাত ৯ টা নাগাদ।
অপূর্ব চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে। গভীর চিন্তায় মশগুল। বুকের ভেতর চাপ চাপ বেথা হচ্ছে ।কি যেন কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে। অপূর্ব না চাইতেও হঠাৎ করে সূর্যের চিন্তা আহরন করে। সূর্যর সাথে কাটানো

দিনগুলি, একসাথে পথচলা।কত কত স্মৃতি।সব চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় জাহাঙ্গীর। অপূর্ব বারান্দায় বসে আছে। জাহাঙ্গীর,দরজা খোলা থাকায় ঘরের মধ্যে চলে আসে।হাতে ভারবহন লাঠি। জাহাঙ্গীর দেখলো, অপূর্ব কে কোন ভাবনা গ্রা,স করেছে। জাহাঙ্গীর গলায় কাশি দিলো। অপূর্বর ভাবনা ভেঙ্গে যায়।

অপূর্ব হালকা ঘার ঘুরিয়ে পরোখ করলো।
অপূর্ব শক্ত গলায় বললো, এখানে কেন? জাহাঙ্গীর ভাঙা গলায় বললো,কি হয়েছে?কি ভাবছিস এত? চোখ মুখে চিন্তার ছাপ !অপূর্ব মেরুদন্ড সোজা করে বসে বললো, কিছু ভাবছি না। মায়ের কথা খুব মনে পরছিলো।

জাহাঙ্গীর নত-যত কণ্ঠে বললো,আমি পাপ করেছি। একবার নয় হাজার বার করেছি। আমার পাপের অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি।আমি অনুতপ্ত।এর শাস্তি আমাকে পেতে হবে।আর এই শাস্তি যদি নিজের ছেলের হাতে পাই,তবেই হবে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। অপূর্ব ঠোঁট কুঁচকে ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, তোমার বেঁচে থাকাই

তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ শাস্তি । জাহাঙ্গীর কিছু বললো না। অপূর্বর দিকে কয়েকবার দৃষ্টি স্থাপন করে স্থান ত্যাগ করে।অপূর্ব বসা থেকে উঠে, রেলিং ধরে দাঁড়ায়।মনে মনে ভাবছে, এলিজা এখনো কেন ফিরছে না! কিছু হলো নাতো।মনের ভেতর অস্থিরতা অনুভব হচ্ছে। সবকিছু এলোমেলো মনে হচ্ছে। কোথাও কিছু একটা হওয়ার আশঙ্কা।মনে

হচ্ছে বিপদ ধেয়ে আসছে। এরকম কেন অনুভূতি হচ্ছে। অপূর্বর অস্থিরতা বেড়েই চলেছে। তৎক্ষণাৎ অপূর্ব অনুভব করলো কেউ তাঁকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছে। অপূর্ব হকচকিয়ে উঠে। অপূর্ব বুঝতে পেরে কাপা কণ্ঠে বললো,ম্যাডাম আপনার এতক্ষনে ফেরার সময় হলো !কখন থেকে অপেক্ষা করছি। এলিজা অপূর্ব কে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে।

অপূর্ব দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে? অপূর্ব পেছন ঘুরে । অপূর্ব দেখলো, এলিজার চোখে পানি । অপূর্ব ভ্রু কুঁচকে বললো, চোঁখে পানি কেন!কি হয়েছে! এলিজা মৃদু হেসে বললো, কোথায় কি হবে! আজকে শেষ বারের মত, নিজের জন্মস্থান ত্যাগ করে এসেছি।তাই খারাপ লাগছে । অপূর্ব এলিজার দুই গালে আলতো,করে ধরে বললো,

সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। এলিজা অপূর্ব কে আঝাপটা দিয়ে জড়িয়ে ধরে। অপূর্ব হতভম্ব হয়ে যায়। এলিজার আচরণ স্বাভাবিক নয়। হঠাৎ কি হলো। অপূর্ব এলিজা কে জড়িয়ে ধরে বললো, সবাইকে বলে দিয়েছো,আজ থেকে নির্মম এই পাপের খেলা বন্ধ? তুমি আর কোনদিন পাপের সম্রাজ্য ফিরে যাবে না? এলিজা ভারী কণ্ঠস্বর নিয়ে

বললো,হুমম।রাতের খাবারের জন্য সবাই টেবিলে বসে আছে।এলিজা সবাইকে খাবার দিচ্ছে।নূরনেসা খাবার খেতে খেতে বললো,আমরা আগামীকাল চলে যাবো। অনেক দিন হয়েছে এসেছি। চাঁদনী নূরনেসার সাথে সহমত জানায়। অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,আর কয়টা দিন থেকে যাওনা ছোট মা! হঠাৎ মা চলে যাওয়াতে , সবকিছু এলোমেলো মনে

হচ্ছে।নূরনেসা বললো, নামাজ পরে সবসময় তোর মায়ের জন্য দোয়া করবি। অপূর্ব খেতে খেতে খেয়াল করলো, এলিজার আমাদের দিকে কোন খেয়াল ই নেই। এলিজা অজানা কোন ভাবনায় বিভোর হয়ে আছে।কি হয়েছে এলিজার। অপূর্ব এসব ভাবতেই, এলিজার ভাবনা ভাঙিয়ে বললো,ম্যাডাম!

এলিজা হকচকিয়ে উঠে,ভাবনা ভেঙ্গে যায়। এলিজা আমতা আমতা করে বলল,কি লাগবে আপনার!মাছ,ভাত কিছু দিবো? অপূর্ব খেয়াল করলো, এলিজা সামনে থেকেও কিছু দেখছে না। অপূর্বর খাওয়া শেষ কখন,অথচ এমন প্রশ্ন । অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, খাওয়া শেষ কখন, কিন্তু তুমি গভীর চিন্তায় মশগুল।কি হয়েছে?এলিজা কিছু না বলে, টেবিল

থেকে সব সরিয়ে নেয়। অপূর্ব পরোক্ষ করলো এলিজা কিছু লুকোচ্ছে। অপূর্ব ঘরে চলে যায়। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। ভাবতে থাকে, হঠাৎ এলিজার কি হলো! এরকম অদ্ভুত আচরণ কেন করছে!রাত বেড়ে চলেছে। অপূর্ব অপেক্ষা করছে,কখন এলিজা কাজ শেষ করে ঘরে আসবে। অনেক টা সময় কেটে যায় । এলিজা আসছে

না। অপূর্ব ঘর থেকে বেড়িয়ে আসে এলিজার উদ্দেশ্যে। অপূর্ব দেখলো রান্না ঘরে নেই। এদিক সেদিক পরোক্ষ করে কোথাও নেই। অপূর্ব উপরে চলে আসে, তৎক্ষণাৎ আওয়াজ পায় জাহাঙ্গীর এর ঘর থেকে একাধিক কন্ঠস্বর ভেসে আসছে। অপূর্ব গিয়ে দেখলো এলিজা সবার মাঝে বসে বসে কথা বলছে। জাহাঙ্গীর নূরনেসা, চাঁদনী

অর্পা। অপূর্ব কে দেখে এলিজা স্থান ত্যাগ করে। অপূর্ব এলিজা কে ভ্রু কুঁচকে বললো, এতক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি, অথচ তুমি এখানে! এলিজা আমতা আমতা করে বলল,ছোট আম্মা কাল চলে যাবেন,তাই একটু কথা বলছিলাম। অপূর্ব এলিজাকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। অপূর্ব এলিজা কে খাটের উপর বসিয়ে, শান্ত স্বরে বললো,

কিছু হয়েছে? তুমি কিছু ভাবছো! কিন্তু কি হয়েছে! তোমার এরকম ফ্যাকাশে মুখ আমার ভালো লাগে না। এলিজা দৃষ্টি সরিয়ে নেয়।নরম গলায় বললো, এরকম কিছু নয়।মা বাবার কথা খুব মনে পরছিলো তাই ভালো লাগছে না। অপূর্ব এলিজার জবাবে সত্যতা পেলো না। অপূর্ব মনে মনে ভাবলো, হয়তো বাবর রাজ্য থেকে সবকিছু ছেড়ে আসাতে

মন পূরছে।মা-বাবা ভাই সবার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। অপূর্ব এসব ভেবে নিজের মনকে শান্ত_না দেয়।অপূর্ব ভাবনা উপেক্ষা করে, এলিজার কপালে চুমু খায়। এলিজা শান্তি অনুভব করলো। অপূর্ব এলিজা কে সুইয়ে দিয়ে শরীরের উপর চাদর দিয়ে দেয়। এলিজার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, ঘুমিয়ে পরো,অতি ভাবনা থেকে মুক্ত হও।আমি এক্ষুনি

আসছি।বলেই অপূর্ব যেতেই, অপূর্বর ডান হাত টা চট করে ধরে ফেললো, অপূর্ব থমকে দাঁড়ায়। এলিজার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করলো । এলিজা কাঁপা গলায় বলল, আপনার বুক পাঁজর ছাড়া যে আমার ঘুম হবে না। অপূর্ব মৃদু হেসে, এলিজার পাশে সুইয়ে পরে। এলিজা কে বুকের উপর সুইয়ে দেয়। এলিজার নিঃশ্বাস ভারী।কেটে যায় অনেক প্রহর।

অপূর্ব ঘুমোয়নি। অপূর্বর বুকের ভেতর চাপ চাপ বেথা হচ্ছে ।মনের গহিনে নতুন করে ভাবনা জন্ম নিয়েছে।এলিজার আচরণ স্বাভাবিক নয়।কি এমন হয়েছে! অপূর্ব অনুভব করলো,এলিজার চোঁখের পানি বুকের উপর পরছে। এলিজার চোখ দিয়ে অঝরে পানি পরছে। কিন্তু এলিজার কান্নায় শব্দ নেই।কি

হয়েছে এলিজার???অপূর্ব ঘুমন্ত পরীকে নিয়েই ঘুমিয়ে পরে।

সূর্যের অহর্নিশি আলো তে ভরে গেছে চারপাশ। জানালা ভেদ করে সূর্যের রশ্মি সরাসরি পড়ে এলিজার চোঁখে। এলিজা টিপটিপ পলকে,চোখ মেলে। এলিজা অপূর্বর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে। মায়াবী চোখে অপূর্ব কে কয়েক প্রহর অনুদর্শন করে। এলিজা কাঁপা ঠোঁটে বিরবির করে

বললো, আপনার বুক পাঁজর ছাড়া কি করে থাকবো! এলিজা সোয়া থেকে উঠে যায়। হাতের উল্টো দিক চোখ মুছে।হাত মুখ ধোয়ার জন্য স্নানঘরে প্রবেশ করে। অপূর্ব এলিজাকে পরোখ করলো।এলিজার বিরবির করে কথাটা , অপূর্ব শুনে নেয়।কি এমন হয়েছে, এলিজা কোথায় যাবে! অপূর্বর বুকের ভেতর তোলপাড় শুরু হয়। হঠাৎ এলিজার

মুখে এরকম বাক্য অপূর্ব কে বিষিন্নত করে ফেললো। অপূর্ব উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে সোয়। এলিজা মুখ-হাত ধুয়ে রান্না করে চলে যায়। আজকে মনজুরা,মনোরা দু'জনে ই আছে।নূরনেসা এবং চাঁদনী দু'জনেই আজ চলে যাবে।এই ভেবে এলিজা ভালো মন্দ রান্না করছে। মনোরা খেয়াল করলো, এলিজা গভীর চিন্তায় মশগুল।

তরকারি পুড়ে যাচ্ছে,সেদিকে এলিজার কোন খেয়াল ই নেই। মনোরা এলিজার শরীরে হাত দিয়ে ভাবনা ভাঙিয়ে দেয়। এলিজা মনোরার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করলো। এলিজার চোখে মনোরা হতাশার ছাপ দেখতে পেলো।মনোরা, শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলো, বউমনি কি ভাবছো?কি হয়েছে? ছোট দাদাবাবুর সাথে মনোমালিন্য হয়েছে?

এলিজা মৃদু হেসে বললো, কিছু হয়নি।পাখির জন্য চিন্তা হচ্ছে খুব। মনোরা নিজের কাজে ব্যাস্ত হয়। এলিজা মনোরা এবং মনজুরা_ কে উদ্দেশ্য করে বললো, তোমাদের ছোট দাদাবাবু কি কি খেতে পছন্দ করেন!তার পছন্দ অপছন্দ তোমরা তো জানো তাই না? এলিজার মুখে হঠাৎ এরকম প্রশ্ন শুনে, মনোরা মনজুরা দু'জনেই অবাক হয়।মনোরা

শান্ত স্বরে বললো, হুম, সব জানি এবং মাঝেমধ্যে তার পছন্দের খাবার তৈরি ও করে দেই। এলিজা মৃদু হেসে বললো,তার কিন্তু সমস্যা আছে, সবকিছু খেতে পারবে না। মনোরা হ্যা সুচক মাথা নেড়ে বললো,হ্যা তা তো জানি। কিন্তু হঠাৎ আমাদের এসব বলতেছো কেন,তার যত্ন নেয়ার জন্য তো তুমি ই সারাজীবন থাকবে। এলিজা কিছু

বললো না। উল্টো দিকে ঘুরে ভারি একটা দ্বির্ঘশ্বাস ফেললো।দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়।নূরনেসা চাঁদনী দু'জনেই চলে গেছে। অপূর্ব জরুরি কাজে থানাতে গেছে।

এলিজা অর্পার ঘরে।অর্পার চুলে তেল দিয়ে দিচ্ছে এলিজা।অর্পা তার বউমনির সাথে এটা,ওটা ব্লা ব্লা বিভিন্ন কথায় মশগুল। এলিজা অর্পার কথা শুনছে আর মিটিমিটি

হাসছে। এলিজা অর্পার চুল বাঁধতে বাঁধতে বললো, তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার সম্পর্ক খুব গভীর । তাইনা!

অর্পা ভ্রু কুঁচকে দেয়। এলিজা ভাঙা গলায় বললো, ভাই বোনের সম্পর্কটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তম সম্পর্কের মধ্যে একটি সম্পর্ক।বড় ভাই বাবার পরে দ্বিতীয় ছায়া।অর্পা এলিজার, দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে

বললো, হঠাৎ এসব বলছো কেন? এলিজা মৃদু হেসে বললো,বলতে ইচ্ছে করলো। সবসময় ভাইয়ের কথা মত চলবে,।তাকে গুরুত্ব দিবে এবং তার খেয়াল ও রাখবে। এবং তোমার ভাই ও তোমাকে অনেক ভালোবাসে। এলিজার কথা বলার ধরন অন্য_রকম।অর্পা উপেক্ষা করে ।বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যায়। এলিজা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা তারা

দেখছে। চৈত্র মাসের আগমন। কিন্তু এখনো শেষ শীতের, শীতল হাওয়া বইছে। এলিজা চাদর পরে দাড়িয়ে আছে। এলিজা কাঁপা ঠোঁটে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিরবির করে প্রার্থনা স্বরুপ,বলছে আমার মহারাজা কে ভালো রেখো। কখনো কোনদিন তোমার কাছে কিছু চাইনি। কিন্তু আজ চাইছি। ভালো রেখো আমার মহারাজা কে।

ধমকা হাওয়াতে এলিজার কপালের কাছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুল গুলো,উড়ে উল্টো দিকে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় অপূর্ব। অপূর্ব ঘর থেকে দেখলো, এলিজা বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপলকে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।বিরবির করে কিছু বলছে। অপূর্ব বুঝতে পারলো এলিজা কোন অজানা ভাবনাতে মশগুল। অপূর্ব এলিজার কাছে গিয়ে

এলিজাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে। এলিজা চমকে উঠলো। অপূর্ব ভাঙা গলায় বললো,কি ভাবছো? এলিজা মায়া ভরা দৃষ্টিতে অপূর্বর দিকে পরোখ করে।অপূর্ব এলিজার কাদের উপর থুতনি রেখে, দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলো, হঠাৎ করে তুমি এরকম শান্ত হয়ে গেলে কেন? কি ভাবছো?কি হয়েছে ?এলিজা আকাশের দিকে তাকিয়ে, ভারী

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, গল্প শুনবেন? অপূর্ব ভ্রু কুঁচকে বললো,কি গল্প? এলিজা মৃদু হেসে বললো,এক রাজার গল্প। অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে বললো, হুম শুনতে চাই। এলিজা নরম কন্ঠে বললো, আমার পাশে এসে দাঁড়ান। অপূর্ব এলিজার কথা মত এলিজার গা-ঘেষে দাঁড়ায়। এলিজা অপূর্বর কাদে মাথা রেখে বলতে শুরু করবে,ঠিক

তখনই মনজুরা উপস্থিত হয়। মনজুরা এলিজা কে উদ্দেশ্য করে বললো, বউমনি হাসপাতাল থেকে ফোন আসছে। এলিজা হাসপাতাল এর কথা শুনেই বিষিন্নত হয়ে যায়। উৎফুল্ল কন্ঠে বললো,কি বলেছে? মনজুরা বললো, আপনাদের চেয়েছে। এলিজা ,অপূর্ব দ্রুত পায়ে নিচে আসে।অপূর্ব হাসপাতালের ল্যান্ডলাইনে ফোন করলে,ওপাশ

থেকে একজন নার্স ফোন রিসিভ করে বললো, শ্রাবন চৌধুরী ফোন করেছিল, ।আমাদের ল্যন্ডলাইন থেকে। অপূর্ব ভাবলো,হয়তো হাসপাতালে আমাদের দরকার। অপূর্ব এলিজা দু'জনেই হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পরে। এলিজা অঝরে ঘামছে।না জানি পাখির কিছু হলো। অপূর্ব এলিজার দিকে পরোখ করে

বললো,এত ঘাবরাচ্ছ কেন!হয়তো সাধারণ কোন বিষয় হবে,তাই ডেকেছে। অপূর্ব এলিজা কে জড়িয়ে ধরে। কিছুক্ষণ এর মধ্যে পৌছে যায় হাসপাতালে। এলিজা দ্রুত পায়ে হেঁটে আসে।পাখি এলিজা কে দেখেই মৃদু হাসে! এলিজা পাখির কাছে বসে কাপা কণ্ঠে বললো,বোন আমার!অপূর্ব শ্রাবন কে উদ্দেশ্য করে বললো, হঠাৎ ডেকে পাঠালি!কিছু

হয়েছে? শ্রাবন শান্ত স্বরে বললো,পাখি , বউমনির জন্য মন খারাপ করেছে।তাই ফোন দিয়েছিলাম। এলিজা পাখির গালে আলতো করে হাত দিয়ে বললো,মনে পারছিলো?পাখি হ্যা সুচক মাথা নাড়ে। এলিজা পাখির কপালে চুমু খেয়ে বললো,এই যে আমি, আমার ছোট্ট পাখির কাছে চলে এসেছি। পাখি কাঁপা কন্ঠে বললো,আমায় একা

রেখে যেও না। আমার আজকাল কিছু ভালো_লাগছে না।খুব উদাস উদাস অনুভব হয়।এই অনুভুতির কোন ব্যাখ্যা পাচ্ছি না। এলিজা পাখিকে শান্তনা দেয়। অপূর্ব শ্রাবন কে বললো,চল বাহির থেকে হেঁটে আসি। ততক্ষণে এরা দু_বোন মিলে গল্প করুক।এলিজা পাখিকে নিজের কোলে সুইয়ে নেয়।পাখির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললো,

সবসময় নিজের যত্ন নিবি, নিজেকে যেকোনো ভাবে আনন্দিত রাখার চেষ্টা করবি।মুখে সবসময় হাসি ফুটিয়ে রাখবি।কারন যেকোনো পরিস্থিতিতে, হাঁসি আমাদের শক্তি যোগায়। শ্রাবন কেও ভালো রাখার চেষ্টা করবি। এলিজার কথা বলার ভঙ্গিমা একদম অদ্ভুত। পাখি নরম গলায় বললো, এভাবে কথা বলছো কেন?কিছু কি হয়েছে? এলিজা মৃদু

হেসে বললো,কি হবে!তুই একটু হলেই ভয় পেয়ে যাস,তাই বললাম। পাখি এলিজার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।এলিজার চোখ মুখের রঙ ভিন্ন।তার আচরণ হঠাৎ বদলে গেছে।

কিছু তো হয়েছে কিন্তু বলছে না । পাখি ভাবনা উপেক্ষা করে।রাত প্রাই ১০:৩০। অপূর্ব শ্রাবন বাহির থেকে ফিরে আসে। শ্রাবন বললো,তোরা

ফিরে যা।রাত অনেক হয়েছে। এলিজা পাখিকে শান্ত স্বরে বললো, সকালে আবার আসবো। এখন তুই ঔষধ খেয়ে সুয়ে পর।

অপূর্ব এলিজা দু'জনেই বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়।যেতে যেতে অপূর্ব বললো,ম্যাডাম আপনার গল্প কিন্তু শোনা হয়নি। আজ রাত বসে কিন্তু আপনার গল্প শুনবো। এলিজা মৃদু হেসে হ্যা সুচক মাথা নাড়ে।

রাত বেড়ে চলেছে। এলিজার দৃষ্টিতে হতাশা।মুখের হাঁসি নিমিষেই ফুরিয়ে গেছে । অপূর্ব পরোক্ষ করলো। অপূর্ব এলিজা কে খাটের উপর বসতে বলে। এলিজা খাটের উপর বসে। অপূর্ব এলিজার সামনে বসে, মৃদু হাসি দিয়ে বলল, এবার তোমার গল্প শোনাও। এলিজা দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। অপূর্ব এলিজার থুতনি ধরে, এলিজার দৃষ্টি নিজের দিকে করে

নেয়।বললো,আমি কিন্তু আজ গল্প না শুনে ঘুমাবো না। এলিজা বললো,শুনবেন?শোনার জন্য ই বসে আছি।

এলিজা মৃদু হেসে বলতে শুরু করলো,এক ছিলো রাজা।রাজার ছিল প্রচুর অর্থ সম্পত্তি।তার অর্থ সম্পত্তির চেয়েও দামি মহর'ছিলো তার ৪ সন্তান।রাজার ছিল,৩ কন্যা এবং একটি পুত্র সন্তান।রাজার

জীবনে ছিল সুখ আর সুখ।তার তিন কন্যা ছিলো ,রাজার বড্ড আদরের। রাজার বড় দুই কন্যার একজন ছিলো, সাহসী।আর একজন ছিলো ভীতি প্রকৃতির। এবং তার ছোট কন্যা সেও ছিল শান্ত স্বভাবের। পূত্রের কথা না বলি।সবকিছু মিলিয়ে রাজার রাজকিয়,রাজ্য ভালোই কাটছিল কিন্তু হঠাৎ ধেয়ে আসে তাদের জীবনে কালো ধোঁয়া।

অপূর্ব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো,কি হয়েছিল?এলিজা বললো, রাজার বড় দুই মেয়ের বিয়ে পাকাপোক্ত হয়।তাও একই সঙ্গে। সবাই তাদের বিয়ে নিয়ে আনন্দিত ছিল।রাজা খুব খুশি হয়।কারন তার দুই মেয়ের বিয়ে একই সঙ্গে এবং একই ঘরে ঠিক হয়। কিন্তু হঠাৎ করেই, পাত্র পক্ষ বিয়ে ভেঙ্গে দেয়। রাজা খুব ভেঙে পরে কারন তার

আত্মসম্মানে লেগেছে। গ্রামের সবাই তার দিকে আঙুল তুলতে শুরু করে। রাজা অপমান সহ্য করতে পারতো না। চিন্তায় চেতনায় রাজা হঠাৎ করে খুব অসুস্থ হয়ে পরে। এবং এক পর্যায়ে মারা যান। তাকে হারানোর বেদনা তার বড় মেয়ে সহ্য করতে না পেরে,সে আত্ম,হত্যা করে। রাজার সুখের সংসার নিমিষেই শেষ হয়ে যায়।সেই মুহূর্তে

রাজার দ্বিতীয় কন্যা প্রতিজ্ঞা করে ,যে সে, এসবের প্রতিশোধ নিবে। রাজার মেজো কন্যা , ফন্দি এঁটে,যে পাত্রের সাথে বিয়ে ঠিক হয়,তাকে আবেগের জ্বালে ফাঁসায়। এবং তাকে বিয়েও করে।রাজার মেজো মেয়ের নাম ছিল মাহিরা।ফন্দি এঁটে যাকে বিয়ে করে তার নাম ছিলো,মাহের। মাহিরা চেয়েছিল মাহের এর পরিবার কে শেষ করে দিবে। এবং

একপর্যায়ে মাহিরা ,মাহের এর অনুপস্থিতিতে তার পরিবারের সবাইকে খু,ন করে। কিন্তু তা মাহের এর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে।মাহের ভেবেছিল তাদের
শত্রুরা খু,ন করেছে। এভাবে কেটে যায় অনেক বছর।মাহিরা ধিরে ধিরে মাহের এর প্রেমে পরে যায়। চেয়েছিলো মাহের এর সাথে ই বাকি জিবন টা কাটাবে।মাহের ও

মাহিরাকে তার জীবনের থেকেও বেশি ভালোবাসতো। কিন্তু, একপর্যায়ে মাহিরার সমস্ত সত্যি ,মাহেরের সামনে চলে আসে। যে,মাহিরাই তার পরিবারের সদস্যদের হ,ত্যা করেছে।মাহের এই অন্যায় মেনে না নিতে পেরে , মাহিরাকে ১০১ টি তলোয়ারের আঘাতে হ,ত্যা করে। কিন্তু যখন মাহিরাকে হত্যা করে,তখন মাহের

খুব ভেঙ্গে পরে।পরবর্তীতে মাহের নিজেকে গুটিয়ে নেয় এবং দ্বিতীয় বিয়ে করে সুখে সংসার করে। এলিজা মৃদু হেসে তৎক্ষণাৎ বললো, সমস্ত পূরুষদের মাহেরের মত শক্ত হতে হয়।

অপূর্ব ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, নিশ্চয়ই ঐ লোকটি স্বার্থপর ছিলো। ভালোবাসার মানুষ টি যত বড়ই পাপি হোক না কেন,তাকে

ক্ষমা করে দিতে হয়।আর যদি খু,নের বদলে খু,ন করতেই হয়,তবে আমি মাহেরের জায়গায় থাকলে নিজেকেও শেষ করে দিতাম।

অপূর্বর কথা শুনে এলিজা হকচকিয়ে উঠে। আহত কন্ঠে বললো, পূরুষদের মন শক্ত করতে হয়।

অপূর্ব কিছুটা কর্কট মেজাজে বললো, তুমি আমাকে এই গল্প দিয়ে কি বোঝাতে চাচ্ছ?আর তুমি আজকে

সকালে এটাই বা বললে কেন?যে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। আমাকে ছাড়া থাকতে কষ্ট হবে? এলিজা জ্বলজ্বল চোখে বললো,আমি না থাকলে কি আপনার খুব বেশি কষ্ট হবে?.....এলিজা সকালে ঘুম থেকে উঠেই জাহাঙ্গীর এর ঘরে আসে।এসে দেখে জাহাঙ্গীর ঘরে নেই।এত সকাল সকাল কোথায় যাবে।এলিজা চারদিকে পরোখ

করতে থাকে। জাহাঙ্গীর ঘরে নেই। এলিজা জাহাঙ্গীর এর ঘর ত্যাগ করে রান্না ঘরে চলে আসে।অর্পা আগে থেকেই রান্না ঘরে। এলিজা অর্পাকে রান্না ঘরে দেখে ইতস্তত বোধ করে বললো, এখানে কি করছো!যা দরকার আমাকে বলো!আমি বানিয়ে দিচ্ছি।অর্পা মৃদু হেসে বললো, কিছু দরকার নেই। তোমরা কিভাবে রান্না করো দেখতে আসলাম। আমার ও

খুব ইচ্ছে করে রান্না করতে। এলিজা মৃদু হাসলো।অর্পা খেয়াল করলো এলিজার চোখ মুখে আতংক।কোন কারনে এলিজা নিশ্চুপ হয়ে আছে।অর্পা নরম কন্ঠে বলল, বউমনি!পাখির জন্য চিন্তা করছো বুঝি? এলিজা অর্পার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো,হ্যাঁ মনটার ভেতর খুব কুহ ডাকছে।সবাইকে খাইয়ে আমি হাসপাতালে যাবো।

অপূর্বর ঘুম ভাঙ্গে অনেক্ষন। অপূর্ব বিছানার এপাশ ওপাশ করছে।কোন ভাবেই শান্তি পাচ্ছে না। অপূর্ব সোয়া থেকে উঠে বসে।মনের মধ্যে গহিন চিন্তা আহরন করেছে। এলিজার অদ্ভুত আচরন, চোখের চাহনি, কথা বলার ভঙ্গিমা, এবং প্রতিটি বাক্যে কিছু লুকিয়ে আছে।কি হয়েছে এলিজার। বাবর রাজ্য কি কিছু হয়েছে!নাকি এলিজার মনে ,অন্য

কোন চিন্তা ভাবনা ঘর বেঁধেছে। অপূর্ব এসব ভাবতে ভাবতে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। স্নানঘরে প্রবেশ করে ।হাত মুখ ধুয়ে স্বচ্ছল হয়ে বের হয়। তোয়ালে টা কাঁদের উপর রেখেই,খাটের এক কোণে ঘাপটি মেরে বসে আছে। এলিজার হঠাৎ কি হলো।কেন গতকাল রাতে, ওরকম একটা গল্প শুনালো।আমিতো এলিজা কে,হ,ত্যা করার চিন্তা

ভুলক্রমেও ভাবিনি ।কারন ভালোবাসার মানুষ টিকে কখনো ঘৃনা করা যায়না। অপূর্ব এসব বিরবির করে বলতেই,ঘরে উপস্থিত হয় এলিজা। এলিজা দেখলো অপূর্ব মুখ ভার করে বসে আছে।এলিজার ভাবনায় অপূর্ব মশগুল তা , এলিজা ভালো করেই বুঝতে পেরেছে। অপূর্বর ফ্যাকাশে মুখ এলিজা কে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। এলিজা নিজের

মস্তিষ্ক স্বচ্ছল করে নরম গলায় বললো, এতক্ষনে ঘুম ভাঙলো! অপূর্ব এলিজার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো,ঘুম আর হলো কোথায়। তুমি যা শুরু করেছো।কি সব উল্টা পাল্টা গল্প শোনালে।এলিজা স্বাভাবিক আচরনে বললো, এভাবে বলবেন না।আমি তো আপনাকে শুধু একটা গল্প ই শুনেয়েছি।তার জন্য এত ভাবনা! অপূর্ব ভাবনা উপেক্ষা

করে বললো,বাদ দাও এসব। তুমি শুধু আমার হয়ে থাকো,বাকি সবকিছু আমি দেখে নিবো। এলিজা মৃদু হেসে বললো, আমি পাখির কাছে যেতে চাই। গতকাল আমাকে দেখে কতটা খুশি হয়েছিলো।আমি ওর কাছে থাকলে ও হয়তো, শান্তি এবং ভরসা পায়। অপূর্ব সম্মতি জানিয়ে বললো,আমিও যাবো।

এলিজা যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। সাথে অপূর্ব। অপূর্ব খেয়াল করলো, এলিজা এক_পলকে মেঝের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে কিছু ভাবছে, অপূর্ব ভাবনা ভাঙিয়ে বললো,কি ভাবছো? এলিজা কাঁপা গলায় বলল,মনের ভেতর অস্থিরতা অনুভব হচ্ছে। শুধু কুহু ডাকছে। কিছু একটা হবে। ভালো লাগছে না কিছু। অপূর্ব এলিজার দুই গাল আলতো করে

ধরে বললো, এরকম ভাবনাকে উপেক্ষা করো। কিছু হবে না।যা হবে ভালো ই হবে।

অপূর্ব এলিজা বেড়িয়ে পরে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে।

পিজি হাসপাতাল–শ্রাবন সিটের উপর বসে আছে।চোখের কার্নিশে কার্নিশে রক্তের ছাপ। শ্রাবন দু হাতের উপর থুতনির ভর দিয়ে বসে আছে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়

এলিজা অপূর্ব। শ্রাবন অপূর্ব, এলিজা কে দেখে হকচকিয়ে উঠে দাড়ায়। শ্রাবণের চোখে হতাশার ছাপ । অপূর্ব ভাঙা গলায় বললো,কি হয়েছে তুই বাহিরে! শ্রাবন অপূর্ব কে জড়িয়ে ধরে বললো,পাখির শেষ রাত থেকে কান থেকে রক্ত বের হচ্ছে। শ্রাবন ভারী গলায়,ফোপাচ্ছে। অপূর্ব শান্তনা মূলক কন্ঠে বললো, কিছু হবে না।এত ভেঙে পরছিস

কেন! এরকম টা হয়।এত ঘাবরাস না। এলিজা সিটের উপর ধপাস করে বসে পরে। বুকের ভেতর তোলপাড় শুরু হয়।চোখ দিয়ে অঝরে পানি গড়িয়ে পরছে। এলিজা বিরবির করে বলছে,পাখির কিছু হয়ে গেলে, পরপারে মা বাবাকে কি জবাব দেবো,আমি যে পারলাম না, পাখিকে বাঁচাতে।এই বুঝি হারিয়ে ফেলছি।তৎক্ষণাৎ ডাক্তার পাখির

চেকাপ-করে বের হয়।ডাক্তার অস্থিরতা দৃষ্টি নিয়ে বললো, পাখির শরীর থেকে অনেক রক্ত বেড়িয়ে গেছে। জরুরি ০-নেগেটিভ রক্ত লাগবে। কিন্তু এই গ্রুপের রক্ত আমাদের হাসপাতালে নেই।মিরপূর প্রাইভেট হাসপাতালে পাবেন। শ্রাবন দ্রুত পায়ে বেড়িয়ে যায়। রক্তের জন্য।শ্রাবন পথ ভুলে যাচ্ছে। সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

সমুদ্র আচরে পরছে । শ্রাবনের ভেতরের ধুকবুকানি টা ধিরে ধিরে বেড়ে চলেছে। শ্রাবন গাড়ি নিয়ে বের হয় মিরপুরে প্রাইভেট হাসপাতাল এর উদ্দেশ্যে। শ্রাবন ধিরে ধিরে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। কিছুদূর এগোলেই গাড়ি আটকে যায় ভরা জ্যামে। শ্রাবন সামনে উঁকি দিয়ে দেখলো, অনেক রাস্তা অব্দি জ্যামের ভরাকান্ত।শ্রাবন স্টেরিয়াং এ

ক্রোধে এক ঘুষি মেরে জ্বলজ্বল চোখে বললো, আমার সাথে ই কেন এমনটা হয়। শ্রাবন দেখলো জ্যাম ছুটছে না। শ্রাবন গাড়ি থেকে নেমে দৌড়াতে থাকে।ভরা জ্যামের মধ্যেখান থেকে,অঝরে কাঁদতে কাঁদতে ছুটছে শ্রাবন। কিছুক্ষণ এর মধ্যে পৌছে যায়, প্রাইভেট হাসপাতালে।রক্ত নিয়ে ফিরে আসে পিজি হাসপাতাল। শ্রাবন নিজেদের

গাড়ি মাঝপথে ই ফেলে রেখে এসেছে সেদিকে কোন খেয়াল ই নেই। রিকশা নিয়ে চলে আসে পিজি হাসপাতালে। শ্রাবন হাসপাতালের ভেতরে যতই এক কদম দু কদম -করে প্রবেশ করে ততই শ্রাবণের বুকের ভেতর ধুকবুকানি টা বেড়ে যাচ্ছে ।শ্রাবন দ্রুত পায়ে হাঁটার চেষ্টা করলে, নিমিষেই নিস্তেজ হয়ে যায়।পায়ের শক্তি ফুরিয়ে যায়।শ্রাবন

আইসিইউর সামনে আসতে আসতে দেখলো, জাহাঙ্গীর,অর্পা, মমতাজ ,বাড়ির কাজের মহিলা,সহ শ্রাবণের দুজন বন্ধু সবাই উপস্থিত। এলিজা অপূর্ব কে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। শ্রাবন অপূর্ব কে কাপা কন্ঠে বললো,কি হয়েছে,সবাই এখানে কেন!কেউ শ্রাবণের কথার উত্তর দিলো না।সবার দৃষ্টি সংযত। শ্রাবন,ধির পায়ে আইসিইউর ভেতরে

প্রবেশ করলে ,যা দেখে তৎক্ষণাৎ শ্রাবণের হাত থেকে রক্তটা মেঝেতে পরে যায়।শ্রাবনের চোখ গুলো ছানাবড়া হয়ে যায়। হৃদয়ের কম্পন ধিরে ধিরে বন্ধ হয়ে যায়।পাখিকে সাদা কাপড়ে- মুড়ি দিয়ে রেখেছে। পাশে থাকা ডাক্তার নিচু গলায় বললো, দুঃখিত আমরা পাখিকে বাঁচাতে পারিনি। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে,হার্টের কার্যক্ষমতা

বন্ধ হয়ে যায়।শ্রাবন পাখির কাছে এগোয়।কাপা হাতে সাদা কাপড় টা মুখের উপর থেকে সরায়। শ্রাবন কাপা ঠোঁটে বললো,এই পাখি ,পাখি,চোখ খুলো,পাখি।শ্রাবনের কথা বলার শক্তি টুকু নিমিষেই শেষ হয়ে যায়। আমতা আমতা করে,কান্না জড়িত কন্ঠে বললো,পাখি ,আমি জানি, আমার সাথে মজা করছো। এখানের সবাই মজা করছে।তু, তুমি

কথা দিয়েছিলে না সারাজীবন আমার সাথে থেকে যাবে।তা, তাহলে আমায় রেখে কিভাবে যেতে পারো!এই ছলনাময়ী!, বেইমানি করলে আমার সাথে।আমায় নিঃস্ব করে রেখে যেতে পারলে,কি করে পারলে আমায় চিরদিনের জন্য শেষ করে দিতে।এই পাখি ,পাখি,। শ্রাবন বুক ফাটা কান্না শুরু করে।পাখির মৃত দেহটাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে

নেয়।শ্রাবনের কান্নার শব্দে চারদিক থেকে হাসপাতালে থাকা লোকজন চলে আসে।নিশ্চুপ হয়ে গেছে চারদিক। আকাশের নিল রঙ বদলে নিমিষেই কালো হয়ে গেছে।থমকে যাচ্ছে শ্রাবন। থমকে যাচ্ছে শ্রাবণের হৃদয়। শ্রাবন রক্তমাখা চোখে,কান্না জড়িত কন্ঠে বলতে শুরু করে,কি করে থাকবো আমি তোমায় ছাড়া।কি করে বাঁচবো আমি তোমায় ছাড়া।

আমার যে , বুকের ভেতর টা দুমরে মুচড়ে যাচ্ছে।পাখি চোখ খুলো। একটা_বার আমার ডাকে সাড়া দাও। অপূর্ব, শ্রাবন এর বন্ধুরা এসে শ্রাবন কে সামলানোর চেষ্টা করে। মমতাজ তার ছেলের হাহা,কার দেখে অঝরে কাঁদছে।মনে মনে বলছে, সৃষ্টি কর্তা, তুমি তো মিরাক্কেল করতে পারো,তবে কি পারো না আমার রুহ টাকে কেড়ে

নিয়ে পাখিকে বাঁচিয়ে তুলতে।আমি যে , আমার ছেলের কান্নার আহা,জারি দেখতে পারছি না।শ্রাবন পাখির নেতিয়ে থাকা মৃত দেহটাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। শ্রাবন ডাক্তার কে উদ্দেশ্যে করে কাপা ঠোঁটে, কাঁদতে কাঁদতে বললো,এই ডাক্তার এমন কিছু করুন যাতে আমিও মরে যাই,আমার শরীরে বিষ প্রয়োগ করুন।আমি বাঁচতে চাই না।

আমি পাখির কাছে চলে যেতে চাই। পাখির সাথে সারাজীবন থাকার কথা দিয়েছি।আমি এই কথা রাখতে চাই,আমাকে মেরে ফেলুন। এরপর আমাদের একসাথে মাটি দেয়া হোক।আমি কবরেও পাখির সাথে থাকতে চাই।মেরে ফেলুন না আমায়।শ্রাবনের কান্নায় থমকে যাচ্ছে চারদিক।পূ্রো পৃথিবীর সমস্ত ভার শ্রাবণের উপর আচরে পরছে।

শ্রাবনের বুক ফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পরছে দেয়াল।থমকে যাচ্ছে প্রকৃতি। অপূর্ব হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখের পানি মুছে। নিজেকে শক্ত করে শ্রাবন কে পাখির কাছ থেকে সরিয়ে নেয়।৪জন ওয়ার্ডবয় এসে পাখির মৃত দেহ নিয়ে যায় হাসপাতালের বাহিরে থাকা এ্যাম্বুলেন্সের উদ্দেশ্যে।এলিজা ফোপাচ্ছে। নিস্তেজ হয়ে বসে আছে।

মমতাজ শান্তনা দিচ্ছে। জাহাঙ্গীর কাঁপা কন্ঠে বললো,সবার বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হওয়া দরকার।সবাই শ্রাবনকে ধরে নিয়ে যায়।শ্রাবনের হাটার মত শক্তি নিমিষেই ফুরিয়ে গেছে। শ্রাবণের বুক ফাটা কান্না থামছে না। আশেপাশের সবাই শ্রাবনের আ,হাজারি দেখছে।

সবাই ফিরে আসে বাড়িতে।পাখির মৃত দেহ রাখা হয় বাড়ির সামনে।

শ্রাবন খাটিয়ার কাছে হাঁটুঘেরে বসে পরে।কাপা কণ্ঠে বললো,কি করে থাকবো তোমায় ছাড়া।পাখিহীন শ্রাবন যে, নিঃস্ব। শ্রাবণের দু'চোখ থেকে গড়িয়ে বিন্দু বিন্দু পানি পরছে মাটিতে। অপূর্ব শ্রাবণের পাশে এসে শান্তনা মূলক কাদে হাত রাখে। শ্রাবন ,অপূর্বর পা দুটো জড়িয়ে ধরে কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো, আমার কাছ থেকে পাখিকে কেড়ে নিস না।

আমি যে,পাখিকে ছাড়া থাকতে পারবো না। শ্রাবন অপূর্বর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে ক্লান্তি ঠোঁটে বললো,এই ভাই, জিবিত মানুষ কে কি কবর দেয়া যায়না! তাহলে আমাকেও পাখির সাথে কবর দে।না হয় আমাকে মেরে ফেল।

অপূর্ব এলিজাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। এলিজা ভাঙা গলায় বললো,আমি পারলাম না আমার

বোনটাকে বাঁচাতে।পারলাম না পাখিকে আর কিছুদিন খুশি রাখতে। এলিজার চোখের পানি অপূর্ব মুছে দিয়ে বললো, এভাবে ভেঙ্গে পরো না।শান্ত হও।নয়তো,পাখির আত্মা কষ্ট পাবে।

ইমাম সাহেব আসেন। জাহাঙ্গীর এর সাথে কথা বলে। ,আসরের পর পাখির জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় নির্ধারিত করে।পাখি কে কিছু

মহিলারা গোসল করানো শুরু করে। শ্রাবন মেঝেতে লেপ্টে বসে আছে। শ্রাবন কান্না করছে।তবে কান্না শব্দহীন। মস্তিষ্কের নিউরন গুলো পাখির ফেলে যাওয়া স্মৃতির জন্য ছিরে যাচ্ছে। মমতাজ শ্রাবণের পাশে বসে ,কাপা ঠোঁটে বললো, নিজের মনকে শক্ত কর।পাখিকে যে তোর স্ত্রি।তুই এভাবে কাঁদলে পাখির আত্মা কষ্ট পাবে।তুই কি চাস পাখি কষ্ট

পাক! শ্রাবন হাতের তালু দিয়ে চোখ মুছে।

কষ্টে ,বেদনায় , হাহাকারে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়।ইমাম সাহেব সবাইকে জানাযায় ডাকে। অনুষ্ঠিত হয় জানাযা।চৌধুরী বাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে কবর খোঁড়া হয় পাখির জন্য।ইমাম সাহেব বললো,খাটিয়া, ৪ জনে ধরে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হোক। অপূর্ব

শ্রাবন কে নিচু কণ্ঠে বললো,খাটিয়া ধরতে হবে!
শ্রাবন রক্তমাখা চোখে ধির কণ্ঠে বললো, আমার শক্তি নেই।
অপূর্ব চোখ দুটো বড় বড় করে শ্রাবন কে দেখলো।বুকের ভেতর চাপ চাপ বেথা অনুভব করলো।
অপূর্ব বিরবির করে বললো, যেই শ্রাবন ১০০ টা আসামির সাথে লড়তো,সে আজ নিজের স্ত্রীর খাটিয়া

ধরার মত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ভালোবাসা বড়ই অদ্ভুত,প্রিয় মানুষ টা কাছে থাকলে, তারজন্য সবকিছু ধ্বংস করে দেয়ার মত শক্তি জন্মায়।আর যখন প্রিয় মানুষটি একা করে চলে যায় ,তখন চোখের পলক ফেলার মত শক্তি ও ফুরিয়ে যায়।

পাখির দাফনের কাছ সম্পন্ন হয়। এঁকে এঁকে সবাই চলে যায়। শ্রাবন পাখির কবরের কাছে উপস্থিত হয়।

ধপাস করে হাঁটু ঘেরে বসে পরে। নিস্তেজ শরীর নিয়ে বিরবির করে বললো, কিভাবে পারলে আমায় রেখে চলে যেতে। কিভাবে থাকবো আমি।কি করে বাঁচবো। কষ্ট হচ্ছে যে বড্ড। সবকিছু খালি খালি লাগছে। শ্রাবন অঝরে কাঁদতে থাকে। অপূর্ব এসে জোড় করে শ্রাবন কে ঘরে নিয়ে যায়।রাত ৯ টা নাগাদ।

এলিজা ঘরের ফ্লোরে লেপ্টে বসে আছে।চোখ দিয়ে অনবরত পানি পরছে। অপূর্ব চেয়ারে বসে আছে। এলিজার চোখে পানি অপূর্ব সহ্য করতে পারছে না।

শ্রাবন ঘরের এক কোণে বসে আছে। নিজের হাতে পাখির জন্য তৈরি করা পেইন্টিং টা বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে রেখেছে ।কাপা কন্ঠে বিরবির করে বলছে কি করে পারলে

আমায় রেখে যেতে।পূ্রো পৃথিবী আজ নিস্তব্ধ। নিঃস্ব চারদিক। শ্রাবনের মুখের হাঁসি চিরদিনের জন্য চাঁপসে গেছে।

রাত বেড়ে চলেছে তবে এই রাত শেষ হবার নয়।মমতাজ শ্রাবণের ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।ছেলের নিস্তেজ মুখ,যে তার সহ্য হচ্ছে না। মমতাজ শ্রাবণের ঘরে এসে দেখলো শ্রাবন ঘরে নেই। মমতাজ

হকচকিয়ে উঠে।বাড়ির সব জায়গায় খুজলো।কোথাও শ্রাবন নেই। মমতাজ আহত কণ্ঠে বলল, কোথায় যাবে শ্রাবন। আবার আত্ম,হত্যা.... বলেই মমতাজ মুখে হাত চেপে ধরেমমতাজ শ্রাবণে কে কোথাও পেলো না।একটা টর্চ নিয়ে বাহিরে বের হয়।এদিক সেদিক পরোক্ষ করে, কোথাও নেই।রাত ঠিক ১১ টা নাগাদ।এত রাতে কাউকে কিছু না

বলে কোথায় যাবে। মমতাজ টর্চ নিয়ে সামনে এগোয়। কোথাও দেখতে পাচ্ছে না। মমতাজ ভয়ে চাপসে যাচ্ছে।বাড়ির গেট অতিক্রম করে এগিয়ে যায়। হঠাৎ চোখ পরে কবরস্থানের দিকে। মমতাজ দেখলো , শ্রাবন পাখির কবরের মাথার দিকে বসে আছে। মমতাজ মুখে হাত দিয়ে শব্দহীন ,নিরবে কেঁদে দেয়।ধিরে ধিরে শ্রাবণের দিকে এগোয়।

চারদিক অন্ধকার। আকাশে অল্প অল্প তারাদের আগমন। শ্রাবন একটা মোমবাতি নিয়ে বসে আছে পাখির কবরের কাছে। মমতাজ শ্রাবণের ভেঙ্গে পরা দেখে নিজেই, নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। শ্রাবনের কাছে এগোয়। শ্রাবণের পেছনে দাঁড়িয়ে মমতাজ।আমতা আমতা করে,কাপা ঠোঁটে বললো,এত রাতে কবরের কাছে কি করছিস?

শ্রাবন ভাঙা গলায়, মমতাজ কে হুসসসস করে ইশারা করে বললো,পাখি ঘুমোচ্ছে। কথা বোলো না। মমতাজ হকচকিয়ে উঠে।চোখ গুলো উৎফুল্ল হয়ে যায়।

মমতাজ খেয়াল করলো, শ্রাবণের হাতে থাকা মোমটা গলে গিয়ে গরম আচ গুলো শ্রাবণের হাতে পরছে। মমতাজ ভেজা কন্ঠে বললো,মোমটা ফেলে দে হাতে গলে পরছে,হাত টা

যে,পুড়ে যাবে। শ্রাবন কাপা কণ্ঠে বললো,পাখির যে , অন্ধকারে ভয় হয়’পুড়ে যাক হাত।যেখানে অন্তর পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে ‘সেখানে হাত পুড়লে কি হবে। মমতাজ জবাব দেয়ার মত কোন বাক্য পেলো না। মমতাজ এক পা -দু পা করে পেছনে সরে যায়।বিরবির করে বললো, সৃষ্টিকর্তা, আমার ছেলেকে ধৈর্য ধরার মত শক্তি দাও

শ্রাবন কবরের কাছে বসে আছে। কবরের উপরের অংশে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ।যেভাবে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়”।

শ্রাবন কাপা কণ্ঠে বললো,কত সুন্দর ভাবনা_হীন মনে ঘুমোচ্ছো। আমার জীবনের ঘুম কেড়ে নিয়ে, কিভাবে এত শান্তি তে ঘুমাতে পারছো! একটুও কষ্ট হচ্ছে না আমার জন্য!! চোখ দিয়ে অনবরত পানি পরছে।

চারদিক নিশ্চুপ। কোথাও একটা ঝিঁঝিঁ পোকার দমন ও নেই।আজ সবকিছু নিস্তেজ। সবকিছু অন্ধকার। আকাশ টা কালো মেঘে ঢেকে আছে।শ্রাবন কবরের কাছে লুটিয়ে শুয়ে পরে।ক্লান্তিময় দেহ নিয়ে ঘুমিয়ে পরে,পাখির কবরের কাছে। এলিজা পাখির ব্যবহৃত স্বর্নের কলমটি নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ।পাখির কথা ভেবেই,চোখ

দিয়ে অঝরে পানি পরছে। অপূর্ব এলিজার গা-ঘেষে দাঁড়ায়। শান্ত স্বরে বললো, তোমাকে শান্ত না দেয়ার মত কোন শব্দ নেই।পাখি আমার ও ছোট বোনের মত ছিল। খুব কষ্ট হচ্ছে। এলিজা অপূর্ব কে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কান্না শুরু করে। অপূর্বর চোখের দু ফোঁটা পানি গড়িয়ে এলিজার কপালে পরে। অপূর্ব ভাঙা গলায় বললো, আমায়

রেখে কখনো চলে যাবে নাতো! খুব ভয় যে,ম্যাডাম।আপনিহীন আমি যে একটা মুহূর্ত ভাবতে পারি না। এলিজা ফোপাচ্ছে।

অপূর্ব এলিজা কে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললো, আমাকে ছুয়ে ওয়াদা করো,কখনো আমায় ছেড়ে যাবে না! এলিজা অপূর্ব কে ছেড়ে দিয়ে ইতস্তত বোধ করে অন্য দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে।

অপূর্ব দ্বিতীয় বার,ক্লান্তি ভঙ্গিতে এলিজার হাত দুটো ধরে,কাপা কণ্ঠে বললো,ওয়াদা করো কখনো ছেড়ে যাবে না তো! এলিজা দৃষ্টি মেঝেতে স্থাপন করে বললো, না, কখনো ছেড়ে যাবো না। অপূর্ব এলিজা কে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে।

এলিজা অপূর্বর বুকের উপর মাথা রাখা অবস্থায় বললো,আমি সবসময় সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি,

আপনার আগে যেন,দুনিয়া থেকে আমাকে নিয়ে যায়।কারন, আমি আমার,চোখের সামনে আপনাকে হারানোর যন্ত্রণা যে, সহ্য করতে পারবো না।অপূর্ব শক্ত গলায় বললো, আমার কিছু হবে না।

এলিজা অহংকারী স্বরে বলল,আমি থাকতে আপনাকে কিছু হতে দেবো না।

তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় মমতাজ। অপূর্ব মমতাজ কে দেখে শান্ত স্বরে বললো,কাকি!এসো বসো।

মমতাজ কান্না জড়িত কন্ঠে বললো, শ্রাবন এত রাতেও কবরের কাছে বসে আছে। এভাবে চললে তো, শ্রাবন অসুস্থ হয়ে পরবে।তুই একটু গিয়ে দেখ, বুঝিয়ে শ্রাবন কে ঘরে আনা যায় কিনা। মমতাজ এই বলে, অপূর্বর ঘর থেকে চলে যায়। অপূর্ব

এলিজা কে বললো, তুমি অপেক্ষা করো আমি শ্রাবন কে নিয়ে আসছি। এলিজা থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্ব বুঝতে পেরেছে, এলিজা নতুন করে সেই অজানা চিন্তায় আহরন করছে। কিন্তু কি চিন্তা করছে। অপূর্ব এলিজার ভাবনা ভাঙিয়ে বললো,কি ভাবছো? এলিজা আমতা আমতা করে বলল,পাখির কথা ভাবছিলাম।মনে পরছে খুব। এভাবে

একা করে চলে যাবে, কখনো ভাবতে পারিনি।অপূর্ব চিন্তিত স্বর নিয়ে বললো,একটা কথা বলবো! যদি কিছু মনে না করো!

এলিজা ভার মুখে বললো,হুমম বলুন। আমায় কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য অনুমতি নিতে হবে না।

অপূর্ব শান্ত স্বরে বললো,তুমি তো চাইলেই পাখির চিকিৎসা করাতে পারতে!তবে করালে না কেন?

এলিজা উল্টো দিকে ঘুরে,পাখির ব্যবহৃত কলমটা টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বলল, আমি আমার পাপের রাজ্যে,কোন ভাবেই,পাখি এবং,মামি, মামাকে জড়াতে চায়নি। এবং পাখির কাছ থেকে সমস্ত কিছু লুকিয়ে রেখেছি। আমাদের আসল পরিচয় ও পাখিকে কোনদিন জানাইনি।পাখি সহ্য করতে পারতো না।রমজান মামা , যেভাবে সংসার

চালাতো,সেটা দিয়েই চলতাম।হারাম টাকা দিয়ে তাদের, প্রয়োজন মিটাতে চাইনি।

অপূর্ব কিছু বললো না। এলিজার দিকে কয়েকবার দৃষ্টি স্থাপন করে চলে যায় শ্রাবণের কাছে। অপূর্ব যেয়ে দেখলো শ্রাবন পাখির কবরের কাছে সুয়ে আছে। অপূর্ব হকচকিয়ে উঠে। অপূর্ব ধিরে ধিরে কাছে এগোয়। শ্রাবন কে ডাকবে, কিনা

ভাবছে। অপূর্ব কাপা কণ্ঠে,বিরবির করে বললো, ভালোবাসার কি নির্মম পরিহাস ‘নির্বিশ থেকে নিঃস্ব করে দেয়। শ্রাবণের আজ এমন অবস্থা দেখতে ভালো লাগছে না।তবে শ্রাবণের মত, শ্রেষ্ঠ প্রেমিক দুটো হয়না,তার প্রেমিকা বেঁচে থাকবে ৬ মাস”এটা জেনেও তাঁকে,প্রেমিকা থেকে স্ত্রী বানিয়েছে।

অপূর্ব ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্থান ত্যাগ করে।ভাবলো, শ্রাবন এখন মানসিক ভাবে ঠিক নেই।ও ওর মতো কিছু টা সময় থাকুক। সকাল হয়ে যায়।কড়া রোদের সোনালী আলোর রঙে রঙিন হয় নতুন একটি সকাল। রোদের খুব তেজ। চৈত্র মাসের শুরু,।রোদের সোনালী ঝিলিকের তেজ থাকার ই কথা। শ্রাবন পাখির কবরের কাছেই

বসে আছে। শ্রাবন যে নিঃস্ব হয়ে গেছে। শ্রাবণের প্রতিটি নিশ্বাস আড়ন্ন,বড্ড ভারী। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কবরের দিকে। শ্রাবনের আঁচরনে প্রকাশ পায়,পাখি মৃত নয়, বেঁচে আছে। মমতাজ শ্রাবণের কাছে আসে। শ্রাবন মমতাজ কে এক নজর পরোক্ষ করে। মমতাজ শান্ত স্বরে বললো,বাবা, এখন তো ঘরে চল।

গতকাল থেকে এভাবে পরে আছিস। শরীর খারাপ করবে। আমার কষ্ট টা তো, উপলব্ধি করবি।আমি যে তোর মা,তোকে এই অবস্থায় দেখতে আমার ভালো লাগছে না। বুকের ভেতর খাঁ _খাঁ করছে। শ্রাবন কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে উঠে দাঁড়ায়। মমতাজ কে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমি যাও।আমি আসছি। মমতাজ পাখির কবরের দিকে দৃষ্টি স্থাপন

করে চলে আসে। মমতাজ ভাবলো, শ্রাবণের আঁচরন স্বাভাবিক আমি যা ভেবেছি তা নয়।এলিজা ঘুম থেকে উঠে স্নানঘরে প্রবেশ করে।স্বচ্ছল হয়ে নিচে আসে। এলিজা দেখলো, জাহাঙ্গীর বৈঠকখানায় বসে বসে পেপার পরছে। জাহাঙ্গীর এলিজার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করলো। এলিজা জাহাঙ্গীর কে , ভেজা কন্ঠে বললো,চা খাবেন? জাহাঙ্গীর আর চোখে

দেখলো। হঠাৎ এলিজার নরম স্বাভাবিক আচরন, জাহাঙ্গীর কে ভাবালো। জাহাঙ্গীর ভাবনা উপেক্ষা করে বললো, চিনি কম,সাথে আদা দিও।

এলিজা রান্না করে চলে যায়। মনজুরা খেয়াল করলো, এলিজার চোখ মুখের ভাষায় কিছু লুকিয়ে আছে। মনজুরা কাট গলায় বলল,কি এমন ভাবছো! আজকাল ভাবনাতে

মশগুল থাকছো যে,। কিছু হয়েছে! নাকি পাখি চলে যাওয়ায় এমন? এলিজা কাঁপা গলায় বলল,হুমম পাখির জন্য কিছু ভালো লাগছে না। আমার এই দুনিয়াতে রক্তের বলতে কেউ রইলো না।মনজুরা বললো, এভাবে বলতে নেই।স্বামীর মত আপন কেউ হয়না।মনজুরার মুখে এরকম বাক্য শুনে, এলিজা হকচকিয়ে উঠে।ভাবনা নিয়ে

বললো,মনজু বুবু,একটা কথা বলবো? মনজুরা বলতে বললো, এলিজা বললো,এই বাড়িতে কাজ করছো অনেক বছর। তোমাদের আমরা বাহিরের বলে মনে করি না। আর তোমরাও কখন ও এমনটি মনে করো না।

মনজুরা বললো,হুমম।

এলিজা চা টা কাপে নিতে নিতে বললো, সবসময় বাড়ির সবার যত্ন

নিবে। বিশেষ করে তোমার ছোট দাদাবাবুর।তার কিন্তু হৃদরোগ আছে।তার সবকিছুর প্রতি খেয়াল রাখবে। মনজুরা এলিজার কথায় অবাক হয়। হঠাৎ এসব বলছে কেন।মনজুরা

কোন জবাব দিলো না।

এলিজা, জাহাঙ্গীর কে চা দেয়।

এলিজা ভেজা কণ্ঠে বললো,বাবা!

জাহাঙ্গীর চোখ বড় করে এলিজার দিকে তাকায়। হঠাৎ এলিজার মুখে এরকম বাক্য শুনে জাহাঙ্গীর উৎফুল্ল হয়। জাহাঙ্গীর নরম গলায় বললো,বলবে কিছু?এলিজা নত মাথায় বললো,বয়স হয়েছে আপনার। জীবনে যা হয়েছে,হয়েছে। আমি জানি অতিতের সে ,সব কিছুর জন্য আপনি অনুতপ্ত।আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

আপনার উপর আমার কোন অভিযোগ নেই। জাহাঙ্গীর ভারবহন লাঠি টা হাতে নিয়ে দাড়িয়ে যায়। এলিজার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বললো, তোমার আমার উপর কোন অভিযোগ না থাকলেও, আমার নিজের উপর নিজের,হাজার টা অভিযোগ। সারাজীবন নিজের কাছেই নিজে দোষী থাকবো।

এলিজা কিছু বললো না। জাহাঙ্গীর স্থান ত্যাগ করে।

তৎক্ষণাৎ নিচে আসে অপূর্ব। এলিজা অপূর্ব কে দেখে মৃদু হাসলো। অপূর্ব এলিজার কাছে এসে বললো,ম্যাডাম আমাকে , একবার থানাতে যেতে হচ্ছে। এলিজার দৃষ্টিতে আপত্তির ছাপ। অপূর্ব বললো,ফিরে আসবো তারাতাড়ি। এলিজা নত স্বরে বলল,আমি আপনার জন্য আপনার

পছন্দের খাবার বানিয়ে রাখবো। অপূর্ব মৃদু হেসে এলিজার কপালে চুমু খায়। অপূর্ব বাহিরে যেতেই, পেছন থেকে এলিজা কাট গলায় বলল,’আজকে একসাথে সন্ধ্যা তারা দেখতে ইচ্ছে করছে।যাবেন,আজ ও অজানা পথে!অপূর্ব এলিজার মুখে হঠাৎ এরকম কথা শুনে হকচকিয়ে উঠে। গতকাল পাখি চিরজীবনের জন্য চলে গেলো।সেই প্রভাব এত

তাঁরাতারি কেটে গেছে।যাক,শোক থেকে মুক্তি পেলেই ভালো। অপূর্ব পেছন ঘুরে এলিজার দু-কাদে হাত দিয়ে বললো, আমার মহারানি বলবে আর আমি যাবো না।আজ দ্রুত ফিরে আসবো। এবং দু'জন মিলে একসাথে,অজানা পথের বাঁকে হাঁটতে হাঁটতে, সন্ধ্যা তারা উপভোগ করবো।

অপূর্ব থানার উদ্দেশ্য বের হয়। অপূর্বর চিন্তা বেড়ে চলেছে। এলিজার হঠাৎ এরকম আচরণ কেন করছে!

কি চাইছে এলিজা!নাকি ,পাপের সম্রাজ্য ছেড়ে আসায় এমন করছে! সত্যিই কি সবকিছু ছেড়ে এসেছে,নাকি গহিন আরহনে নতুন ভাবনা এটে রেখেছে!

অপূর্ব অস্থিরতা অনুভব করলো।,কোন প্রশ্নের ব্যাখ্যা মিলছে না।মমতাজ সকালের ফজরের নামাজ পরে জায়নামাজ থেকে আর ওঠেনি। নামাজে বসে কাঁদছে। শ্রাবন এর ফ্যাকাশে মুখ,ক্লান্তি চোখ, নিস্তেজ শরীর দেখতে পারছে না। ছেলের এরকম করুন অবস্থা মা হয়ে সহ্য করার মত নয়।

শ্রাবন ঘরের এক কোণে ঘাপটি মেরে বসে আছে।হাতে পাখির ছবি। পাখির ফেলে যাওয়া স্মৃতির পাতায় নিজেকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পাখির বলা প্রতিটি বাক্য , চারদিকে ঘুরে বেড়ায়।কানের কাছে ভেসে আসছে পাখির বলা মিষ্টিমধুর শব্দ গুলো। শ্রাবন কোন ভাবেই নিজের মন কে শক্ত করতে পারছে না। পাখির ছবিটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে

অঝরে কাঁদছে। ভাঙা গলায় বার বার বলছে,পাখি কিভাবে থাকবো আমি তোমায় ছাড়া।কি করে বাঁচবো, নিঃশ্বাস টা যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শ্রাবন এর বুক ফাটা কান্নায় থমকে যাচ্ছে চারদিক। নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে সবকিছু।মমতাজ শ্রাবণের ঘরের বাহিরে দাড়িয়ে। শ্রাবণের কান্নার আওয়াজ তার কানে ভেসে আসছে। মমতাজ হাতের উল্টো দিক দিয়ে

চোখের পানি মুছে ।ধির পায়ে শ্রাবণের ঘরে প্রবেশ করে। খাটের সাথে হেলান দিয়ে, মেঝেতে লুটিয়ে বসে আছে শ্রাবন। মমতাজ ভাঙা গলায় বললো,বাবা! শ্রাবন কোন সাড়া দিচ্ছে না। মমতাজ শ্রাবণের শরীরে স্পর্শ করে বললো,তোর বেদনা আমি উপলব্ধি করতে পারছি। কিন্তু এভাবে কাঁদলে যে,পাখি মায়ের আত্মা কষ্ট পাবে।মৃত

ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে হয়।তুই চাস না ,পাখি পরপারে ভালো থাকুন। শ্রাবন ঘার সোজা করে বসে। হাতের তালু দিয়ে চোখ মুছে। মমতাজ পরোখ করলো, শ্রাবণের চোখের কার্নিশে কার্নিশে রক্তের দানা ভেসে উঠছে। মমতাজ শ্রাবণের মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, গোসল করে নিজেকে স্বচ্ছল কর। জোহরের আজান দিলেই, নামাজ আদায়

করবি। মসজিদ শান্তির জায়গা। সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজের ভেতরের বেদনা গুলো প্রকাশ করবি।পাখি মায়ের জন্য দোয়া করবি।পাখির আত্মাও শান্তি পাবে,আর তোর মনেও শান্তি অনুভব হবে। মায়ের কথা শুনতে হয়।যা, গোসল করে স্বচ্ছল হয়ে-নে। শ্রাবন ভাঙা গলায় বললো,মা আমার যে খুব কষ্ট হচ্ছে। ভেতরটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।কোন

ভাবেই শান্তি পাচ্ছি না। মমতাজ শ্রাবণের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। এখন আমি যা বলেছি তাই কর।

শ্রাবন মায়ের কথা মত গোসল করে। আলমারি থেকে পাঞ্জাবি বের পরে নেয়। শ্রাবন ঘরের চারদিকে বারবার পরোখ করছে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পাখির স্মৃতি।

শ্রাবন নিজের মনকে শক্ত করে মসজিদ এর উদ্দেশ্য বের হয়।

এলিজা রান্নাঘর থেকে শ্রাবণের যাওয়ার পানে- পরোখ করে।

এলিজা অপূর্বর সমস্ত পছন্দের খাবার তৈরি করে। এলিজার চোখ থেকে বিন্দু বিন্দু চোখের পানি গড়িয়ে পরছে।মনজুরা খেয়াল করলো। ভাঙ্গা গলায় বললো, বউমনি কি হয়েছে তোমার গত-দু-

তিন ধরে তোমার মুখের ভাষায় কিছু একটা প্রকাশ পাচ্ছে।কি হয়েছে তোমার? এলিজা মৃদু হেসে বললো,পাখির জন্য ভালো লাগছে না কিছু।মনজুরা এলিজার জবাবে সত্যতা পেলো না।মনজুরা ভাবনা উপেক্ষা করে বললো, হঠাৎ করে দাদাবাবুর জন্য এত এত পছন্দের খাবার তৈরি করছো!! এলিজা নত স্বরে বলল, আমার হাতের রান্না উনি

ভিষন পছন্দ করেন। এভাবে মাঝেসাঝে তার পছন্দের খাবার গুলো তৈরি করে দিবে।

আচ্ছা শোনো, তুমি এদিক টা দেখো।আমি গোসল করে আসছি, কেমন!বলেই এলিজা নিজের ঘরে চলে যায়।

মনজুরা এলিজার যাওয়ার পানে চেয়ে চেয়ে দেখলো। এলিজার অদ্ভুত আচরণ মনজুরা কে ভাবালো।

এলিজা গোসল শেষ করে, অপূর্বর পছন্দের রঙের শাড়ি পরে। অপূর্বর মিষ্টি রঙ পছন্দের।তার সাথে চুল গুলো বেনুনি। ছোট করে কপালে টিপ পরেছে।এলিজা তৈরি হয়ে নিচে আসে। রান্না ঘরে যেতেই চোখে পরে ,বাহিরে। বায়েজিদ বসে বসে কাঠ কাটছে। এলিজা বায়েজিদ এর কাছে আসে। বায়েজিদ এলিজা কে

দেখেই মৃদু হাসলো। শান্ত স্বরে বললো,আপা!
এলিজা মৃদু হেসে বললো, আজকে ভালোমন্দ, অনেক কিছু রান্না করেছি। তোকে কিছুক্ষণ_পর পাঠিয়ে দেবো। বায়েজিদ অমৃদু হাঁসি দিয়ে বলল,আপা তুমি আর বাবর রাজ্যে যাবে না?
এলিজা মুখের রঙ বদলে ফেলে। কাপা কণ্ঠে বললো,আমি আর

কোনদিন যাবো না।আর তুই ও এই বাড়ি ছেড়ে কোনদিন কোথাও যাবি না। ছোট দাদাবাবুর সাথে থাকবে। বায়েজিদ ভ্রু কুঁচকে দেয়।

এলিজা ঘরে চলে আসে।এক প্রহর দুই প্রহর কেটে যায় অনেক প্রহর। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে যায়। এলিজা না খেয়ে অপূর্বর জন্য অপেক্ষা করছে।এখনো আসছে না। এলিজা বৈঠকখানায় পায়চারি করতে

থাকে। তৎক্ষণাৎ জাহাঙ্গীর উপর তলা থেকে বললো, অপূর্ব ফিরেনি? এলিজা না সূচক মাথা নাড়ে। জাহাঙ্গীর শান্ত স্বরে বললো, আমার ঘরে পানি নেই।খুব পিপাসা পেয়েছে।মনজুরাকেও দেখছি না। এলিজা নত স্বরে বলল,আমি নিয়ে আসছি।

এলিজা পানি নিয়ে জাহাঙ্গীর এর ঘরে উপস্থিত হয়। জাহাঙ্গীর

বারান্দায় উল্টো ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে। এলিজা পানির জগ টা টেবিলের উপর রাখে। জাহাঙ্গীর আড় চোখে পরোক্ষ করলো। এলিজা চলে আসতেই থমকে দাঁড়ায়, জাহাঙ্গীর কে উদ্দেশ্য করে বললো,একটা কথা বলবো? জাহাঙ্গীর চেয়ারে উপর বসে বললো,বলো।

এলিজা ভাঙা গলায় বললো, আপনার ছেলে আপনাকে খুব ভালোবাসে।

বাবা ছেলে একসাথে ,সবসময় ভালো থাকবেন। ভালো থাকার চেষ্টা করবেন। আম্মার জন্য,মন খারাপ করবেন না।,পরপারে সে ভালো আছে। জাহাঙ্গীর আড় চোখে এলিজাকে পরোখ করলো। হঠাৎ এরকম আচরণ, এবং তার সাথে বলা বাক্য গুলো ভারী অদ্ভুত। জাহাঙ্গীর শান্ত স্বরে বললো, এগুলো বলছো কেন!এলিজা বললো, কখনো

বলা হয়নি।তাই বললাম।আর আপনার উপর আমার কোন অভিযোগ নেই।এলিজা জাহাঙ্গীর এর ঘর থেকে চলে আসে। বৈঠকখানায় বসে বসে অপূর্বর জন্য অপেক্ষা করছে। হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখের পানি মুছলো।মনজুরা নিজের ঘর থেকে পরোখ করলো।

তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় অপূর্ব। অপূর্ব এসেই এলিজা কে পেছন থেকে

জড়িয়ে ধরে। এলিজা হকচকিয়ে উঠে। অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, আমার জন্য অপেক্ষা করছো বুঝি। এলিজা মৃদু হেসে হ্যা সুচক মাথা নাড়ে। অপূর্বর বা হাত পেছনে,ডান হাত এলিজার কাদের উপর। এলিজা ঘুরে বসে বললো,হাতে লুকিয়ে রেখেছেন কি? অপূর্ব ভাবনা নিয়ে বললো,কি লুকিয়ে রেখেছি, আন্দাজ করো তো! এলিজা উঁকি

মেরে দেখল,বললো, হেঁয়ালি করবেন না।অপূর্ব হাত টা সামনে আনতেই, এলিজা চোখ দুটো বড় বড় করে বললো,বেলিফুল! অপূর্ব মৃদু হেসে বলল ,আমার মহারানি বলেছে, আজকে আমার পছন্দের খাবার তৈরি করবে। এবার তারজন্য তো, উপহার আনতেই হতো। এলিজা মৃদু হাসলো। অপূর্ব বেলি ফুলের মালা টা,পরিয়ে দেয় । এলিজা বেলিফুলের

মালা টা আলতো হাতে স্পর্শ করলো। অপূর্ব খেয়াল করলো, এলিজার চোখে পানি। অপূর্ব এলিজা কে জড়িয়ে ধরে বললো, চোঁখে পানি কেন?কি হয় আজকাল তোমার? কোনো কিছুর,ব্যাখা মিলছে না।বলো আমাকে! কষ্ট ভাগ করে নেই!এলিজা অপূর্বর হাত সরিয়ে শান্ত স্বরে বললো, জীবনটাই একটা রহস্যময়,প্রতিটি পদক্ষেপে থাকে

রহস্য,যার ব্যাখা আমরা কেউ জানি না। অপূর্ব এলিজার ভাবনা উপেক্ষা করে মৃদু হেসে বললো, ম্যাডাম, সারাদিন কিছু খাইনি। তোমার হাতে রান্না খাওয়ার জন্য যে, ছটফট করছি,আর তুমি অজানা ভাবনায় বিভোর।

অপূর্ব খাবার টেবিলে বসে। এলিজা খাবার দেয়। অপূর্ব এলিজার দিকে পরোক্ষ করলো,তার পছন্দের রঙের

শাড়ি পরেছে।চুল গুলো বেনুনি করা,মায়াবী চোখ,ভি-কার থুতনি, চিকচিক করছে ঠোঁটের দর্পন। অপূর্ব অপলকে দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে। এলিজা আড় চোখে দেখে বললো,কি দেখছেন? অপূর্ব মৃদু হেসে বললো, আমার নিজস্ব পরীকে আমি দেখছি। অপূর্ব টেবিলের দিকে পরোক্ষ করলো।তার সব পছন্দের খাবার সাজানো। অপূর্ব হাত ঘেঁষে,বললো,

লোভনীয়।বাড়ির সকলে খেয়েছে? এলিজা অপূর্বর পাশে গিয়ে বসে বললো, সবাই খেয়েছে।শ্রাবন খায়নি। জোহরের নামাজ পরে,এসে থেকে ই ঘরের মধ্যে।আর বের হয়নি।

অপূর্ব খাবার মাখাতে মাখাতে বললো, তুমি ও তো খাওনি।সেটা বললে না। এলিজা মৃদু হাসলো।

অপূর্ব নিজ হাতে এলিজা কে খাইয়ে দেয়। এলিজা জ্বলজ্বল চোখে অপূর্ব কে পরোক্ষ করছে। মায়াভরা কণ্ঠে,বিরবির করে বললো, আপনার দাগহীন অঙ্গে,আমি কোনদিন চুলের দর্পন ও লাগতে দিবো না। অপূর্ব কথাটি শুনে নেয়। এলিজার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো, তোমার মত সাহসী স্ত্রী থাকলে , কিভাবে আমার দেহে দাগ পরবে।কেউ,

আমার দিকে তেরে আসলে, তুমি তাকে ভস্য করে দিবে।কারন,`আর কেউ না জানুক,আমি তো জানি আমার বউটা কত সাহসী!এলিজা আওয়াজ করে হেসে বললো, আপনি না!

রাত বেড়ে চলেছে। চারদিকে তারাদের আনাগোনা। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত চারদিক। নিস্তব্ধ পরিবেশ।শান্তশীরে কিছুটা মেঘ

চাঁদের গা-ঘেষে উড়ে যাচ্ছে। চৈত্র মাসের শুরু, কিন্তু এখনো শীতল হাওয়ার হাতছানি।

অপূর্ব ,এলিজা, দু'জনে হাঁটতে বের হয়। হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় অনেক দূর। অপূর্ব এটা সেটা,থানাতে কি হয়েছে,কে কোন কেস নিয়ে এসেছে ব্লা ব্লা অনেক কথা বলছে। এলিজা অপলকে অপূর্বর দিকে দেখছে। মনে মনে ভাবছে, আমার পাশে

থাকা মানুষ টি কতটা মায়াবী । যার,জোড়াশয় ভ্রুর দর্পনে বারবার হারিয়ে যাই আমি।

অপূর্ব হাতে তুরি দিয়ে এলিজার ভাবনা ভাঙিয়ে দেয়।বললো,কি ভাবছো ম্যাডাম? এলিজা মৃদু হেসে না সূচক মাথা নাড়ে।চাঁদনী রাতের ভরাকান্ত জোনাকির দর্পন দু'জনে উপভোগ করলো।

রাত বেড়ে চলেছে। অপূর্ব এলিজা , দুজনে ঘরে ফিরে আসে। অপূর্ব এলিজার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করলো,এলিজা কোন ভাবনাতে মশগুল।কোন অজানা ভাবনাতে তাকে একাকার করে দিচ্ছে। কিন্তু কি!

অপূর্ব এসব ভাবতেই, এলিজা বললো,সুয়ে পরুন।রাত অনেক হয়েছে।

অপূর্ব সোয়।এলিজা অপূর্বর বুক পাঁজরে মাথা রেখে বললো, আপনার বুক পাঁজর আমার শান্তির স্থান। সমস্ত ক্লান্তি ভাবনা সব দূর হয়ে যায়,যখনই আপনার স্পর্শ পাই। অপূর্ব এলিজার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললো, ম্যাডাম আপনি ও যে আমার অনন্ত সুখ।

শ্রাবন হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে দাড়িয়ে আছে পাখির কবরের কাছে।

ভাঙা গলায় বললো,ফিরে আসো না!
কি করে থাকবো,। তুমিহীনা বেঁচে থাকা যে,বড্ড কঠিন হয়ে যাচ্ছে।
শ্রাবন কবরের কাছে লুটিয়ে সুয়ে পড়ে।
পরদিন সকাল বেলা—-কষ্ট জড়িত হৃদয়ের,ভার বহনে বহনে রাত ফুরিয়ে দিনের আলো ফুটে।
পাখিদের কিচিরমিচির আওয়াজ।
কড়া রোদের সোনালী ঝিলিকের

আলো এসে অপূর্বর চোখে। অপূর্ব চোখ মেলে দেখলো এলিজা পাশে নেই। অপূর্ব বিছানার এপাশ ওপাশ করলো।চোখ পরিষ্কার করতে করতে নিচে আসে।ভাবলো এলিজা রান্না ঘরে। অপূর্ব পরোখ করে দেখলো সেখানেও নেই। অপূর্ব এদিক সেদিক পরোক্ষ করলে কোথাও এলিজা নেই। অপূর্ব অস্থিরতা নিয়ে মনজুরা কে জিজ্ঞেস করলো,এলিজা

কোথায়?মনজুরা বললো, সকাল থেকে দেখিনি। অপূর্ব দ্রুত পায়ে জাহাঙ্গীর এর ঘরে যায় ।সেখানেও নেই। অপূর্ব বাড়ির প্রতিটি কোনায় কোনায় দেখলো, কোথাও নেই। অপূর্বর বুকের ভেতর তোলপাড় শুরু হয় যায়। কোথায় যাবে।আমায় কিছু না বলে তো কোথাও যায়না,আজ কোথায় যাবে! কোথায়

এলিজা?....আজকের তারিখ ১৫ মার্চ ২০০০..

অপূর্বর বুকের ভেতর কুহ ডাকতে শুরু করে। বুকের ভেতর ধুকবুকানি বেড়ে চলেছে। অপূর্ব বিষিন্নত হয়ে ওঠে।

। তৎক্ষণাৎ ল্যান্ডলাইনে ফোন বেজে ওঠে। অপূর্ব হইহুস্মুর খেয়ে উঠলো। কাঁপা হাতে ফোনটা তুললে, ওপাশ থেকে একজন কনস্টেবল

বললো,স্যার দীগন্ত নদীতে দুটো লাশ পাওয়া গেছে। তদন্ত অনুযায়ী জানা যায়, তাদের মৃত্যুর বয়স তিনদিন। অপূর্ব কাপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, তাদের পরিচয়?ওপাশ থেকে বললো, একজনের নাম চীপস ডুপিয়ালি এবং ডাঃ ইব্রাহিম। অপূর্বর হাত থেকে চট করে ফোন টা পরে যায়।চীপস ডুপিয়ালি এবং ডাঃ ইব্রাহিম কে ,কে মেরেছে!তাও ৩

দিন হয়। অপূর্ব দ্রুত পায়ে বাহিরে বের হয়।থানার উদ্দেশ্য বের হতেই, সামনে পরে একজন কনস্টেবল। অপূর্ব থমকে দাঁড়ায়। কনস্টেবল হাঁপাতে হাঁপাতে এগোয়। অপূর্বর সামনে এসে দাঁড়ায়।ইনি নতুন পুলিশে যোগদান করছে। অপূর্ব আহত চোখে বললো,কি হয়েছে এভাবে ছুটে এলেন কেন? কনস্টেবল হাঁপাতে হাঁপাতে,কাপা

কণ্ঠে বললো,স্যার আমরা দীর্ঘদিন ধরে যে,সিরিয়াল কি,লার কে খুঁজেছি সে নিজে এসেই ধরা দিয়েছে। অপূর্ব ছিটকে দু-কদম পেছনে স্বরে যায়। অপূর্বর চোখ গুলো ছানাবড়া হয়ে যায়। হৃদয়ের স্পন্দন ধিরে ধিরে বন্ধ হয়ে যায়। অপূর্ব আতংক স্বরে বলল, কিহ কোথায় উনি?আর উনি মহিলা না লোক? কনস্টেবল ঢেক গিলে বললো,মহিলা। অপূর্ব

নিমিষেই থমকে যায়।সময় না নিয়ে অপূর্ব দ্রুত পায়ে দৌড়াতে শুরু করে। কনস্টেবল পেছন পেছন দৌড়ে বললো স্যার,গাড়ি তে চলেন। দৌড়ে যাচ্ছেন কেন? অপূর্ব কি করবে বুঝতে পারলো না।দ্রুত পায়ে গাড়িতে উঠে। কনস্টেবল গাড়িতে উঠার আগেই, অপূর্ব গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পরে। অপূর্ব বার বার ঢেক গিলতে থাকে।গলা শুকিয়ে

একাকার। শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস টা বন্ধ হয়ে আসছে। অপূর্ব কাঁপা ঠোঁটে বললো,এটা তুমি কি করলে। অপূর্বর চোখ মুখে আতংক। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে।দিনের রোদ কড়া অথচ সবকিছু ধোঁয়াসা লাগছে। অপূর্ব কিছুক্ষণ এর মধ্যে পৌছে যায় থানাতে।থানাতে কেউ নেই। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় একজন

কনস্টেবল বললো,স্যার আমরা যে কি,লার কে, খুঁজছিলাম,২৭ বছরের ছেলেদের হত্যা,র পেছনে যে ছিল। সে আজ নিজেই আত্মসমর্পণ করেছে। অপূর্ব কনস্টেবল এর দুই স্বিনাতে শক্ত করে হাত দিয়ে বললো, কোথায় সে, কোথায়? কনস্টেবল বললো,ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে।

অপূর্ব সম্পূর্ণ ভাবে বিষিন্নত হয়ে যায়। নিস্তেজ হয়ে যায়। থমকে যাচ্ছে চারদিক। অপূর্ব গাড়িতে উঠে রওনা হয়,ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশ্যে। বারবার রক্তমাখা চোখে বিরবির করে বলছে,এটা তুমি কি করলে!আমি তো পাপীটাকে নিয়েই থাকতে চেয়েছিলাম।তবে এরকম করলে কেন।গাড়ি এসে থামে,ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে। অপূর্ব

দেখলো, ইতিমধ্যে হাজার ও মানুষ ভির করেছে। সৃষ্টি হয়েছে কো'লাহল।কেউ কেউ দৌড়ে দৌড়ে আসছে। কিছু শব্দ কানে ভেসে আসছে।কেউ কেউ বলছে,এত বছর লেগেছে এই মারাত্মক,কিলা,র কে ধরতে।কেউ কেউ পাশ থেকে বলছে আমার ২৭ বছরের ছেলেটাকেও এই হায়,না বাঁচতে দেয়নি। অপূর্বর শ্রবন শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে। ক্ষতবিক্ষত হয়ে

যাচ্ছে হৃদয়। অপূর্ব ধির পায়ে হেঁটে কারাগারের সামনে এগোয়। হাজার হাজার মানুষ ভির করেছে। অপূর্বর বুকের ভেতর সুনামির মতো প্রবনতা শুরু হয়। সামনে এগোতেই সামনে পরে ,ডিসি সাহেব। অপূর্বর কথা বলার ক্ষমতা নিমিষেই হ্রাস পায়। ডিসি সাহেব অপূর্বর কাছে আসে। কাঁপা কন্ঠে বললো, পরিস্থিতি হাতের বাহিরে চলে গেছে। আইনমন্ত্রী

তোফায়েল আহমেদ,উনি কিছুক্ষণ এর মধ্যে ই , আদালতে হাজির করতে বলেছে। অপূর্বর চোখ দিয়ে বিন্দু বিন্দু পানি পরছে।

ডিসি সাহেব, আমতা আমতা করে বলল,আমি চিনতে পেরেছি, এলিজা হচ্ছে মালাইকা।ডিসি সাহেবের দৃষ্টি সংযত।ডিসি সাহেব অপূর্বর কাদে শান্তনা মূলক হাত দিয়ে বললো,দ্রুত একজন উঁকিল ঠিক করো।যদিও

চেষ্টা করে কিছু হবে না।তবুও... অপূর্ব নিজের কান কে বিশ্বাস করতে পারছে না।কি শুনছে এসব। চারদিক কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। অপূর্ব ডিসি সাহেব কে, উপেক্ষা করে ভেতরে প্রবেশ করে। কারাগারের ভেতরে প্রবেশ করতেই, দেখে বা দিকের লকাবের ভেতর তার প্রিয়তমা স্ত্রী দাড়িয়ে আছে। এলিজা উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে

আছে।পরনে সাদা কাপড়।আচল টা অনেক বড়।চুল গুলো ছেড়ে দেয়া। হাতে হাতকড়া,গলাতে শিকল। অপূর্ব থমকে যায়।গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অপূর্ব মনে মনে বললো, এটা হতে পারে না,সবকিছু দুঃস্বপ্ন হয়ে যাক। অপূর্ব লকাবের দিকে এগোয়।কি বলবে বুঝতে পারলো না।কন্ঠনালী থেকে কথা বলার স্বর

বের হচ্ছে না। বুকের ভেতর ধুকবুকানি টা বেড়েই চলেছে। অপূর্ব কাপা কণ্ঠে বললো, এলিজা — এলিজা হকচকিয়ে উঠে। এলিজা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্ব ভাঙা গলায় বললো,ঐ ম্যাডাম, তুমি কেন করলে এমনটা ,কেন করলে? ঘুরে তাকাও, আমার দিকে ঘুরে তাকাও, জবাব দাও। এলিজা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এলিজা অপূর্বর

দিকে ঘুরে তাকাচ্ছে না। অপূর্বর বলা বাক্য গঠন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।কি বলবে বুঝতে পারছে না। অপূর্বর চোখ দিয়ে অনবরত পানি পরছে । বারবার থমকে যাচ্ছে হৃদয়।নীলাকার আকাশ টা ভেঙ্গে পরছে। অপূর্বর কোন কথার জবাব দিলো না এলিজা। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় দু'জন অফিসার। অপূর্ব কে উদ্দেশ্য করে বললো,মি.অপূর্ব

ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনাকে সবাই ছিঃ ছিঃ করছে। একজন দায়িত্ববান পুলিশ অফিসার হয়ে, কিভাবে পারলেন একজন কিলা,র কে নিজের ঘরের স্ত্রী করতে! এবং সেই অপরাধী কে দিনের পর দিন,আশ্রয় দিয়েছেন। অপূর্ব জবাব দেয়ার মত শব্দ পেলো না। অপূর্ব কাকুতি মিনতি করে বললো, একটাবার আমায় এলিজার সাথে কথা বলতে

দিন, একটাবার!কর্কট মেজাজে অফিসার দুজন বললো, কখনোই না। কনস্টেবল ডেকে বললো, আইনমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ,এলিজা কে নিয়ে ১১ ঘটিকায় আদালতে হাজির হতে বলেছে।তোমরা এখনই নিয়ে চলো। চারজন মহিলা কনস্টেবল এসে এলিজা কে লকাব থেকে বের করে। অপূর্ব এলিজা কে কিছু বলার চেষ্টা

করবে,ঠিক তখনই তিনজন কনস্টেবল অপূর্ব কে ধরে ফেলে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় কমিশনার। কমিশনার অপূর্বর উদ্দেশ্য বললো, অপূর্ব কে, আসামি এলিজার আশেপাশে ও আসতে দিবেন না। অপূর্ব কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো, একটা বার আমায় এলিজার সাথে কথা বলতে দিন।একটা বার।

এলিজা ভাব ভঙ্গিমা দেখে মনে হচ্ছে অপূর্বর কোন কথা সে শুনছেই না। অপূর্বর কোন বাক্য, হাহা,কার এলিজার কানে পৌঁছাচ্ছে না।। এলিজা কে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা হাইকোর্টে। অপূর্ব পেছন থেকে জোর গলায় চিৎকার দিয়ে বললো,ম্যাডাম, আমার কথা শুনুন ম্যাডাম।কেন করলে এমন?অপূর্ব ধিরে ধিরে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে।

শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র আচরে পরছে। অপূর্ব হাঁটু গেড়ে বসে পরে।কাপা কণ্ঠে বললো,এটা তুমি কি করলে!কেন এমন করলে!আমি অপরাধীটা _ কে নিয়েই সারাজীবন থাকতে চেয়েছি। কেন এরকম করলে। এলিজা কে লকাব থেকে কারাগারের সামনে নিয়ে আসা হয়। চারদিক দিয়ে কোলাহল এর নির্মম বাক্য গুলো

ভেসে আসছে।কেউ ইটের টুকরা,পাথর ছুরে মারছে।কেউ কেউ চিৎকার দিয়ে বলছে,কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি দেয়া হোক। এলিজার কোন উত্তেজনা নেই। এলিজা কে পুলিশ গাড়িতে বসানো হয়।পাশে বসা ছয় -জন মহিলা কনস্টেবল।সামনে বসা কমিশনার। একজন মহিলা কনস্টেবল পরোখ করলো, এলিজা মিটিমিটি হাসছে।

মহিলা কনস্টেবল,ভয়ে চাপসে যাচ্ছে।এত সাংঘা,তিক কি করে হতে পারে। দেশের সমস্ত মানুষ তাকে সাজা দেয়ার জন্য ওত পেতে আছে।আর সে হাসছে। মহিলাটি দৃষ্টি সরিয়ে নেয়।অপূর্ব মেঝে থেকে উঠে দাড়ায়। কোথায় যাবে কি করবে কিছু বুঝতে পারলো না। হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখের পানি মুছে, হাইকোর্টের উদ্দেশ্যে

রওনা হয়। তৎক্ষণাৎ সামনে পরে ডিসি সাহেব,বললো, একজন উঁকিল পেয়েছি, মোটামুটি সবকিছু বলেছি। আমরা ওনাকে নিয়ে যাই।যেখানে এলিজা নিজেই স্বীকারোক্তি দিয়েছে সেখানে কিছু করা যাবে না।তবুও চেষ্টা করে দেখি।

অপূর্ব ডিসি সাহেব এর কথা মত তাই করলো।রওনা হয় হাইকোর্ট এর উদ্দেশ্যে। সমস্ত ঢাকার শহরের

মানুষ ছোটাছুটি করছে।এত বছরের ব্যাবধানে ,সেই সাংঘাতি,ক সাইকো কি,লার কে খুঁজে পেয়েছে।সবাই একটা নজর দেখার জন্য ছুটছে।

অপূর্ব ঘামছে। নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। চারদিক কোলা,হলে আচ্ছন্ন । কিন্তু অপূর্বর কাছে সবকিছু শুনশান মনে হচ্ছে।কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।কি হবে না হবে,এসব ভেবেই ,ভেতরের কম্পন টা বেড়ে চলেছে।

অপূর্ব বারবার বিড়বিড় করে বলছে, সবকিছু দুঃস্বপ্ন হয়ে যাক।আর ঘুমটা এখনি ভেঙ্গে যাক।গাড়ি এসে থামে ঢাকা হাইকোর্টের সামনে। সমস্ত পুলিশ বেরিগেট দিয়ে রেখেছে । চারপাশে ভির করেছে হাজার ও মানুষ। আদালত এই অপরাধের কি রায় দিবে সবাই তা শোনার জন্য বেকুল।

অপূর্ব গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে ভেতরে যেতেই, কিছু অফিসার আটকে দেয়। অপূর্ব কাপা কণ্ঠে বললো,আমাকে যেতে দিন। আটকাচ্ছেন কেন।ভেতরে যেতে দিন না,দয়াকরে যেতে দিন।

অফিসার রা বললো,ভেতরে আইনমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ আছেন।উনি আপনাকে যেতে বারন করেছে। কোনভাবে আপনি ভেতরে

যেতে পারবেন না। অপূর্ব তাদের সাথে কিছুক্ষণ লরিঝাপটা করলো। তবুও ভেতরে যেতে পারলো না। অপূর্ব নিস্তেজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডিসি সাহেব তার ঠিক করা উকিল কে নিয়ে হাইকোর্টের ভেতরে চলে যায়।

আইনমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেছেন আদালতের কার্যক্রম দ্রুত

শেষ করতে ।সেই অনুযায়ী সবকিছু হচ্ছে।

সকাল ১১:০০ ঘটিকা।শুরু হয় আদালতের কার্যক্রম।এলিজা কে দাড় করিয়ে দেয়া হয় , কাঠগড়ায়। আদালতে উপস্থিত হয়, সাধারণ কিছু মানুষ ।সবাই আতংকিত হয়ে দেখছে।সবাই ফিসফিস করছে। বাহিরে থাকা সবার কোলাহল ভেসে আসছে। একজন বয়স্ক মহিলা

ঘৃনিত কণ্ঠে বলে উঠলো,এই সেই ডাইনি,এই ডাইনি আমার ছেলেটাকে বাঁচতে দেয়নি।খালি করেছে আমার বুকটাকে।

জজ, অর্ডার অর্ডার বলে,চুপ নির্দেশক ইঙ্গিত করলো।সবাই শান্ত হয়ে বসলো। উপস্থিত হয় আইনজীবী তোফায়েল আহমেদ। তোফায়েল আহমেদ,কোন কেসে আজ পর্যন্ত আদালতে উপস্থিত

হননি। কিন্তু আজ সে উপস্থিত। উপস্থিত কমিশনার,এসপি সহ সকলে।জজ এলিজার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করলো।চুল গুলো এলোমেলো।দু হাতে হাতকড়া,গলাতে শিকল।পরনে সাদা কাপড়। এলিজার ভেতরে কোন ভয় ভিতী কাজ করছে না।জজ,অবাক হয়,সে এত। বড় অপরাধি হয়েও ,কেন নিজেই দোষ শিকার করলো।

পাপের অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে নাকি অন্য কোন রহস্য।জজ ভাবনা উপেক্ষা করলো।

জজ বললো, আদালতের কার্যক্রম শুরু করা হোক।

উকিল আশরাফ বলতে শুরু করলো, মিলট গত নয় বছর আমরা যে কি,লার কে খুঁজেছি সে এই মুহূর্তে আমাদের সামনে। একের পর এক নির্মম হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে আসামি

এলিজা।১৯৯২ সাল,৪ঠ অক্টোবর প্রথম ২৭ বছর বয়সী খলিল এর লা,শ পাওয়া যায় দীগন্ত নদীতে। ময়নাত,দন্তের পর জানা যায়,তার শরীর থেকে হার্ট বের করা হয়। যার প্রমান পত্র আপনার কাছে পেশ করছি। উকিল মেডিক্যাল রিপোর্ট সহ সবকিছু জজ কে দেখায়।

উকিল আশরাফ আবার বলতে শুরু করলো,খলিল পর্যন্ত ই থেমে

থাকেনি এই নির্মম হত্যা,কান্ড। এরপর থেকে শুরু হয় একের পর এক নিরীহ মানুষদের নিয়ে মৃত্যু খেলা। এই পর্যন্ত আমরা হৃদয়হীন লা,শ পেয়েছি ৪০ টা। তাদের কারো শরীরে হার্ট ছিল না। কেননা,তাদের হার্ট গুলো, বিদেশ পাচার হতো। এবং সেই টাকা মানবসেবা নামক প্রতিষ্ঠানে দান করা হতো।যার প্রমানপত্র আপনার কাছে পেশ

করছি। উকিল প্রমানপত্র জজের কাছে দেয়।জজ দেখলো। আইনমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, এলিজার দিকে পরোক্ষ করলো, মনে মনে বললো,ডেঞ্জারাস।

উকিল আশরাফ আবার বলতে শুরু করলো, মিলট,শুধু ২৭ বছরের ছেলেদের হ,ত্যা করা হতো, এবং তাদের শরীর থেকে হার্ট বের করা হতো শুধু তাই নয়, এদের সাথে

হ,ত্যা করা হতো, সদ্য বিয়ে ঠিক হওয়া কনেদের। গত নয় বছর ধরে আসামি এলিজা খেলছিল এই নির্মম মৃ,ত্যু খেলা। আসামি এলিজা, তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সমস্ত কিছুর পেছনে তার ই হাত।তার গ্যাং এর কথা জিজ্ঞেস করলে উনি বলেন,তার গ্যাং এ দু-জন ছিল। এবং তাদের দুজনকে ৩ দিন আগে আসামি এলিজা নিজেই হ,ত্যা

করেছে।তথ্য অনুযায়ী একজনের পরিচয়,ভিন্ন দেশের নাগরিক চীপস ডুপিয়ালি। এবং ডাঃ ইব্রাহিম।যাদের ফরেন্সিক রিপোর্ট আপনার কাছে পেশ করা হয়েছে।

মিলট, সমস্ত প্রমান এবং আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ সব কিছু বিশ্লেষণ করা হয়েছে।মিলট আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

এলিজা ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। একবার চোখ তুলে পর্যন্ত দেখেনি। সবাই এলিজার দিকে ঘৃণিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।বাহিরে হাজার ও মানুষ কোলাহ,ল সৃষ্টি করছে। কখন আদালত তার রায় ঘোষণা করবেন। জজ ,বললো, আসামির পক্ষে কোন উকিল নেই? তৎক্ষণাৎ ডিসি সাহেব এর ঠিক করা উকিল কিছু বলার জন্য দাড়ায়।তিনি কিছু বলার

আগেই, এলিজা কাট গলায় বললো,আমি অপরাধী,আমি খু,নি, আমাকে শাস্তি দিন। আমার পক্ষে কোন উকিল এর দরকার নেই।

আদালতে উপস্থিত থাকা সমস্ত মানুষ হকচকিয়ে উঠে।কানা ফিসফিস শুরু করে। আইনমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ,এর ম্যানেজার , তোফায়েল এর কানে ফিসফিস করে বলল,স্যার,কতটা সাহসী,কতটা

মারাত্মক খুনি।কি করে ধরলেন একে? তোফায়েল হুসস করে, চুপ নির্দেশক ইঙ্গিত করলো।

জজ অর্ডার অর্ডার বললে সবাই চুপ হয়।সবাই আতংকিত জজ কি রায় দিবেন।

অপূর্বর বুকের ভেতরের হাড় গুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস এর গতিক্রম কমে যাচ্ছে। থমকে যাচ্ছে অপূর্ব। থমকে যাচ্ছে হৃদয়ের

দর্পন। হাইকোর্টের সামনে ভির করে থাকা সবাই আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে। কখন জজ রায় দিবেন।জজ বলতে শুরু করলো, আসামি এলিজা যিনি একজন নির্মম হত্যাকারী। আসামি এলিজার বিরুদ্ধে সমস্ত সাক্ষ্য ,প্রমান এবং আসামির স্বীকারোক্তির ভিত্তিক আসামি এলিজা কে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করা হলো। বাংলাদেশের সংবিধান

অনুযায়ী হত্যাকাণ্ড , এবং পাচারকারী জঘন্য তম অন্যায়। বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী, হত্যাকাণ্ডের ৩০৩ ধারা, এবং পাচারকারী ১০১ ধারা অব্যাহত করে আসামি এলিজা কে ৩০৬ ধারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

আগামী ১৬ মার্চ ২০০০ ”তারিখে আসামি এলিজার মৃত্যুদণ্ড আইনমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এর সিদ্ধান্ত

মোতাবেক ঢাকা ১০০ সিড়ি বিশিষ্ট অচিন পাহাড়ে বিকেল ৪:০০ ঘটিকায় কার্যকর করা হবে।

ভবিষ্যতে যাতে এরকম অন্যায় কাজ কেউ না করে ,তাই সবার স্বচক্ষে আসামি এলিজার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।

রায় শেষে জজ তার কলমটি ভেঙে উঠে চলে যায়।সমস্ত মানুষের কোলা,হলে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে

চারদিক।রায় শুনতে আশা প্রতিটি মানুষ খুশিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে। কিন্তু থমকে গিয়েছে অপূর্ব। নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে অপূর্ব। অপূর্ব ধপাস করে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে।কথা বলার বাকরুদ্ধ হারিয়ে ফেলেছে।আজ প্রকৃতিও থমকে গিয়েছে। আকাশ টা কালো মেঘে ঢেকে গেছে। সমুদ্র আচরে পরছে। অপূর্বর বুকের ভেতর তোলপাড় শুরু হয়,যা পর্বত

পাহাড় ধ্বং,সের মতন। এলিজা কে আদালত থেকে বের করা হয়। এলিজার দৃষ্টি সংযত। এলিজা মৃদু হাসছে। আশেপাশের সবাই দেখছে। সবাই হকচকিয়ে উঠছে।সবাই বলাবলি করছে কতটা নিষ্ঠুর,এই এলিজা। মনে কোন ভয় নেই। মৃত্যুদণ্ডের রায় শোনার পরেও হাসছে।অপূর্ব দ্রুত পায়ে উঠে দাড়ায়। অপূর্ব চট করে দৌড়ে গিয়ে

এলিজার পা জড়িয়ে ধরে, অঝরে কাঁদদে কাদদে বললো, কেন করলে,কেন আমার সাথে এমনটা করলে,কি দোষ করেছিলাম আমি, ধ্বংস করে দিচ্ছ কেন আমায়, বেঁচে থাকতেও যে মরে যাচ্ছি।আমি বাঁচব না, বাঁচব না আমি। এলিজা অপূর্বর দিকে একবার ও দৃষ্টি স্থাপন ও করলো না। কনস্টেবল রা অপূর্ব কে সরিয়ে দেয়। অপূর্ব তাদের সাথে

ধস্তাধস্তি করেও এলিজার দিকে আসতে পারলো না। এলিজা কে নিয়ে যাওয়া হয় , ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। অপূর্ব গাড়ির পেছন পেছন ছুটতে থাকে। অপূর্ব বেঁচে থেকেও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করছে। তিব্র যন্ত্রনায় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

রাত ১০ টা নাগাদ —এলিজা কারাগারে। অপূর্ব কে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়নি। একবার দেখা

করতেও দেয়নি। হাজারবার চেষ্টা করেও এলিজার সাথে একটি বার কথা বলতে পারেনি। অপূর্ব ক্লান্তিময় দেহ নিয়ে কারাগারের সামনে দেয়াল ঘেঁষে বসে আছে। অঝরে কাঁদছে। এই কান্না কোনদিন থামার নয়। অপূর্বর বুকের ভেতর টা দুমরে মুচড়ে যাচ্ছে।যা প্রকাশ করার মত কোন বাকরুদ্ধ নেই।

তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় শ্রাবন। উপস্থিত হয় ডিসি সাহেব। শ্রাবন কাঁপা গলায় অপূর্ব কে হাজার টা প্রশ্ন করলো।যার কোন উত্তর অপূর্ব দিতে পারলো না।একজন কমিশনার আসলো। এলিজা লকাবের এক কোনে ঘাপটি মেরে বসে আছে। কোন নড়াচড়া ও তার মধ্যে নেই। কমিশনার কনস্টেবল কে বললো, শেষ বারের মত ইচ্ছা প্রকাশ করতে

বলো। এবং আমাকে জানাও।বলেই কমিশনার চলে যায়। একজন মহিলা কনস্টেবল লকাবের ভেতর প্রবেশ করে। মহিলাটি মেঝেতে বসলো। এলিজা কে দেখে তার মায়া হয়। শান্ত স্বরে বললো, কিছু বলতে চাও? এলিজা কিছু বললো না। দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলো, তোমার শেষ ইচ্ছা কি? এলিজা মহিলা কনস্টেবলের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করলো। এলিজার

তেজি,রক্ত মাখা চোখ দেখে মহিলাটি কিছুটা অবাক হয়। আবার ও জিজ্ঞেস করলো, তোমার শেষ ইচ্ছা কি? এলিজা অহংকারী স্বরে, বলল ”’আমার শেষ ইচ্ছা আমার স্বামীর বুক পাঁজরে মাথা রেখে ঘুমানো”’কনস্টেবল কথাটি শুনে হতভস্ব হয়ে যায়। ছিটকে কিছু টা দূরে সরে যায়। দৃষ্টি সংযত করলো। পাশে থাকা আরেকজন কনস্টেবল

কে বললো, কমিশনার স্যার কে ডেকে নিয়ে এসো।

কমিশনার স্যার উপস্থিত হয়।

কনস্টেবল বললো,ওনার শেষ ইচ্ছা,ওনার স্বামীর বুক পাঁজরে মাথা রেখে ঘুমানো।

কমিশনার কর্কট স্বরে বলল,এটা ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছা থাকলে বলতে বলো।এটা কখনো ই সম্ভব নয়। অপূর্ব কে সাসপেন্ড করা হবে।

কমিশনার উৎফুল্ল আচরনে চলে যায়।

কনস্টেবল মহিলাটি নতসত হয়ে বসলো। শান্ত স্বরে বললো, তোমার অন্য কোন ইচ্ছা থাকলে বলো। এলিজা কিছুক্ষণ থম মেরে থেকে বললো,একটা সাদা কাগজ এবং একটা কলম দিন।

কনস্টেবল কথা মত সাদা কলম আর কাগজ দেয়। এলিজা ধিরে

ধিরে অনেক কিছু লিখলো।চোখ দিয়ে দু এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পরলো।এক প্রহর দুই প্রহর কেটে যায় অনেক প্রহর। এলিজার লেখা শেষ হচ্ছে না।

অতংপর শেষ হয় লেখা । কাগজটি ভাঁজ করে বললো, আমার শেষ ইচ্ছা পূরন হলো না। কিন্তু এই চিঠিটা আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার পর আমার স্বামিকে দিয়ে দিবেন।

১৬ মার্চ ২০০০

বিকেল ৪:০০ ঘটিকা।

ঢাকার শহরের প্রতিটি মানুষ অচিন পাহাড়ের নিচে অবস্থান করে।সবাই হইহই করছে। নিকৃষ্ট হত্যাক,রীর মৃত্যুদণ্ড দেখার জন্য বেকুল হয়ে আছে সবাই।

এলিজা কে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অচিন পাহাড়ের চূড়ায়। অপূর্ব কে কিছু কনস্টেবল জোড় করে ধরে

রেখেছে। এলিজা এলিজা বলে চিৎকার করছে।

কেউ কেউ অপূর্বর বুক ফাটা কান্না দেখছে। তো কেউ, পাহাড়ের চূড়ায় তাকিয়ে আছে।

শ্রাবন মুখের উপর হাত দিয়ে অঝরে কাঁদছে।ভিরের মধ্যে কাদছে অর্পা। এলিজা কে চুড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঝুলন্ত দড়ির সামনে দাড় করিয়ে দেয়া হয়।

অপূর্ব কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে ছুটে আসতে পারে।একটা ,দুটো করে দ্রুত পায়ে অচিন পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে উপরে আসতে থাকে। অঝরে কাদতে থাকে।এলিজার মুখে কালো কাপড় বাঁধবে,ঠিক তখনই এলিজা বললো, কাপড় টি বাঁধবেন না।আমি মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার স্বামী কে দেখছে চাই। অপূর্ব দৌড়ে

আসতে আসতে ফাসির দড়িতে ঝুলে পরে এলিজা।
অপূর্ব সিড়ি বেয়ে অচিন পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে উঠতে ততক্ষণে এলিজা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। অপূর্ব এসেই আঝাপটা দিয়ে জড়িয়ে ধরে এলিজার ঝুলন্ত পা। শুরু হয় বুক ফাটা কান্না। অপূর্বর কান্নার শব্দে ভেঙ্গে যাচ্ছে অচিন পাহাড়। ভস্য হয়ে যাচ্ছে শস্য শ্যামল।

প্রকৃতির রঙ নিমিষেই বদলে গেছে। আকাশে কালো মেঘের হাতছানি। দিনের আলো নিমিষেই ফুরিয়ে যায়। ধেয়ে আসে অন্ধকার।অপূর্ব এলিজার মৃত দেহ টে জড়িয়ে কাঁদছে।চিৎকার দিয়ে বললো,কেন করলে এমন ,কেন করলে।হও তুমি মহাপাপী,থাকতাম না হয় এই পাপিকে নিয়েই।কেন নিজেকে এভাবে শেষ করলে।কেন আমার

জীবন টা ছারখার করে দিয়ে গেলে। ধ্বংস করে দিয়েছো আমায়।কেড়ে নিয়েছো সুখ।মাটি হয়ে গেছে আমার আনন্দ। চিরতরে শেষ হয়ে গেছি আমি।কেন এমন করলে। অপূর্বর কান্নায় প্রকৃতি ও কাঁদছে।

অপূর্ব এলিজার পা টা চট করে ছেড়ে দেয়।এক কদম-দু কদম করে পেছনে সরে। ঝুলন্ত এলিজার দেহ'খানীর দিকে তাকিয়ে ক্লান্তি

কণ্ঠে বললো, তুমি বেইমান।তুমি ছিলে স্বার্থপর।তুমি ছিলে মিথ্যা বাদি। কথা দিয়েছিলে, চিরদিন আমার সাথে থাকবে। তুমি কথা দিয়েও কথা রাখতে পারোনি।”প্রতিশোধের বি,ষাক্ত নেশায় তুমি আশক্ত ছিলে”আমার পবিত্র ভালোবাসাও পারেনি তোমাকে পরিবর্তন করতে ”।তুমি আমাকে ভালোবাসালে নিজেকে আত্মসমর্পণ

করতে না। আমার হয়েই থাকতে। গুটিয়ে নিতে নিজেকে।দুজনে চলে যেতাম গহীন রাজ্যে।যেখানে আমাদের কেউ পেতো না।

"তুমি মরোনি ,মরোনি তুমি "

জনমে জনমে এলিজা অমর হয়ে থাকবে আমার মাঝে "'

অপূর্ব পেছনের দিকে যেতেই একজন কনস্টেবল ধরে ফেলে বললো,এক্ষুনি পরে যেতেন।

অপূর্ব এলিজার ঝুলন্ত লাশ টিকে মায়ার দৃষ্টিতে পরোক্ষ করে।
এলিজার মৃত দেহ ঝুলছে।
ভির কমে যায় পাহাড়ের নিচ থেকে।
রাত ১২ টা নাগাদ। এলিজার মৃত দেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।
অপূর্ব এলিজার মৃত দেহ টাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে আছে।
আজ কোন ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক

নেই।নেই কোন অঙ্গিকার।থমকে আছে আকাশ,থমকে আছে প্রকৃতি। দূরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে অর্পা।শ্রাবন মেঝেতে লুটিয়ে বসে আছে। বায়েজিদ আপা আপা বলে চিৎকার করছে।মনজুরা মনোরা, হতভম্ব হয়ে দেখছে।কি থেকে কি হয়ে গেলো। জাহাঙ্গীর বাকরুদ্ধ হারিয়ে ফেলেছে। পাপের অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় একজন মহিলা কনস্টেবল।

অপূর্বর কাছে এসে নত হয়ে বললো, এলিজা মৃত্যুর আগে আপনার জন্য, জেলখানায় বসে চিঠি লিখেছে

অপূর্ব দ্রুত হাতে চিঠিটা নেয়। এলিজা কে বুকের মাঝে শুইয়ে চিঠিটা খুললো।

চিঠিতে লেখা

”প্রানের চেয়েও প্রিয় স্বামি। আমি জেলখানা থেকে বলছি। আপনার ভালোবাসা জড়িত কণ্ঠে,ঘৃনিত অহর্নিশি ছিলো ,হৃদয়_হরনের চেয়েও বিষাক্ত।রক্ত মাখা মায়ার চোখে যখন,ঘৃনা দেখতে পেয়েছি, দুমরে মুচড়ে গিয়েছিল আমার হৃদয়।যখন থেকে প্রতিশোধের বি,ষাক্ত নেশায় আসক্ত হয়েছি,তখন থেকে এই দু’চোখ, হৃদয় শুধু

আপনাকে হ’ত্যা করতে চেয়েছে। এঁকে এঁকে বহু বার আপনাকে ‘হ’ত্যা করার পরিকল্পনা করি। কিন্তু কোন এক অজানা কারণে বার বার থমকে গিয়েছে আমার বিষা,ক্ত হৃদয়। বিষা,ক্ত মনের আঙ্গিনায়,ধিরে ধিরে ফুটেছে , ভালোবাসার কলি। আমার মিথ্যা ভালোবাসার মায়াজালে আপনাকে ফাসাঁ তে যেয়ে আমিই ফেঁসে গেছি, আপনার পবিত্র

ভালোবাসায়। জোৎস্না রাতের, অহর্নিশি ঝিলিকের মাঝে উপস্থিত হই, আপনার হৃদয় কেড়ে নেয়ার জন্য। কিন্তু বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, আপনার ঐ মধুরতা কন্ঠ- স্বর। সেই,বাধাকেও অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে_ছিলাম,আপনাকে ভস্য করে দেয়ার জন্য।কিন্তু অজানা কোন বাধায় আমি বেঁধে যাই। বিয়ের মত পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও, ছারখার

করতে চেয়েছি আপনার ঐ বুক’। কিন্তু সেই বুক হয়ে যায় আমার নিদ্রার স্থান। আপনার বুক পাঁজর হয়ে যায় আমার প্রতিদিনের অভ্যাস। প্রতিশোধের বি,ষাক্ত নেশায় আসক্ত হতে হতে, আটকে গিয়েছি আপনার নেশাক্ত ভালোবাসায়।ধিরে ধিরে হেরে যাই, আপনার পবিত্র ভালোবাসার কাছে। অনুভূতি_হীন হৃদয়ে যখন, আপনার ভালোবাসার

অনুভূতি আগ্রতি হয়, তখন ইচ্ছা করতো, আমার হৃদয়টাকে ছুরির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে দেই। তখনই ভেবে নিঃস্ব হতাম,যখনই ভাবতাম যে, মনে আপনাকে ভালোবাসি,সেই মনে আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছি।খুব কষ্ট হতো,যখনই মনে পরতো,যে চোখ দিয়ে, আপনার মায়াবী চোখ গুলো দর্পন করেছি,সেই চোখ দিয়ে আপনাকে

একসময় হত্যা করার দৃষ্টি এঁকেছি । অনেক বার চেয়েছি , আমার হৃদয়টাকে বুক চিরে বের করে আপনার হাতে দিয়ে দেই।যদি সম্ভব হতো, আমার চোখ গুলো খুলে আপনার বুকের উপর রেখে দিতাম। একবার নয় ,বহুবার চেয়েছি, কিন্তু আমি পারিনি।”ভেবেছি,যদি আমার দৃষ্টি চলে যায়,তবে আপনার ঐ রক্তমাখা দৃষ্টি আমি আর দর্পন

করতে পারবো না। প্রতিশোধের বিষা,ক্ত নেশা হেরে যায়,আপনার পবিত্র ভালোবাসার আশরের কাছে। আপনার স্পর্শ, আপনার চাহনি, আপনার কণ্ঠস্বর, আপনার আলতো হাতের ছোঁয়া,জোড় ভ্রুর জোড়াশয় দর্পন,হয়ে ওঠে আমার প্রতিদিনের অভ্যাস'।হিং,স্রী মালাইকা সিকদারিনী থেকে হয়ে উঠি,শান্তময় এলিজা। হিংস্রী মালাইকা,যার মনে ছিল না

ভালোবাসা,যার মনে ছিল না,আবেগ,ছিলো না মিষ্টিময় অনুভুতি, আপনার পবিত্র ভালোবাসার জোড়ে,তার মনে ফুটে ছিলো বসন্তের ফুল। বিষাক্ত মনে জন্মনেয় ভালোবাসা,জন্মনেয় আবেগ, জন্মনেয় মায়ার অনুভূতির ভূষণ।যে হৃদয়ের গহীন আঙিনায় প্রতিজ্ঞা করেছি আপনাকে ধ্বংস করার”সেই হৃদয়ের কার্নিসে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

হই,আপনাকে রক্ষা করার। বলেছিলাম, আপনার বিপদে আমি ঢাল হয়ে দাড়াবো।আমি বেঁচে থাকতে আপনার উপর বিপদের আঁচ ও আসতে দিবো না।সেই,আমি আমার কথা রেখেছি। শেষ বারের জন্য যেদিন,বাবররাজ্যে উপস্থিত হই, আমার অস্তিত্ব সেদিন বরবাদ হয়ে যায়।মৃত্যুর আগেই ,আজরাইল রুপে উপস্থিত ছিলো,চীপস ডুপিয়ালি এবং

ডাঃ ইব্রাহিম। বেঈমানি করেছে আমার সাথে।৫ কোটি টাকার লোভে পরে আমার সমস্ত সত্যি বাংলাদেশ আইনমন্ত্রীর কাছে প্রকাশ করে দেয়। চীপস ডুপিয়ালি এবং ডাঃ ইব্রাহিম চেয়েছিলো,আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে , আইনমন্ত্রীর পুরষ্কিত,৫ কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে বিদেশ চলে যাবে। আইনমন্ত্রী এটাও জেনে গিয়েছিল,এস আই অপূর্ব চৌধুরীর

স্ত্রী,এলিজা চৌধুরী।সেই কিলা,র যাকে খুঁজে বেড়িয়েছি কয়েকটি বছর ধরে।ডাঃ ইব্রাহিম এবং চীপস এর মাধ্যমে আইনমন্ত্রী এবং কমিশনার আমার উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠায়। এবং সেই চিঠিতে বলা হয়,আমি যদি ৭২ ঘন্টার মধ্যে,নিজের স্বীকারোক্তি, এবং সমস্ত অন্যায়, এবং হ,ত্যার দায় যদি স্বীকার না করি তবে,আপনাকে মিথ্যা মামলায়

ফাঁসিয়ে দিবে।এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্ট চেয়ারে বসিয়ে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।কারন, আইনমন্ত্রী এবং কমিশনার জেনে গিয়েছিল আমি আমার জবানবন্দি একবার, ঘুরিয়ে নিলে আমার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ থাকবে না।তাই তারা পরিকল্পিতভাবে আমার উদ্দেশ্যে চিঠি পাঠায়। এবং আপনাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর ষড়যন্ত্র করে।

হিং,স্রি এলিজা সেদিন থমকে গিয়েছিল।থমকে গিয়েছিল আমার হৃদয়।সেদিন আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম আমার আর আমার প্রিয় মহারাজার সাথে পথচলা এখানেই শেষ। আমার জীবনের নীল রঙ নিমিষেই কালো হয়ে যায়। সেদিন আমি ডাঃ ইব্রাহিম এবং চীপস ডুপিয়ালি কে হ,ত্যা করি।আমি মনস্থির করি,আমি আইনের কাছে

আত্মসমর্পণ করবো।কারন কথা দিয়েছিলাম,আমি বেঁচে থাকতে, আপনার বুকে কেউ আঘাত করতে পারবে না।আমি কথা দিয়েছিলাম, আমার জীবনের বিনিময়ে হলেও আপনাকে রক্ষা করবো। সেই আমি আমার কথা রাখতে পেরেছি। ”আমার জীবনের বিনিময়ে আপনার জীবন দিয়ে গেলাম ”।আপনাকে বাঁচাতে একবার নয়, হাজার বার

আমি ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে রাজি। আপনাকে রক্ষা করতে একবার নয়, হাজার বার হাসি মুখে, মৃত্যু কে বরন করে নিতে রাজি। আইনের আদালতে আমি হেরে গেছি, কিন্তু আমি ভালোবাসার আদালতে জিতে গেছি। শুনছেন, হাজার চেষ্টা করেও, আপনার বুক পাঁজরে আর কয়টা দিন মাথা রেখে ঘুমাতে পারলাম না। আপনার ঐ মধুরতা কন্ঠের,ম্যাডাম

ডাকটি আর কয়টা দিন শোনা হলো না। শুনছেন, দুনিয়াতে আমাদের মিলন হয়েও হলো না,ভাগ্যের আতশবাজি জোয়ারে হেরে গেছি। পরপারে না হয়,আমরা নীলতিমি হয়ে জন্ম নেবো। একসাথে নীলাশয় সমুদ্র হাজার বছর ধরে পারি দেবো। যেখানে থাকবে না অন্ধকার,যেখানে থাকবে না, মৃত্যু খেলা,যেখানে আমাদের বিচ্ছেদ হবে না। শুনছেন,

খুব কষ্ট হয়,আমি মরে যাবো সেই ভেবে কষ্ট হয়না, কিন্তু আমি চলে যাওয়ার পর আপনার হাহাকা,র তারনার কথা ভেবেই বুকটা ছারখার হয়ে যাচ্ছে। শুনছেন, আপনার

সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো শিরায় শিরায় বেঁধে আছে। নিয়তির এক কঠিন পরিহাস।অচিন পাহাড় ১০০ সিড়ি বিশিষ্ট সিড়ি বেয়ে উঠে, আপনার ভালোবাসার প্রমান

দিয়েছিলেন।আমিও সেদিন কথা দিয়েছিলাম, আপনার বিপদে ঢাল হয়ে দাড়াব।কিছুটা সময়ের ব্যাবধানে আমার বলা বাক্যটি বাস্তব রুপ ধারণ করেছে।অচিন পাহাড়ে প্রথম বার আপনি আপনার ভালোবাসা প্রমান দিয়েছিলেন,নিয়তের জোড়ে প্রথম ও শেষ বার,আমিও অচিন পাহাড়ে ফাসির দড়িতে ঝুঁলে ভালোবাসার

প্রমান দিলাম।নিয়তি আমাকে আর কয়টা দিন বাঁচতে দিলো না। সৃষ্টিকর্তা চাইলে পরপারে হয়তো আবারো আমাদের মিলন হবে।রোজ হাশরে আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করবো।রোজ হাশরে সৃষ্টিকর্তার কাছে আপনাকে ভিক্ষা চাইবো।আমি পাপী, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা অধম দয়াবান। একবার নয় বারেবারে আপনাকে চাইবো। বিনিময়ে আপনাকে পাবো।

আমি হাসি মুখে আমার মৃত্যু গ্রহন করে নিলাম। আমার প্রানের বিনিময়ে,দিয়ে গেলাম আপনার প্রান। এলিজার প্রানের বিনিময়ে বেঁচে থাকবে অপূর্ব। শুনছেন, কষ্ট পাবেন না।আমি বেঁচে থাকবো আপনার মধ্যে। নিয়তি আমাকে কাঠ গড়ায় এনে দাড় করিয়েছে,বিনিময়ে পরপারে, আপনি আমার পাশে এসে দাঁড়াবেন। আমার প্রিয় মহারাজা

,আপনাকে আমি ভালোবাসি। আজকে শেষ বারের মত বললাম। হয়তো আর কোনদিন বলার সুযোগ হবে না।বুক ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে আপনাকে ভালোবাসি। শুনছেন,ভালো থাকবেন। সবাইকে নিয়ে ভালো থাকবেন।আর হ্যাঁ নামাজে বসে আমার জন্য দোয়া করবেন,যাতে রোজ হাশরেও আমি আপনাকে নিজের করে পাই।ভালো

থাকবেন। নিজের শরীরের যত্ন নিবেন।বাবার সাথে সবসময় সদাচরণ করবেন।অর্পাকে আগলে রাখবেন। শ্রাবন কে বলে দিয়েন,পাখি আমার কাছে ভালো থাকবে।

শেষ বারের মত,বলতে ইচ্ছে করছে,আপনাকে ভালোবাসি, অসম্ভব ভালোবাসি। আমার প্রানের বিনিময়ে দিয়ে গেলাম আপনার জীবন।

ইতি

আপনার আপরাধী

এলিজা।দেখতে দেখতে কেটে যায় ১৫ টি বছর। এলিজার মৃত্যুর পর পরই জাহাঙ্গীর স্ট্রোক করে। ২০০১.০৫.০১ তারিখে জাহাঙ্গীর মৃত্যু বরন করেন।

এলিজা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়াতে জয়তুন, এবং রমজান দুজনেই ভেঙে পরে। একসময় রমজান

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। জয়তুন এখন ও বেঁচে আছে। তবে নিজের শক্তিতে চলার মত অবস্থায় নেই।তাই তাকে দেখা শোনার জন্য অপূর্ব চৌধুরী তার পরিবার থেকে একজন কাজের মহিলাকে ঠিক করে দিয়েছে।যার খরচা অপূর্ব চৌধুরী নিজেই বহন করেন।১৬ মার্চ ২০০০ তারিখে থমকে গিয়েছিল অপূর্ব চৌধুরী। শেষ হয়ে গিয়েছিল একটি

উৎফুল্ল মানুষের হৃদয়।সারাক্ষন মুখে এঁটে থাকা সুখ নিমিষেই ফুরিয়ে গিয়েছিল। হাজারো চেষ্টা, হাহা,কার কাকুতি মিনতি,করেও পারেনি তার প্রিয় মানুষটিকে বাঁচাতে। অপরাধী ছিল তার প্রান প্রিয় স্ত্রী।পরপর ৪২ টা খু,ন করার পর ও তার স্ত্রী ছিল তার কাছে নিষ্পাপ। এলিজার রুপের ঝলক,চুলের দর্পন,মায়াবী হাঁসি,নেশাযুক্ত চোখ, আলতো হাতের

স্পর্শ যা ছিল অপূর্বর প্রতিদিনের অভ্যাস। এলিজার তির্ঝক কণ্ঠ,যে কণ্ঠস্বর অপূর্ব কে বারবার ক্ষতবিক্ষত করে দিতো।প্রতিটি ঘরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে এলিজার স্মৃতি। যে স্মৃতি জড়িয়ে বেঁচে আছে অপূর্ব। এলিজা মৃত্যুর আগে তার ঘরটি নিজ হাতে যেভাবে সাজিয়ে, গুছিয়ে রেখেছে,১৫ বছর পর সেই ঘরটি তেমনি আছে।

এলিজার ব্যবহৃত শাড়ির, স্নিগ্ধ গন্ধ শুঁকে অপূর্বর প্রতিদিনের সকাল শুরু হয়। তার দেয়া প্রথম ও শেষ চিঠি প্রতিদিন নিয়ম করে কয়েক প্রহর বুকে জড়িয়ে রাখে।যেভাবে জড়িয়ে ছিলো এলিজা।আজ এলিজা নেই, কিন্তু তার ফেলে যাওয়া স্মৃতির জোয়ারে ভাসছে অপূর্ব। অপূর্বর মস্তিষ্কের নিউরনের ভাঁজে ভাঁজে মিশে আছে তার প্রিয়তমা স্ত্রীর

স্মৃতি।যা চাইলেও কোনদিন ভুলে যাওয়ার নয়।

অর্পা ,তার মা বাবা , এবং বউমনি চলে যাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেয় কোনদিন বিয়ে করবে না। তার ভাইয়ের দেখা শুনা করবে। রক্তের সঙ্গি হয়ে থাকবে।অর্পা সকালের নাস্তা তৈরি করে অপূর্বর ঘরে আসে। কিন্তু অপূর্ব নেই। দ্রুত পায়ে হেঁটে নিচে আসে।এদিক সেদিক

চোখ বুলিয়ে দেখলো কোথাও নেই। বাড়ির বাহিরে বের হয়।দেখলো বায়েজিদ হাতে তসবিহ নিয়ে পায়চারি করছে।পরনে পাঞ্জাবি।অর্পা ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, বায়েজিদ ভাইয়া, অপূর্ব ভাইয়া কোথায় গেছে?ঘরে তো নেই!

বায়েজিদ অর্পাকে হাতের ইশারায় গেটের বাহিরে দেখিয়ে দেয়।

অর্পা গেটের বাহিরে আসে।এদিক সেদিক পরোক্ষ করে দেখলো, অপূর্ব হাতে ভারবহন লাঠি নিয়ে এলিজার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্বর বর্তমান বয়স ৪৫। কিন্তু দেখে মনে হয় ৬০ বছরের বৃদ্ধা। এলিজা চলে যাওয়ার পর দ্বির্ঘদীন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়। মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পরে।যা সেরে উঠতে ৮ মাস সময়

লেগেছিল। নিজের যত্ন নিতেও ভুলে যায়। অনিদ্রা, পানাহারে থাকতে থাকতে শরীরের বল লক্তি একেবারেই চলে গেছে।

অর্পা অপূর্বর কাছে এগোয়। জ্বলজ্বল চোখে পরোক্ষ করলো। অপূর্বর হাতে বেলিফুল, এলিজার ব্যবহৃত শাড়ি বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে রেখেছে।ডান হাতে ভারবহন লাঠি। হাঁটার জোড় তো সেদিন ই ফুরিয়ে

গিয়েছিল,যেদিন তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে ফাঁ,সির দড়িতে ঝুলতে দেখেছে। বাঁচানোর জন্য পারি দিয়েছিল ১০০ সিড়ি। কিন্তু পারেনি।কারন তার প্রান প্রিয় স্ত্রী নিজেই চেয়েছিল তার মৃত্যু।

অর্পা ভাঙ্গা গলায় বলল, ভাইয়া,ঔষধ খাওয়ার সময় হয়েছে। এভাবে বেশিক্ষণ দাড়িয়ে থাকলে রাতে পা বেথা করবে। আবার অসুস্থ হয়ে

পরবে। অপূর্ব কাঁপা চোখে অর্পার দিকে পরোক্ষ করলো। অপূর্ব বাড়ির উদ্দেশ্যে হাটা শুরু করে।অর্পা অপূর্বর হাত ধরলো। অপূর্ব ফিরে আসতে আসতে,পেছন ঘুরে এলিজার কবরের দিকে একবার দৃষ্টি স্থাপন করলো।

অর্পা অপূর্ব কে সোফাতে বসিয়ে দেয়।

শান্ত স্বরে বললো, তুমি বসো,আমি খাবার আর ঔষধ নিয়ে আসছি। অপূর্ব কে অর্পা খাইয়ে দিতে দিতে বললো, বউমনি চলে গেছে ১৫ বছর। কিন্তু তার উপর থেকে তোমার ভালোবাসা এক চুল পরিমান ও কমেনি। অপূর্ব মৃদু হাসলো। অপূর্ব আজকাল কথা বলে না।তার কণ্ঠস্বর থেকে হ্যা,বা না,ছাড়া কোন

বাক্য সহজে বের হয়না।অপূর্ব কে ঔষধ খাইয়ে দেয়।
তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় শ্রাবন। শ্রাবন অপূর্বর কাছে বসে। অপূর্ব মৃদু হাসলো। শ্রাবন অর্পাকে বললো,খিদে পেয়েছে আমাকেও খাবার দে।
অপূর্ব কাঁপা কণ্ঠে বললো,ফ্যাক্টরিতে সবকিছু ঠিক আছে? শ্রাবন হাতে মোবাইল বের করে বললো,সব ঠিক আছে। আমাদের বাংলাদেশ

গ্লাসকোফ ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্ট থেকে ইনভাইট করেছে। সেখানে আজকে ইভেন্ট।

অপূর্ব শ্রাবণের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে কাপা ঠোঁটে বললো, কিসের? শ্রাবন বললো,সেটাতো গেলেই বোঝা যাবে। আজকে সন্ধ্যায় আমাদের যেতে বলেছে। এবং বিশেষ করে তোকে। অপূর্ব যেতে রাজি হয়।

সন্ধ্যা বেলা শ্রাবন ইভেন্টে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। মমতাজ হাতে ভারবহন লাঠি নিয়ে,কাপা শরীরে শ্রাবনের ঘরে আসে। কাপা কন্ঠে বললো, কোথায় যাস? শ্রাবন মৃদু হেসে বললো, আজকে ইভেন্ট আছে।যেখানে বিশেষ অতিথিদের মধ্যে একজন অপূর্ব।তাই সেখানে যাচ্ছি। মমতাজ খাটের কোনে বসে বললো, অপূর্বর হাঁটতে সমস্যা হয়।

দেখে শুনে নিয়ে যাস।শ্রাবন অপূর্বর ঘরে আসে। শ্রাবন ঘরের ভেতর প্রবেশ করতেই বুকের ভেতর দুবার চাপ সৃষ্টি হয়। এলিজা তার মৃত্যুর আগে ঘরটি যেভাবে সাজিয়ে রেখেছে ঠিক সেরকম সবকিছু। অপূর্ব কাউকে ঘরে প্রবেশ করতে দেয়না।ঘরের জিনিসপত্র পরিষ্কার করতে চাইলে , কাউকে পরিষ্কার করতে দেয় না। অর্পা বিছানা

গুছাতে চাইলে অপূর্ব বারন করে। এলিজা যেভাবে বিছানার চাদর,বালিশ রেখেছে ১৫ বছরের ব্যবধানে সব সেভাবেই আছে। অপূর্ব খাটের উপর বসে আছে। শ্রাবন গলায় কাশি দিয়ে বললো, চল বের হই। অপূর্ব নড়েচড়ে বসল।

শ্রাবন খাটের পাশে দাড়ায়।নত কন্ঠে বললো,আমি তোর কষ্ট টা অনুভব করতে পারি।তোর প্রতিটা মুহূর্ত

আমি উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু তাই বলে নিজেকে এভাবে শেষ করিস না। নিজের যত্ন নে। মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তোল। অপূর্ব ভেজা কণ্ঠে বললো,মুখের হাসিটা সেদিন ই ফুরিয়ে গেছে ,যেদিন আমার ম্যাডাম ,আমাকে ছেড়ে চিরতরে হারিয়ে চলে গেছে।শ্রাবন অপূর্ব কে কিছুক্ষণ বোঝানোর পর, ইভেন্ট এর উদ্দেশ্য বের হয়।

বাংলাদেশ গ্লাসকোব ফরেন্সিক ল্যাবের সামনে হাজার ও মানুষ ভির করেছে। রিপোর্টার, থেকে শুরু করে,গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সবাই উপস্থিত।

অপূর্ব কে দেখে একজন ফরেন্সিক ডাঃ এগিয়ে আসে। ডাঃ জুনায়েদ বললো, মি. অপূর্ব, আজকে বাংলাদেশের অনেক বড়

সায়েন্টিস্ট কে শুভেচ্ছা জানানো হবে। এবং তাকে স্বর্নের মেডেল প্রদান করা হবে। কিন্তু উনি তখন বললো, আমি আমার অর্জন, মি.অপূর্ব চৌধুরীর হাত থেকে নিতে চাই।

অপূর্ব কাঁপা কন্ঠে বললো কে সে? ডাঃ জুনায়েদ বললো, ভেতরে আসুন। জানতে পারবেন। শ্রাবন অপূর্বর এক হাত ধরে রেখেছে।

কিছুক্ষণ এর মধ্যে ই অনুষ্ঠান শুরু হয়।একজন উপস্থাপক তার নিয়মানুসারে কার্যক্রম শুরু করে। উপস্থাপক বলতে শুরু করলো, জীবন মানেই একটা যুদ্ধ।কেউ এই যুদ্ধে হার মেনে যায়,তো কেউ জিতে যায়।জীবনে চলার পথে হাজার ও বাধা বিপত্তি আসে। জীবনে সফল হতে হলে , থাকতে হয় ইচ্ছাশক্তি,থাকতে হয় প্রচেষ্টা,রাখতে

হয় ধৈর্য, এবং অন্যর দেয়া কষ্ট গুলো উপেক্ষা করতে পারলেই সফলতা অর্জন করা যায়। কখনো কখনো নিজের পরিবারের মানুষ গুলো ও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কখনো কখনো কেউ মনের সাথে সাথে,শরীর ও পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। কিন্তু সমস্ত ঝড়ঝাপটা পার হয়েও এগোতে হয় সামনে।

মনে রাখতে হয় ”সফলতার মুল মন্ত্র কষ্ট, বিশ্বাসঘাতকতা, এবং সমালোচনার শিকার ‘।একটি খারাপ পরিস্থিতির জন্য শিকার হতে হয় , সমালোচনার। কিন্তু কখনো কোন পরিস্থিতিতে,অন্যের বলা বাক্য গুলো কানে নেয়া যাবে না।যত অন্যের বলা নিচু কথা গুলো কানে নিবে, মস্তিষ্ক আমাদের তত হয়রানি হবে।তাই সর্বদা নিজের ইচ্ছা শক্তি কাজে

লাগিয়ে সামনে এগোতে হবে। আজকে আমরা আমাদের মাঝে এমন একজন ব্যাক্তি কে সম্মান প্রদর্শন করবো,যে জীবনে অনেক সংগ্রাম এবং যুদ্ধ করে আজকের অনেক বড় একজন সায়েন্টিস্ট হয়েছে। আমরা ডেকে নিচ্ছি আজকের সেরা সফল ব্যাক্তি কে। মঞ্চে উপস্থিত হবে, সায়েন্টিস্ট খুশি।

তৎক্ষণাৎ অপূর্ব হকচকিয়ে উঠে। সবাই কোলাহল সৃষ্টি করে। অপূর্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখলো। এই সেই খুশি যার মুখ এ,সিডে পুড়িয়ে দেয়া হয়।যে চেয়েছিল একসময়,সে অনেক বড় সায়েন্টিস্ট হবে। কিন্তু পরিস্থিতি তাকে আটকে দেয়।সে ছিল পাখির বিশ্বস্ত বান্ধু।পাখি ই সেদিন খুশিকে অনুপ্রাণিত করার জন্য অপূর্ব কে নিয়ে যায়। এবং

অপূর্বর বলা বাক্যে গুলো আজ সফল।মঞ্চে খুশি উপস্থিত হয়।পরনে সাদা রঙের শাড়ি।চুল গুলো খোঁপা। মুখের ডান দিকের অংশ পোড়ারত। তৎক্ষণাৎ খুশিকে মেডেল প্রদান করার জন্য অন্যান্য গুনিমান ব্যাক্তির সাথে অপূর্ব কে ডাকা হয়। শ্রাবন অপূর্ব কে ধরে মঞ্চে নেয়। খুশি অপূর্বর হাত থেকে মেডেল পরে। খুশি হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে

অনেক কথা বললো। খুশির শেষ কথা গুলো ছিল, আমার মুখ যে পুড়িয়ে দিয়েছে,এটা তার ব্যার্থতা। আমার নয়।যারা আমার পোড়া মুখ দেখে ভয় পায়,এটা তাদের ব্যার্থতা, আমার নয়।যে মানুষ গুলো আমাকে, বোঝা মনে করতো, আজকে আমি তাদের দায়িত্ব নিয়েছি।আমি পেরেছি।আমি ১ কে ১০০ তে পরিবর্তন করতে পেরেছি। খুশি

ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমার সফলতার পেছনে দুজন মানুষের অনুপ্রেরণা ছিল।এক আমার মা এবং দ্বিতীয়জন, যিনি আমার পাশে দাড়িয়ে মি.আপূর্ব চৌধুরী।যিনি আমার রক্তের ভাইয়ের থেকেও আপন। আমার রক্তের ভাই আমাকে বলেছিল,আমি কোনদিন সফল হতে পারবো না। কিন্তু তার ভাবনা বদলে দেয় অপূর্ব ভাইয়া।আজকে আমি

আমার মেডেলটি আমার মা এবং আমার ভাই অপূর্ব চৌধুরী কে উৎসর্গ করতে চাই।

আমরা নারী আমরা চাইলেই পারি।

নারি মানে শক্তি নারী মানে ভালোবাসা। “”অসম্ভব শব্দটির মাঝেই লুকিয়ে আছে সম্ভব”””

খুশি খুশির বক্তব্য শেষ করে।

ইভেন্ট এ আসা সবাইকে রাতের খাবার দেয়া হয়।যে যার মত খাচ্ছে।

অপূর্ব মুখ ভার করে চেয়ারে বসে আছে। শ্রাবন অপূর্বর কাদে ভরসা সূচক হাত রাখলো। তৎকালীন সময় উপস্থিত হয় খুশি।

অপূর্ব পরোখ করলো।খুশি অপূর্বর পাশের চেয়ারে বসে ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, “”সৃষ্টিকর্তা ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে না ” আমার মুখে যে এসিড নিক্ষেপ করেছিলো ,বর্ষন,সে ৫ বছর আগে তার

গার্মেন্টসে আগুন ধরাতে পুড়ে মারা যায়।
অপূর্ব টেবিল থেকে এক গ্লাস পানি খেয়ে ,কাপা কণ্ঠে বললো, মানুষ অন্যায় কারীকে ছেড়ে দিলেও নিয়তি ছেড়ে দেয়না”অভিশাপ মানুষ কে উত্তম থেকে উত্তাপ করে দেয়। ধ্বংস করে দেয়।
ইভেন্ট শেষে সবাই যে যার মত চলে যায়।

রাত ১১:৩০ নাগাদ।শ্রাবন প্রতিদিন ঘুমানোর আগে অপূর্বর সাথে দেখা করে।নিয়ম করে আজকেও আসে। কিন্তু অপূর্ব ঘরে নেই। শ্রাবন অবাক হয়।এত রাতে কোথায় যাবে।একা একা বেশিক্ষণ হাঁটতে পার না। কোথায় আবার লুটিয়ে পড়ে যাবে ,,এসব ভাবতে ভাবতে শ্রাবন অপূর্বর ঘর থেকে বের হয়। এদিক সেদিক পরোক্ষ করে দেখলো,৩

তলায় স্টোর ঘরে আলো জ্বলছে। শ্রাবন দ্রুত পায়ে উপরে উঠে।গিয়ে দেখলো, অপূর্ব স্টোর ঘরের ভেতর হাতে কিছু একটা নিয়ে দাড়িয়ে আছে। শ্রাবন ভ্রু কুঁচকে বললো এটা কি?

অপূর্ব কিছু বললো না।শ্রাবন ভালো করে দেখলো। অপূর্বর হাত থেকে বোতলটা নিজের হাতে নেয়, শ্রাবন কাপা কন্ঠে বললো,এটা তো

কেমিক্যাল।যেটা শরীরে পুশ করলে ,তার শরীর থেকে হার্ট বের করে নেয়ার পরেও ১৫ মিনিট বাঁচে।দেখে তো মনে হচ্ছে এটা অনেক দিনের পূরানো।শ্রাবন অপূর্বর চোখে চোখ রেখে বললো,এই কেমি,ক্যাল দিয়ে কি করছিস।আর এটার তো মেয়াদ নেই। অপূর্ব কাপা হাতে বোতলা টা জায়গা মত রেখে দেয়।

বললো,চল ঘরে যাই।

শ্রাবন ভ্রু কুঁচকে বললো,যাবো,আগে বল এটা দিয়ে কি হতো? কেন এটা কিনেছিলিস?

অপূর্ব বললো,বলবো আগে ঘরে চল।

শ্রাবন অপূর্ব কে ঘরে নিয়ে আসে। অপূর্ব কে খাটে বসিয়ে দেয়। শ্রাবন পাশে দাঁড়িয়ে বললো,এবার তো বল, ওগুলো দিয়ে কি হতো?

অপূর্ব বিছানায় শুয়ে বললো, সকালে বলবো।

এখন বললে সমস্যা কি?অপূর্ব চোখের চশমা টা পাশে রেখে বললো,চাদরটা দিয়ে দে। শ্রাবন চাদরটা জড়িয়ে দেয়। অপূর্ব বা কাদ হয়ে সুয়ে বললো,১৫ বছর আগে , কেমি,ক্যাল কেন এনেছি তা সকালে বলবো।এখন বললে সম্পুর্ন ব্যাখ্যা দিতে পারবো না।

শ্রাবন কথা না বাড়িয়ে শুভ রাত্রি বলে চলে যায়।

মমতাজ দু'দিন ধরে শ্রাবণের সাথে সোয়। মমতাজের শরীর টা ভালো যাচ্ছে না।

রাত ৩ টা নাগাদ। মমতাজ বুঝতে পারলো, শ্রাবন বিছানায় নেই। মমতাজ ঘুরে তাকায়। মমতাজ ঝাপসা চোখে উঠে বসে। বাল্ব জ্বালায়। ঘরের চারদিকে চোখ

বুলালো।ঘরে নেই শ্রাবন। মমতাজ ধির পায়ে হেঁটে ঘরের বাহিরে বের হয়। মমতাজ হাতে ভারবহন লাঠি নিয়ে নিচে নামে। মমতাজ দেখলো ,ঘরের দরজা খোলা। বাহিরে কুকুর ডাকছে। মমতাজ কমড়ে হাত দিয়ে কাপা শরীরে বাহিরে বের হয়।টর্চ নিয়ে তাদের পারিবারিক কবর স্থানের দিকে যায়। মমতাজ বুঝতে পেরেছে। শ্রাবন ঘরে না থাকলে,

কবরস্থানেই থাকবে। মমতাজ দেখলো, শ্রাবন পাখির কবরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।হাতে মোমবাতি।কে বোঝাবে মৃত মানুষের ভয়,ভীতি থাকে না। তাদের দুনিয়ার অনুভূতি থাকে না। তারা যে এখন পরপারের স্বরধী।সময়টা পেরিয়ে গেছে ,১৫ বছর হয়। কিন্তু শ্রাবন পরে আছে সেই পূরানো স্মৃতি তে। সারাদিন মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখে।যা সম্য

অভিনয়। নিজের কষ্ট টাকে লুকিয়ে রাখার জন্য ক্ষনিকের অভিনয়। মমতাজ ধির কণ্ঠে ডাকলো শ্রাবন কে। মমতাজের ডাকে শ্রাবণের ধ্যান ভাঙ্গে।ডুবে ছিলো পাখির তিগ্ন স্মৃতিতে।

শ্রাবন হাতের তালু দিয়ে চোখ মুছলো। কবরের পাশে মোমবাতি টা রাখলো। কবরের উপর হাত দিয়ে অশ্রু চোখে বললো,”মানুষ কেন অল্প

সময়ের জন্য জীবনে আসে ”চিরদিনের জন্য কে আসে না।” ভালোবাসার মানুষ কে হারানোর কষ্ট যদি”ভুলে না যাওয়া যায়!তবে কেন সৃষ্টিকর্তা ভালোবাসার মানুষ টির সাথে একই সময় বেঁধে দেয়না!

ঐ পাখি! তুমি চলে গেছো ১৫ টি বছর। কিন্তু তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা সেই প্রথম দিনের মতই অক্ষয় আছে।

তোমার ফেলে যাওয়া স্মৃতি গুলো আমাকে গ্রা,স করে রেখেছে। শ্রাবন মাটিতে লুটিয়ে বসে পরে।মমতাজ আর ডাকলো না। মমতাজ ধির পায়ে হেঁটে ঘরে চলে যায়।ঘরে যেতে যেতে দেখলো, অপূর্বর ঘরের দরজা খোলা। মমতাজ কিছুটা সামনে এগিয়ে উঁকি মেরে দেখল, অপূর্ব নামাজ পরছে। মমতাজ বুঝতে পেরেছে, তাহাজ্জুদ নামাজ

পরছে। অপূর্ব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।কান্নার ধ্বনি মমতাজ এর কানে ভেসে আসছে। মমতাজ ডান দিকে দৃষ্টি স্থাপন করলো। ২ তলার ডান দিকের জানালা দিয়ে কবরস্থান টা দেখা যায়। মমতাজ বিরবির করে বললো, একজন কাঁদছে কবরের কাছে বসে।অন্যজন কাঁদছে তাহাজ্জুদে বসে।

মমতাজ নিজের ঘরে চলে যায়। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললো, আমার দুই ছেলে কে ধৈর্য্য ধারন করার ক্ষমতা দাও।অপূর্ব নামাজ শেষ করে সুয়ে পরে। এলিজার ব্যবহৃত শাড়ি বুকের ভেতর জড়িয়ে ঘুমিয়ে পরে।

রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। অপূর্বর ঘুম ভেঙে যায়।টিপ টিপ করে চোখ মেলে দেখলো, বারান্দায়

কেউ দাঁড়িয়ে আছে।যার শাড়ির আঁচল টা উড়ে চলে যাচ্ছে অনেক দূর।চুল গুলো ধমকা হাওয়া তে উড়ছে। অপূর্ব বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।কাট গলায় বললো,কে তুমি? বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি ঘরের বাহিরে বের হয়। অপূর্ব পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করে। উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকা মেয়েটা চলে যাচ্ছে অজানা পথে।যে

পথের কোন শেষ নেই। অপূর্ব আশপাশ দৃষ্টিজ্বয় করে দেখলো, চারপাশ প্রকৃতিহীন। কোথাও কোন গাছ নেই,শষ্য নেই।যেমন মরুভুমি হয়,ঠিক তেমন যায়গা। সামনে থাকা মেয়েটি হেঁটেই চলেছে। অপূর্ব জোড় গলায় বললো, কোথায় যাচ্ছো?

মেয়েটি নরম কণ্ঠে বললো,অজানা ঠিকানায়।সেটা কোথায়?

যেখান থেকে কেউ কোনদিন ফিরে আসতে পারে না।

কিন্তু তুমি কে?

উক্ত সময় মেয়েটি অপূর্বর দিকে ঘুরে তাকায়। অপূর্ব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পরে। অপূর্ব দেখলো তার সামনে থাকা মেয়েটি আর কেউ নয়, এলিজা।

এলিজা অপূর্বর দিকে হাত বাড়িয়ে জ্বলজ্বল চোখে বললো,চলে আসুন

না। আমার যে আপনাকে ছাড়া থাকতে কষ্ট হয়।চলে আসুন।আমি প্রতি প্রহর আপনার অপেক্ষায় থাকি। অপূর্ব এলিজার হাত টি ধরতেই এলিজা দৌড়ে চলে যায়। অপূর্ব পেছন পেছন দৌড়াতে থাকে। কাট, গলায় বলতে থাকে,দাড়াও। আসছি আমি। চলে যাচ্ছ কেন আমায় রেখে!

ততক্ষণে এলিজা কোথাও গায়েব হয়ে যায়। অপূর্ব উষ্ন মরুভূমিতে বসে পরে। চাঁদনির আলোয় মরুভূমির বালু চিকচিক করছে। অপূর্ব চারদিকে পরোখ করে দেখলো, কোথাও এলিজা নেই। অপূর্ব বুক ফাটিয়ে কান্না শুরু করে। কম্পন ঠোঁটে বললো,কেন আমায় রেখে গেলে!! কেন এভাবে নিঃস্ব

করে গেলে!কাঁদছিস কেন? এই অপূর্ব! সকাল হয়ে গেছে।উঠে পর। অপূর্ব চোখ মেলে তাকায়। আশপাশ পরোখ করলো। শ্রাবন দাঁড়িয়ে আছে। অপূর্বর শরীর থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছে। শ্রাবন ঝুকে বললো, দুঃস্বপ্ন?

অপূর্ব চশমা টা পরে হ্যা সুচক মাথা নাড়ে।

শ্রাবন বললো, বাহিরে চল।ডাক্তার বলেছে প্রতিদিন সকালে ২০ মিনিট হাঁটতে। অপূর্ব বের হয়।

অপূর্ব শ্রাবন কে বললো,তোর প্রশ্নের উত্তর গতকাল দিতে পারিনি।আজ দেবো।

তো বল! কিসের জন্য ঐসব এনেছিলিস?

অপূর্ব বললো, বাড়ির পেছনের দিকে চল। শ্রাবন অপূর্বর হাত ধরে নিয়ে

যায়।একটা গোলাকার জায়গা দেখিয়ে বললো,ঢাকনা টা তোল। শ্রাবন পাতারহ সরিয়ে দেখলো,মাটিতে কিছু পুতে রাখা। আগ্রহ নিয়ে উপরের পাথরের ঢাকনাটা সরায়।দেখলো,তার ভিতরে কিছু মেডিকেলের সিজার এবং ঔষধ। এবং মাঝারি সাইজের রা,ম দা।

শ্রাবন জিজ্ঞেস করলো, এগুলো কয়েক বছরের পূরানো।

অপূর্ব বললো,১৫ বছরের পূরানো।

শ্রাবন হাতে নিয়ে জিনিস গুলো দেখলো।

অপূর্ব ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল এলিজার সমস্ত অতিত যেদিন জেনে গিয়েছিলাম,সেদিন নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছিল। শুধুমাত্র আমার জন্য ওর পরিবার টা বরবাদ

হয়ে গেছিলো। আমার হৃদয়ের জন্য নিতে হয়েছিল হাজার ও হৃদয়।তাই চেয়েছিলাম,আমি নিজেই আমার হৃদয় টা খুলে ওর হাতে তুলে দিবো। এবং আমি যে ১৫ মিনিট বেঁচে থাকবো,সেই ১৫ মিনিট এলিজার কোলে মাথা রেখে মৃত্যু বরন করতাম।শ্রাবন অপূর্বর কাছে এগোয়। মৃদু হেসে বললো,সে

অপরাধী যেনেও তাকে ভালো_বেসেছিস।
অপূর্ব মৃদু হেসে বললো,সে আমার কাছে কখনোই অপরাধী ছিল না। যাকে আমরা ভালোবাসি তাকে কখনো ঘৃনা করা যায়না””’আর যাকে ঘৃনা করি তাকে কখনো ভালোই বাসিনি।

বেলা ফুরিয়ে বিকেলের আগমন। শ্রাবন অপূর্ব বৈঠকখানায় বসে আছে।

অর্পা দু'জন কে চা দিয়েছে। অপূর্ব শ্রাবন কে উদ্দেশ্যে করে বললো, একটা ইচ্ছা পূরণ করবি?

শ্রাবন মৃদু হেসে বললো, এভাবে বলার কি আছে।

অপূর্ব বললো,আজ এখন একবার,তিলকনগর নিয়ে যাবি?

কেন?এলিজার সাথে যেসব জায়গায় হাতে হাত, রেখে হেঁটেছি। শেষ বারের মত সেই জায়গা গুলো প্রদর্শন করতে চাই।

শ্রাবন, অপূর্ব আলি বাড়ি, রুশ রাজ্য, দিগন্ত নদীর তীর শেষ বারের মত প্রদর্শন করে।

ফিরে আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। অপূর্ব বললো, একবার এলিজার কবরের কাছে নিয়ে চল।

শ্রাবন, অপূর্ব দু জন মিলে,পাখি, এলিজা, এবং জয়ার কবর জিয়ারত করে।অপূর্ব শ্রাবন কে জ্বলজ্বল চোখে বললো, আমার সমস্ত সম্পত্তি তোর আর অর্পার নামে লিখে দিয়ে যাবো। কালকেই উকিল কে নিয়ে আসিস।আর তার সাথে ঢাকার ১৮ টি বাড়ি বিক্রি করে সেই টাকা এলিজার নাম করে ,

মসজিদ,মাদ্রাসা, এবং এতিমখানায় দিয়ে দিবি।কারন এসব এলিজার।

শ্রাবন বললো, হঠাৎ এসব বলছিস কেন?

কারন গতকাল এলিজা নিতে এসেছিল।আমি আর বেশিদিন বাঁচব না....অপূর্বর মুখে এরকম বাক্য শ্রাবন কে নাড়ালো। শ্রাবন হাত থেকে চায়ের কাপটা রেখে দেয়। সোফাতে হেলান দিয়ে বসে,আড়

চোখে অপূর্ব কে পরোখ করলো। অপূর্ব শ্রাবণের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো, কষ্ট পেয়েছিস?

শ্রাবন দৃষ্টি সরিয়ে বললো, এরকম টা আর কখনো বলবি না।কাকাকে হারালাম,মায়ের মত ছিল কাকি,তাকেও হারালাম। নিজের জীবনের থেকেও যাকে ভালোবাসলাম অবশেষে তাঁকেও হারিয়ে ফেলেছি।

অপূর্ব ভারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর কথা বললি না!

শ্রাবন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাতের তালু দিয়ে চোখ মুছলো।

তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয় বোরকা পরিধান করা কেউ। কালো বোরকা দিয়ে,পা থেকে চোখ অব্দি ঢেকে রেখেছে। শ্রাবন উঠে দাড়ায়।অর্পা মহিলাটিকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত

পরোখ করলো। মহিলাটি অপূর্বর সামনে এসে বললো, কেমন আছেন স্যার?অপূর্ব এক নজর তাকালো। শ্রাবন অপূর্বর দিকে দৃষ্টি স্থাপন করে বললো,কে ইনি? চিনতে পারলাম না।

অপূর্ব চাপ গলায় বললো,রুমা।

শ্রাবন ভ্রু কুঁচকে আওয়াজ করে হাসলো।এই সেই রেখা যার চাল-চলন নিয়ে আমরা কত হাসাহাসি

করেছি।আর আজ তার কতটা পরিবর্তন।কি করে সম্ভব! শ্রাবন এসব ভাবতেই রুমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, আপনি হঠাৎ এখানে? রুমা পর্দার আড়ালে থেকেই বললো,স্যার অসুস্থ তাই তাকে দেখতে আসলাম। আমি একা আসিনি সাথে আমার মেয়েও এসেছে। শ্রাবন বললো, কোথায়?রুমা ,রুনা বলে ডাকলো। বাহির থেকে ভেতরে আসে ১৪

বছরের রুনা।রুমার একমাত্র মেয়ে। অপূর্ব কে এসেই সালাম করলো। অপূর্ব রুনার দিকে একবার চোখ বুলালো।রুনার মুখের গঠন কিছু টা ভিকার। থুতনির হরন, কিছুটা ভিকার।

অপূর্বর বুকের ভেতর দু'বার চাপ চাপ বেথা হয়। অপূর্বর চোখের সামনে হঠাৎ করেই এলিজার মায়াবী মুখ খানি ভেসে ওঠে।রুমা শ্রাবন

অর্পার সাথে, কিছুক্ষণ অপূর্বর শরীরের অবস্থা নিয়ে কথা বলে। অতংপর স্থান ত্যাগ করে।

রুমা চলে যাওয়ার পর শ্রাবন জিজ্ঞেস করলো,তুই না দেখেই, রুমাকে কিভাবে চিনতে পারলি?

অপূর্ব কিছুটা আওয়াজ করে হেসে বললো,আমি পুলিশ ছিলাম। পুলিশের চোখ আগুনের মত।যার চোখ একবার কাউকে প্রদর্শন

করলে,তাকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মনে রাখে।

অপূর্ব শ্রাবন কে দ্বিতীয় বার বললো, আজকে রাতেই একবার উকিল কে ডেকে নিয়ে আয়। আমার বাঁকি কাজ টা সম্পন্ন করি। শ্রাবন ইতস্তত বোধ করলো। উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে দেখছে অপূর্ব কে। অপূর্ব স্বাভাবিক ভাবেই কথা গুলো বলছে। শ্রাবন তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, সম্ভব নয়।

অপূর্ব শ্রাবণের হাত ধরে বললো, না করিস না। আজকে এখনি নিয়ে আস।শ্রাবন বাধ্য হলো। সন্ধ্যা বেলায় ই বেড়িয়ে পরে, উকিল এর উদ্দেশ্য। অপূর্ব বৈঠকখানা থেকে ছাদে চলে যায়।অর্পা যেতে সাহায্য করলো।অর্পা বললো, তুমি সন্ধ্যা তারা উপভোগ করো।আমি নিচ থেকে আসছি।

অপূর্ব জ্বলজ্বল চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।ঝলমল করছে তাঁরা রা। চাঁদের গা ঘেঁষে মেঘ উড়ে যাচ্ছে। অপূর্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে ভারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।কম্পন ঠোঁটে বললো, হাজার ও তারাদের মাঝে আমার এলিজার বসবাস।সে কত শান্তি তে দূর থেকে আমাকে দেখছে। হাজারো তারা তার সঙ্গী।তার কোন একাকীত্ব

নেই। অথচ, এলিজা_হীন আমি যে প্রতি মূহুর্তে,পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছি। অপূর্ব অঝর বৃষ্টির মত কেঁদে উঠে। কান্না জড়িত কন্ঠে বিড়বিড় করে বললো, এখন ও মনে পরে, তোমার ঝুলন্ত দেহ_টাকে। চোখের সামনে ঝুলছিলে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী। আমাকে বাঁচাতে নিজের প্রান দিয়ে দিলে।এই ঋণ কি কোনদিন শোধ করার !নারী হলো সুখের

ভুষন। আমার সুখ যে ছিল, আমার এলিজা।হৃদয়ের প্রতিটি কর্নারে কর্নারে গেঁথে আছে যার স্মৃতি,তার স্মৃতি গুলো কোনদিন ভুলে যাওয়ার নয়।আমি ভুলে যেতেও চাই না। আমি আসছি, শীঘ্রই আমি আসছি। তুমি’হীন জীবন টা বড্ড বেশি ভারী।যার,ভার_বহন করার মত শক্তি আমার নেই।তাই চলে আসছি

আমি।অপূর্ব কাপা হাতে চোখের পানি মুছলো।

অপূর্ব কারো উপস্থিতি অনুভব করলো। পেছন ঘুরে দেখলো শ্রাবন। শ্রাবন অপূর্বর পাশে এসে দাঁড়ায়। শ্রাবন আকাশের তারা গুলো অপলকে দেখছে।

শ্রাবন অপূর্ব কে নিচে নিয়ে আসে। বৈঠকখানায় বসে আছে উকিল। উঁকিল তার সমস্ত কাগজপত্র তৈরি

করে রেখেছে। অপূর্ব কে বললো,স্বাক্ষর করতে।
শ্রাবন ক্লান্ত চোখে অপূর্বর দিকে পরোখ করে বললো,এখনি এসব করার খুব দরকার?
অপূর্ব মৃদু হেসে স্বাক্ষর করে দেয়। সমস্ত পেপার শ্রাবণের হাতে তুলে দেয়।বললো,ঢাকার ১৮ টি বাড়ি বিক্রি করে টাকা গুলো বিলিয়ে দিস।গরিব, অসহায়, মসজিদ

মাদ্রাসা সহ সকল সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে।

শ্রাবন শ্বাস ফেলে হ্যা সুচক মাথা নাড়ে।রাত ১১ টা নাগাদ ল্যান্ডলাইনে ফোন বেজে উঠলো। শ্রাবন দ্রুত পায়ে ফোনটা রিসিভ করে। ওপাশ থেকে শ্রাবণের এক বন্ধু বললো,শুনেছিস, ৩ জন লোক মিলে একটা মেয়েকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলেছে।তবে, পুলিশের হাত থেকে

অপরাধীরা রেহাই পায়নি। পুলিশ ধরে ফেলেছে। শ্রাবন কাট গলায় বললো,মেয়েটির ঠিকানা কি?নাম কি?

ওপাশ থেকে বললো,মেয়েটি খ্রিষ্টান। নাম রেখা।

শ্রাবন ফোনটা রেখে দিল। অপূর্বর ঘরের উদ্দেশ্যে যায়। অপূর্ব বসে বসে তসবিহ পরছে।ডান হাতে তসবিহ,বাম হাতে এলিজার ব্যবহৃত

শাড়ি। শ্রাবন গলায় কাশি দিয়ে বললো,রেখা কে তো চিনতিস? অপূর্ব ঘুরে তাকায়। অপূর্ব হ্যা সূচক মাথা নাড়ে। শ্রাবন বললো,রেখাকে কেউ,ধর্ষন করে মেরে ফেলেছে।তবে খু'নিদের ও ধরে ফেলেছে।

অপূর্ব তসবিহ টা কপালে ছুঁইয়ে পাশে রাখলো

ঠোঁট কুঁচকে হেসে,নরম গলায় বললো,পাপ মানুষ কে ছেড়ে দেয়না।

এর শাস্তি পেতেই হয়।হয় দু'দিন আগে নয়তো দু'দিন পরে।অপূর্ব বললো,চল একবার কবরস্থানে যাওয়া যাক।

শ্রাবন নিয়ে যায়। শ্রাবন প্রতিদিনের মত,হাতে মোমবাতি নেয়।

পাখির কবরের কাছে শ্রাবন মোমবাতি রাখে। অপূর্ব এলিজার কবরের দিকে ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে আছে।

ভার কন্ঠে বললো,”আমি মরলে আমাকে এলিজার ডান দিকে কবর দিস”কারন আমার বুক পাঁজর ছাড়া যে,এলিজা ঘুমাতে পারছে না ”

“”””

রাত গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। শ্রাবন অপূর্ব কে ঘরে দিয়ে এসে ঘুমিয়ে পরে।

মমতাজ শ্রাবণের দিকে একবার পরোখ করে বললো, আমার বুকের

ভেতর পুড়ে উঠছে।একটু পর পর, চাপ চাপ বেথা হচ্ছে।কি যেন কি হবে। শ্রাবন উপেক্ষা করে বললো, ঘুমিয়ে পরো।ফজরের আজান পরে। তৎক্ষণাৎ শ্রাবনের কানে অর্পার কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। শ্রাবণের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

। শ্রাবন দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বের হয়। শ্রাবনের হাঁটার জোড় শক্তি কমে যাচ্ছে। বুকের ধুকবুকানি বেড়ে

চলেছে। শ্রাবন নিচে আসে। বাড়ির দারোয়ান সামনে পরে, শ্রাবন কাঁপা কণ্ঠে বললো,কি হয়েছে?অর্পা কোথায় বসে কাঁদছে? দারোয়ান কবরস্থানের দিকে দেখিয়ে দেয়। শ্রাবন দ্রুত হেঁটে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

দেখলো, অপূর্ব এলিজার কবরের উপর লুটিয়ে পড়ে আছে।যেভাবে কবর জড়িয়ে ধরে,সেভাবে উপর

হয়ে পরে আছে। আশেপাশে কিছু লোকজন ভির করেছে।অর্পা বুক ফাটিয়ে কাঁদছে। শ্রাবন অপূর্বর কাছে বসে।কাপা হাতে অপূর্বর পাল্স পর্যবেক্ষন করে দেখলো, অপূর্ব আর দুনিয়াতে নেই।শ্রাবন ভাই ভাই বলে চিংকার দিয়ে কেঁদে উঠে। ভেজা কণ্ঠে বললো, আমার ভাই ,এই ভাই ,কি করে এভাবে একা করে রেখে যেতে পারলি।

আমি যে নিঃস্ব হয়ে গেলাম। কাকে, অপূর্ব অপূর্ব বলে ডাকবো।এই ভাই! শ্রাবনের কান্নায় ফেটে যাচ্ছে মাটি। আকাশের রং বদলে গিয়ে ধোঁয়াসা হয়ে যাচ্ছে।

অপূর্বর মৃত দেহ টা নিস্তেজ হয়ে পরে আছে। আশেপাশে মানুষজন ভির করছে। বায়েজিদ পাশে বসে অঝরে কাঁদছে।

থমকে গিয়েছে প্রকৃতি। অপূর্ব নামক মানুষটি চিরতরে হারিয়ে গেছে।চলে গেছে তার,প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে।

শ্রাবন অপূর্বর মৃত শরীর স্পর্শ করে কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো, পরপারে এলিজার সাথে তোর আবার দেখা হোক। পরপারে অপূর্ন জীবনটা এলিজার সাথে পূর্ন হোক।ভালো থাকিস পরপারে। জান্নাতে আমাদের দেখা হবে।

বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়। শ্রাবন অপূর্বর কথা মত এলিজার ডান পাশে কবর দেয়।

শ্রাবন দাঁড়িয়ে আছে কবরের কাছে। কিছুদূরে দাড়িয়ে আছে চাঁদনী।দূর থেকে অপূর্বর কবরটা পরোখ করছে।

বায়েজিদ স্বর্বহারা হয়ে বসে আছে এলিজার কবরের কাছে।

অর্পা ক্লান্ত শরীরে ভাই ভাই বলে কাঁদছে।

‘নিয়তির নিয়মে থমকে গিয়েছে হাজার ও হৃদয়’’’(শেষ অংশ) কিছু চরিত্র তুলে ধরা____

জাহাঙ্গীর যে তার ছেলেকে অসম্ভব ভালোবাসতো।তার ছেলের জীবন বাঁচানোর জন্য নিয়েছিল অন্যের প্রান।তার সাথে লোভ সামলাতে না পেরে হাতিয়ে নেয় তার বন্ধুর

সম্পত্তি। কিন্তু এই পাপের অনুশোচনার দগ্ধে পুড়েছে সারাজীবন।যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন পাপের অনুশোচনায় দগ্ধ ছিলো।ছিলো না মানসিক শান্তি।পাপ মানুষ কে ক্ষনিকের সুখ দেয় তবে চিরস্থায়ী নয়।সূর্য নিজের ভালোবাসার মানুষ হারিয়ে,ভীতিকার থেকে হয়ে ওঠে হা'য়নার মত হিংস্র।

প্রতিশোধের আগুনে তক্ত হয়ে ওঠে। সেই প্রতিশোধের জ্বালে ভুলক্রমে হ’ত্যা করে নিজের প্রানপ্রিয় বন্ধুকে। যে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করলো তার আরেক বন্ধুর হাতে মৃত্যু বরন করে।

অতঃপর,চলে গেলো নির্দোষ একটি মানুষ তাদের প্রান প্রিয় বন্ধু রায়হান।

ডাঃ ইব্রাহিম যিনি লোভে পরে কেড়ে নেয় একটি প্রান। কিন্তু এই পাপকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য নিতে হয়েছিল একাধিক প্রান। টাকার জন্য অন্ধ হয়েছিল, চীপস সহ অনেকে। তাদের মধ্যে কেউ বেঁচে গিয়ে নিজেকে সুদরে নিয়েছে।তো কেউ শাস্তি পেয়েছে।শ্রাবন "তার ভালোবাসার মানুষটি বেঁচে থাকবে ৬ মাস, জেনেও তাকে বিয়ে করে।

অতংপর থমকে যায় তার ও হৃদয়। বেঁচে আছে তার স্মৃতি নিয়ে। ভাগ্যর নির্মম পরিহাসে যুক্ত হয় মালাইকা।মালাইকা ছিল শান্তিপূর্ণ,ভীতিকার, মেয়ে।যে অল্প আচেই কেঁদে উঠতো। সামান্য ধমকে বুক কেঁপে উঠতো। কিন্তু,সেই মালাইকা তার পরিবার হারানোর বেদনায় হয়ে ওঠে হিংস্রি এলিজা। প্রতিশোধের বিষাক্ত নেশায়

আসক্ত হয়ে যায়। নিয়েছিল একাধিক প্রান। কিন্তু অতংপর থমকে যায় ভালোবাসার কাছে।

যার প্রান নেয়ার জন্য যার চোখে ঘুম আসতো না, কিছু টা সময়ের ব্যবধানে তাকে বাঁচানোর জন্য ঝুলেছিলো, ফাঁসি নামক দড়িতে। প্রতিশোধ নামক শব্দের জন্য, এলিজা হয়ে উঠেছিল, ”শান্ত থেকে সাংঘা’তিক।

কিন্তু পবিত্র ভালোবাসার জোয়ারে হেরে যায় এলিজা।

নিয়তির নির্মম পরিহাসে,হেরে যায় ভালোবাসার আতশবাজির জোয়ারে।

তার সাথে চিরদিনের জন্য থমকে যায় অপূর্ব নামক মানুষ টি।বেচে থেকেও প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর স্বাদ পাচ্ছিল। অতংপর চলে যায় তার প্রিয়তমা স্ত্রীর কাছে।

একটি ভুলের জন্য থমকে গিয়েছিল হাজার ও জীবন। শেষ হয়েছিল হাজার ও পরিবার।

বর্তমান কর্মের উপর নির্ভর করে আগাম দিনের পরিচ্ছেদ। সময়ের সাথে সাথে মানুষ বদলে যায়।বদলে যায় তাদের আচরন।”সময় মানুষ কে শান্ত থেকে করে তুলে সাংঘাতিক ”

”সময় মানুষ কে করে তুলে উত্তম থেকে উত্তাপ ”

সময়ের তারনায় শান্ত নদীর জোয়ার ,তিগ্ন হয় ভারী জোয়ারে”

যে জোয়ার ভাসিয়ে নিতে পারে অন্ধকার থেকেও গহীন অন্ধকার জগতে ”

রুপের ঝলক বৈষম্য মাত্র “সফলতা অর্জন করতে রুপের বাহার

প্রয়োজন নেই ’’দরকার চেষ্টা _প্রচেষ্টা ’’

হাজারো বাঁধা বিপত্তি পার হয়ে সফল হয়েছিল খুশি’’

“আমরা নারী চাইলেই পারি”